কেনোপনিষদ

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Keno Upanishad*
before the students of Ramakrishna Vivekananda University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

সামবেদীয়শান্তিবচনম্

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং। মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময় সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

(আমার অঙ্গসমূহ বাক্, প্রাণ চক্ষু, শ্রোত্র বল ও সব ইন্দ্রিয় পুষ্টি লাভ করুক। বস্তুমাত্রই স্বরূপতঃ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁর সাথে আমার এবং আমার সাথে তাঁর নিত্য অবিচ্ছেদ হোক। সেই পরমাত্মায় সতত নিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ধর্ম সমূহ হোক; আমাতে তাই হোক। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।)

বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বা হিন্দু সংস্কৃতি বা হিন্দু শব্দকে সরিয়ে শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির কথাই যদি বলা হয় তাহলে দেখা যাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সব কিছুর উৎস হল বেদ। আজ হিন্দু ধর্মে আমরা যা কিছু পাই, তার সবই বেদ থেকে এসেছে। এমনকি যারা পুরোপুরি ভোগবাদী, ধর্মের ব্যাপারে, সংস্কৃতির ব্যাপারে কিছুই জানে না, বোঝে না, তারাও তাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু করছে সেগুলোর উৎসকে যদি জানার চেষ্টা করা হয় দেখা যাবে সব কিছু বেদের কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। কিন্তু এটাই দুর্ভাগ্য যে ভারতে আজ মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেদের পণ্ডিত ছাড়া কেউ বেদ পড়েও না, কেউ বোঝেও না, বোঝার চেষ্টাও করে না। কেন পড়ে না, কেন বোঝে না, এর অনেক কারণ আছে। তবে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে আমাদের সমগ্র জীবন জুড়ে যা কিছু হচ্ছে সব কিছু সরাসরি বেদে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে। জন্ম হলে তার অন্নপ্রশান করতে হবে, বেদের আদেশ। বিবাহে যে মন্ত্রের ব্যবহার হয় সরাসরি বেদ থেকে আসছে। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে যে বিবাহ হয় এও সেই বেদে থেকে আসছে। মৃত্যুর পর মৃত শরীরকে যে অগ্নিতে সৎকার করা হয়, বেদ থেকে আসছে। দাহকার্যের সময় যে মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় সেও বেদ থেকে আসছে। আমরা যে রাম বলছি, কৃষ্ণ বলছি, এই নামগুলো রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা এই শাস্ত্র থেকে আসছে। এই শাস্ত্রগুলোর মূল রচনা যাঁরা করেছেন, বাল্মীকি, ব্যাসদেব, এনারাও বেদকে আধার করেই এই সব শাস্ত্রের রচনা করেছেন। শুধু চরিত্রগুলো পাল্টে যাচ্ছে। পুলি পিঠের ভেতরের পুর সেই এক কিন্তু বাইরের আকৃতিগুলো পাল্টে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনি সব শাস্ত্রের ভেতরের সার সেই এক কিন্তু তার বাইরের আকৃতিগুলো আলাদা আলাদা।

বেদ শব্দ আসে বিদ্ ধাতু থেকে, বিদ্ মানে জানা বা জ্ঞান। বেদ মানে জ্ঞান রাশি। হিন্দু ধর্মের যাবতীয় জ্ঞান রাশি সব বেদেই আছে। জ্ঞান রাশি বলতে ক্ষুদ্র কিছু নয়, জ্ঞান রাশি যেমন বিশাল তেমনি বেদও বিশাল। বেদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জীবনে কৃতার্থ হওয়া, বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের জীবনকে কিভাবে ধন্য ও সার্থক করে দেওয়া যায়। মানুষের জীবনকে ধন্য করার জন্য অনেক রকম কর্ম আছে। যেমন কেউ চুরি-চামারি করছে, কেউ ঘুষ নিচ্ছে, কেউ খেটে রোজগার করছে, কেউ রাজনীতি করছে, কেউ লটারির টিকিট কাটছে, কেউ আবার শেয়ার মার্কেটে যাচ্ছে, এই রকম অনেক ধরণের কর্মের মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনকে ধন্য করতে চাইছে। কিন্তু আমাদের ঋষিরা বললেন, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই যে সৃষ্টিকে তুমি দেখছ, এই পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র দেখছ, তোমার এই দৃশ্যমান সৃষ্টিটা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খুবই ছোট্ট একটা নগন্য অংশ। এই সৃষ্টির পেছনে একটা সূক্ষ্ম জগৎ আছে,

সেই সূক্ষ্ম জগতের পেছনে আরও সূক্ষ্ম জগৎ আছে। যত সূক্ষ্ম জগৎ থাকতে পারে, সব সূক্ষ্ম জগতের যে চালিকা শক্তি সবটাই আলাদা আলাদা। যদি ঐ শক্তিগুলোকে পূজা বা আরাধনা করা হয় তাহলে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

জীবন চালাতে গেলে আমাদের টাকা-পয়সার দরকার, টাকা-পয়সা উপার্জন করার জন্য নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর দরকার, ইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয় করার জন্য নিজের ক্ষমতা লাগে, প্রভুত্ব দরকার, যাকে পছন্দ করি না তাকে নাশ করতে লাগে, আর সব শেষে মৃত্যুর পর আমি যেন একটা ভালো স্বর্গে থাকতে পারি। মৃত্যুর পর যদি পুনর্জন্ম হয় আমি যেন ভালো কোথাও জন্ম নিতে পারি। এরপর আরও আছে, যার সন্তান হচ্ছে না, তার সন্তান চাই, তারপর বিভিন্ন পশু, কীট, পতঙ্গের উপদ্রব আছে, সাপের উপদ্রব আছে, ভূতের উপদ্রব আছে, আবার কারুর জুয়া খেলার নেশা আছে, সুরাপানের নেশা আছে। এগুলো থেকে আমাকে কিভাবে বাঁচাতে হবে? বেদ বলছে এর সব কিছু থেকে বাঁচার পথ আছে। কিভাবে? মন্ত্র দিয়ে। যার জন্য দেখা যায়, আমাদের জীবনের হেন জিনিস নেই যার মন্ত্র বেদে পাওয়া যাবে না। বৃষ্টি হচ্ছে না, এই নাও তার মন্ত্র, এই মন্ত্র দিয়ে তুমি যজ্ঞ কর বৃষ্টি এসে যাবে। বৃষ্টি বেশি হচ্ছে, বৃষ্টিকে আটকাতে হবে, বেদ বলছে তারও মন্ত্র আমার কাছে আছে। মজা করে বলা হত, তোমার যদি গরু হারিয়ে যায় তুমি বেদে গিয়ে খোঁজ গরু পেয়ে যাবে। মূল কথা হল আমাদের জীবনে এমন কিছু নেই যেটা বেদে পাওয়া যাবে না।

কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনকে চালায়। কথা ও কাজের পেছেন মনের একটা শক্তি কাজ করে, যেখানে চিন্তা ভাবনা হয়। সেইজন্য এর একটা প্রচলিত পরিভাষা হল কায়মনোবাক্য বা সহজ ভাষায় বলা যায়, শরীর, মন ও বাণী। চুপচাপ বসে আছি, বাণী কাজ করছে না, শরীর কাজ করছে না কিন্তু মন তখন কাজ করে। মানুষ ঘুমিয়ে আছে তখনও মন কাজ করে, গভীর নিদ্রাতেও মন কাজ করে। যার জন্য সুষুপ্তি থেকে যখন মানুষ ফিরে আসে তখন বলে 'কি দারুন ঘুমিয়ে ছিলাম আমার কিছুই হুঁশ ছিল না'। তার মানে মন তখনও কাজ করছে, কারণ তার এই বোধটা আছে যে আমার কিছু মনে নেই। একজনের অনেক টাকা ছিল, সব টাকা হারিয়ে গেছে, তখন সে যেভাবে বলে আমার এত টাকা ছিল সব চলে গেছে, মন ঠিক সেভাবেই বলে আমি এমন ঘুমের ঘোরে পড়েছিলাম যে আমার কোন হুঁশ ছিল না, আমার কিছু মনে নেই। ওই গভীর নিদ্রাতেও তার মন কাজ করছে, তার ওই অভাব বোধটা জেগে যাচ্ছে। মন যত চঞ্চল হয় কথাও তত চঞ্চল হয়, ক্রিয়াও তার তত চঞ্চল হয়। বসে বসে হাত নাড়ছে, পা নাড়ছে, তার মানেই মন এখন চঞ্চল। চঞ্চল মন বানরের মত। আর যখন বকর বকর করে যাচ্ছে, টিয়া পাখির মত ট্যাঁ ট্যাঁ করেই যেতে থাকে। বানর আর টিয়া এই দুটোর মধ্যেই মানুষের জীবন ঘুর ঘুর করতে থাকে। কদাচিৎ কখন মানুষ যদি শান্ত হয়ে যায় তখন সে আরও গভীর ও সূক্ষ্ম জিনিসকে ধরতে পারে। মন যখন শান্ত হয়, তখন তার বাক্ শান্ত হয়, তার ক্রিয়াও শান্ত হয়, তখন তার মন অন্য একটা অবস্থায় গিয়ে আরও গভীরে সূক্ষ্ম জিনিসকে ধরে। ওই গাম্ভীর্য যখন আরও বেড়ে যায় তখন তার জ্ঞানের সীমা আরও বাড়ে। যাঁরা সত্যিকারের কবি হন তাঁরা সবাই নৈঃশব্দের অনুশীলন করেন। একটা কবিতা মনের গভীর থেকে বেরিয়েছে নাকি শব্দের রচনা থেকে এসেছে, চারটে লাইন দেখলেই বোঝা যায়, কবিতার শব্দগুলোকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে নাকি হৃদয়ের গভীর থেকে শব্দগুলো বেরিয়ে এসেছে স্পষ্ট বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লেই বোঝা যায় যে সেখানে একটা contemplating silence ছিল, একটা meditative silence ছিল। মন যত গভীরে যায় জ্ঞান তত গভীর হয়। সেখান থেকে আরও যদি গভীরে মন চলে যায় তখন মন এই জগতকে ছেড়ে দিয়ে জগতের ক্রিয়ার পেছনে যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে তাঁরা তখন দেখতে শুরু করেন। ঠাকুর বলছেন, সবাই বাগানবাড়ির ঐশ্বর্যই দেখে, বাগানবাড়ির যিনি মালিক তাঁর কেউ খোঁজ নেয় না। যদি কেউ মনের গভীরে চলে যান তখন তিনি সৃষ্টির তত্ত্বগুলোকে ধরে নিতে সক্ষম হন। তাঁদেরকেই আমরা ঋষি বলি। সৃষ্টির তত্ত্বকে জানা মানে, যে সিদ্ধান্তের উপর স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ চলছে সেই সিদ্ধান্তগুলোকে জানা। এই সূক্ষ্ম জগতের জন্যই আবার স্বর্গলোক, পাতাললোক যত লোক

চলছে। যাঁরা এর থেকে আরও গভীরে চলে যান তাঁরা স্রষ্টার মুখোমুখি হয়ে যান। তার মানে তাঁর কাছে তিনটে জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায়, স্রষ্টা, সৃষ্টি তত্ত্ব ও সৃষ্টি।

মানুষ মাত্রই সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বেশি আগ্রহ। যত পণ্ডিত আছেন, ডিগ্রিধারীরা আছেন সবাই সৃষ্টিকে নিয়েই আছেন। দার্শনিকরা সৃষ্টি তত্ত্বের দিকে যান। কিন্তু বড় বড় ঋষিরা ওই সৃষ্টি তত্ত্বের আরও গভীরে নিজেকে স্বয়ং স্রষ্টার কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ করেন। স্রষ্টার মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার পর বলা মুশকিল, তিনি কি কোন মানুষ নাকি ভগবানের দূত নাকি সাক্ষাৎ ভগবান। এটা জানার কোন উপায় নেই। এখন আমরা জানি, মহম্মদ স্রষ্টার কাছে গিয়েছিলেন তাই তাঁকে পয়গম্বর বলা হয়, যীশু গিয়েছিলেন তাই তাঁকে son of God বলে, আমরা ঠাকুরকে ভগবান বলছি বা অবতার বলছি। এভাবে আমরা কাউকে বিচার করে জানতে পারব না। তবে আমাদের আছে এক দীর্ঘ পরম্পরা, আমাদের গুরু বলে দিয়েছেন ঠাকুর অবতার, তাই ঠাকুর অবতার। বৈষ্ণবরা তাঁদের পরম্পরায় শুনে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ অবতার, তাই শ্রীকৃষ্ণ অবতার। এর বাইরে আমাদের জানার কোন উপায় নেই। যদি হিসেব করে বলা হয় কে অবতার হবেন, son of God কে হবেন বা পয়গম্বর কে হবেন, এগুলো এভাবে কোন দিন জানা যাবে না। শুধু দেখতে হয় তিনি কি নিয়ে কথা বলছেন, সৃষ্টি নিয়ে বলছেন নাকি সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে বলছেন বা নাকি স্রষ্টাকে নিয়ে বলছেন। আর তাঁর কথা শুনলে বোঝা যায় তাঁর কথায় কতটা গাম্ভীর্য আছে, তাঁর বক্তব্য কতটা সহজ সরল। এর আরেকটা পরীক্ষা হল, সময়ের সাথে সাথে তাঁর বিস্তার হতে থাকে, বেশি বেশি মানুষ তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে। একজন আচার্য আর ঋষির এখানেই তফাৎ হয়ে যায়। একজন আচার্য যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁর শিষ্যরা তাঁদের গুরুর নাম করবে, আচার্যের মৃত্যুর পরেও কিছু দিন তাঁর নাম থাকবে, শিষ্যরাও যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাঁর নাম থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে তিনি ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে যাবেন। কিন্তু একজন ঋষি যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তাঁর নাম থাকবে না, মৃত্যুর পরেই তাঁর নাম চারিদিকে ছড়াতে থাকে। আজও যদি কেউ ভগবান বুদ্ধের উপর একটা ভালো কোন বই লেখে মানুষ আগ্রহ নিয়ে পড়বে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দকে নিয়ে লিখলে সেভাবে কেউ পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করবে না, গবেষকরা হয়ত গবেষণার কাজের জন্য পড়বে। ঠাকুর ১৮৮৬ সালে দেহ রাখলেন, দিনে দিনে ঠাকুরের নাম আরও ছড়িয়ে পড়ছে। স্বামীজীর নামে এখনও কত লোক কত কিছু লিখে যাচ্ছে, স্বামীজীর নামে কত রকম সংস্থা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রের উপর যদি কেউ ভালো কিছু কাজ করে লোকেরা আগ্রহ নিয়ে দেখতে আসবে। এটাই হল একজন আচার্য আর ঋষির তফাৎ। পয়সা খরচ করে, কত দূর দূর থেকে মানুষ আমাদের এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছে। শাস্ত্রের কথা কে বলছেন? একজন ঋষি বলছেন। একজন শিক্ষকের কথা হলে এভাবে কেউ আসত না। ঋষি মানে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অবতার, পয়গম্বর, সবটাকে মিলিয়েই বলা হচ্ছে। এনাদের কথাই আমাদের মর্মস্থলে খুব গভীরে গিয়ে স্পর্শ করে।

আমাদের যা কিছু সব মনকে নিয়েই চলে, মন যখন শুধু দেহের দিকে, ইন্দ্রিয়ের ভোগের দিকে থাকে আমরা তখন সেই মনকে স্থূল বলি, মন যখন নিজের মত থাকে আমরা ওটাকে সূক্ষ্ম বলি আর মন যখন চৈতন্যের দিকে চলে যায় তখন ওটাকেই আমরা ঠিক ঠিক সূক্ষ্মতর বলি। তিনটে জিনিস মানুষের মধ্যে সব সময়ই কাজ করছে, স্থূল ভাব, সূক্ষ্ম ভাব ও সূক্ষ্মতর ভাব। কেউ হয়ত নাচ, গান নিয়েই আছে, তাকেও যদি ঠাকুরের একটা দুটো কথা বলা হয় হঠাৎ তারও খুব ভালো লাগবে; আহা! কি সুন্দর কথা। মনে হবে কোন কারণে তার মন তখন আত্মার দিকে ঘুরে ছিল। তাই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই মনটা তার ঐদিকে চলে গেল। এই জিনিসটাই, যীশু বা ঠাকুরের সব সময় চলছে। ওনাদের মনটা সব সময় ঈশ্বর তত্ত্বেই বিচরণ করছে। সাধারণ লোক আর অবতারের মধ্যে এটাই তফাৎ। অবতার সব সময় ঐ তত্ত্ব নিয়েই থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন কখন সখন ঈশ্বরের দিকে যায়, গিয়েই আবার স্থূলের দিকে চলে আসে। ঋষিরা সব সময় সৃষ্টি তত্ত্ব আর স্রষ্টাকে নিয়েই আছেন। এভাবে থাকতে থাকতে তাঁদের সামনে সত্যগুলো নিজেই ভেসে ওঠে। ঋষিরা চিন্তা ভাবনা করে কিছু পান না।

উনি হয়ত সারা জীবন সাধনা করে একটি মাত্র কথা বললেন, যদিও ঋষিরা একটি কথা বলেন না, অনেক কথাই বলেন, যে কথাই তিনি বলেন আর সেই কথা যেভাবে এসেছে অনেক সময় হয়ত সেই ভাবেই রেখে দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় ঋষির শিষ্যরা, শিষ্য বলতে তাঁর সন্তানও হতে পারে, তারা ওটাকে মুখস্ত রাখার জন্য ছন্দোবদ্ধ করে দিত। এই পরম্পরা যাতে না হারিয়ে যায় সেইজন্য শিষ্য পরম্পরায় ঋষিদের কথাগুলো মুখস্ত রাখা হত। সৃষ্টি তত্ত্ব আর স্রষ্টা এই দুটোর মধ্যে ঋষিরা যে বাচ খেলতেন, সেখান থেকে ঋষিদের কাছ থেকে যে জ্ঞানরাশি এসেছে, এই জ্ঞানরাশিকেই বলা হয় বেদ।

বেদের মূল ধর্ম ছিল প্রার্থনা আর যজ্ঞ। স্রষ্টা ঋষিদের সামনে যে সত্যগুলোকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেগুলোকে বিভিন্ন ভাবে ছন্দোবদ্ধ করে মন্ত্র রূপে দেওয়া হয়েছে, এর মোটামুটি দুটো category আছে। প্রথমটা হল কিছু মন্ত্রকে ওনারা শুধু স্তুতি বা প্রার্থনার জন্য ব্যবহার করতেন। এই স্তুতিগুলো একটা বিশেষ ছন্দে বাঁধা, এই ছন্দকে বলা হয় ঋক্ ছন্দ। ঋক্ ছন্দে যে মন্ত্রগুলোকে প্রার্থনার জন্য ব্যবহার করা হয়, এগুলোকে ঋচা বলা হয়। সব ঋচাগুলোকে যেখানে রাখা হয়েছে সেটাকেই ঋগ্বেদ বলা হয়। আবার কিছু মন্ত্র আছে যে মন্ত্রে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া যায়। কিছু কিছু মন্ত্র আছে যে মন্ত্রে আহুতি দেওয়া যায় না। ইদানিং অনেকে গীতা যজ্ঞ করেন, চণ্ডী যজ্ঞ করেন, সেখানে গীতা বা চণ্ডীর একটা করে শ্লোক বা মন্ত্র বলে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। এগুলো অবশ্য পরবর্তি কালের সংযোজন, কিন্তু মূল হল বেদ, সেখানে সব পরিষ্কার এই এই মন্ত্রে স্তুতি করা হবে আর এই এই মন্ত্রে যজন্ বা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হবে। ঋগ্বেদের মন্ত্র স্তুতির জন্য আর যজুর্বেদের মন্ত্র যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য।

বেদের ঋষির সংখ্যা বিশাল, সেখানে ঋষিদের বংশের অনেক তালিকা আছে। এত এত ঋষিরা সবাই যদি একটু একটু করেও অবদান দিয়ে থাকেন তাতেই জ্ঞানরাশি বিশাল আকার ধারণ করে নেবে। হিন্দুদের একটা প্রচলিত কাহিনী আছে যে, বেদ নাকি একটা সময় লোপ হয়ে যায়। একটু আগে আমরা বললাম ঋষিরা যেন স্রষ্টা বা ভগবানের মুখোমুখি হয়ে যান, সেখানে তাঁরা তাঁরই কথা যেন স্পষ্ট শুনছেন। ওই কথাগুলোকে একদিক থেকে দেখলে ঋষিবাক্য আবার অন্য দিক থেকে দেখলে ঈশ্বরীয় কথা হয়ে যায়। মা কালী ঠাকুরকে ভাবমুখে থাকতে বলছেন, ঠাকুরের আগে আমরা ভাবমুখে থাকার কথা শুনিনি। ভাবমুখে থাক, এই কথা একদিক থেকে মনে হবে ঠাকুরের কথা আর যারা ভক্ত তারা বলবে এটা তো ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বর সাক্ষাৎ বলেছেন। কোরানেও ঠিক একই জিনিস হয়, মহম্মদ বলছেন, এই কথা আমাকে আল্লা বলেছেন। তাই কোরানের কথা আল্লার কথা। বেদের ঋষিদেরও একই ভাব ছিল, এগুলো আমার রচনা নয়, বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এগুলো আমি কিছু করিনি, সবই ঈশ্বরীয় কথা। সেইজন্য হিন্দুরা মনে করেন বেদ ভগবানের মুখ থেকেই বেরিয়েছে। বেদ কোন মানুষের রচনা নয়, মানুষকে আমরা বলি পুরুষ, সেইজন্য বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়। ঠাকুর বার বার বলছেন, মা আমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন বা আবার বলছেন, মা আমাকে রাশ ঠেলে দেন। ঠিক তেমনি বাইবেলে যীশু যে কথা গুলো বলছেন সেই কথা গুলোও ঈশ্বরীয় কথা। ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বেশি দিন চলবে না, কালের সাথে সেই কথাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সেদিক থেকে বাইবেল, কোরানও বেদ অর্থাৎ জ্ঞানরাশি। হিন্দুদের মতে বেদও একটা সময় হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া মানে, জ্ঞানরাশি লুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমান কালের ভারতবর্ষের এই অবস্থাই হয়েছে। দুদিন আগে এক রাজ্য সরকার থেকে ফতোয়া জারি করা হয়েছে যে রাম শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, সেইজন্য রামধনু শব্দ থেকে রাম শব্দ সরিয়ে দিয়ে এখন থেকে বলা হবে রঙধনু। এইভাবে বেদ মাঝে মাঝে লুপ্ত হয়ে যায়। ভগবান তখন আবার বেদকে উদ্ধার করেন। কোন এক সময়ে বেদ হারিয়ে যাওয়ার পর ভগবান মীন অবতার হয়ে বেদ উদ্ধার করেছিলেন। ভগবান আবার এক সময় বরাহ অবতার হয়ে পৃথিবীকে জলের উপর রাখলেন আর তার সাথে বেদের জ্ঞান দিলেন। বক্তব্য হল এই জ্ঞানরাশি একটা সময় হারিয়ে যায়। কারণ এই জ্ঞানরাশি পরম্পরা চলতে থাকে, মাঝখানে কোন শিষ্য মারা গেলেন বা তিনি কোন শিষ্য পেলেন না, তখন জ্ঞানরাশি হারিয়ে যায়।

এইভাবে চলতে চলতে আমরা ব্যাসদেবকে পাই। যদিও আখ্যায়িকা, বলা হয় যে ব্যাসদেব হলেন শেষ অবতার যিনি বেদকে আবার নতুন করে নিয়ে এলেন। এমনিতেই সেই সময় ব্যাসদেবের বিরাট নাম ও সম্মান ছিল। তাঁর অনেক নামকরা শিষ্যরাও ছিলেন। সেই সময় ভারতের যেখানে যেখানে বেদের জ্ঞানরাশি ছড়িয়ে ছিল, ব্যাসদেব নিজের কর্তৃত্ব দিয়ে বেদের সব জ্ঞানরাশিকে এক জায়গায় সংগ্রহ করলেন। সংগ্রহ করার পর চারিদিকে যত বেদের জ্ঞানরাশি ছড়িয়ে ছিলে সবটাকে তিনি চারটে অংশে সাজালেন। এখন আমরা যে বেদ পাই, এই বেদ দেখলেই বোঝা যায় যে কেউ সব কিছুকে সুন্দর ভাবে একটা ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছেন। যত স্তুতি ছিল সব স্তুতিকে ব্যাসদেব এক জায়গায় সাজিয়ে তার নাম দিলেন ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদেরই যে মন্ত্রগুলিকে আহুতিতে ব্যবহার করা হত সেগুলোকে আর তাছাড়া আরও যা কিছু ছিল যেগুলো ঋচা নয় অর্থাৎ ঋক্ ছন্দে নয়, সেগুলোকে একটা জায়গায় সংগ্রহিত করে তার নাম দিলেন যজুর্বেদ। ঋচার যে মন্ত্রগুলিকে বীণার উপর গান করা যেতে পারে আর কিছু যে যজ্ঞ ছিল যেখানে ঋগ্বেদেরই কিছু মন্ত্র গান করে করে সোমরস অর্পণ করার প্রথা ছিল, সেগুলোকে সংগ্রহ করে তিনি যেটাতে রাখলেন তার নাম দিলেন সামবেদ। সহজ ভাষায় ঋগ্বেদে স্তুতি হয়, যজুর্বেদে যজ্ঞ হয় আর সামবেদ মানে যে মন্ত্রগুলো গান করা যায়। যার জন্য সামবেদে যত মন্ত্র আছে তার প্রায় সবই ঋগ্বেদে পাওয়া যাবে। যজুর্বেদে বেশির ভাগ মন্ত্র ঋগ্বেদেও আছে আবার কিছু মন্ত্র যজুর্বেদের নিজস্ব আছে। এই তিনটের বাইরে বেদের আর বাকি যা কিছু আছে সবটাকে তিনি অথর্ব বেদে রেখে দিলেন। যার জন্য অথর্ব বেদের বেশির ভাগ মন্ত্র ছন্দে নয়। কিন্তু আশ্চর্যের যে অথর্ব বেদের একটা নামই হল ছন্দ। এই ভাবে বেদের বিভাজন করে দেওয়ার পর ব্যাসদেব বলে দিলেন, এরপর যত বড় ঋষিই হন আর তাঁর যাই অনুভূতি হয়ে থাকুক, কোন অনুভূতিই আর বেদে নেওয়া যাবে না। ব্যাসদেবের পর থেকে বেদে নতুন করে আর কোন কিছুই সংযুক্ত করা হয়নি, ওখানেই বেদ শেষ। এই হল চারটে বেদের ইতিহাস। বেদের মূল যে অংশ তার দুটি নাম, একটাকে বলে মন্ত্র, আরেকটাকে বলে সংহিতা। বেদ বললেই বোঝায় মন্ত্র বা সংহিতা। দুটোর মধ্যে যে কোন একটা শব্দ নেওয়া যায়। কোথাও মন্ত্র বলা হয়, কোথাও সংহিতা বলা হয়। মন্ত্র এই জন্যই বলা হয় এগুলো আসলে মন্ত্র, আর সংহিতা বলা হয় এইজন্য যে এগুলো সংগ্রহিত, মন্ত্রের সংগ্রহ তাই এর আরেকটা নাম সংহিতা।

মন্ত্রগুলোকে এবার যজ্ঞের কাজে লাগাতে হবে। এই যজ্ঞ কিভাবে হবে, যজ্ঞ কেন করা হচ্ছে, অনেক সময় বলা থাকত, এই এই যজ্ঞ করে কে কি পেয়েছেন, তার সাথে যজ্ঞের যে বিভিন্ন রকমের আনুষাঙ্গিক জিনিস লাগত, তার মধ্যে নানা রকমের নির্দেশিকা, গুরু-শিষ্যের নির্দেশ, এই ধরণের বিস্তারিত বর্ণনা যেখানে দেওয়া হয়েছে সেটা হল বেদের দ্বিতীয় অংশ, এর নাম ব্রাহ্মণ, এই ব্রাহ্মণের সাথে ব্রাহ্মণ জাতির কোন সম্পর্ক নেই। ব্রাহ্মণের বেশির ভাগটাই যজ্ঞবিধি আলোচনাতে চলে গেছে। শুধু যে যজ্ঞবিধি নিয়েই আলোচনা করছেন তা নয়, আমরা পরম্পরাতে এভাবেই পেয়ে এসেছি। ঋষিরা বলে দিয়েছেন এটা ব্রাহ্মণ, সেই থেকে চলে আসছে এটা ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ খুলে দেখলে দেখা যাবে সব সময় সব কিছু মিলছে না। কোন কোন ব্রাহ্মণে কাহিনী পাওয়া যাবে। বেদকে যখন পরিভাষিত করা হয়, বেদ কি, তখন বলা হয় মন্ত্র আর ব্রাহ্মণই বেদ, যজ্ঞের মন্ত্র আর যজ্ঞবিধি এটাই বেদ। মূলতঃ যজ্ঞ আর যজ্ঞবিধিকে নিয়ে চলে বলে এর একটা নাম কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ড বলা হয় ঠিকই কিন্তু নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। দ্বিতীয় কথা বেদে কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বলে কোন আলাদা করা নেই, পরে পরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা এই সংজ্ঞাগুলো দেন। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ হলেই বেদের কাজ চলে যায়, এরপর বেদের আর কিছু লাগে না।

কিন্তু হিন্দুদের চিন্তাধারাতে একটা প্রশ্ন প্রায়শই আসে, জীবনের উদ্দেশ্য কি? তখন বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য হল তোমার নিজের একটা উত্থান, জীবনের একটা পূর্ণতা। কিভাবে আসবে? হিন্দুদের কাছে সবচেয়ে যে গুরুত্ব ছিল তা হল পুত্রৈষণা, আমার একটা সন্তান হোক। বায়োলজির দিক থেকে দেখলে প্রত্যেক প্রজাতি চায় আমার একটা সন্তান হোক। এটাকে বলে পুত্রৈষণা, পুত্রকে কেন্দ্র করে

তাদের অনেক আশা থাকত, আমার কাজে সাহায্য করবে, বৃদ্ধ বয়সে আমার দেখাশোনা করবে, মৃত্যুর পর আমার প্রেতকর্মাদি করবে যাতে আমি অন্যান্য লোকে যখন যাব তখন আমার তৃপ্তি লাভ হবে। পুত্রের কামনা থাকলে একজন স্ত্রী লাগবে, স্ত্রী আর পুত্র থাকলে অর্থের প্রয়োজন হবে। সেইজন্য দ্বিতীয় গুরুত্ব ছিল বিত্তৈষণা। পুত্র আর বিত্ত এই দুটোর মধ্যেই সবাই ঘুরপাক করতে থাকে। এই দুটোকেই আজকের ভাষায় আমরা অর্থ আর কাম বলছি। তৃতীয়টা ছিল লোকৈষণা, লোক বলতে বোঝায় যেটাই যে কোন ভাবে অনুভব করা যায়, যেটাকে দেখা যায়, দেখা যায় এর অর্থ অনুভব করা যায়। সেইজন্য স্বর্গলোক, পাতাললোক, পিতৃলোক, যমলোক, যে কোনটাতে লোক লাগিয়ে দিন। বেদে নরক বলে কিছু নেই, নরক ব্যাপারটা হিন্দুদের মধ্যে অনেক পরে ঢুকেছে। বিশেষ করে রোমান পরম্পরা, যে পরম্পরা খ্রীশ্চান ও ইসলাম পরম্পরাকে প্রভাবিত করেছে, সেখানকার কোথাও থেকে নরক ধারণাটা হিন্দুদের মধ্যে পরে ঢুকেছে। প্রথম থেকেই হিন্দুদের নরকের কোন ধারণা নেই। বেদে বিভিন্ন লোকের কথা আছে, সংক্ষেপে বলছেন স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক আর পাতাললোক। কিন্তু পাতাললোক নরক নয়। যারা ভোগবাদী তারা পাতাললোকে যায়। যারা আধ্যাত্মিক ভাবের তারা স্বর্গলোকে যায়, এছাড়া কোন তফাৎ নেই। পাতাললোকে কোন কষ্টের বর্ণনা নেই বরঞ্চ সুখেরই বর্ণনা দেয়। বলেন যে, কিছু কিছু পাতাললোক আছে যেখানে স্বর্গলোক থেকেও বেশি সুখ। মানুষ এই তিনটে লোকৈষণা, বিত্তৈষণা আর পুত্রৈষণার মধ্যেই ঘুরঘুর করে। এষণা মানে ইচ্ছা, কামনা-বাসনা।

এবার এটাকে বিস্তার করলে অনেক কিছুতে দাঁড়িয়ে যায়, কোথায় গিয়ে যে থামবে তার কোন হিসাব নেই। একটা বিবাহ করল, তার থেকে সন্তান হল, কিন্তু তাতেও তার তুষ্টি হচ্ছে না। এরপর আরও চারটে বিবাহ করল, তার মানে আরও চারটে মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল। চারটে মেয়েকে কাছে টানার জন্য টাকার দরকার, কিছু ক্ষমতা ও গুণ দরকার। তখন সে নিজের গুণ বাড়াতে নেমে গেল। তারপর সাধারণ লোক ক্ষমতা চায়, সন্তানকে একজন বড় মানুষ কি করে বানাবে, নিজে আরও টাকা পাবে কি করে। তারপর আসছে রাজা হওয়ার ইচ্ছা। আর অমুক আমার নিন্দুক, অমুক আমার শত্রু, অমুক থাকতে আমার কোন দিনই ভালো হবে না, অমুককে টাইট করতে হবে। কিভাবে টাইট করবে? কায়দা করে তাকে নাশ করে দাও। সেটা যদি না পার তাহলে মন্ত্রের আশ্রয় নাও, অমুক যজ্ঞ করলে সে শেষ হয়ে যাবে। বেদ সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত। এরা সবাই পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণার মধ্যে ঘুর ঘুর করছে। পরে আমরা দেখব এখান থেকে এনারা বেরিয়ে আসছেন।

ঠাকুর যে কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলছেন, তার সাথে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা মিলবে না। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা হল ধর্মের দিক থেকে অনুমোদিত, ধর্ম বলে দিচ্ছে এটা তুমি করতে পার। ঠাকুরের ধর্ম মূলতঃ সন্ন্যাসীদের ধর্ম, যেখানে নারীর কোন স্থান নেই, পুত্র-বিত্তের কোন কথাই নেই। কিন্তু বেদের ধর্ম গৃহস্থের ধর্ম, উপনিষদের ধর্ম সন্ন্যাসীদের ধর্ম। এবার যে লোকৈষণার দিকে গেছে, যখন সে গৃহস্থ ছিল তখন সে দান করেছে, তীর্থ করেছে, যজ্ঞ করেছে, তার ভালো কোন লোক হয়ে যাবে। তার এখন বয়স হল, খেলে হজম করতে পারছে না, শরীর থেকে আর সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তাদের বলছেন, এবার তুমি সংসারের খেলাগুলো ছাড়ো, ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাও। জঙ্গলে তো তুমি থাকতে পারবে না, তাই কোথাও কোন গ্রামের পাশে নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে আশ্রম বানিয়ে স্বামী-স্ত্রী মিলে থাক। স্ত্রীদের মায়া বেশি, সংসারের নাতি-পোতাদের ছেড়ে থাকতে চায় না, সে যদি ছাড়তে না চায়, তার থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে তুমি নিজে বেরিয়ে এসো। এটাকেই বাণপ্রস্থী বলা হত। কিন্তু সবাই এভাবে বেরিয়ে আসতে পারত না। এই সমস্যা তৎকালীন ব্রাহ্মণদেরও ছিল। ওনাদের বলা হল তুমি বেরিয়ে এসো, কিন্তু বেরোতে পারত না। যদিও বা বেরিয়ে এলো, কিন্তু সারাটা জীবন ধরে যে যজ্ঞযাগ করে এসেছে, অগ্নিহোত্রাদি, মন্ত্রোচ্চারণ করে এসেছে, সেটা থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারত না। ঋষিরা তখন একটা উপায় বলে দিলেন, ঠিক আছে, এতদিন যত যজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদি করে এসেছ এবার তুমি এগুলো মনে মনে অনুষ্ঠান কর। সেখান থেকে নতুন একটা class of literature বেরিয়ে এল, যাকে বলা হয় আরণ্যক। আর যাঁরা শেষে আরণ্যক থেকে বেরিয়ে এলেন, ধ্যান ও গভীর চিন্তনে অভ্যস্ত

হয়ে গেছেন, তাঁদের বললেন, তুমি পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা তিনটে থেকেই বেরিয়ে এসো। এই সংসার চক্র, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে কি বেরোবার কোন পথ আছে? আছে, যদি তুমি নিজেকে জানত পার। নিজেকে কিভাবে জানা যাবে, এই বিদ্যার ব্যাপারে যেখানে বলা হয়েছে তার নাম উপনিষদ। উপনিষদের প্রথম শর্তই হয়, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা এই তিনটের সম্পূর্ণ ত্যাগ। তিনটের কোন একটার প্রতি সামান্যতমও যদি দুর্বলতা থাকে, উপনিষদ তার জন্য নয়। বেদের এই চারটে ভাগ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। পরের দিকে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে কর্মকাণ্ড ও আরণ্যক ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলছেন ঠিকই কিন্তু এর কোন দাম নেই, বেদের এই চারটে অংশকে আমাদের মনে রাখতে হবে। চারটে বেদ আর প্রত্যেকটি বেদের চারটে ভাগ।

উপনিষদের একটাই সংজ্ঞা, আত্মজ্ঞান। আচার্য শঙ্কর উপনিষদকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। সেখানে তিনি উপনিষদ শব্দের ধাতু, প্রত্যয় এগুলোকে নিয়ে দেখাচ্ছেন উপনিষদের এই এই অর্থ। কিন্তু উপনিষদের তত্ত্ব, যেটা উপনিষদের বিষয় বস্তু, সেখানে তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা কথাই বলে যাচ্ছেন, উপনিষদের বিষয়বস্তু হল আত্মতত্ত্ব। আত্মা মানে আমিত্ব, এছাড়া আত্মার আর কোন অর্থ হয় না। যে মনে করে আমার দেহটাই আমি তার কাছে দেহটাই আত্মা, যে মনে করে আমার মনটাই আমি তার কাছে মনটাই আত্মা। যিনি নিজেকে বুদ্ধি রূপে ভাবছেন তাঁর কাছে বুদ্ধিই আত্মা। যিনি মনে করেন ঈশ্বর আর আমি এক, তাঁর কাছে ঈশ্বরই আত্মা। আর যিনি সর্বব্যাপী আত্মা, যাঁর কথা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, তাঁকে আত্মা মনে করেন, তাঁর কাছে সেই সর্বব্যাপীই আত্মা। এই পার্থক্যকে আনার জন্য, উপনিষদে যে আলোচনা হবে সেখানে ব্রহ্ম শব্দ এনে বলবেন ব্রহ্ম শব্দের একটা বিশেষ অর্থ আছে। ব্রহ্ম মানে বৃহৎ, যাঁর থেকে বৃহৎ কিছু নেই। আত্মাকে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম রূপে যেখানে আলোচনা করা হয় সেটাই উপনিষদ।

আমরা মনে করতে পারি আত্মাকে দেহ রূপে কোথাও তো আলোচনা করা হয় না। কিন্তু তা না, সারা বিশ্বে বেশির ভাগ উপন্যাস, সাহিত্য তাই। বিশ্বের বেশির ভাগ সাহিত্য আত্মাকে দেহ রূপে ধারণা করেই লেখা হয়। এমনকি দর্শন শাস্ত্র, যারা আরও গভীরে গিয়ে জীবনকে নিয়ে, মনকে নিয়ে আলোচনা করে, সেখানেও দেখা যাবে একটা দর্শন আছে (Existentilism) যার প্রধান প্রবক্তা জাঁ পল সার্ত্রে, ওই দর্শনে দেহকেই আত্মা রূপে ধরে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে মনকে আত্মা রূপে ধরে নিয়ে আলোচনা চলে সেটাকে আমরা দর্শন বলি। যেখানে কাম ভাবকেই আত্মা রূপে দেখছে তখন সেটাই কামসূত্রের মত দর্শন হয়ে যাচ্ছে। উপনিষদ শুধু আত্মাকে নিয়েই আলোচনা করে, কিন্তু আত্মাকে ব্রহ্ম রূপে আলোচনা করা হয়। যাঁরা সাহিত্য, উপন্যাসাদি রচনা করেন তাঁরা কখনই বলেন না যে আমি আত্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি। আত্মাকে যখন ব্রহ্ম রূপে দেখা হয় তখন এর একটা সংক্ষিপ্ত নাম – আত্মতত্ত্ব বিবেচনা। যারা দেহকে আত্মা রূপে দেখছে তারাও আত্মতত্ত্বেরই বিবেচনা করছে। চার্বাক মতের লোকেরা যে বলছে, আমি জন্মালাম, জন্মাবার পর আমি মরে যাব, মরার পর আর কিছু নেই, তারাও কিন্তু আত্মাকে নিয়েই আলোচনা করছে। কিন্তু তাদের কাছে আত্মা হল এই দেহ। উপনিষদের একমাত্র বৈশিষ্ট হল, উপনিষদ আত্মাকে ব্রহ্ম রূপে দেখে, ঋষিদের কথা এনে দেখান ঋষিরা আত্মা ও ব্রহ্মকে কিভাবে দেখতেন। তাঁরা সেখানে যুক্তি দিয়ে দেখান, সব কিছুর পেছনে যে আসল বস্তু, সেটা আত্মা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। উপনিষদে মানেই যেখানে আত্মতত্ত্বকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপনিষদ দেহাত্মা, মন আত্মা বা পরাগ্ আত্মাকে নিয়ে কখনই আলোচনা করে না। তবে দেখানোর জন্য যে এটা কখনই আত্মা হতে পারে না, তখন কোথাও কোথাও দেহাত্মা বা পরাগ্ আত্মার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। উপনিষদ সব সময় প্রত্যগ্ আত্মা, যিনি ভেতরে রয়েছেন তাঁকে নিয়ে আলোচনা করবেন। তার সাথে দেখাবেন ভেতরে যিনি আত্মা আছেন তিনিই কিভাবে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, এটাই উপনিষদের মূল বক্তব্য বা *অহং ব্রহ্মাস্মি*, যা কিছু আছে আমিই সেই। এছাড়া উপনিষদের আর কোন বক্তব্য নেই।

আগে বলা হল যে, প্রত্যেকটি বেদের চারটি করে আলাদা ভাগ, প্রথমে আসে মন্ত্র, মন্ত্রের পর আসে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পর আরণ্যক আর সব শেষে উপনিষদ। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মন্ত্রেই উপনিষদ এসে গেছে, অনেক সময় দেখা যায় ব্রাহ্মণে উপনিষদ ঢুকে আছে, আবার অনেক সময় দেখা যায় আরণ্যকে ঢুকে আছে। আবার অনেক সময় উপনিষদ আলাদা ভাবে আছে। কেউ হয়ত এই নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে, আলাদা আলাদা ভাগ হওয়ার পরেও কেন এই গোলমাল হয়েছে? কিন্তু আলাদা করে ভাগ হয় না। ওনারা বিষয়বস্তুকে নিয়ে এই ভাগ করে দিয়েছেন। যেমন অনেকে বলেন মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকে কর্মকাণ্ড বলা হয় আর আরণ্যক ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। কিন্তু এই ধরণের কোন বিভাজন নেই। উপনিষদ যেমন অনেক কিছুতে ঢুকে আছে তেমনি আরণ্যকও অনেক সময় দেখা যায় ব্রাহ্মণে ঢুকে আছে। ওই অংশের নাম ব্রাহ্মণ কিন্তু ঢুকে আছে আরণ্যকে। ম্যাক্সমূলার পরে এগুলো সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সাজাতে গিয়ে দেখছেন অন্য ধরণের সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি যেমনটি আছে তেমনটিই রেখে দিলেন। খুব নামকরা উপনিষদ ঈশোপনিষদ মন্ত্রের মধ্যেই ঢুকে আছে। শুক্ল যজুর্বেদের চল্লিশটি অধ্যায়, তার ঊনচল্লিশটা অধ্যায় মন্ত্র, মানে এই কটি অধ্যায়ের মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চল্লিশতম অধ্যায় ঈশোপনিষদ, যা যজ্ঞে ব্যবহার হয় না। ওনারা এগুলোকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী ঠিক করে দিয়েছেন, আর এগুলোকে যজ্ঞে ব্যবহারও করেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ খুব নামকরা উপনিষদ। যদিও উপনিষদ কিন্তু ঢুকে আছে আরণ্যকে। নামেই বোঝা যাচ্ছে এটা আরণ্যক, বলছেন বৃহদারণ্যক কিন্তু উপনিষদের বিষয়বস্তুকে নিয়ে আলোচনা করছেন। কেনো উপনিষদ উপনিষদের আলাদা কোন অংশ নয় কারণ কেনো উপনিষদ ঢুকে আছে ব্রাহ্মণ অংশে। সেইজন্য কেনো উপনিষদ ব্রাহ্মণেরই একটি অংশ। কঠোপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ যেমন আলাদা করে উপনিষদ কিন্তু কয়েকটা উপনিষদ আছে যেগুলো এখানে সেখানে ঢুকে আছে। মন্ত্র বা সংহিতা চারটে বেদেরই আলাদা আলাদা নিজস্ব রূপে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সেইজন্য কোথাও কোন ধরণের অমিল পাওয়া যাবে না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে এসে একটা সময় প্রচুর লুঠ তরাজ শুরু করে দিয়েছিল। ভারত থেকে প্রচুর ধন সম্পদ লুট করে রাতারাতি সবাই বিশাল বড়লোক হয়ে গেল। বলা হত যে এই দেশে যারাই কোম্পানির কাজ করতে আসত, কয়েক দিনের মধ্যেই সবাই কোটিপতি হয়ে যেত। যার পরিণতি হল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। তখন খোদ ইংল্যাণ্ডেই প্রচুর সমালোচনা শুরু হয়ে গেল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ভালো কোন কাজ করছে না, লুঠ তরাজ করে বৃটিশ জাতির বদনাম করে দিচ্ছে। ইংল্যাণ্ড থেকে বলে দেওয়া হল কোম্পানির কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। কোম্পানি তখন তড়িঘড়ি কাজ করে দেখাতে শুরু করল, আমরা ভারতে অনেক ভালো ভালো কাজও করছি। আর সত্যিই দেখাবার জন্য ওরা রীতিমত কিছু কিছু কাজ করতে শুরু করল। বৃটিশরা যতই অত্যাচার করুক, তারা সবাই পড়াশোনা করা লোক ছিল, ভারতের মত সব মুর্খ ছিল না। ভারতের কি ঐতিহ্য আছে দেখার জন্য তারা প্রচুর খাটতেন। যাই হোক, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখন জার্মানের বেশ কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিতদের ভারতে হিন্দুদের ও বৌদ্ধদের যত গ্রন্থ আছে সব গ্রন্থের অনুবাদ করার কাজ লাগালেন। কিন্তু সমস্যা হল অনুবাদ করতে গিয়ে বেশির ভাগে ক্ষেত্রেই পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য দিকে ম্যাক্সমূলার অক্সফোর্ডে বসে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় লোকজন লাগিয়ে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। শুধু ম্যাক্সমূলারই ছিলেন না, তাঁর একটা বড় টিম ছিল, টিমের সবাই দুর্ধর্শ স্কলার। তাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে বইয়ের উদ্ধার করে পঞ্চাশ খণ্ডের একটা বই বার করলেন যার নাম দিলেন Sacred Books of the East। এর মধ্যে ভারতের মূল গ্রন্থগুলো ইংরাজী অনুবাদ করে রাখা হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত ভারতে কেউ জানত না কাশ্মীরে বেদ কেমন আছে, কন্যাকুমারীতে কেমন আছে, কামাখ্যাতে কেমন আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া তখন ভারতে রাজা হয়ে বসে আছে। তারা ব্রাহ্মণদের কাউকে প্রশংসা করে, কাউকে টাকা দিয়ে, কাউকে দানপত্র দিয়ে, কাউকে ধমক দিয়ে তাদের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি গুলো সংগ্রহ করতে লাগলেন। সব সংগৃহিত পাণ্ডুলিপিকে অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমূলারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ম্যাক্সমূলার নিজে মিলিয়ে দেখছেন, কন্যাকুমারীর ব্রাহ্মণের কাছে যে বেদ

আর কামাখ্যাতে ব্রাহ্মণের কাছে সেই বেদে কোথাও কোন তফাৎ নেই। কাশ্মীরের বেদের যে শব্দ, তার যে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত উচ্চারণ তার সাথে কন্যাকুমারী বা কামাখ্যার বেদের কোন অমিল নেই। অথচ এদের কারুর সাথে কোন যোগাযোগ নেই। ম্যাক্সমূলার দেখে হতবাক হয়ে গেলেন, কোথাও কোন ধরণের অমিল নেই। চার হাজার পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাসদেব যেটা দিয়ে গেছেন, আজও সেটাকেই সব জায়গায় অধ্যয়ন করা হয়, কোথাও তার কোন অমিল নেই। এটা গেল সংহিতার ব্যাপারে।

কিন্তু এরপর ব্রাহ্মণে আসার পর অনেক গোলমাল শুরু হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, ব্যাসদেব যেটা করে দিয়েছিলেন তার সাথে পরে পরে ঋষিরা যা করেছিলেন সেগুলোও যোগ হয়ে গিয়েছিল। কোন কারণে হয়ত কোথাও বড় দুজন ঋষির সাথে অমিল হয়ে গেছে বা তাঁরা অন্য পরম্পরায় সেটাকে লালন পালন করে এসেছেন। ব্যাসদেবের আগে থেকেই বেদ চলে আসছিল কিনা। সেইজন্য দেখা যাচ্ছে যে দুটো ব্রাহ্মণ একটু আলাদা হয়ে গেছে, কিংবা আরণ্যক একটু আলাদা হয়ে গেছে। সংহিতা অংশ যেভাবে একেবারে সুবিন্যস্ত করা ছিল বাকি গুলো সেভাবে নির্দিষ্ট ছিল না বলে একটু অমিল হয়ে গেছে। সংহিতা বা মন্ত্র এক থেকে গেছে কিন্তু ব্রাহ্মণের বা আরণ্যকের বইগুলো পাল্টে যাচ্ছে। কারণ ভগবানের দেওয়া ওই অর্থে নেওয়া হত না, ভগবানের দেওয়া মন্ত্র যেটা আমরা এর আগে আলোচনা করে এসেছি।

এই চারটের পরে আরও ছটি গ্রন্থ আসে, যেটাকে বলছেন বেদাঙ্গ। যজ্ঞে মন্ত্র লাগবে, যজ্ঞে কিভাবে আহুতি দেওয়া হবে সেই ব্যাপারে ব্রাহ্মণ বলে দিচ্ছে। সেইজন্য কর্মকাণ্ডীরা বলেন মন্ত্র আর ব্রাহ্মণই বেদ, আরণ্যক আর উপনিষদ বেদ নয়। আরণ্যক ও উপনিষদকে কর্মকাণ্ডীরা বেদ রূপে মানতেই চাইবে না। কিন্তু যজ্ঞ করতে গেলে আরও আনুষাঙ্গিক অনেক কিছু লাগবে। যজ্ঞ কখন হবে, মন্ত্রের উচ্চারণ কিভাবে হবে। এগুলোর জন্য ছয়টি অঙ্গ করে দেওয়া হল, ছটিকে মিলিয়ে বলা হয় বেদাঙ্গ। ছয়টি বেদাঙ্গ হল – **শিক্ষা**, শিক্ষা মানে বেদের উচ্চারণ বিধির শিক্ষা দেয়। তৈত্তেরিয় উপনিষদ পুরোপুরি শিক্ষাকে নিয়েই আলোচনা করছে। দ্বিতীয় **কল্প**, কল্প হল যজ্ঞ কিভাবে হবে ব্রাহ্মণে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, কল্পতে একই জিনিস বলছে কিন্তু সংক্ষেপে। কল্প হল ম্যানুয়ালের মত। তৃতীয় **ব্যাকরণ**, বেদ অধ্যয়ন করার জন্য ব্যাকরণ জানাটা আবশ্যক ছিল। চতুর্থ **নিরুক্ত**, নিরুক্তর অর্থ বেদের শব্দ কিভাবে এসেছে বলা। বর্তমান কালে আমরা এখন আর সেভাবে করি না, কিন্তু আগেকার দিনে ইংরাজী অভিধানে বলে দেওয়া হত এই শব্দটা কিভাবে কোথা থেকে এসেছে। ব্যসদেবের সময়ই বেদের ভাষা এত পুরনো হয়ে গিয়েছিল যে তৎকালীন ব্রাহ্মণরা জানতেন না বেদের এই শব্দের অর্থ কি। বলা হয় যে মোটামুটি অষ্টম শতাব্দিতে যাস্ক নামে একজন অব্রাহ্মণ পণ্ডিত তখনকার যে শব্দগুলো অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে সেই শব্দগুলোর অর্থ বার করে অভিধাণের মত তৈরী করলেন। আজকেও বেদ অধ্যয়ন করতে গেলে নিরুক্তের খুব দরকার পড়ে, তা নাহলে বোঝাই যায় না এই শব্দের ওখানে কি অর্থ হবে। বলা হয় যে, যাস্কের আগেও একজন নাকি ছিলেন যিনি নিরুক্ত লিখেছেন, এতেই ধারণা করা যায় যে বেদ কত পুরনো। কথামৃতে ঠাকুর অনেকগুলো শব্দের ব্যবহার করছেন, যেমন পাল্কী, ঢেকী, হুটকো কল। আজকাল তাও দু একজন এই জিনিসগুলো জানতে পারে, কিন্তু একশ বছর পর লোকেরা জানবেই না এই জিনিসগুলো কি। একজন একটা নতুন বই লিখেছেন, তাতে তিনি কথামৃতের এই শব্দগুলির ছবি এঁকে এঁকে জিনিস গুলোর বর্ণনা করেছেন। পঞ্চম হল **ছন্দ**, বেদ অধ্যয়ন করার সময় তাকে জানতে হবে হাত কখন উপরে যাবে কখন নীচে যাবে, বলা হত যে তা নাহলে যজ্ঞ পুরো হবে না। আর শেষে হল **জ্যোতিষ**, জ্যোতিষ মানে যজ্ঞ কোন সময়ে আরম্ভ করতে হবে, যেমন ঊষাকালের যজ্ঞ এক ধরণের, দ্বিপ্রহরের যজ্ঞ এক ধরণের, সন্ধ্যার যজ্ঞ আরেক ধরণের। কোন সময়ে যজ্ঞ করা হবে জানার জন্য তিথি, নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হত। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দুটো দিক, একটা হল সময়ের গণনা, আরেকটা হল ভবিষ্যদ্বাণী করা। পণ্ডিতদের মত যে আমাদের ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র ছিল না, আমাদের ছিল গ্রহ নক্ষত্রের বিজ্ঞান। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে আমরা পাই

যেখানে দশরথ বলছেন, আমার উপর এই এই গ্রহের প্রভাব পড়ছে, তার মানে আমার মৃত্যু কাছে এসে গেছে। সেইজন্য তিনি রামচন্দ্রকে তাড়াতাড়ি যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে দিতে চাইলেন। সেইজন্য যে পুরোপুরি ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র ছিল না তাও নয়, কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন ভারতবর্ষের জ্যোতিষ চর্চা সব সময় ছিল গ্রহ নক্ষত্রের বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে সময়ের গণনা করা। সেইজন্য সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উষাকাল, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এগুলোকে নির্ধারণ করাই জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল কাজ ছিল। এই বিজ্ঞান বেদের সময় থেকে একভাবে এখনও চলে আসছে।

বেদের চারটি অংশ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এবং ছটি বেদাঙ্গ, এই দশটি যদি সমান থাকে তখন তাকে বলা হয় শাখা। বেদাঙ্গের ক্ষেত্রে অমিল কম হত। তবে শিক্ষাতে বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন উচ্চারণ বিধি দিয়ে গেছেন, জ্যোতিষ বিদ্যায় খুব বেশি তফাৎ হত না, ছন্দতেও বেশি তফাৎ হত না, শুধু শিক্ষাতে কিছু কিছু তফাৎ পাওয়া যায়। এই দশটির মধ্যে কোন একটা যদি পাল্টে যায় তাহলে শাখা পাল্টে যাবে। একজন ঋষির প্রভাবেই শাখা পাল্টে যেত। কোন ঋষি আছেন, তিনি তাঁর গুরুর কাছে শিক্ষা নিয়েছেন, মন্ত্রে কোন আপোষ হবে না, হয়ত ব্রাহ্মণেও কোন আপোষ হবে না। কিন্তু কোন কারণে অন্য আরেকজন গুরুর কাছে কিছু শিক্ষা নিলেন, তখন তাঁর মনে হতে পারে যে এই জিনিসটা ঠিক না, তখন হয় তিনি নিজে লিখে দিচ্ছেন বা দুটোকে মিলিয়ে কিছু একটা করলেন তাতে ব্রাহ্মণ একটু পাল্টে গেল, সেইভাবে আরণ্যক ও উপনিষদেও কিছু পাল্টে যেতে পারে। শিক্ষাতেও আমাদের কয়েকটা আলাদা আলাদা বই আছে। এনাদের শাখাগুলো পাল্টে যেত। যে ঋষি ওটাকে আলাদা করে দিলেন সাধারণ ভাবে সেই ঋষির নামেই শাখার নামকরণ করা হত। কিন্তু পরবর্তি কালে এইভাবে শাখার উৎপত্তি হওয়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান কালে এসে যদিও শাখা এখন আর নেই কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করে বলি সম্প্রদায়। একটা কোন সম্প্রদায় আছে, সেই সম্প্রদায় থেকে একটা সম্প্রদায় কর্তা হয়ে যায়। যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের মতের অনুগামী। কিন্তু পরে তিনি নতুন একটা পথ বার করে দিলেন, আমরা তাঁদের নাম দিলাম বৈষ্ণব সম্প্রদায়। বৈষ্ণবদের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি নিজে কিন্তু একজন অদ্বৈতী। চৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে গেলেন সম্প্রদায় কর্তা। ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তাই, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরাও দশনামী সম্প্রদায়ের, কিন্তু ঠাকুরের ভাব আলাদা হয়ে গেছে। ঠাকুর হয়ে গেলেন সম্প্রদায় কর্তা। আরও মজার হল, রামানুজ, মাধ্বাচার্য এনাদেরও সন্ন্যাস হয়েছে শঙ্করাচার্যের পরম্পরায়, মানে দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। কিন্তু পরে এনারা নিজের নিজের আলাদা আলাদা সম্প্রদায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে হয়ে গেলেন সম্প্রদায় কর্তা। আজকে আমরা যে সম্প্রদায় কর্তা বলছি, তখনকার দিনে এটাকেই শাখাকার বলা হত। শাখাকারে পরিষ্কার একটা ব্যাপার ছিল, সেখানে মন্ত্রের সাথে কোন আপোষ করা যাবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ এবং ছটি বেদাঙ্গে এসে তফাৎ হয়ে যায়। কালে বেদের শাখার সংখ্যা বাড়তে থাকল। যেমন নামকরা উপনিষদ কঠোপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদের, কিন্তু সেটা আবার কঠ শাখার। সেইজন্য তার নাম হল কঠোপনিষদ। কেউ বলেন কঠ নামে কোন মুনি ছিলেন আবার কেউ বলেন কাঠক নামে একজন মুনি ছিলেন, সেই মুনির থেকে কঠ শাখা এসেছে। নামকরা একটা ব্রাহ্মণ হল শতপথ ব্রাহ্মণ, আবার অনেক সময় মুনি বা ঋষির নামেই ব্রাহ্মণ হত।

পতঞ্জলি আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগে বলছেন সামবেদের হাজারটা শাখা ছিল। পতঞ্জলি যখন বলছেন তখন আমাদের মেনে নিতে কোন দ্বিধা নেই যে সেই সময় হাজারটা শাখাই ছিল। পরে ম্যাক্সমূলারের লোকজনরা খুঁজে খুঁজে মাত্র তিনটি শাখা পেলেন। এই তিনটে শাখা হল রাণায়ণীয় শাখা, কৌথুম শাখা আর জৈমিনি শাখা। আমরা এখানে ধরে নিতে পারি যে হাজারটি শাখায় ছটি বেদাঙ্গে কোন অমিল ছিল না, অমিল ছিল ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদকে নিয়ে। আজকের দিনে আমাদের কাছে মাত্র তিনটি শাখা আছে কিন্তু তেইশ বছর আগে পতঞ্জলি বলছেন হাজারটি শাখা। হাজারটি শাখার মাত্র তিনটি যে পাওয়া গেল তার মানে বাকি ৯৯৭টি শাখার যে জ্ঞানরাশি সেটাও চিরতরে হারিয়ে গেল। আমরা জানিই না ওই শাখাতে কি আছে, যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন জানার কোন পথ নেই।

কেনোপনিষদের ইতিহাস

সামবেদে আমরা আজকে মাত্র দুটি উপনিষদ পাই, কেনোপনিষদ আর ছান্দগ্যো উপনিষদ। যদি হাজারটি শাখা থাকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি সামবেদে আরও উপনিষদ ছিল। কিন্তু আজ এগুলো আমাদের পক্ষে জানার কোন উপায় নেই। হারিয়ে যাওয়াটা যে কত সাংঘাতিক সেই ব্যাপারে আমরা একটা ধারণা করতে পারি, এই যে কেনোপনিষদ, যার আলোচনা আমরা করতে যাচ্ছি, বলা হয় কেনোপনিষদ জৈমিনিয় ব্রাহ্মণ থেকে এসেছে। তার মানে জৈমিনি শাখা থেকে এই ব্রাহ্মণ এসেছে বলে এর নাম জৈমিনিয় ব্রাহ্মণ। জৈমিনিয় ব্রাহ্মণেরই শেষের দিকে চারটি অধ্যায়ের নামে কেনো উপনিষদ। কিন্তু আচার্য শঙ্কর কেনোপনিষদের ভাষ্য লেখার সময় বলছেন কেনোপনিষদ তলবকার শাখার। তলবকারও একজন কোন নামকরা ঋষি ছিলেন, জৈমিনিও ঋষি ছিলেন। তলবকার শাখার বাকিটা সমান, কিন্তু তার ব্রাহ্মণের শেষ চারটে অধ্যায় কেনোপনিষদ। কিন্তু আশ্চর্যের যে আজকে তলবকার শাখা বলে কেউ কিছু জানে না। তলবকার শাখাতে যে জিনিসগুলোকে নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন কারণে লোকেরা বলে ওটারই পরে নাম হয়ে গেছে জৈমিনিয় শাখা। সমস্যাটা আরও গভীর, আচার্য শঙ্কর বলছেন তলবকার শাখার নবম অধ্যায় হল কেনোপনিষদ। কিন্তু আজকের দিনে ছাপা অক্ষরে যে জৈমিনির বই আমরা পাই, তাতে কেনোপনিষদ জৈমিনি ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায়। তলবকার শাখা যদি পরে জৈমিনিয় শাখা হয়ে যায় তাহলে পাঁচটি অধ্যায় সেখানে কম হয়ে যাচ্ছে। এখন যাঁরা বই লিখছেন তাঁরা বলছেন এর মধ্যে যদি দুটো জিনিসকে যোগ করা যায় আর তার সাথে এটাও যদিও যোগ করা যায় তাহলেও কেনোপনিষদ সপ্তম অধ্যায়ে আসবে, নবম অধ্যায়ে কোন ভাবেই নিয়ে আসা যাবে না। তার মানে জৈমিনিয় শাখায় কোন পথই নেই যে কেনোপনিষদ সপ্তম অধ্যায়ের উপরে আসতে পারে। কিন্তু জৈমিনিয় শাখার নিজস্ব যে ব্রাহ্মণ সেখানে কেনোপনিষদ চতুর্থ অধ্যায়। আচার্য শঙ্কর বলছেন তলবকার শাখার নবম অধ্যায় হল কেনোপনিষদ। তার মানে কোন ভাবে তলবকার শাখাটাও হারিয়ে গেছে। কবে হারিয়েছে? আচার্য শঙ্করের পরে। আচার্য শঙ্করের কাছে যে পাণ্ডুলিপি ছিল তাতে তলবকার শাখার পাণ্ডুলিপিই ছিল। এটা তাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তলবকার শাখা আর জৈমিনিয় শাখাতে খুব বেশি অমিল ছিল না, কিন্তু জৈমিনিয় শাখা থেকে গেছে তলবকার শাখাটা হারিয়ে গেছে। কিন্তু আজকের দিনে পণ্ডিতরা, ঐতিহাসিকরা বলছেন তলবকার শাখাটাই পরে জৈমিনিয় শাখা হয়ে গেছে। নামের কেন পরিবর্তন হল কেউ বলতে পারছেন না, আর এই অধ্যায়গুলো কেন হারিয়ে গেল সেই ব্যাপারেও কেউ কিছু জানে না। কারণ বেদের কোন অধ্যায় কখন হারিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আমরা আজকে জানি না কিভাবে হারিয়ে গেলে, কিভাবে নামের পরিবর্তন হল। সেইজন্য আচার্য প্রথম যেখানে শুরু করছেন সেখানেই এগুলো মেলে না। উনি প্রথম বাক্যেই শুরু করছেন তলবকার শাখার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায়টি কেনোপনিষদ। তলবকার নামে একজন মুনি ছিলেন, সেই শাখার সব বই আমরা পাইনা, কিন্তু অন্য বই পাই। বর্তমান কালে আমরা যে বই পাই সেখানে বলছেন জৈমিনিয় ব্রাহ্মণ উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে কেনোপনিষদ আসছে। গুরুত্বপূর্ণ হল, আচার্য শঙ্কর বলছেন তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায় কেনোপনিষদ আর মেনে নিলাম যদি জৈমিনি শাখাই নেওয়া হয় তাহলে চতুর্থ অধ্যায় কেনোপনিষিদ, এতে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ দুটো ব্রাহ্মণের আলোচ্য বিষয়বস্তু এক।

চারটে অধ্যায় নিয়ে কেনোপনিষদ। প্রথম দুটো অধ্যায় গুরু-শিষ্য সংবাদ, শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করেছে, গুরু শিষ্যকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এই চারটি অধ্যায় পুরোটাই যেন একটা আখ্যায়িকা, প্রথম অংশ কথোপকথন আর পরের অংশে একটা কাহিনীর মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। কেনোপনিষদের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মনিরুপণ। বৈদিক যুগে আট বছর বয়সেই ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান গুরুর কাছে বেদ অধ্যয়ন করতে চলে আসত। এই ধরণের কথোপকথন দিয়ে অনেক সময় মনে হয় কোন কোন মেধাবী ছাত্র ছিল যারা কোন বড় গুরুর কাছে গিয়ে হয়ত উপনিষদের শিক্ষা নিতে চলে আসত। কিন্তু এখানে একটা সংশয় হবে, কারণ যতক্ষণ না কর্মকাণ্ড করা হয় ততক্ষণ সে

উপনিষদ বুঝতে পারবে না। আমাদের যে পরম্পরা তাতে বলা হয় প্রথমে সংস্কৃত ও ব্যাকরণ শিখতে হবে, তারপর প্রকরণ গ্রন্থ পড়ার পর বেদ পড়তে হবে, বেদ পড়ার পর, ব্রহ্মসূত্র পড় তারপর উপনিষদ পড়লে বুঝতে পারবে উপনিষদ কি বলতে চাইছে। আর সব শেষে সমন্বয় শাস্ত্র গীতা পড়, গীতা সবার শেষে আসে। কিন্তু এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখন শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরুই হয় গীতা দিয়ে। আর কেনোপনিষদ এত সূক্ষ্ম জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করা হয় যে বোঝাই যায় না কি বলতে চাইছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি মন্ত্রে একই কথা বলছেন কিন্তু একটি করে শব্দ পাল্টে যাচ্ছে। জিনিসটা কত সূক্ষ্ম সেটাকেই দেখাতে চাইছেন।

কেনোপনিষদ শুরু হয় একটা প্রশ্ন দিয়ে, আমাদের চোখ, কান, বাক্ ইন্দ্রিয়গুলো যে কাজ করছে, মন কাজ করছে, এরা নিজেরা কেউ কাজ করে না, কিন্তু এদেরকে কেউ চালাচ্ছে বলে কাজ করছে। কে এদেরকে চালাচ্ছে? মূলতঃ এটাই প্রশ্ন। তবে একটা আখ্যায়িকারা মাধ্যমে কেনোপনিষদ তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করছেন। উপনিষদের বক্তব্যকে এক কথাতেই বলে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রথম দুটি অধ্যায় যেন গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে রাখা আছে। কথোপকথনের মাধ্যমে যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি সর্বব্যাপী, তিনি সবারই ভেতরে আত্মা রূপে বিরাজমান। এখানে দেখাচ্ছেন, তাঁর সন্নিধি মাত্রে কিভাবে ইন্দ্রিয় মন কাজ করে। আমাদের খুব প্রচলিত কথা যে, ঈশ্বরই সব করাচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর বলছেন, দেখছি মা দিগম্বরী হয়ে মন্দিরের আলসেতে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর চাহনিতে জগৎ নড়ছে। চাহনি মানে, একবার দেখা, দেখার ইচ্ছা মাত্র তাতেই জগতটা চলছে। ঈশ্বরকে নিয়ে আমরা যখন ভাবি তখন এটাই ঠিক ঠিক অভিব্যক্তি, তাঁর চাহনি। তিনি যে তাকিয়েছেন তাতেই জগতটা চলছে। ঈশ্বরের ব্যাপারে বলার সময় এটাই বলা হবে। কিন্তু এটাই যদি আত্মার ব্যাপারে চলে আসে, যাঁকে আমরা ব্রহ্ম বলছি, সচ্চিদানন্দ বলছি, সেখানে তখন চাহনির ব্যাপারও থাকে না। তিনি আছেন, এটুকুই যথেষ্ট। তাঁর যে উপস্থিতি, তাঁর যে সন্নিধি, সেই সন্নিধি মাত্রেই এই জগৎ চলছে, তাঁকে আর ইচ্ছা করতে হয় না। মাকেও ইচ্ছা করতে হয় না, তিনি আছেন, তাঁর চাহনিতেই জগৎ নড়ছে, তার মানে তিনি আছেন বলেই জগতটা নড়ছে, তিনি না থাকলে পুরো জগতটাই নাশ হয়ে যাবে। যেমন ইলেক্ট্রিসিটি আছে বলে ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। ইলেক্ট্রিসিটি না থাকলে হয়ত পাখা ঘুরবে না কিন্তু আলো অন্য ভাবে নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু তিনি না থাকলে জগতটাই থাকবে না। তিনি থাকার জন্যই জগতের অস্তিত্ব আর তার সাথে জগৎ কাজ করছে। শুধু কাজ করছে না, নিজের নিজের মত কাজ করে যাচ্ছে, যার যা কাজ করার কথা সে সেই কাজই করছে। শেষ কথা যদি আত্মা হন বা ব্রহ্ম হন, আমাদের তো তাঁরই খোঁজ করা দরকার, তাঁর কথাই তো চিন্তন করা উচিৎ। আমি যদি মালিককে জেনে যাই, আর জানি মালিকের কাছে গেলে তিনি আমাকে দশ লাখ টাকা দেবেন আর বাকিদের কাছে গেলে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা পাব, আমি কার কাছে যাব? আমি অবশ্যই মালিকের কাছেই যাব, মালিকের পেয়াদার কাছে গিয়ে আমার কোন লাভ নেই। মন্ত্রিকে যদি আমি জানি তাহলে সান্ত্রির কাছে কেন যাব! এখানে এটাই বক্তব্য, তুমি যে ইন্দ্রিয়ের সন্ধান করছ, মনকে জানতে চাইছ এরা সবাই সান্ত্রি, পিওন। রাজা ভেতরে বসে আছেন, বাইরে এদের দেখতেই রাজার মত, বাইরে এদেরই বেশি তড়বড়ানি। ঠাকুর বলছেন সাহেবের থেকে তার পেয়াদার জোর বেশি, ইন্দ্রিয়গুলো তাই লাফাচ্ছে। কিন্তু যতই লাফালাফি করুক সাহেবের উপরে কখনই পেয়াদা যাবে না। উপনিষদের ঋষি তাই বলছেন, আগে তুমি এটাকে বোঝ। কিভাবে বোঝাচ্ছেন? যুক্তি দিয়ে।

কিন্তু উপনিষদ যুক্তি নিয়ে চলেন না, একটা তত্ত্ব কথা বলে দিয়ে চলে যান। কারণ যাঁরা শিষ্য, যাঁরা উপনিষদের শিক্ষা নিতে এসেছেন, বেদ আদি অধ্যয়ন করে করে তাঁদের এমন প্রস্তুতি হয়ে গেছে যে, একটা করে তত্ত্ব কথা বলে দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝে নিচ্ছেন। কিন্তু পরে পরে যারা পড়ছে তাদের অতটা প্রস্তুতি বা জ্ঞান নেই, তাদের জন্য মন্ত্রের উপর ভাষ্য লিখতে হয়, ব্যাখ্যা করতে হয়। কিন্তু ওই ভাষ্যকে বোঝার ক্ষমতাও আমাদের নেই, কারণ ভাষ্যকে বোঝার জন্যও একটা আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি লাগে। আগেকার দিনে ঋষি কুমাররা বেদ আদি অধ্যয়ন ও তপস্যাদি করে করে মনের প্রস্তুতি

তৈরী করতেন। সেই প্রস্তুতি নেই বলে ইদানিং আচার্যরা লম্বা লম্বা লেকচার দিয়ে যান, আমরাও দিনের পর দিন শুনে যাচ্ছি। শুনে যাওয়াটাও একটা তপস্যা, অনেক দিন শুনতে শুনতে ভেতরে একটা ছাপ পড়ে। কেনোপনিষদের বিষয়বস্তুটাই খুব কঠিন, তার থেকেও বড় সমস্য হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যে জিনিস যত সূক্ষ্ম হয় সেই জিনিসটা ধারণা করা তত কঠিন। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম তত্ত্বকে ধরার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। সূক্ষ্ম বুদ্ধি হওয়ার জন্য একটা প্রস্তুতি লাগে।

শেষের দুটি অধ্যায় পুরোপুরি কাহিনী, যে কাহিনীতে ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু আছেন। কাহিনীটা একটা রূপক। ইন্দ্রিয় গুলিকে অসুর বলা হয়। অসুর বলার প্রথম কারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে আত্মার জ্ঞান হয় না, আর দ্বিতীয় কারণ অসু মানে প্রাণ, প্রাণ মানে শক্তি, যে কোন জিনিস যা শক্তি দিয়ে চলে সেটাই অসুর। যেহেতু ইন্দ্রিয় গুলি প্রাণ শক্তি দিয়ে চলে সেইজন্য অসুর। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন করে অভিমানী দেবতা আছেন, ইন্দ্রিয়গুলোর পেছনে যে শক্তি কাজ করে সেই শক্তি আরেকটু যেন সূক্ষ্ম। তিনটে জিনিস খুব শক্তিশালী, প্রথম বাক্, দ্বিতীয় প্রাণশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি এবং তৃতীয় আমিত্ব, যেখানে মন কাজ করে। কায়োমনোবাক্য যে বলা হয়, একই জিনিস। মনকে চালায় আমি বোধ, কায়কে চালাচ্ছে প্রাণশক্তি আর বাক্। সব কটি ইন্দ্রিয়ই অসুর। মানুষ মাত্রই অসুর দ্বারা আচ্ছাদিত। মানুষ ইন্দ্রিয় জগতে বাস করছে আর ইন্দ্রিয় দিয়ে সব রকম ভোগ করে যাচ্ছে। কিন্তু কখন সখন, দুঃখ আঘাত পেয়ে হোক, ধাক্কা খেয়ে হোক, গুরুর কৃপায় হোক বা ঈশ্বরের কৃপাই বলুন, যেমন ঠাকুর কাউকে ছুঁয়ে দিচ্ছেন, কাউকে কিছু বলে দিচ্ছেন তার অনুভূতি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কিছু ভালো হলে, আত্মোন্নতি হলে মনে করছি, আমার প্রাণন ক্রিয়ার জন্য এই উন্নতি হয়েছে। প্রাণন ক্রিয়া মানে বায়ু দেবতা। আবার অনেক মনে করে বাক্ শক্তি দিয়ে আমি অনেক এগিয়ে গেছি, বাক্ শক্তির পেছনে আছে অগ্নি। আর ইন্দ্র হল আমিত্ব বা অহঙ্কার, যার দ্বারা মন বুদ্ধি চলে। বায়ু, অগ্নি আর ইন্দ্র এই যে তিনটে মূল শক্তি, এরা মনে করে, আমি যে এতটা এগিয়ে গেছি, আমার যে আত্মার বোধ হচ্ছে এটা আমাদের জন্যই হয়েছে। কিন্তু এরা যাই মনে করুক, এভাবে হয় না, আত্মার বোধ আত্মাতেই হয়। এই জিনিসটাই শেষের দুটি অধ্যায়ে অগ্নি, বায়ু আর ইন্দ্রকে রূপক করে উপস্থাপন করছেন। দেখাচ্ছেন অগ্নি আর বায়ু তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারল না। এখন ইন্দ্র, যিনি রাজা, অর্থাৎ আমি ভাব, তিনি একটু ইতস্ততঃ করছেন। ওখানে বলছেন, যা অল্প একটু জ্ঞান ছিল আমিত্ব আসাতে সেটাও চলে গেল, সেখানে বলছেন *তস্মাৎ তিরোদধে*। কিন্তু যার উপর একটু কৃপা হয়েছে, যে কৃপার জন্য ইন্দ্রিয়ের উপর জয় পেয়েছে, ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পেরেছে বলেই তার আত্মজ্ঞানের অনুভূতি লাভ হয়েছে। তখনই দৈবী কৃপা অর্থাৎ যা দিয়ে বেদের জ্ঞান হয়, সেটা এসে যায়, সেটাকে এখানে রূপক রূপে উমা বলছেন। এই যে দৈবী কৃপা, তিনিই পথ দেখিয়ে বলে দেন, তোমরা যে ইন্দ্রিয়ের উপর জয় পেয়েছ বলে লাফালাফি করছ, এই জয় তোমাদের জন্য হয়নি, তিনি আছেন বলেই জয় হয়েছে। হাড়িতে আলু পটল যখন লাফায় তখন বুঝতে হবে নীচে আগুন আছে। মা যেমন তার বাচ্চাকে এই জিনিসটাকে বুঝিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি দৈবী কৃপা এটাকে বুঝিয়ে দেন বা বেদের যে জ্ঞানরাশি, উমা রূপে যাঁকে দেখানো হচ্ছে, এই যে আমাদের শরীরের ভেতরে তিনটে শক্তি কাজ করে, কায়, মন ও বাক্, এই তিনটে শক্তিকে তিনি বুঝিয়ে দেন।

কেনোপনিষদের চারটে অধ্যায়কে দুটো আলাদা বিন্যাসে সাজানো হয়েছে। প্রথম দুটো অধ্যায় গুরু-শিষ্য সংবাদ, সব কিছুর পেছনে আত্মা বা ব্রহ্মের শক্তি কাজ করছে বলেই জগতটা চলছে, এই জিনিসটাকে শিষ্যের প্রশ্নকে আধার করে বলছেন। শেষের দুটো অধ্যায়তেও একই আলোচনা চলছে, কিন্তু একটা রূপক কাহিনী রূপে দেখাচ্ছেন। মানুষ যেখানেই কোন জয় পায়, কোন সাফল্য পায় মনে করে আমি আমারই শক্তিতে করেছি। একবার যদি কোন মানুষ বুঝে যায় যা কিছু হয় সব তাঁর জন্যই হয়, তখন সে তাঁকে পাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে সব কিছুর পেছনে মানুষ নিজেকেই মনে করে, আমার জন্যই সব কিছু হয়েছে। প্রথম একটু আনন্দ পায়, object থেকে আসছে, তারপরে মনে আমি এটা করেছি বা করছি। Subject Object দুটোর মধ্যে কোনটাই ঠিক নয়।

একটা মেয়েকে যখন কোন ছেলে ভালোবাসে তখন সে মনে করে মেয়েটির মধ্যে এই গুণ আছে বলে ভালোবাসছি। তারপর বিচার করে দেখে, আমার ভেতরেই এই ভাব আছে। নিজের ভেতরে বা তার ভেতরে সেই আত্মারই প্রকাশ। কোন কারণে সেই জায়গাতে ওই বোধটা হয় বলে ভালোবাসতে যায়। কেনোপনিষদের এটাই বক্তব্য, আত্মাকে জানা, আত্মারই একমাত্র গুরুত্ব, আত্মাই সব, আত্মজ্ঞান লাভ করাই উদ্দেশ্য। বলার পর দেখাচ্ছেন, বাকি যা কিছু তুমি করছ এগুলো সব ছাড়, সব কিছুর উপর তুমি যদি নিয়ন্ত্রণ পেতে চাও, জ্ঞান যদি পেতে চাও তাহলে তুমি শুধু আত্ম চিন্তন কর।

<u>ভাষ্য-ভূমিকা</u>

আচার্য শঙ্করের ভাষ্যকে অবলম্বন করে আমরা কেনোপনিষদের আলোচনা করতে যাচ্ছি। আচার্য শঙ্করের একটা বৈশিষ্ট্য হল তিনি তাঁর ভাষ্যে নিজের তরফ থেকে কোন কিছু যোগ করতেন না। গীতার ভাষ্যে তিনি খুব সুন্দর বলছেন, গীতায় যা বলা হয়েছে সহজ সরল করে আমি তার এই অর্থ করলাম। অনেক সময় তিনি ব্যাখ্যা করতেন এই জিনিসটা এখানে কেন বলা হয়েছে, এর উপর তিনি একটা আলোচনা করতেন। আবার অনেক সময় অন্যান্যরা যে মত আনছেন সেটাকে যুক্তি দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন এখানে এই মত দাঁড়াতে পারে না। দর্শন বলতে আমরা যা মনে করি, আচার্য শঙ্কর সেই অর্থ দার্শনিক ছিলেন না, তিনি অর্থটা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। আচার্য শঙ্করকে তাই দার্শনিক বলা হয় না, তিনি নতুন কোন দর্শনও দিচ্ছেন না। দর্শনটা হল অদ্বৈত, তিনি তার একজন আচার্য। আচার্য শঙ্করকে সেইজন্য সব জায়গায় গুরু রূপে দেখা হয়, গুরু রূপে তিনি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন, জিনিসটা এই এই। আচার্য শঙ্করের ভাষ্য মানেই শিক্ষা, এর অর্থটা কি, এই শব্দকে এখানে কেন নিয়ে আসা হয়েছে, এখানে দুটো শব্দের অর্থ মনে হচ্ছে এক রকম, এক রকম হওয়ার কথা নয় কিন্তু কেন এক রকম মনে হচ্ছে। একটা প্রচলিত কাহিনী আছে যে, আচার্য ভাষ্য লেখার পর তাঁর মনে হল বক্তব্যটা ঠিক ঠিক হয়নি, বক্তব্যকে আরও যুক্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। এরপর তিনি আরেকটা ভাষ্য লিখলেন। প্রথমটাতে উনি শব্দগুলোর শুধু ব্যাখ্যা করে গেছেন, যেমন গীতা বা অন্যান্য উপনিষদে করেছেন। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, সেইজন্য আবার আরেকটা ভাষ্য লিখলেন। প্রচলিত ভাষ্য হল পদভাষ্য, বাক্যভাষ্য পাওয়া যায় তবে খুব বেশি প্রচলিত নয়। গীতা প্রেস কেনোপনিষদের আচার্যের যে ভাষ্য প্রকাশ করেছে তাতে পদভাষ্য ও বাক্যভাষ্য দুটোই পাওয়া যায়। কেনোপনিষদ কত কঠিন এতেই বোঝা যায়, আচার্য শঙ্কর যার উপর দুটো ভাষ্য লিখেছেন তার মানে খুবই কঠিন। আমরা এখানে দুটো ভাষ্যকে মিলিয়েই আলোচনা করব।

আচার্য শঙ্কর ভাষ্য দেওয়ার আগে একটা ভূমিকা দিচ্ছেন। আমরা যেমন কোন বই রচনার আগে প্রাককথন্ দিয়ে শুরু করি, যদিও সব বইয়ে ভূমিকা বা প্রাককথন্ দিতে হয় না, কিন্তু যে গ্রন্থের বক্তব্য খুব কঠিন হয় সেই গ্রন্থের একটা প্রাককথন্ দরকার হয়। মজার জিনিস হল, জর্জ বার্ণাড'শর কিছু কিছু নাটক বা লেখার ভূমিকাটা মূল বইয়ের থেকে বড়। মাণ্ডুক্য উপনিষদের মাত্র বারোটি মন্ত্র কিন্তু তার ভাষ্য প্রায় তিনশ পাতা। যেখানে খুব কঠিন বিষয় হয় সেখানে ভাষ্য ও তার প্রাক কথন্ অনেক বড় হয়। আচার্য শঙ্করের যত ভাষ্য আছে, তা গীতা হোক, উপনিষদ হোক, তিনি প্রথমে একটা ভূমিকা দেবেন, এই ভূমিকাকে উপোদ্ঘাত বা সম্বন্ধ ভাষ্য বলা হয়। আচার্য শঙ্করের ভাষ্যে সম্বন্ধ ভাষ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা কেনোপনিষদের আলোচনা শুরু করছি আচার্যের সম্বন্ধ ভাষ্য দিয়ে। সম্বন্ধ ভাষ্য যদি না পড়া হয় তাহলে আচার্যের যে কোন ভাষ্য গীতা, উপনিষদ বোঝা যায় না। আচার্যের ভাষ্যগুলো খুব ছোট্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের আগে ওনার একটা ভূমিকা আছে যা সাংঘাতিক। যারাই ব্রহ্মসূত্র পড়তে যান, প্রথম সূত্র *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, এর ভূমিকা পড়তে পড়তে বেশির ভাগ পাঠক কান ধরে বলে দেন যে আমার দ্বারা আর এই বই পড়া হবে না। তবে বেদান্তে এই ভূমিকার খুব দরকার।

কেনোপনিষদের মূল বক্তব্য আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য। এই ঐক্য হয় consciousnessএর levelএ। আমাদের ভাষায় consciousnessএর অনুবাদ করার সময় দুটো শব্দ আসে, একটা চৈতন্য আর দ্বিতীয় চেতনা। ইংরাজীতে একটাই শব্দ consciousness। বিদেশীরা consciousness শব্দ ব্যবহার করছেন ঠিকই, কিন্তু ওনারা যখনই consciousnessএর ব্যবহার করেন consciousএর অর্থেই করেন। চেতনা আর চৈতন্য দুটো আলাদা জিনিস। Consciousness জিনিসটা, দর্শন এটাকে কিভাবে দেখে, বিজ্ঞান কিভাবে দেখে, হিন্দুরা কিভাবে দেখে, এটা যতক্ষণ না বোঝা যাবে ততক্ষণ কেনোপনিষদ কিছুই বুঝতে পারা যাবে না। শ্রেষ্ঠ মহাত্মারা consciousnessকে কিভাবে দেখেছেন ওটাকে আগে জানা দরকার। Consciousness বা consciousকে যে অর্থেই নেওয়া হোক, এর আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলা দরকার। রজার পেনরোজ একজন বড় তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন, সেইজন্য ওনার লেখাগুলোও খুব দুর্বোধ্য হয়। উনি consciousnessকে বিষয় করে একটা মোটা বই লিখেছেন, যে বই লোকে পড়ে কম কিন্তু দেখায় বেশি, যে আমি বইটা পড়ি। বইটির নাম Emperor's new mind। অত্যন্ত দুর্বোধ্য বই, উনি consciousnessএর মধ্যে নানা রকমের ইক্যুয়েশান নিয়ে আসছেন, ফিজিক্সের অনেকগুলো জটিল আইডিয়াকে নিয়ে consciousness এর উপর আলোচনা করছেন। প্রথমেই উনি ওনার বক্তব্যকে একটা ছোট কাহিনী দিয়ে শুরু করছেন। দেশের রাজা একজন বিরাট বিজ্ঞানী, সে একটা রোবট তৈরী করেছে, সেই রোবট সব ক্ষেত্রে মানুষকে ছাড়িয়ে গেছে। রাজা একটা প্রেক্ষাগৃহে সবাইকে খুব গর্ব করে দেখাচ্ছে এই রোবট এসে গেছে, এর কাছে মানুষ কিছুই না। তখন একটা বাচ্চা ছেলে জিজ্ঞেস করছে, can it feel? এর কি বোধ আছে? বাচ্চার প্রশ্ন শুনে হলের সবাই হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছে। এখান থেকে পুরো বইটা লেখা হল। বইটা যখন শেষ হয়, তখন বাচ্চাটা নিজের মনেই বা তার বাবাকে বলছে, আমার কথার উপর সবাই হাসল কেন? কিন্তু বইটার মাঝখানে উনি কি বলতে চাইছেন কিছুই বোঝা যায় না। কারণ পদার্থ বিজ্ঞানীরা এত বেশি অমূর্তে চলে যান যে কারুর বোঝার দম থাকে না। উনি এত মোটা বই লিখে যে conclusion আনছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী বা দার্শনিকদের কাছে চেতনা বলতে এটাই শেষ কথা, এর নিজের বোধ আছে কিনা, এই রোবট feel করতে পারে কিনা।

আলো জ্বলছে, আমার চোখে আলোর প্রতিফলন হচ্ছ, আমার বোধ হচ্ছে আলো আছে। আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে জগতকে গ্রহণ করছি, তার মানে জগতের একটা বোধ আমাদের আছে। তাহলে আমি বলতে, আমি নিজেকে যেটাই বুঝে থাকি, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, এসব কিছু মিলিয়ে যা কিছু বোধ হবে তা আমি নিজেকেই বুঝি। আমি আছি, আমি জগতকে জানতে পারছি, এটাই আমার আমিত্ব, আমি সত্য জগৎ সত্য, এটাই চেতনা। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীরা যখনই চেতনাকে নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা অনুভব করা হচ্ছে, এটাকে consciousness রূপে নেন, আর বর্তমান কালে সমগ্র পাশ্চাত্য consciousness এটাই একটা বিরাট field হয়ে গেছে, consciousness কে নিয়ে তারা study করছেন, সেখান কত ধরণের যে study দেখলে মাথা ধরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এতেই বোঝা যায় যে consciousnessএর ব্যাপারে এরা পুরোপুরি সংশয়াচ্ছন্ন। পাশ্চাত্যের মূল হল observability, সব কিছুকে observe করা। আমি যখন একটা জিনিসকে অনুভব করতে পারছি, এটাই consciousness। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সমস্ত যুক্তি, study সব একে কেন্দ্র করেই ঘুরতে থাকে। ওই অনুভবকে আমি যখন আমার চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি দিয়ে বাড়িয়ে দিই, এটাও আমার consciousnessএর মধ্যে পড়ে। তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে, আমার যে সুখ-দুঃখের অনুভব হয়, এটা কি? একটা ভালো কিছু খেয়ে আমার তৃপ্তি, কাউকে দেখে মনে একটা আনন্দ হল, এগুলো কোথা থেকে আসছে? এগুলো কি ইমোশানাল? ওরা বলছে, এগুলো হল reaction to observation, সেইজন্য এগুলোও observabilityর মধ্যেই পড়ে। তার মানে জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরে থেকে যা কিছু আমার কাছে অনুভূতি আসছে, এগুলোকে নিয়ে আমার মন এর বোধ তৈরী করে দিচ্ছে, এটাই consciousness, এটাই পাশ্চাত্য জগতের খুব প্রচলিত মত।

এখান থেকে দ্বিতীয় দুটো জিনিস আসছে, মস্তিষ্ক আর মন। আমাদের মস্তিষ্ক যে কাজ করছে, মস্তিষ্কের যে নিওরোনস্‌গুলো কাজ করছে এটাই তাহলে মন, কারণ এটাই সব কাজ করে। আপাত দৃষ্টিতে ঠিকই, মস্তিষ্কই সব কাজ করছে। তাহলে মস্তিষ্কের সব নিওরোনস্ গুলোকে যদি খুলে সরিয়ে দেওয়া হয় বা মিশিয়ে দেওয়া হয়, কম্প্যুটার দিয়ে যদি পুরো ম্যাপিং করা হয়, তাহলে কি ওই ভাবেই কাজ করবে, যেভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করে? যদি chemical functioning করা হয়, একটা আলো এলো, আমার চোখে লাগল, নার্ভস গুলো মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিল। মস্তিষ্কে এবার কি হচ্ছে? তখন কয়েকটা কেমিক্যাল উপরে যায় আর কয়েকটা কেমিক্যাল নীচে যায়। তাহলে আমার বোধ কি করে হচ্ছে যে, এই আলোর জোর বেশি, এই আলোটা কম? তার থেকে আরও বেশি গুরুত্ব হল, একটা জিনিসকে ভালোবাসি, আরেকটা জিনিসকে ভালোবাসি না। এই যে হাজারটে প্রশ্ন, শুধু যদি ব্রেন কেমিক্যালসকে দেখা হয়, তাহলে কি এর ব্যাখ্যা হয়ে যাবে? বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই মানছেন যে, এর ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু তাঁদের কাছে observability ওটাই consciousness, তার সাথে এটাকেও ধরে আছেন যে মস্তিষ্কের কেমিক্যালসের function দিয়ে consciousnessকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

দ্বিতীয় আরও মারাত্মক প্রশ্ন, যে প্রশ্ন প্রায়শই করা হয়, তাহলে স্বপ্ন জিনিসটা কি? মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে তার ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে না। খুব হলে তার স্পর্শেন্দ্রিয় কাজ করে, গরম বেশি লাগলে ঘুম ভেঙে যায়, শীত করলে ঘুম ভেঙে যায়। দরজা ধাক্কালে অনেক সময় বোধ হয় আবার অনেক সময় বোধ হয় না। কিন্তু স্বপ্নে মস্তিষ্ক যে কাজ করছে, বা কোন কিছু করছে সেখানে ইন্দ্রিয় দিয়ে কোন অনুভব ছাড়াই সব কাজ করে যাচ্ছে। এই জিনিসটা কি করে হয়? যারা observabilityকে নিয়ে চলে, বিজ্ঞানের ভাষায় যাদের ঘোর dualist বলা হয়, এরা এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তারা যে ব্যাখ্যা করে না তা নয়, ব্যাখ্যা করে বলে যে, যে জিনিসগুলো আগে এসেছিল সেগুলোই ঘুর ঘুর করে। যাদের বুদ্ধি বেশি তারা নানান ভাবে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করেন। তারা যেটাকে একবার সত্য প্রমাণিত করতে চাইবেন, যেভাবেই হোক তার সত্য প্রমাণিত করে দেন। এরপর দেখা গেল তাদের থেকে আরও বেশি উন্নত মস্তিষ্কের কেউ এল, তারা দেখিয়ে দিল যে এই যুক্তিগুলো ঠিক ছিল না।

পাশ্চাত্যের অনেক ধরণের মতের পণ্ডিত আছেন, বিভিন্ন শব্দ দিয়ে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। একটা হল reductionist, এদের মতে একটা জিনিসকে যদি টুকরো টুকরো করে দেওয়ার পর যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে, আগের যোগ আর পরের যোগ দুটো সমান। যেমন একটা গাড়ি, গাড়ির চাকা, স্টিয়ারিং, হর্ন, ইঞ্জিন, বডি অনেক কিছু থাকে, এর সব কটাকে যদি মিলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ওটাও যা, গাড়িও তাই। তাহলে মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হবে, আমার মাথা আছে, হাত আছে, পা আছে, এগুলো যা আর ওর যে sum total body এটাও তাই। এটাকে বলে reductionist approach, বিজ্ঞানে এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং consciousness studyর ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ তখন মস্তিষ্কের কোশিকার কার্যটাই প্রধান হয়ে যায়।

এদের বিপরীত আরেকটা মত আছে, যাদের বলা হয় Holistic। এরা বলে individual is much more than sum of all the parts। যত গুলো parts রয়েছে, সেগুলোকে যোগ করলে যা হবে তার থেকে বেশি হয় individual। যেমন আপনি, আপনার হাত, পা, মাথাকে যদি যোগ করে দেওয়া হয় তাহলেও ওই যোগফল আপনার থেকে কম থাকবে। যার জন্য বলা হয়, we are more than all our parts taken together, আমার যত গুলো ইন্দ্রিয় আছে, যত গুলো অঙ্গ রয়েছে আর তার সাথে মস্তিষ্ক, এর সব কটিকে মিলিয়ে দিলেও আমি হব না। বেদান্ত একটা খুব নামকরা উদাহরণ দেন, মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সব কিছুই থাকে কিন্তু সেই লোকটা থাকে না, তার নিজস্ব কোন বোধ থাকে না। এনারা তাই consciousnessকে ব্যাখ্যা করার সময় বোধ জিনিসটা নিয়ে আসেন। বলছেন, স্বপ্ন জগতে মানুষ যখন বিচরণ করে তখনও তার নিজস্ব একটা বোধ আছে, সেইজন্য আমরা যখন consciousness বলব তখন জাগ্রত ও স্বপ্ন দুটোকেই বলব। একটা বাচ্চাও জানে জাগ্রতটাও

সত্য আর স্বপ্নে থাকার সময় স্বপ্নটাও সত্য। তাহলে consciousness কোথায় থামে, থেমে কোথায় যায়? ওনারা বলেন আমাকে যদি বেহুঁশ করে দেওয়া হয় তখন আমার কোন বোধ থাকে না। যদি গভীর নিদ্রায় একটা সুষুপ্তির অবস্থায় থাকি, ওনারা বলেন তখনও আমার কোন consciousness থাকে না। এর বাইরে যা কিছু আছে ওটাই consciousnessএর অবস্থা। তাছাড়া একজনের যে consciousness, তাই দিয়ে সে অপরের conscisousnessকে কখনই বুঝতে পারবে না। যেমন একটা পিঁপড়ের ব্যাপারে আমরা সব কিছুই জানতে পারি, পিঁপড়ে এভাবে হাঁটে, এভাবে খায়, কিন্তু পিঁপড়ে হওয়াটা কি এটা আমরা কোন দিন কল্পনা করতে পারব না। আমি যাকে ভালোবাসি তাকে আমি দুঃখ করে বলি, তুমি আমাকে একটুও বুঝলে না। কি করে বুঝবে! আমাকে বোঝা মানে, তুমি আমি, যা কখনই সম্ভব নয়। তার মানে, আমার যে consciousness, আমার যে স্ব-বোধ এটা কখনই অপর কেউ নিতে পারে না। এই ব্যাপারটাকেও মোটামুটি সব বিজ্ঞানীরাই মানেন।

তাহলে আমরা আলোচনা করে করে যে জায়গাটায় দাঁড়ালাম, যেমন সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রা বা বেহুঁশ অবস্থা, এই দুটি অবস্থায় মানুষের কোন বোধ থাকে না। Consciousnessএর উপর পাশ্চাত্যের যে পর্যবেক্ষণ ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু হয়। তাহলে মানুষ বেহুঁশ অবস্থা থেকে বা গভীর নিদ্রা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় যখন ফেরত আসছে, তখন পুরো জিনিসটা যেমনটা ছিল তেমনটাই ফেরত আসে, এই পুরো জিনিসটা কি? আরেক মতবাদের দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁদেরকে Idealistic বলা হয়, তাঁরা বৈষয়িক মনকে মানেন, তাঁরা বলেন একটা বৈষয়িক মন বা সমষ্টি মন আছে। আমরা সবাই ওই বৈষয়িক মনের ছোট ছোট অঙ্গ। আমরা এগুলো সব পাশ্চাত্য দর্শনের মত নিয়ে বলছি। আমাদের মস্তিষ্কটাও তার একটা অর্গান। মস্তিষ্ক ওই মনকে ধরে, ধরে সে নিজের কাজ চালায়। মস্তিষ্ক থেমে গেলেও মনের কাজ বন্ধ হয় না। ইদানিং কালে বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু পরীক্ষা করেছেন, একটা লোকের ব্রেন ডেড হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও তার মন কাজ করে যাচ্ছে। যেমন দিল্লীর একটা ঘটনা আছে, একজন বাঙালী ভদ্রমহিলার পার্কিনসন হয়ে তার ব্রেন পুরো শুকিয়ে ফাঁকা হয়ে গেছে। নার্সরা তার দেখাশোনা করত। সবাই জেনে গেছে যে মহিলা আর বেশি দিন বাঁচবে না, কারণ ব্রেন পুরো শুকিয়ে গেছে। তার নার্সও একজন বাঙালী মহিলা, নার্স একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গান গুন্ গুন্ করতে গিয়ে একটা লাইন ভুলে গেছে। হঠাৎ সবাই অবাক হয়ে দেখল, ওই মহিলা বিছানায় দুম্ করে উঠে বসে বাকি লাইনটা পূরণ করে দিল। পূরণ কর দুম্ করে বিছানাতেই পড়ে গেল, সব শেষ। বিজ্ঞানীদের কাছে এটা একটা রহস্য, যার ব্রেন পুরো ডেড, হঠাৎ কি করে তার কি হয়ে গেল, আর তারপরই সব শেষ। তার মানে কোথাও কিছু একটা কার্যাবলী আছে যা মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে হয় না। খুব সহজ উদাহরণ হল সেলফোন। সেলফোন রিসিভারেরও কাজ করে, ট্রান্সমিটারেরও কাজ করে, ওয়েভস গুলোও আছে। সেলফোন যদি খারাপ হয়ে যায় তাতে ওয়েভ চলাটা বন্ধ হবে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের যে ধারণাগুলো আলোচনা করা হল, মস্তিষ্ক, মন, তাতে মন মস্তিষ্ককে জন্ম দিচ্ছে, অর্থাৎ মন মস্তিষ্ককে দিয়ে কাজ করায় নাকি মস্তিষ্ক মনকে জন্ম দেয়, কিছুই পরিষ্কার করে বলতে পারছে না। পাশ্চাত্য নিওরো বিজ্ঞানীদের লেখা আমরা যত পড়ব তত আমাদের সংশয় বাড়বে। আর লেখক যত উচ্চমানের তার লেখা তত সংশয়াত্মক।

একটা কথা ওনারা বলেন, মানুষ যখন বেহুঁশ থাকে বা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে, এই দুটি অবস্থায় চেতনা কাজ করে না। এখানে এসেই বেদান্ত বাকি সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। বেদান্ত ঠিক এই জায়গাটাকে ধরবে। বেদান্ত বলবে, তুমি কি করে বলছ সুষুপ্তিতে মন কাজ করে না? কারণ মানুষ সুষুপ্তি থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন সে বলে, আমি জোর ঘুমিয়ে ছিলাম, আমার কিছু মনে নেই। ওই অবস্থায় তাকে যদি কলকাতা থেকে পাটনায় নিয়ে যাওয়া হয় সে কিছুই বুঝতে পারবে না, তার কোন বোধ নেই। কিন্তু একটা বোধ তার কাজ করে যাচ্ছে, আমার কিছু মনে নেই। আমার কোন বোধ নেই এটাও একটা বোধ। শুধু তাই না, এই যে বলছে আমার দারুণ ঘুম হয়েছিল, তার মানে আনন্দের একটা অনুভূতি আছে। শুধু যে অজ্ঞানের বোধ থাকছে তা নয়, তার সাথে একটা আনন্দের

বোধও আছে। কোথাও যে আনন্দের বোধ থেকে যাচ্ছে, সেটা দেখে মনে হয় কিছু একটা আছে, ঐ অবস্থায় সে আনন্দে ছিল, ওখান থেকে যখন ফেরত আসছে সে তখন সেখান থেকে আনন্দের আস্বাদটা নিয়ে ফিরছে। খুব সহজ যুক্তি, আমি জানি না, আমি জানি না বলাটাও একটা জানা। তেমনি আমার বোধ নেই, এটাও একটা বোধ। আমার কোন কিছুর বোধ ছিল না, এই বোধটা সুষুপ্তির পর কোথা থেকে আসছে? এই প্রশ্নের উপর বেদান্ত বাকি সবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। বেদান্ত বলবে, তোমরা আসলে চেতনাকে নিয়ে কথা বলছ, যেখানে বুদ্ধির কাজ চলছে, ইন্দ্রিয়ের কাজ চলছে, তোমার অনুভূতি, তোমার আবেগের কাজ চলছে, তোমার জানা অজানা যা কিছু আছে সব কিছুকে নিয়ে কাজ চলছে, কিন্তু সেটা পূর্ণ চৈতন্য নয়। যখনই আমার আর তোমার বোধ আসে তখন বুঝতে হবে ওটা চৈতন্য নয়, ওটা চেতনা। সেইজন্য চেতনা আর চৈতন্য দুটো আলাদা শব্দ আমরা ব্যবহার করি। চেতনা হল মন, বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার মাধ্যম দিয়ে কাজ করে আর চৈতন্য হল সর্বব্যাপী। চৈতন্যই আছে, আর চৈতন্যই বাকি সব কিছুকে ধরে আছে। খুব হলে তুমি একটা প্রশ্ন করতে পার, যদি সব জায়গায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন তাহলে আমি সেটাকে বোধ করি না কেন? একটা সমুদ্রের মাছকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'ওহে ভাই! তুমি জানো তুমি জলের মধ্যে আছ'? মাছ বলবে, 'আমি জানি না'। 'তুমি কি জান স্নান কি জিনিস'? 'স্নান! স্নান আবার কি জিনিস, আমার জানা নেই'। কারণ স্নান জানার জন্য শুকনোর বোধ থাকতে হবে। মাছের শুকনো বোধ নেই তাই তার স্নান কি জিনিস জানা নেই। 'আচ্ছা ভাই! তুমি কি জানো তুমি জলে ভিজে আছ'? 'ভিজে থাকাটা আবার কি! আমার ওসব জানা নেই'। মাছের এই উদাহরণটা খুবই স্থূল উদাহরণ, কিন্তু চৈতন্যের ব্যাপারে আইডিয়াটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে সাহায্য করে। যেভাবে গভীর জলের কোন মাছ স্নান কি জিনিস জানে না, জল কি জিনিস জানে না, জলের বোধ তার হয় না, জলে ভেজার বোধ হয় না, ঠিক তেমনি মানুষ কখনই চৈতন্যের বোধ করতে পারে না যদিও সে অনন্ত অচিন্তনীয় চৈতন্যের মহাসাগরে নিমজ্জমান।

একটা জিনিসকে জানার জন্য duality দরকার, যেখানে দুই নেই সেখানে জানার কোন উপায় নেই। জলের বোধ আনার জন্য আমাকে ডাঙায় আসতে হবে, বাতাসে আসতে হবে, মাছের পক্ষে যেটা কখনই সম্ভব নয়। মাছের তাই জলের কোন বোধ হয় না। যখন oneness থাকে, তখন কোন কিছুই জানা যায় না। আমাদের শাস্ত্রে তাই ঋষিরা বলেন, সূর্যলোকের বাসিন্দাদের কাছে দিন রাত বলে কিছু হয় না। আমরা পৃথিবী থেকে সহজে বলে দিতে পারব সূর্যলোকে সব সময় দিন। কিন্তু যে সূর্যলোকের বাসিন্দা সে কোন দিন জানবে না দিন বলে কিছু হয়। কারণ দিন জানতে হলে আগে তাকে রাত জানতে হবে। সূর্যলোকে রাত হয় না বলে দিনের কোন বোধ হয় না। চৈতন্যে দুঃখ নেই বলে সুখ কি জিনিস তার জানা নেই। সুখ জানে না বলে তাই দুঃখটাও জানে না। সেইজন্য শাস্ত্রে আমরা প্রায়ই এই কথা পাই, সুখ-দুঃখের পার। আমি আপনাকে আলাদা করে জানি, আপনাকে দেখলে আমার আনন্দ হয়, আবার মেজাজ খারাপ থাকলে আপনাকে দেখলে বিরক্ত হয়ে যাই। কখন আপনাকে ভালোবাসছি, কখন আপনার উপর অসন্তুষ্ট হই। কিন্তু আলাদা বলে যদি কোন বোধ না থাকে, সব এক দেখি, দুই বলে কিছু নেই তখন কাকে ভালোবাসব, কার উপরই বা অসন্তুষ্ট হব। ক্রিয়া হওয়ার জন্য অন্য অনেক কিছু লাগে, তাই কোন ক্রিয়াও হয় না। ক্রিয়া হয় না বলে ধর্ম অধর্মের পারে, ধর্ম অধর্মের পারে তাই পাপ-পূণ্যের পারে। ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য, জন্ম-মৃত্যু যেখানেই দুই হয় সেটার পারে। ঐটাই আছে, যেখানে দুই হয় সেখানে একের বোধ বা যেখানে এক আছে সেখানে দুইয়ের বোধ। সংখ্যা আসা মানেই diferentiation এসে গেল। Differntiation নেই সেইজন্য আমরা বলতে পারব না ওটা এক না দুই। আর যখন জানা নেই ওটা এক না দুই কিন্তু আছে, সেইজন্য ওটাকে শূন্য বলা যাবে না। তাই সেটা শূন্যও না, একও নয়, দুইও নয়। অদ্বৈত বললে আমরা সব সময় ভাবি এক। অদ্বৈত মানে কখনই তা নয়, অদ্বৈত মানেই দুইও নয়, একও নয় আর শূন্যও নয়। বেদান্ত consciousnessকে একটা কথা দিয়ে বলে দেন, এটাই আছে, এছাড়া আর কিছু নেই, এটা আছে বলেই বাকি সব কিছু চলছে। সমুদ্রে জল আছে বলেই সেখানে মাছের অস্তিত্ব, সমুদ্র আছে বলেই মাছ খাওয়া পায়। এটা উপমা,

চৈতন্য আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে, নড়াচড়া হচ্ছে, ক্রিয়া হচ্ছে। আমার আপনার অস্তিত্ব আছে কারণ চৈতন্য আছেন। ঠাকুর বলছেন, হাড়ির নীচে আগুন আছে বলে হাড়ির ভেতর আলু পটল লাফাচ্ছে। আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যে টগবগ করছে কারণ নীচে আরেকটা সত্তা আছে।

যদি বিচার করতে যাওয়া হয়, এই সব কিছুকে কে চালাচ্ছে, আসল মালিক কে, যেমন আমরা বলি চোখ দিয়ে আমি দেখছি, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে চোখ তাকিয়ে থেকেও কিছু দেখি না। ভিড়ের মধ্যে হাজার হাজার লোক, তার মধ্যে একজনের দিকে চোখ পড়তেই বলছি, এতো আমার বন্ধু, বাকিদের চোখ দেখলেও কারুকেই মনে থাকে না। তাই না, নার্ভ সেন্টার যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে চোখ থাকলেও দেখতে পারব না। চোখের কিছু কিছু রোগ আছে, চোখের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও চোখ কাজ করে না। তাহলে চোখের সাথে আরেকটা জিনিস আছে। সেখান থেকে মস্তিষ্কে যে অপ্টিক্যাল সেন্টারস্ রয়েছে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে আমরা আগে যে আলোচনা করলাম, তাতে এটাই দেখানো হল যে Reductionism, Holism, Idialism কোনটাতেই সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। আসলে পুরো জিনিসটা কে করছে?

কেনোপনিষদ ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়েই আলোচনা করছে। ওটাকে জেনে আমার কি হবে? জেনে গেলে এটাই লাভ হবে, আসলে কে করছে জেনে গেলে তখন আমাদের জীবনে ভালো মন্দ যা কিছু হচ্ছে, সুখ-দুঃখ যা হচ্ছে, শোক মোহ যা হচ্ছে, এই ভালো থাকছি, এই মন খারাপ, তাহলে আমি জানতে পারব এর উৎসটা কি। আর আমি বলতে আমি নিজেকে যেটা মনে করছি, যখন জানতে পারব আমার সাথে ওই উৎসের কি সম্পর্ক, তখন কিছু একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়, তখন কিছু করা যায়। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নরেন আদিদের দেখিয়ে বলছেন, এই ছোকড়ারা যারা এখানে আসে এদের শুধু জানতে হবে তারা কে আর আমি কে আর তার সাথে ওদের কি সম্পর্ক, তাহলেই হয়ে যাবে। এই যে জ্ঞান, আমি কে, আর সব কিছুকে যে চালাচ্ছে সে কে? এই দুটোর সাথে সম্পর্ক কি? এই জিনিসটাকে যখন জানা হয়ে গেল তখন এই জীবনে যা কিছু, দ্বন্দ্ব রয়েছে, দ্বৈত ভাব যা আছে সেটা কেটে যায়। দ্বন্দ্ব ভাব যেমনি কেটে গেল সে সুখ-দুঃখের পারে চলে গেল। তার জীবনের যত কষ্ট, যত দুঃখ সব চলে যাবে। তার সাথে আপাত ভাবে যেটাকে সুখ বলে সেটাও চলে যায়। ঠাকুরের জীবনে এটা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। ঠাকুর যেমন যেমন মায়ের ভাবে, অদ্বৈতের ভাবে ডুবে যাচ্ছেন, তিনি অনেক কিছু করতে চাইছেন, শৈশব থেকে তিনি যে সংস্কারগুলো নিয়ে বড় হয়েছেন, গোঁড়া ব্রাহ্মণ বাড়ির আচারি ছেলে হয়েও এগুলো কিছুই করতে পারছেন না। পৈতে খুলে ফেলে দিচ্ছেন। এসবের জন্য হৃদয়রাম যখন গালাগালি দিচ্ছে তখন ঠাকুর বলছেন, আমি রাখতে চাইছি কিন্তু খসে যাচ্ছে। তিনি চোখের জল ফেলছেন কিন্তু কিছু করতে পারছেন না। কাঙালীদের এঁঠো পাতা তুলছেন। গঙ্গায় নেমে পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে যাচ্ছেন কিন্তু আঙুলগুলো খুলে যাচ্ছে, সব জল আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মানে, ঠাকুর পূণ্য কর্ম করতে চাইছেন, ধর্ম করতে চাইছেন, আচার করতে চাইছেন, সমাজে যে জিনিসগুলো করলে ভালো বলা হয় তার সব কিছুই করতে চাইছেন, তার সাথে ভদ্রলোকের মত সেজেগুজে থাকতে চাইছেন। কিন্তু কোনটাই করতে পারছেন না, চেষ্টা করেও পারছেন না। পাশের লোকেরা বলছে চেষ্টা করলেই পারবেন, তিনিও চেষ্টা করছেন কিন্তু করে উঠতে পারছেন না। এটাই অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকলে যা হয়, মানুষ যখন চৈতন্য অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এটাই হয়। সেই চৈতন্যটা কি আর তার সাথে ব্যক্তির কি সম্পর্ক? এই প্রশ্নকে জানার জন্যই কেনোপনিষদ।

এতক্ষণ চৈতন্য জিনিসটা কি বোঝার চেষ্টা করলাম। ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে, ইন্দ্রিয়গুলি কি চৈতন্য? নাকি ইন্দ্রিয়ের পেছনে যে নার্ভ সেন্টার আছে সেটা চৈতন্য? নাকি মস্তিষ্ক কেন্দ্রটা চৈতন্য? মস্তিষ্কের পেছনে মনের যে ভূমিকা কাজ করছে, আমরা মেনেই নিচ্ছি মন মস্তিষ্কের কার্য থেকে শ্রেষ্ঠ, তাহলে মনই চৈতন্য না অন্য কিছু? কোন সন্দেহ নেই যে মনের এলাকায় অনেক কিছু জিনিস আছে, বোধ আছে, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানাদি যত রকমের বোধ থাকতে পারে সব আছে আর সব থেকে বড়

হল আমিত্ব বোধ। কিন্তু এরও পেছনে কি কিছু একটা আছে? আছে কি নেই? কেনোপনিষদ এটাকে নিয়েই আলোচনা করবে।

স্বামীজী বলছেন পদার্থ বিজ্ঞান যেদিন সেই শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়ে যাবে যেখান থেকে বাকি সব কিছু বেরোয়, সেদিন পদার্থ বিজ্ঞানের সব অনুসন্ধান শেষ হয়ে যাবে। রসায়ন বিজ্ঞান যেদিন সেই উপাদান পেয়ে যাবে যেখান থেকে বাকি সব উপাদান বেরোচ্ছে, সেদিন রসায়ন বিজ্ঞানের সব অনুসন্ধান থেমে যাবে। মজার ব্যাপার হল, ১৮৯৩ সালে স্বামীজী যখন এই কথা বলছেন তখনও বিজ্ঞানে unification বলে কোন আইডিয়া ছিলই না। তত দিনে খুব নাম করা দুটো unification হয়েছিল। প্রথমটাকে বলে Maxwell Equations, যেখান থেকে দেখা যায় electricity আর magnetism দুটো এক, যার জন্য এখন শুধু electric বলে না, electro-magnetic force বলে। আগেকার দিন electricity আলাদা ছিল, magnet আলাদা ছিল। কিন্তু তিনি যে ইক্যুয়েশান দিলেন তাতে দেখাচ্ছেন যে electricity আর magnet এক। তার কিছু দিন আগে, James Prescott Joul নামে একজন নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী দেখালেন heat and motion are related। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তাপ আর গতির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমরা জানি ঠাণ্ডাতে হাতের তালু ঘষলে হাতের তালু গরম হয়। উনি কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকে গাণিতিক ফর্মুলাতে ফেলে দিলেন, ওনার খুব নামকরা ইক্যুয়েশান w=jh (work done = heat x one constant)। এই দুটো বাদে সবটাই আলাদা। আর কত আলাদা এভাবে দেখতে হবে, স্বামীজী যখন এসেছেন তখন পদার্থ বিজ্ঞানে একশর কাছাকাছি element পাওয়া গেছে, আর একশটা elementএর সবটাই আলাদা, হাইড্রোজেন আলাদা, অক্সিজেন আলাদা, হিলিয়াম আলাদা, কারুর সাথে কারুর কোন লিঙ্ক নেই। অথচ স্বামীজী তখন বলছেন, যেদিন রসায়ন বিজ্ঞান সেই ওয়ান এলিমেন্ট পেয়ে যাবে, যেখান থেকে বাকি সব রসায়ন এলিমেন্ট বেরিয়ে আসছে। পদার্থ বিজ্ঞান যেদিন সেই এনার্জি পেয়ে যাবে যেটা থেকে বাকি সব এনার্জি বেরোচ্ছে। ১৯০২ সালে স্বামীজীর মহাসমাধি, ১৯০৪ সালে আইনস্টাইনের নাম প্রথম আসছে যেখানে উনি দেখালেন পদার্থও যা, শক্তিও তাই। এরপর থেকে পদার্থ বিজ্ঞানের সব কিছু খুলতে শুরু হয়ে গেল, ইলেক্ট্রন এলো, প্রোটন এলো। তারও কিছু পরে এলো নিউট্রন, আরও পরে পজিট্রন এল। এরপর আবার বিজ্ঞানীদের মাথায় বাজ পড়ল, এতগুলো জিনিস কোথা থেকে এসে গেল! কারণ বিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটা unify করে দিয়েছিল, এ্যটম যারই হোক তার ভেতরে নিউক্লিয়াস আছে, নিউট্রন প্রোটন আছে, বাইরে নিউট্রন ঘুরছে, মোটামুটি একটা unify হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ দেখা যাচ্ছে একগাদা পার্টিকেলস এসে গেল, কত পার্টিকেলস্ আছে বিজ্ঞানীরাও জানে না।

এরপর আবার ঘুরে এসে বলতে শুরু করে দিল, সবটাই হল কোয়ার্ক্স। কোয়ার্ক্স দিয়ে আবার পুরো সব জিনিসকে কাছে নিয়ে এসে unify করে দিল। মাইক্রোফোন আলাদা, আমার কলম আলাদা, এটা local wisdom। কিন্তু দুটো আলাদা জিনিসকে একটা জায়গায় নিয়ে unify করে দেওয়ার জন্য দরকার knowledge, actual wisdom। ওই জ্ঞান যখন পেয়ে যায় তখনই unificationটা আসে, তখন বলে মুসলমানদের আল্লাও যা খ্রীশ্চানদের গডও তাই আর হিন্দুদের বিষ্ণুও তাই। Unification যখন আসে তখন বলে *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*। তখনই মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করে, আমি ধন্য, আমার জীবন ধন্য, আমার গর্ভধারিণী মা ধন্য, যে সমাজে আমি জন্মেছি সেই সমাজ ধন্য। যতক্ষণ এই unification না হয় ততক্ষণ বুদ্ধি দিয়ে, মন দিয়ে যা কিছু আমরা জানছি, বুঝছি সবটাই local wisdom। তার মানে আমাদের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় local wisdomএর উপরই চলছে। যেখানে সত্যিকারের unifcation হয়ে যায় আর ওই unificationএর জ্ঞানে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, সেটাই প্রকৃত জ্ঞান। বিজ্ঞানের সব শাখাই তাই করে যাচ্ছে, আমরাও তাই করি তবে অন্য ভাবে করি।

এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, চৈতন্যকে আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করলাম আমরা যেন মনে না করি এটা হিন্দুদের মত, একমাত্র বেদান্তই এই মতকে নিয়ে চলে। বেশির ভাগ হিন্দু consciousness বলতে চেতনাকেই নেয়। চেতনাকে যদি consciousness রূপে না নেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু ওনাদের দর্শনে অনেক সমস্যা এসে যাবে। আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে আমাদের যে এত বড় বড় মুনি ঋষিরা ছিলেন, কপিল মুনি, জৈমিনি, গৌতম এনারা কি করে এই ভুলটা করলেন। এটা কিন্তু ভুল নয়, এনারা যখন ধ্যানের গভীরে যান, তখন কিছু কিছু সত্য তাঁদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। এই সত্যগুলিকে তাঁরা নিজের শিষ্যদের বলতেন। শিষ্যদের মধ্যে কেউ তাঁর সন্তান হতে পারে, নাতি হতে পারে বা তাঁর নাম শুনে তাঁকে গুরু রূপে বিদ্যার্জন করতে এসেছে। এই বিদ্যা বা জ্ঞান হাজার হাজার বছরের পুরনো। বিভিন্ন ঋষি মুনিদের জ্ঞান হাজার হাজার বছর ধরে জমে যাচ্ছিল। মাস্টারমশাই কথামৃত লিখলেন, প্রথম খণ্ড বের হল, স্বামীজী প্রশংসা করছেন, লোকেরা পছন্দ করছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড করে করে পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হল। আমরা যদি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে এক দেখি, তাহলে আমাদের কটা বই হয়ে গেল, ঠাকুরের কথামৃত পাঁচটা খণ্ড, ঠাকুরের জীবনী লীলাপ্রসঙ্গ দুটো খণ্ড, স্বামীজীর রচনাবলী দশ খণ্ড আর শ্রীশ্রীমায়ের কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের একটা নিজস্ব দর্শন তৈরী হয়নি। কারণ সেই ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যই এখন আসেনি যিনি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শের উপর একটা স্বতন্ত্র দর্শন দাঁড় করাবেন। ঠাকুরের পুরো দর্শন আর তার সাথে স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলীকেও যদি নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা দেখছি, ঠাকুর ওখানে একটা কথা বলছেন, সেখানে আরেকটা কথা বলছেন, ওখানে এক রকম এখানে আরেক রকম বলছেন, গৃহস্থকে এক রকম বলছেন, সন্ন্যাসীকে এক রকম বলছেন, তাহলে ঠাকুর কি বলতে চাইছেন? ঠাকুরের central philosophyটা কি? এটা কে ঠিক করবেন, কবে করবেন, আমাদের কোন ধারণা নেই। তাই এখন সবাই নিজের মত ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, নিজের মত কাহিনী বলে যাচ্ছেন।

বেদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই জিনিসটাই হয়েছিল। বেদের কলেবর অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ব্যাসদেব সবটা এক জায়গায় নিয়ে এলেন, আর বলে দিলেন এরপর থেকে ঋষিরা যা বলবেন বেদে যাবে না। মাস্টারমশাই পাঁচটি খণ্ডে কথামৃতে যা দিয়ে দিয়েছেন এর পর আর কথামৃত হবে না। কারণ মাস্টারমশাইর কাছে তখনও অনেক অপ্রকাশিত ডাইরি থেকে গিয়েছিল। কিন্তু আর কথামৃত হবে না। বেদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস হয়েছিল। বেদের ঋষিদের সাধনা খুব উচ্চমানের, তাঁরা জগতকে কিভাবে দেখছেন, ঈশ্বরকে কিভাবে দেখছেন, বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর একটা মত দাঁড় করিয়ে দিলেন। যে মত গুলো দাঁড় করিয়ে দিলেন, সেই মত গুলোই হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। তখন শঙ্করাচার্য এসে বললেন এভাবে তো চলতে পারে না। তারও অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথম কথা বৌদ্ধ ও জৈনদের মত খুব যৌক্তিক ভাবে দাঁড়াতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর ভারতের চার্বাকপন্থীরা, যারা ভোগবাদী, তারা তাদের সুন্দর সুন্দর কথাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করেছে। ভারতে তখন খুব জটিল পরিস্থিতি। শঙ্করাচার্য তখন বেদের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে পুরোদমে নেমে পড়লেন। তিনি তখন ভাষ্য লিখতে শুরু করলেন। অনেকে বলবেন, আচার্য শঙ্কর তো বেদের উপর ভাষ্য লেখেননি, উনি উপনিষদের উপর ভাষ্য রচনা করেছেন। কিন্তু তা নয়, শঙ্করাচার্য বলে দিলেন, বেদ হল কর্মকাণ্ড, কর্মকাণ্ড না করলে মন শুদ্ধ হবে না, মন শুদ্ধ না হলে উপনিষদের বক্তব্য ধারণা করা যাবে না। কর্মকাণ্ডে যে কথা বলা হয়েছে সেই কথা উপনিষদের বিরোধী কিছু নয়। আচার্য বললেন, সত্য কি, এটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। সারা দেশে যারা বেদের যজ্ঞাদি করে বেড়াতেন, তাঁদেরকে পূর্বমীমাংসক বলা হত, আর তাঁদের দর্শন ছিল কর্মকাণ্ড। কুমারিল ভট্ট, মণ্ডন মিশ্র এনারা সব তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ পূর্বমীমাংসক পণ্ডিত ছিলেন।

পূর্বমীমাংসকদের মতে জীবনের উদ্দেশ্য স্বর্গে যাওয়া, যার জন্য তাকে যজ্ঞ করতে হবে। পূর্বমীমাংসকরা বেদের অর্থ নিরুপণ করার জন্য কিছু নিয়মাবলী বেঁধে দিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য তাঁর

বিরোধী মতাবলম্বীদের খণ্ডন করার জন্য পূর্বমীমাংসকদের নিয়মাবলীকেই ব্যবহার করলেন। এর সাথে তিনি আরও তিনটে জিনিস নিয়ে এলেন, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। একটা জিনিস সত্য কিনা জানতে হলে প্রথমে দেখতে হবে যে existing wisdomকে যেন contradict না করে। Contradict না করলে এগোবে কি করে? এনারা বলছেন, তাতেও এগোবে, সেখানে extension of truth হবে, কিন্তু contradiction of truth যেন না হয়। ঠাকুরকে যেমন আমরা অবতার বলছি, ঠাকুর যদি নতুন কিছু না বলেন তাহলে আমরা তাঁর কথা শুনতে যাব কেন! কিন্তু এমন কথা বললেন যার সাথে বেদের কোন মিল নেই, তাহলে তো সেই কথা বেদ বিরোধী হয়ে গেল। সেটাকে হিন্দুরা কখনই গ্রহণ করবে না। এটাকেই বলে extension of truth। যে সত্যটা রয়েছে সেটাকে আরও টেনে স্পষ্ট রূপে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে কিন্তু মূল সত্যের সাথে কোন বিরোধ হওয়া চলবে না। বিজ্ঞান ঠিক এভাবেই এগিয়ে চলে। শ্রুতি মানে এটাই। Existing spiritual wisdom যা রয়েছে, সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু বিরোধ হওয়া যাবে না। সন্ন্যাসীর নিয়মাবলী তৈরী করে স্বামীজীও বলে দিলেন, পরে পরে যদি কেউ সাধনা করে এমন কোন অনুভূতি লাভ করে, যে অনুভূতি বর্তমানের জ্ঞানের বিরুদ্ধে যাবে না, সেটাকেও ঠাকুরের ভাব বলে গ্রহণ করতে হবে।

বেদের ঋষিরা একত্বের যে জ্ঞান দিয়ে গেছেন, সেই জ্ঞানকে যদি বিভিন্ন ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আমরা সবাই সেটাকে গ্রহণ করব। ঠাকুর যেমন বলছেন, সব ধর্মই ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। ঠাকুরের এই কথাতেও একত্বের ভাব পরিস্ফুটিত হচ্ছে। পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে বেদও একই কথা বলছেন, *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। বেদের এই কথারই সম্প্রসারিত রূপ হল, মহম্মদ, যীশু এনারাও বিপ্র, এনাদের যে কথা সেই কথাও এক সৎকে বলছে। তার মানে ঠাকুর যে কথা বললেন, এটাই হল extension of existing truth। আচার্যও বলছেন, যা কিছু হবে তা যেন শ্রুতির বিপরীত না হয়। তার মানে বেদে যদি এই রকম কথা থাকে বা বেদের কথাকে একটু যদি টেনে দিলে মিলে যায় তাহলে এটাকেও সত্য বলে গ্রহণ করা হবে।

দ্বিতীয় হল যুক্তি, অযৌক্তিক কিছু যেন না হয়, যুক্তিতে দাঁড় করাতে হবে। বেদে বলছে ঠিকই, কিন্তু যুক্তিতে দাঁড়ায় না, তাহলে এই কথা চলবে না। তৃতীয়, আমি যে জিনিসটাকে দেখছি, অনুভব করছি, এটাকে কখন না করা যাবে না। বলছেন, শ্রুতিতে যদি হাজারটা বাক্য থাকে যেটা একটা অনুভূতিকে বিরোধিতা করছে, তাহলে বেদের কথা অমান্য হয়ে যাবে। তার মানে বেদ আমাদের কাছে সর্বপোরি নয়। আমি যেটা অনুভব করছি সেটার শক্তি বেশি। যে কোন সিদ্ধান্ত যেটা হবে, সেটা যেন এই তিনটে পরীক্ষা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবকে পার করে। গীতা, উপনিষদে আচার্যের যা কিছু কাজ সব ক্ষেত্রে তিনি এই তিনটেকে ধরে রেখেছেন। অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের সাথে আচার্যের মতের অমিল হয়েছে। দুই পক্ষ এখন তর্ক করতে নেমে গেলেন। তর্ক আবার দুই প্রকার, যেমন বৌদ্ধরা বেদ মানে না, আচার্য ওদের পুরো যুক্তি দিয়ে হারিয়েছেন। বৌদ্ধ, জৈন, বস্তুবাদী সবাইকে যুক্তি দিয়ে হারালেন। আচার্যের যুক্তি এত সূক্ষ্ম স্তরে চলে যে, ওই যুক্তির সামনে কারুর দাঁড়ানো সম্ভব নয়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায় দর্শনের যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে তিনি শ্রুতি দিয়ে আটকে দিলেন। ওরা বলছে আমাদের কথা বেদে আছে। আচার্য তখন শ্রুতি থেকে উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন, বেদে এই কথাও বলছে। উনি পুরো reconcile করে দেখাচ্ছেন। বেদে এই রকম কথা আছে তার সাথে এই রকম কথাও আছে, এবার দুটো বিপরীত কথাকে যদি মেলাতে হয় তাহলে এই রকম সিদ্ধান্ত যদি হয় তবেই দুটো কথা মিলবে, তা নাহলে কোন দিন মিলবে না। তারা বলতে পারবে না যে, বেদের এই কথাকে আমি নেব আর এই কথা নেব না। ইংরাজীতে একটা নামকরা কথা আছে, love me love my dog, কোন মেয়েকে একটা ছেলে ভালোবাসে। মেয়েটিকে যদি বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে তার কুকুরকেও নিয়ে যেতে হবে। কোন মেয়েকে ভালোবেসে বলছে, আমি তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু তোমার রাগকে আমি গ্রহণ করতে পারব না। তা হবে না, নিতে হলে দুটোই নিতে হবে। যুক্তিতেও এনারা ঠিক তাই বলেন। তুমি আলোচনায় শ্রুতিকে নিয়ে আস তাহলে তোমাকে দুটোই নিতে হবে। এখানে যে যে কথা বলছ, তোমার

এই কথার সাথে ওটা মিলছে না। তুমি বলছ স্বর্গে যাওয়টাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঠিক আছি আমি মানলাম, কিন্তু বেদেই যে জায়গায় বলছে স্বর্গে যাওয়াটা নিকৃষ্ট জিনিস, সেটাকে তুমি কিভাবে মেলাবে? আচার্য শঙ্কর পুরো যৌক্তিক ভাবে আর বেদে যে কথাগুলো রয়েছে সব কথাকে নিয়ে চলেছেন। পূর্বমীমাংসকরা আবার উপনিষদকে সত্য বলে মানে না। আচার্য তখন বেদের যে অংশগুলো তাদের মতের বিরুদ্ধে যায় সেগুলোকে নিয়ে তিনি তাদের মেরেছেন। বেদের অমুক জায়গায় এই রকম কথা আছে, তুমি তোমার কথার সাথে এটাকে মেলাও। পূর্বমীমাংসকরা মেলাতে পারল না। আমরা মনে করছি আচার্য উপনিষদকে উপনিষদের মন্ত্র দিয়েই ব্যাখ্যা করছেন, একেবারেই তা নয়। আচার্যকে এখনও ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ intellect বলে মনে করা হয়, তার কারণই এটা। যে যেটার উপর দাঁড়িয়ে আছে তাকে সেটা দিয়েই মেরেছেন। যার আধার বিজ্ঞান, তাকে বিজ্ঞান দিয়েই মারছেন, তোমার আধার যুক্তি, তোমাকে যুক্তি দিয়েই কাত করে দিলাম, তোমার আধার বেদ, তোমাকে বেদ দিয়েই মারলাম। আর যারা যোগদর্শনের, তাদের অনুভূতি দিয়ে মারছেন। আচার্য পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছেন, অনুভূতিতে এই এই রকম হয়। তিনি কাউকে ছাড়েননি। শেষে তিনি অদ্বৈত বেদান্ত, যেটা আগে থেকেই ছিল, তিনি এই তিনটে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, অদ্বৈতই শ্রেষ্ঠ।

আমাদের কিছু কিছু দর্শন consciousness বলতে চেতনাকেই মনে করেন। Consciousness মানে যে চৈতন্য, এটাই বেদান্তের মত। শ্রুতিতে বলছেন চৈতন্যই শেষ কথা, কেনোপনিষদে সেটাকেই স্পষ্ট করা হয়েছে। যুক্তিতে দেখান, স্বপ্ন জগতের পেছনে রয়েছে সুষুপ্তির জগৎ, আর সুষুপ্তিতে বোধ থেকে যায়। অনুভূতিতে আরও মজার হয়। আগেকার দিনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কথা আমরা অতটা জানি না, কিন্তু ঠাকুরের কথা আমরা জানি। কালীঘরে ঠাকুর পূজা করছেন, দেখছেন কোশাকুশি চিন্ময়। কোশাকুশি চিন্ময়, এটা আবার কি জিনিস? অদ্বৈত সাধনার সময় তিনি দেখছেন ঘাস চিন্ময়, ঘাসের উপর দিয়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে, তাঁর বুকে ব্যাথা হচ্ছে। আমরা জানি ঘাসের চেতনা আছে, কিন্তু ঠাকুর দেখছেন ঘাস চিন্ময়। এখানেই যদি শেষ হয়ে যেত আমরা মনে করতাম ঠাকুরের হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে একদিন নরেন আর হাজরা হাসাহাসি করছে, কি বলে! ঘটি, বাটি, সবই ব্রহ্ম, সবই নাকি চৈতন্য। ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখছেন দুজন হাসাহাসি করছে। কথা শুনে বুঝতে পারলেন হাসির কারণ। তিনি শুধু নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন। নরেন সমস্ত জগতকে চৈতন্যময় দেখতে শুরু করলেন। বাড়িতে মাংস রান্না হয়েছে, সেটাকেও দেখছেন চৈতন্য। খেতে পারলেন না। মা জিজ্ঞেস করছেন, তোর কি শরীর খারাপ। ঘর থেকে বেরিয়ে হেদুয়ার পার্কে লোহার রেলিংএ মাথা ঠুকছেন, লোহাকেও চৈতন্য দেখছেন। মাথা ফুলে ঢোল। চৈতন্য কি জিনিস আমরা জানি না, আমরা বইয়ে পড়েছি মাত্র। তার মানে চৈতন্যকে অনুভব করা যায়। ঠাকুর ও স্বামীজীর এই সব ঘটনা যেখানে ঘটেছে আর এই ভাষায় বর্ণনা করা আছে, সেইজন্য আমাদের আর সন্দেহ করার কিছু নেই। অন্যান্য ঋষিদের যেসব ঘটনা পরম্পরাতে এখনো পর্যন্ত এসেছে সেখানেও এত পরিষ্কার আর এভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি, সেইজন্য আমাদের জানা সম্ভব নয় ওনাদের ঠিক ঠিক কি কি অনুভূতি হয়েছিল। কিন্তু আচার্য শঙ্কর যেভাবে ভাষ্য গুলো রচনা করেছেন, সরাসরি এই জ্ঞান না হয়ে থাকলে এভাবে লেখাই যায় না।

প্রফেট মানে পণ্ডিত। ইজ্রায়ইলে যেখানে জহুদিরা ছিল সেখানে অনেক প্রফেট ছিল। আমাদের যেমন পূজারীও হয় আর সন্ন্যাসীও হয়। আমাদের ভাষায় যাঁরা সন্ন্যাসী, তাদের ভাষায় প্রফেট। তাঁরা ঈশ্বরীয় কথা বলতেন, আর লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব জাগাতেন। যেমন জন দি ব্যাপটিস্ট, ইনিও একজন প্রফেট ছিলেন। গ্রামের মেয়েরা কুয়ো থেকে জল তুলছে, যীশু তাদেরকে ঈশ্বরীয় কথা বলতে শুরু করলেন। আর কেউ নেই, শুধু ওরাই আছে, ওরা কোন দিন এই ধরণের কথা শোনেনি। এতদিন তারা শুধু প্রফেটদের দেখেছে, তাঁদের মুখ থেকে প্রচলিত কথাগুলো শুনে এসেছে। একজন মেয়ে বলছে, he was unlike other prophets, he talked with authority, চাপরাশ আছে। যীশুকে প্রথমে গ্রামের কয়েকটি মেয়েই চিনেছিল। যীশুও বলছেন আমার পরেও অনেক প্রফেটরা

আসবে, কিন্তু সাবধান এরা false prophet। উনি প্রফেটের সংজ্ঞাটা পাল্টে দিচ্ছেন। সেখান থেকে তিনি হয়ে গেলেন ঈশ্বরীয় দূত। যীশু যে শুধু অথোরিটিতে বলছেন তা নয়, উনিও শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতিকে দিয়ে বলছেন। আচার্য শঙ্করের ভাষ্যও এই তিনটে জিনিসকে নিয়েই চলেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে নিজের কোন মত দিচ্ছেন না, আমরা দার্শনিক বলতে যা মনে করি, আচার্য সেই রকম কোন দার্শনিকও নন, তিনি শুধু আচার্য। উপনিষদে যেমনটি বলা আছে, ঠিক তেমনটি তার অর্থকে তিনি শুধু ব্যাখ্যা করে গেছেন। ব্যাখ্যা করার সময় তিনি শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতিকে ব্যবহার করছেন আর তার সাথে পূর্বমীমাংসকরা বেদের ব্যাখ্যার যে নিয়মাবলী করে দিয়েছে, সেটাকে অবলম্বন করছেন। ব্যাখ্যা করার সময় তিনি শুধু দেখছেন কথা গুলো যেন কোথাও অযৌক্তিক না হয়ে যায়, দ্বিতীয় শ্রুতির বিরোধী যে না হয় আর তৃতীয় এটা যেন অনুভূতি সাপেক্ষ হয়।

চৈতন্য মানে, ওখানে আলাদা কিছু থাকে না, আমার চৈতন্য তোমার চৈতন্য বলে কিছু থাকে না। আমার আর তোমার বোধ মানে চেতনা, এই বোধ চৈতন্য নয়। পাশ্চাত্য জগতে এই ভাব প্রথম প্লেটো নিয়ে এলেন, প্লেটোর ধারণা ছিল একটা বিশ্বমন আছে। তবে যাঁরা বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করেন তাঁরা নিজের বক্তব্য বা ধারণাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে নিয়ে যেতে চান, আজকে অনেকে মানছে, কিন্তু আগামী দিনে আরও একজন বেশি বুদ্ধিমান লোক এসে সেটাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে কেটে দেবেন। আচার্য শঙ্কর শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি তিনটেকে দিয়েই দেখাচ্ছেন কিভাবে ultimate truthএ গিয়ে সব কিছু মিলে যায়, মিলে একটা universal জিনিস হয়, সেটা হল চৈতন্য। এই চৈতন্যকে আমরা আত্মাই বলি, ব্রহ্মই বলি, সচ্চিদানন্দই বলি, ভগবানই বলি যাই বলি না কেন, আমি আপনি যে পরম্পরায় বড় হয়েছি সেই অনুসারে চৈতন্যের নাম দেব। যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তার গুণগুলো এক থাকবে।

এর আগে আলোচনা করে হয়েছিল কর্মকাণ্ডীদের মতে বেদ বলতে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকেই বোঝায়। বেদের ব্রাহ্মণে অনেকগুলো জিনিস থাকে, এই যজ্ঞ কিভাবে হবে, এই যজ্ঞের ফল কি, কোন ঋষিদের পরম্পরায় এই যজ্ঞ এসেছে, এর সব কিছুর আলোচনা থাকে। আচার্য শুরু করছেন *কেনেষিতমিত্যাদ্যোপনিষৎ*, কেন শব্দ দিয়ে শুরু হয় বলে এই উপনিষদের নাম কেনোপনিষদ্, ঈশাবাস্য উপনিষদও তাই, সেখানেও প্রথম শব্দ *ঈশাবাস্যমিদং*। *পরব্রহ্মবিষয়া বক্তব্যেতি*, এবার শুরু হল কেনোপনিষদ্, এর বিষয়বস্তু পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম আর পরমব্রহ্ম একই। ব্রহ্ম এমন এক জিনিস যার পরমব্রহ্ম হয় না, যদিও আত্মার ক্ষেত্রে আমরা আত্মা, পরমাত্মা বলি। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে ব্রহ্মই বলা হয়, ব্রহ্ম মানে যেটা সব থেকে বৃহৎ। অনেক সময় লোকেদের মনে ধারণা আনার জন্য বা সম্মান জানানোর জন্য পরব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম বলা হয় আর শুধু ব্রহ্মও বলা হয়। কেনোপনিষদের বক্তব্য পরব্রহ্ম, আর তার শুরু হয় *কেনেষিতম্* থেকে। তবে শুরু করার জন্য প্রস্তুতি লাগে।

দুম্ করে উপনিষদ্ পড়া যায় না, উপনিষদ পড়ার জন্য প্রস্তুতি লাগে। কলেজে ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হতে গেলে যেমন জিজ্ঞেস করে, তোমার বারো ক্লাশ পাস করা আছে তো। ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে ডিগ্রী থাকলেও ভর্তি হওয়া যায় না, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়ে ঢুকতে হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখে নেওয়া হয় যে এখানে পড়াশোনা করতে চাইছে তার একটা মৌলিক জ্ঞান আছে কিনা। মৌলিক জ্ঞান থাকলেই যে সে এগিয়ে যাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই, আর মৌলিক জ্ঞান না থাকলে কিছুই হবে না। উপনিষদ শেখার জন্যও কিছু মৌলিক প্রস্তুতি লাগে। কি রকম মৌলিক প্রস্তুতি? যজ্ঞের কর্ম করে করে সমস্ত কর্মের সমাপ্তি হয়েছে কিনা।

কেনোপনিষদ সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। তলবকার ব্রাহ্মণে বলে দেওয়া আছে কিভাবে যজ্ঞের কর্ম সম্পাদন হবে। কর্ম সম্পাদন করার পর সমস্ত কর্মের যে প্রাণ, সেই প্রাণের উপাসনা সে করেছে কিনা আর কর্মের যে অঙ্গ সাম উপাসনা করা হয়েছে কিনা। বেদে যারা যজ্ঞ করছে না, বা যজ্ঞ যাদের সমাপ্তি হয়ে গেছে, সমাপ্তি অনেক কারণেই হতে পারত, বয়সের জন্য, মানসিকতার জন্য, মানসিকতা মানে আমার আর কিছু লাগবে না, স্বর্গ বা ইহ জগতের ভোগ কিছু লাগবে না, এমন কি

অনেক সময় লাগলেও বলতেন, এই যে যজ্ঞ করা হচ্ছে যজ্ঞ গুলো যেন এক একটা দেহ। হিন্দু শাস্ত্রে ওনারা সব কিছুকে একটা মানব দেহ রূপে কল্পনা করতেন, যজ্ঞকেও তাঁরা দেহ রূপে দেখতেন। দেহের যেমন অনেক রকম অঙ্গ হয়, আর দেহ চলে প্রাণ দিয়ে, কারণ যজ্ঞে একটা ক্রিয়া আছে।

ঠিক ঠিক যজ্ঞকে যদি বুঝতে হয় বা যজ্ঞ না করেও তার সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে তাকে কাজ করতে হয়, সেইজন্য সামবেদে দুটি উপাসনা আসে – একটা প্রাণোপসনা আর সামোপসনা। সামপোসনা আবার সব বেদে থাকবে না, শুধু সামবেদের যে ব্রাহ্মণ রয়েছে তাতে আছে। ছান্দগ্যো উপনিষদেও প্রাণোপসনা আর সামোপসনা আছে। উপনিষদেও উপাসনা এই শব্দের ব্যবহার আছে। উপাসনা বলতে আমরা আজকে যে পূজাদি অর্থে মনে করি তখন সেই অর্থে উপাসনা ছিল না, ওর মধ্যে ধ্যানের ব্যাপারটা ছিল, অথচ পুরো ধ্যানও নয়, সেইজন্য এর নিজস্ব একটা শব্দ হল উপাসনা। সামবেদের যে যজ্ঞ তার দুটো জিনিস, একটা তার আশ্রয় আরেকটা তার অঙ্গ। দেহের যেমন আশ্রয় হল প্রাণ আর অঙ্গগুলো হল হাত পা। যজ্ঞেরও দুটি জিনিস – একটা আশ্রয় অর্থাৎ প্রাণ আর অঙ্গ। যে কোন ক্রিয়াতে প্রাণকে থাকতে হবে। স্বামীজী ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তকে আধার করে একটা থিয়োরী দাঁড় করেছিলেন, সেখানে তিনি বলছেন, জগতে দুটি বস্তু প্রাণ আর আকাশ। প্রাণকে তিনি universal energy বলতেন আর আকাশ হল particles বা পদার্থ। নাসদীয় সূক্তে বলছেন, সৃষ্টির আগে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, সেখান থেকে কোন ভাবে প্রাণের সৃষ্টি হল। প্রাণ মানে, যেখানেই কোন কম্পন হবে সেটাকে প্রাণ বলা হয়। এ্যটম বোমা সেটাও প্রাণ, বাতাস যে চলছে সেটাও প্রাণ। যেখানেই সামান্যতম নড়চড়া হয়, প্রাণের জন্যই হয়, যেখানেই motion সেখানেই প্রাণ, প্রাণ ছাড়া motion হয় না। এটা ঠিক এনার্জিও নয়, এটাকে আমরা বলতে পারি energy in motion। এনার্জি হতে পারে যেটা confined energy, কিন্তু এখানে এনার্জি জিনিসটাই প্রাণ। প্রাণ যখন পিওর এনার্জিই শুধু আছে, সেই পিওর এনার্জি যখন নিজের উপর আঘাত করতে শুরু করে, সেখান থেকে প্রথমে খুব সূক্ষ্ম পার্টিকেলস বের হতে শুরু হয়, তাকে বলছেন আকাশ। আকাশ মানে সব থেকে সূক্ষ্ম পার্টিকেলস, কত সূক্ষ্ম হতে পারে আমরা বোঝাতে পারব না।

তখনকার দিনে টেক্সলা খুব নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন, পদার্থ বিজ্ঞানের সব শাখাতেই যাঁর দখল ছিল, তিনি স্বামীজীর ব্যাখ্যা শুনে খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সমস্ত সৃষ্টির পেছনে শুধু দুটি বস্তু, প্রাণ (energy) আর আকাশ(matter), পদার্থও না, শুধু পিওর এনার্জি। পিওর এনার্জি বলতে কি বলছেন আমরা জানি না, কিন্তু ঋগ্বেদে এর উল্লেখ আছে, স্বামীজী সেটাকে সামনে নিয়ে এসে একটা থিয়োরী দাঁড় করাতে চাইলেন। টেক্সলা স্বামীজীর ক্লাশ শুনতে আসতেন, তিনি শুনে খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে স্বামীজীকে বললেন, বিজ্ঞানের দিক থেকে এটাকে পুরো দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে, যেখানে প্রাণ আর পদার্থের সাথে সম্পর্ক দেখানো যায়। টেক্সলা পরে এটাকে নিয়ে বেশি এগোতে পারেননি। কিন্তু তার সাত আট বছর পরে আইনস্টাইনের বিখ্যাত ইক্যুয়েশান এসে গেল, $E=MC^2$, প্রাণই পদার্থ, পদার্থই প্রাণ। কিন্তু সেখানে স্বামীজীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এটাই unifying principle, এই যে আমরা বৈচিত্রময় জগৎ দেখছে, কোথাও এই বৈচিত্রের মধ্যে একত্ব হয়ে আছে। কোথায় একত্ব আছে? সৃষ্টি মানেই কম্পন, যেখানে চলন আছে, ওই কম্পনের যে শক্তি সেটাই প্রাণ। যিনি উপাসনা করছেন, যজ্ঞ করছেন, তাতে ক্রিয়া হচ্ছে, দেবতারা কৃপা করছেন, কৃপা করাটাও কাজ, সেখানেও প্রাণ। স্থূল মনের অধিকারীরা পূজা করবে, যজ্ঞাদি করবে, এটাই তাদের কাছে সহজ উপায়। কিন্তু পূজা করার সময় যখন সে দেখে আমি যে পূজা করছি প্রাণের খেলা, যাঁর পূজা করছি তিনিও প্রাণের খেলা। আর যে জায়গাতে সব কিছু একত্বে চলে যাচ্ছে, এই একত্বের যদি আমরা স্তুতি করি তাতেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। এটা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়, এখানে একটা জিনিসকে বোঝানর জন্য উল্লেখ করা হল।

আচার্য শঙ্কর বলছেন তলবকার শাখার ব্রাহ্মণের প্রথমের দিকে কর্মের বর্ণনা, প্রাণোপসনা ও সামোপসনার বর্ণনা করা হয়েছে। আরেকটা ব্যাপার হল, আগে যে জৈমিনি ব্রাহ্মণের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর শুধু উল্লেখ করে যাচ্ছেন জৈমিনি ব্রাহ্মণে পর পর এই কয়েকটা জিনিসের উপর আলোচনা রয়েছে। তার মধ্যে একটা হল গায়ত্রীসাম, এটাও এক ধরণের উপাসনা। এই উপাসনাতে পাঠ করছে তার সাথে চিন্তন করছে। আর শেষে শিষ্য পরম্পরায় বংশের বর্ণনা করছেন। এখন যেগুলো পাওয়া যায় সেখানে বংশ দেওয়া আছে। ওনারা বিভিন্ন ঋষির নাম করে বলে দিচ্ছেন, এই এই বংশে প্রাণোপসনা আছে, এই এই বংশে সামোপসনা আছে, গায়ত্রীসাম উপাসনা আছে। দেখাচ্ছেন পরম্পরায় কিভাবে এই উপাসনা গুলো চলে আসছে।

বাইরের লোকেদের কাছে ধর্ম মানে বিশ্বাস, বিশ্বাসের উপরেই ধর্ম চলে। কিন্তু ধর্মে যদি বিশ্বাস নিয়েই চলে তাহলে তা আর যাই হোক সেটা ধর্ম নয়। ঋষিরা দুটি উপায়ের কথা বলেন, এই যে তোমাকে মন্ত্রগুলির কথা বলা হল, তুমি ধ্যানের গভীরে যদি চলে যাও তাহলে এই মন্ত্রগুলো তোমার মধ্যেও প্রকাশিত হবে, প্রকাশিত হলে তোমার কাছে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তুমি যদি সেই ভাবে ধ্যানের গভীরে না যেতে পারে, তাহলে গুরু-শিষ্য পরম্পরাতে যা চলে আসছে সেটাকে সত্য বলে ধরে রাখ। যজুর্বেদের দায়ীত্ব ব্যাসদেব দিলেন বৈশাম্পয়ন ঋষিকে। বৈশাম্পয়নের শিষ্য ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। কোন কারণে গুরু শিষ্যের মধ্যে বিবাদ লেগে যায়। শিষ্য বলে দিলেন আপনার এই বিদ্যা আমার লাগবে না। গুরুকে বিদ্যা ফেরত দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলে দিলেন মানুষ গুরুর উপর আমার আর বিশ্বাস নেই, মানুষের কাছে আমি কিছু শিখব না। তিনি নদীর ধারে সূর্য দেবতাকে গুরু রূপে বরণ করে ধ্যানের গভীরে ডুবে গেলেন। তারপর সূর্য দেবতা তাঁকে পুরো যজুর্বেদের শিক্ষা দিয়ে দিলেন। সূর্য দেবতা এসে দিলেন বা ধ্যানের গভীর থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু দেখা গেল দুটো যজুর্বেদের মন্ত্রগুলো এক, তবে সাজানোতে কিছু তফাৎ আছে। দুটো আলাদা শাখা এই জন্যই নয়, কারণ মন্ত্রগুলো এক কিন্তু সাজানোটা পাল্টে গেছে। সাজানো আলাদা হলে বেদই আলাদা হয়ে যাবে, সেইজন্য বলে যজুর্বেদ দুটি, শুক্ল যজুর্বেদ আর কৃষ্ণ যজুর্বেদ। আগেকার দিনে, এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিবাহের সময় গোত্রের ব্যাপারটা থাকে। এখনও শ্রাদ্ধাদির সময় বাবার দিকের সাত পুরুষ আর মায়ের দিকের সাত পুরুষের নাম দিতে হয়। গোত্র বা সাত পুরুষের নাম জানা থাকাতে একটা ঐতিহ্যের চেতনা আসে, আমার বংশে অমুক অমুক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এনাদেরও বংশের তালিকা জানাটা আবশ্যিক ছিল, কিভাবে এই পরম্পরা এসেছে। বেদে তো আসেই, এমনকি উপনিষদেও এসেছে। মুণ্ডকোপনিষদে প্রথমেই বলে দিচ্ছেন কিভাবে পরম্পরাতে এই বিদ্যা চলে আসছে, কোন কোন ঋষিরা এই পরম্পরাতে এসেছিলেন।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, সামবেদের তলবকার শাখার নবম অধ্যায়ে কেনোপনিষদ এসেছে। প্রথম আটটি অধ্যায়ে যজ্ঞাদির বর্ণনা, প্রাণ উপাসনা, সাম উপাসনা, গায়ত্রীসাম উপাসনা ও বংশাবলী এসেছে। আচার্য একটা ভূমিকা দেওয়ার পর বলছেন, এই আটটি অধ্যায়ে এতক্ষণ যা যা আলোচনা হল তাতে দুটি জিনিস আসে, একটা কর্ম আর দ্বিতীয় জ্ঞান। এখানে এই জ্ঞান মানে দেবতা বিষয়ক উপাসনার কথা বলছেন। আমরা যে ইদানিং জ্ঞানযোগাদির কথা বলি এই জ্ঞান তা নয়। তার মানে প্রাণ উপাসনা, সাম উপাসনা ও গায়ত্রীসাম উপাসনাকে বলছেন দেবতা বিষয়ক উপাসনা। বংশাবলীর কথা যেখানে বলা হয়েছে, ওই অংশটা কিছুটা জ্ঞান এইজন্য যে, ঋষিদের পরম্পরার কথা বলছেন। এখানে কোন ঋষিকে নিয়ে যখন চিন্তন করা হচ্ছে, তখন ওটাও ধ্যানের জন্যই করা হচ্ছে। তাই বংশাবলী শুধু মাত্র কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে না। প্রথম অংশ যেখানে যজ্ঞাদির বর্ণনা করা হয়েছে সেটাই কর্মকাণ্ড। দ্বিতীয় অংশে যে বিভিন্ন উপাসনার কথা বলা হয়, এটাই জ্ঞানকাণ্ড। এই জ্ঞান কিন্তু আত্মজ্ঞান নয়, এই জ্ঞান দেবতা বিষয়ক জ্ঞান। ঈশোপনিষদের নবম মন্ত্র থেকে ছটি মন্ত্রে শুধু কর্ম আর বিদ্যা আর তার সম্যক নিয়ে বলছেন। সেখানে অবিদ্যা মানে কর্ম আর বিদ্যা মানে দেবতা বিষয়ক জ্ঞান। বলছেন, যে কর্ম নিয়েই শুধু থাকে সে অন্ধকারে ডুবে যায় আর যে দেবতাদের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে

ডুবে যায়। কারণ শুকনো জ্ঞান কোথাও নিয়ে যেতে পারে না। সেইজন্য ওনারা কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ের কথা বলছেন, যজ্ঞ করবে আর তার সাথে দেবতা সম্বন্ধী জ্ঞানটাও রাখবে। দুটোকে নিয়ে চললে ফল ভালো হয়। কি ফল ভালো হয়? আরও ভালো স্বর্গ পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর ঈশোপনিষদে এটাই দেখাচ্ছেন, মানুষ যদি যজ্ঞ করে সে ডুবে যায়। কারণ সে আত্মজ্ঞান পায় না। আমাদের জাগতিক অর্থে ডোবার কথা বলছেন না। যজ্ঞ করে সে স্বর্গে গেল। স্বর্গে যাওয়া মানে আরও অনেক দিনের জন্য সে ফেঁসে গেল। আর দেবতা সম্বন্ধী শুকনো জ্ঞান নিয়ে যদি শুধু থাকে, যারা কোন কর্ম করেনি তাদের দু রকম হয়। হয় তারা আরও উঁচু স্বর্গ পাবে, মানে আরও বেশি দিনের জন্য ফাঁসল আর দ্বিতীয় যদি মনে মনে ভাবে তাতে যজ্ঞ করার ফলটাও সে পেল না আর দেবতাদের জ্ঞানও পেল না, মাঝখান থেকে গোল্লায় যাবে। বেদে যজ্ঞের প্রাধান্য, পরের দিকে তাঁরা দেখলেন যজ্ঞের প্রাধান্য আছে ঠিকই কিন্তু দেবতা সম্বন্ধী জ্ঞান ও দেবতা বিষয়ক উপাসনারও দরকার আছে, যদি না হয় তাহলে ফল ভালো হয় না। সেখান থেকে একটা আলাদা দর্শন দাঁড়াল যার নাম জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়। সমুচ্চয় মানে মিলিয়ে নিয়ে চলা, যজ্ঞাদি কর্মও কর তার সাথে দেবতা বিষয়ক জ্ঞানের সাধনাও কর। বেদের একটা মত ছিল, কর্ম যদি কর ভালো তবে জেনে করবে। সেইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে বলছেন, যেটা বিদ্যা দিয়ে করা হয় সেটা বীর্যতর ভবতি, আরও শক্তি দেয়।

আচার্য শঙ্কর জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়কে সব জায়গায় খণ্ডন করছেন, বলছেন এটা চলে না। অন্য দিকে স্বামীজী বলছেন do it either by work or worship or knowledge। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, স্বামীজী এখানে যে জ্ঞানের কথা বলছেন আর আচার্য শঙ্কর যে জ্ঞানের কথা বলছেন, দুটো এক নয়। আচার্য শঙ্কর উপনিষদে বেশির ভাগ জায়গায় যে জ্ঞান বলছেন এর অর্থ হয় দেবতা বিষয়ক উপাসনা। শুধু দেবতা বিষয়ক উপাসনাতে বিরাট কিছু ফল হয় না। যদি যজ্ঞের সাথে দেবতা বিষয়ক উপাসনা করা হয় তাহলে ভালো স্বর্গে যাবে ঠিকই কিন্তু আত্মজ্ঞানের পথে নিয়ে যাবে না। স্বামীজী যে জ্ঞানের কথা বলছেন, তাতে তিনি নিত্যানিত্যবস্তু বিবেকের কথাই বলছেন, বিচার করে করে যে জ্ঞান হয়। আচার্য শঙ্কর আবার যখন জ্ঞানের কথা বলবেন তখন সেখানে তিনি বলেন আত্যন্তিক অজ্ঞান নিবৃত্তি, এই জ্ঞান অজ্ঞানের পুরোপুরি নাশ করে দিচ্ছে। জ্ঞানের এই একটা সমস্যা, জ্ঞান বলতে কখন বোঝাবে দেবতা বিষয়ক জ্ঞান, কখন বোঝায় নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক আবার কখন বোঝায় আত্মজ্ঞান। তিনটে অর্থে জ্ঞানের ব্যবহার হওয়ার জন্য অনেকের মনেই প্রচুর সংশয় উৎপন্ন হয়।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, এই দুটি জিনিস কর্ম ও জ্ঞান নিষ্কাম ভাবে করলে চিত্তশুদ্ধি হয়, মন নির্মল হয়। প্রথমটা উত্তরমার্গ ⟹ মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানরহিত সকাম কর্ম করলে দক্ষিণমার্গের দিকে নিয়ে যায়। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়নের কথা বলা আছে। বেদের সময় যজ্ঞই ছিল প্রধান কর্ম, কিন্তু মহাভারত থেকে সব কর্মকেই যজ্ঞ রূপে করার কথা বলা শুরু হয়, আর স্বামীজী তো সমস্ত কর্মকেই যজ্ঞের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন। বলছেন, কর্মকে যদি দেবতা জ্ঞানের সাথে করা হয়, যদিও আমাদের সময় থেকে দেবতা বিষয়ক জ্ঞান উঠে গেছে, এখানে আমরা ঠাকুরের উপমা নিয়ে আসতে পারি। ঠাকুর আর দেবতা এক নন, কারণ ঠাকুর ভগবান। আমি রোজ ঠাকুরের পূজা অর্চনা করি। ঠাকুরের এই পূজা অর্চনা যদি ঠাকুরের স্বরূপের ধ্যান করে করি, এই পূজা অর্চনা আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া মানে চিত্তশুদ্ধি করবে। যদি মুক্তি নাও হয়, ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তাহলেও উত্তরমার্গ দিয়ে আমাকে উচ্চ স্বর্গে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে পরে আবার যখন জন্ম হবে তখন কোন শুভ ও শুচিষ্মান জায়গায় জন্ম হবে। তার সাথে এই শুভকর্মের স্মৃতিটাও ভালো থাকবে, যে স্মৃতি টেনে আবার ওই পথে নিয়ে যাবে। গীতাতেও এই কথা বলছেন *তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্*। ওই রকম শুভ জায়গায় জন্ম নেওয়ার পর এমন কিছু একটা হয়ে যায় যার ফলে আগের জন্মের সংস্কারের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। আগের জন্মে যে জায়গাতে ছেড়েছিল ঠিক সেই জায়গা থেকেই শুরু হয়ে যায়।

এর সাথে আরেক ধরণের হয়, জ্ঞান সাধন না করে শুধু যজ্ঞ করে যাচ্ছে। আমরা সবাই তাই করছি, ঠাকুরের মন্দিরে যাচ্ছি, দু এক টাকা প্রণামী দিচ্ছি, চরণামৃত খাচ্ছি কিন্তু ঠাকুর কি জিনিস, ঠাকুর কে, একবারও বোঝার চেষ্টা করি না। এর মধ্যে জ্ঞান নেই আর নিষ্কামও নয়, আমরা যা করছি সবটাই সকাম। এরা সবাই দক্ষিণমার্গে যায়। বেদের একটা মত যে, দক্ষিণমার্গে যাঁরাই যান, তাঁরা পিতৃলোকাদিতে যান। পিতৃলোকও স্বর্গ, সেখানেও অনেক সুখ, কিন্তু ওখান থেকে অনেক তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসতে হয়। উত্তরমার্গে যাঁরা যান তাঁদের সুখ পিতৃলোকের থেকে বেশি আর ওনারা সেখানে দেবতাদের সাথে থাকেন আর দক্ষিণমার্গের লোকেরা পিতৃদের সাথে থাকেন। হিন্দু ধর্মের বেশির ভাগ মানুষই দক্ষিণমার্গে যেতে যায়, তারা চায় আমার যারা প্রিয়জন, আমার বাবা, ঠাকুর্দা, তাঁদের সাথে আমি স্বর্গে গিয়ে নতুন শরীর নিয়ে বাস করব। দক্ষিণমার্গের ব্যাপারটা অনেক ঘরোয়া ব্যাপার, শ্রাদ্ধাদি কর্মও ঘরোয়া ব্যাপার। যারা শ্রাদ্ধের অন্ন ভালোবেসে খায়, দায়ীত্ব রূপে খাওয়াটা অন্য, এরা দক্ষিণমার্গের পথিক। কদাচিৎ কখন কখন কেউ কেউ হন যাঁরা উত্তরমার্গের পথিক হন। উত্তরমার্গের আবার দুটি শ্রেনী, একজন হলেন যাঁরা পৃথিবীতেই মুক্তি পেয়ে যেতে পারেন, আরেক ধরণের হলেন যাঁরা দু-চারবার উপর নীচ ওঠানামা করার পর মুক্তি পেয়ে যান। আর গীতাতে আরেকটা খুব কচিৎ কদাচিৎ মুক্তির কথা বলছেন, *সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ*, এনারা সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে টেনে নিয়ে এসে শরীরটা ছেড়ে দেন। এনারা উত্তরমার্গেরই একটা আলাদা তৃতীয় শ্রেনী। তিনি সারা জীবন যাঁর চিন্তন করে এসেছেন, মৃত্যুর পর তিনি উত্তরমার্গ দিয়ে তিনি ওই লোকেই যাবেন যাঁর চিন্তন করেছিলেন। যিনি বিষ্ণুর চিন্তন করেছেন তিনি বিষ্ণুলোক, যিনি ঠাকুরের চিন্তন করেছেন তিনি রামকৃষ্ণলোকে যাবেন। আর যেহেতু ভক্তি ভাব নিয়েই সারা জীবন সাধনা করে এসেছেন তাই তাঁর ইষ্টের সাথেই তত দিন থাকবেন যত দিন এই সৃষ্টি থাকবে। এরপর সৃষ্টির যখন নাশ হয়ে যাবে তখন তিনি ক্রমমুক্তি দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবেন। আসলে ঈশ্বরের ভাবে কেউ যদি চলে যান তিনি আর এই জগতে ফিরে আসবেন না। ওই অবস্থায় থেকে এখন যে সৃষ্টিটা যতদিন আছে ততদিন তিনি ওখানে ওভাবেই থাকবেন, ওখান থেকেই তিনি শুভ চিন্তনের দ্বারা লোককল্যাণ করবেন। এই সৃষ্টি যেমনি মিটে যাবে তিনি পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যাবেন। এরপর আবার নতুন যে সৃষ্টি হবে সেখানে তিনি আর আসবেন না।

তাহলে কয় প্রকার গতি হল? এক, দক্ষিণায়ণ, উত্তরমার্গে তিনটে গতি হয়ে গেল। এরপর পঞ্চম একটা গতি আছে, যারা যজ্ঞ কর্ম আর উপাসনা কোনটাই করে না, এদের ক্ষেত্রে বলা হয়, এরা কোথাও যায় না, এখানেই মরছে আর এখানেই জন্মাতে থাকে, জন্ম নিচ্ছে মরছে, আবার জন্ম নিচ্ছে মরছে, জন্ম-মৃত্যুর খেলা খুব দ্রুত চলতেই থাকে। এদের কথাই নচিকেতা তাঁর বাবাকে বলছেন, *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিব জায়তে পুনঃ*। এদের কোন গতি হয় না, সেটা আবার আচার্য শঙ্কর ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, যাদের সচ্ছন্দ প্রবৃত্তি, সচ্ছন্দ প্রবৃত্তি মানে কোন বিধি নিষেধ মানে না, এরা কোন ধর্ম মানে না, ধর্মে প্রবৃত্তি নেই। গীতাতে এদেরকেই আসুরীযোনি বলছেন, কিন্তু এখানে বলছেন *জায়স্ব ম্রিয়াস্ব*, জন্মায় মরে এদের দক্ষিণমার্গ, উত্তরমার্গ কোনটাই হয় না, ধান গমের মত এরা শুধু জন্মায় আর মরে, আবার জন্মায় আবার মরে, এদেরকে বলা হয় মৃত্যুধর্মা। এই তিনটে গতি, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ আর মৃত্যুধর্মা। উত্তরায়ণে আবার তিনটে গতি।

এই যে আচার্য *জায়স্ব ম্রিয়স্ব* বলছেন, জন্মায় আর মরে, এটাকে তিনি কোন যুক্তি দিয়ে বলছেন না, নিজস্ব অনুভূতি থেকেও বলছেন না, বলছেন শ্রুতি থেকে। ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে তিনি কোট করছেন। আচার্য একটা কথা বারবার বলবেন, মুক্তি, স্বর্গ, সৃষ্টি এগুলো প্রত্যক্ষ করা যায় না, যুক্তি দিয়েও জানা যায় না। এগুলোকে জানার একটাই মাত্র পথ হল শ্রুতি। আচার্যকে যদি বলেন, আমি শ্রুতি কেন মানব। উনিও বলবেন, না মানার তো কারণ নেই, কারণ যে ঋষিরা এই জিনিসগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা সাধনা করেছেন, তপস্যা করেছেন, তার থেকেও বড় তাঁদের কোন স্বার্থ ছিল না। মানুষ সাধারণ ভাবে দুটো অবস্থায় অপরকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। প্রথম হল তার নিজস্ব কোন

স্বার্থ থাকে, নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য থাকে, কিছু আদায় করতে চায়। যদি আমরা বিশ্বের মহাত্মার দিকে তাকাই, যীশু ক্রুসিফাইড হয়ে গেলেন, শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম রক্ষার জন্য চৌদ্দ বছর বনবাসে চলে গেলেন, ঠাকুর একজন অকিঞ্চন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পূজারী রূপেই তাঁর সারাটা জীবন গেল, ভগবান বুদ্ধ নিজের রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে যাঁদের আত্মত্যাগ সেখানে কিসের জন্য তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ থাকবে! শুধু যে একজন দুজনের জীবনে এই রকম হয়েছে তা তো নয়, যাঁরাই এই পথে গেছেন সবারই আত্মত্যাগ অত্যন্ত উচ্চতম অবস্থায় চলে গিয়েছিল। নিজের বাড়িঘর ছেড়ে দিচ্ছেন, স্ত্রী-পুত্রদের ছেড়ে দিচ্ছেন। কিছু এমন কোন জিনিস আছে যেটার জন্য তিনি সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন। এই বিরাট ত্যাগের বদলে যে তিনি অন্য কোথাও থেকে কিছু নিচ্ছেন তাও না। স্বামীজী নিজের মা ভাই-বোনরা অভুক্ত, তাতেও তিনি বেরিয়ে এসেছেন। ভাবলে আতঙ্ক লাগে, একদিকে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য তাঁকে টানছে আরেকদিকে তাঁর বাড়ির পরিস্থিতি তাঁকে ধরে রাখতে চাইছে। অন্য দিকে দ্বিতীয় যেটা ভুল পথে নিয়ে যায় সেটা অজ্ঞানের জন্য। এই দুটো কারণে ভুল পথে চালিত করে, এক তার নিজস্ব ধান্দা আছে আর দ্বিতীয় সে অজ্ঞানে আছে। এনাদের ক্ষেত্রে অজ্ঞান এই জন্য মানা যাবে না, প্রথমতঃ তাঁরা পরম্পরা বিদ্যা নিয়েছেন, সেই বিদ্যাকে নিয়ে সাধনা করেছেন, তপস্যা করেছেন। শুধু একজনের হলে আমরা তাও অজ্ঞান বলে মেনে নিতাম। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে একটা পরম্পরাতে হাজার হাজার মহাত্মারা আসছেন, আর বিভিন্ন জায়গায় একই জিনিস পুনরুত্থিত হচ্ছে, একটা জায়গাতে সীমাবদ্ধ থাকছে না। তাই একে অজ্ঞান বলে মেনে নেওয়া যায় না। মহম্মদ আল্লার কথা বলছেন, যীশুও ভগবানের কথা বলছেন, ঠাকুরও একই কথা বলছেন, ভগবান বুদ্ধও তাই বলছেন, কোথাও এটা এই জগতের নয়। তাঁদের সেই সত্যকেই সবাই সত্য বলে গ্রহণ করে নিচ্ছে, কখনই তাই এটাকে অজ্ঞান বলা যেতে পারে না। সেইজন্য তাঁদের কথাকে মানব না, এটা বলা যায় না।

তৃতীয়, তাহলে আমি উপনিষদের কথা না শুনে ইসলামের কথা কেন শুনব না। এইজন্য শোনা যাবে না, কারণ যে পরম্পরায় আমি বড় হয়েছি, সেটাই আমার জন্য সহজ পথ। যিনি ঈশ্বরের পথে যেতে চাইছেন তিনি যে পথই নিন না কেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর এই ব্যাপারে আমাদের কোন সমস্যাও ছিল না। কিন্তু আমি যে সংস্কারে, যে পরম্পরায় বড় হয়েছি আমার কাছে সেটাই সহজ পথ। ঋষিরা এই সহজ পথের উপর খুব জোর দিতেন। যখন আমি একটা পথ নিয়ে নিলাম, তা সে বেদান্তের পথই হোক, শক্তির পথ হোক, ইসলামের পথ হোক, এরপর আমি ওই পথকে নিয়ে কোন প্রশ্ন করতে পারি না। ওই পরম্পরায় যা যা আছে সবটাই আমাকে নিতে হবে। এবার আমি সাধনা করলাম, সিদ্ধিও পেলাম, এরপর আমার যদি মনে হয় এই জায়গাতে একটা পরিবর্তন দরকার, আমি তা করতে পারি। যদি কারুর মনে হয় এর পুরোটাই ধাপ্পা, তাহলে তাকে এই পরম্পরার বাইরে চলে যেতে হবে, ধর্ম তার জন্য নয়। আগেকার দিনে হিন্দু সমাজ এই অনুমতিটা দিত না। তাঁদের কাছে এটাই বক্তব্য ছিল, তোমার একটা খামখেয়ালীর জন্য, তোমার ঔদ্ধতের জন্য সবার জীবনকে আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না। মনে করুন, একটা নৌকাতে চারজন যাচ্ছে। ছোট নৌকা, হঠাৎ একজন উঠে নৌকার মধ্যে মদ খেয়ে মাতলামো করতে শুরু করে দিল, নৌকার বাকি লোকগুলো বিপদে পড়ে গেল। আগেকার দিনে সমুদ্রে জাহাজে যদি কেউ বদমাইশি করত তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন তাকে লোহার চেন দিয়ে বেঁধে রাখত, তোমার জন্য সবার জীবনকে আমি বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারি না। বর্তমান কালে এই জিনিসটাই খুব দুর্ভাগ্যের হয়ে গেছে। এখনকার লোকেরা ধর্মের ঐতিহ্যের ব্যাপারে কিছু জানেও না, বোঝেও না, বোঝার চেষ্টাও নেই। পুরো ব্যবস্থাটাই অন্য রকম হয়ে গেছে। আগেকার দিনে সব কিছু অন্য রকম ছিল। তুমি হিন্দু বংশে জন্ম নিয়েছ তোমাকে এগুলো পালন করতে হবে। আচার্য খুব সাধারণ ভাবে বলে দিলেন, এই তিনটে পথ, দক্ষিণমার্গ, উত্তরমার্গ আর বাকিরা জন্মাবে মরবে।

আমরা এর আগে একটা পথের কথা বলেছিলাম, এই শরীরেই মুক্তি। আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে এই শরীরেই মুক্তি, এটা আবার কোন মার্গ নয়। গতি কয় প্রকার হতে পারে? শ্রেষ্ঠ গতি হল দেহ থাকতে থাকতেই আত্মজ্ঞান লাভ, দ্বিতীয় ঈশ্বরের সাথে এক, সেখান থেকে কল্প শেষে মুক্তি। তৃতীয় উচ্চতম

স্বর্গে গেলেন, সেখান থেকে নেমে এসে আবার চেষ্টা করতে থাকলেন। চতুর্থ হল, পিতৃলোকে গেলেন, সেখান থেকে ফিরে আবার জন্ম নিল, আবার পিতৃলোকে গেল, আবার জন্ম নিল এভাবে চলতে থাকবে। আর পঞ্চম যারা জন্মাচ্ছে আর মরছে, এদেরকে ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া হয় না। এর মধ্যে প্রথম যেটা বলা হল, দেহ থাকতেই মুক্তি, সেটা কিন্তু উত্তরমার্গ নয়। এইবার উত্তরমার্গের কথা শুরু করছেন, উত্তরমার্গ হল বাকি দুটো, ঈশ্বরের সাথে এক আর উচ্চতমে স্বর্গে দেবতাদের সাথে থেকে আবার সেখান থেকে নীচে নেমে আসা।

বলছেন, দক্ষিণমার্গ, উত্তরমার্গ আর জন্মাচ্ছে আর মরছে, এর বাইরে একটি পথ। এটাই মুক্তি, যেটা প্রথমে বলা হল। কেনোপনিষদ শুধু এই মুক্তিকে নিয়েই আলোচনা করবে। আচার্য বলছেন, *বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তু নিষ্কামস্যৈব বাহ্যাদনিত্যাৎ সাধ্যসাধনাসম্বধাৎ ইহকৃতাৎ পূর্বকৃতাদ্বা*। মানুষ এই জন্মে কিছু কাজ করে, এর আগের আগের জন্মেও ভালো-মন্দ কিছু কাজ করেছে। আগের আগের জন্মে যা কিছু করেছে, এই জন্মে যা কিছু করেছে, সব কর্ম একটা জায়গায় এসে পুটলি হয়ে থাকে। এই যে আমার এই মুহূর্ত, এই মুহূর্ত হল আমার একটা শরীর আছে, একটা সময় আছে, এই সময় আর দেশের মধ্যে আমার যে এই শরীর, যে শরীর এই মুহূর্তে চেয়ারে বসে আছে। এরও পেছনে কি আছে? প্রথম যখন সৃষ্টি হয়েছিল সেখান থেকে আজ পর্যন্ত আমার এই জীবাত্মা যতগুলো শরীর ধারণ করেছিল, সেই শরীর দিয়ে যত রকম কর্ম করা হয়েছে, সমস্ত কর্মের বোঝা আমার পিঠে চাপানো আছে, এই বোঝা নিয়ে আমি চলছি। কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাবে না, সুক্ষ্ম রূপে আছে কিনা তাই দেখা যাবে না। এটিএম কার্ড দেখলে বোঝা যায় না আমার কত টাকা আছে, ঠিক তেমনি আমার পিঠে কর্মের কত বোঝা আছে জানা যাবে না। এটিএম কার্ড দিয়ে সব থেকে বেশি কত টাকা তোলা যাবে? আগে বলা হত আড়াই হাজার কি তিন হাজার, এখন দশ হাজার টাকাও তোলা যায়। এই শরীর থেকেও ওই সীমিত কর্মই বেরোতে পারবে। বোঝানর জন্য এটা একটা উপমা দেওয়া হল। কোন জন্মে আমি কুকুর বেড়াল ছিলাম, এখন এই মনুষ্য শরীর দিয়ে দুম্ করে ওই সব জন্মের কর্মগুলো বেরোতে পারবে না। কিন্তু যখন আসবে তখন বোঝা যায় যে এর পেছনে অন্য কিছু আছে। আমরা অনেক সময় মজা করে বলি, আগের জন্মে তুই বেড়াল ছিলি নাকি মাছ ছাড়া কিছু খাবি না! কত হাজার, লক্ষ, কোটি জন্ম, তার যে প্যাকেজ, পুরো কোটা আমার এই শরীরে আছে।

কর্মের এই কোটা প্রত্যেক মুহূর্তে আমার শরীরকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কোন দিকে নিয়ে যায় আর কোন শক্তি নিয়ে যায়? Resultant force নিয়ে যায়। Resultant force যেটা সেটা আবার সমস্ত resultant force হয় না। ঠিক সেই মুহূর্তে, এই শরীর, এই পরিস্থিতির জন্য যেটা উপযুক্ত। সেইজন্য দুটি শর্ত এসে যায়, এই শরীর আর পরিস্থিতি। দেহ আর পরিস্থিতি এই দুটোর মিশ্রণে আমার ভালো মন্দ হচ্ছে। এটাকে work out করলে স্বাভাবিক ভাবে দেখা যাবে দুটো জিনিস হয়ে যাচ্ছে, আমি আর এই পরিস্থিতি। অথবা এই পরিস্থিতিকে work out করার জন্য কিছু জিনিসের সাহায্য বা মাধ্যম দরকার। যেমন আমার কথাগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছানর জন্য একটা মাইক্রোফোন দরকার। এটাকে এনারা বলেন সাধ্য সাধন। কর্মের জন্য সাধ্য সাধন। সাধ্য মানে আমি যা চাইছি আর আমাকে সেগুলো পেতে গেলে আমাকে যা যা করার দরকার পড়ে।

সহজ ভাবে বলতে গেলে, এই জগতে যারাই আছে তাদের সবারই নানা রকম আশা আকাঙ্খা আছে, সেটাকে বলছেন সাধ্য। সাধ্যের জন্য দরকার সাধন। সেই সাধনটা নিজেও কিন্তু একটা সাধ্য। সেই সাধ্যের জন্য আরেকটা সাধন লাগবে। আর সেই সাধনটাও একটা সাধ্য। মানুষ বিবাহ করে, কেন করে? মনে সুখ পাবে বা শাস্ত্রবিধি দিয়ে দেখলে একটা ভালো সন্তানের আশা করছে। তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য কি? জীবনে সুখ পাওয়া, সন্তান পাওয়া। তারা জন্য একটা সাধন লাগবে। সাধনটা কি? একজন নারী, যাকে সে ভালোবাসে। ওই নারীকে পাওয়াটাও একটা সাধ্য। নারী আগে ছিল সাধন, এবার হয়ে গেলে সাধ্য। ওই সাধ্যের জন্য আবার সাধন লাগবে। নারীর মন পাওয়ার জন্য তাকে তার কাছে

পৌঁছাতে হবে। সেই নারী হয়ত অনেক দূরে থাকে, এবার তাকে ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে। ট্রেনের টিকিটটা এবার হয়ে গেলে সাধ্য। টিকিটের জন্য পয়সা লাগবে। পয়সাটা এবার হয়ে গেল সাধ্য। পয়সা তো এমনি এমনি এসে যাবে না, পয়সা পাওয়ার একটা উৎস চাই। এবার উৎসটা হয়ে গেলে সাধ্য, সেই সাধ্যের জন্য লাগবে সাধন। তার মানে রোজগার করতে হলে তাকে পড়াশোনা করতে হবে, একটা ভালো ডিগ্রী না হলে চাকরী পাওয়া যাবে না। সাধ্য সাধনের কি সাংঘাতিক সম্পর্ক চিন্তা করলে মাথা ঘুরে যাবে। সাধ্য সাধন শুধু একটাতে নয়, সব কিছুতে লেগে আছে। যেটা সাধ্য সেটা সাধন আর যেটা সাধন সেটাই সাধ্য। দুটোর এমন মারাত্মক সম্পর্ক যে এখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ নেই। সব দিকেই সাধ্য সাধনের এই খেলা চলতে থাকে। আমার খিদে পেয়েছে, সাধ্য হল খিদে মেটানো, খেতে হবে, খাওয়ার জন্য খাবার কিনতে হবে, খাবার কেনার জন্য পয়সা লাগবে। এর আরও উদাহরণ দিলে সাধ্য সাধন জিনিসটা পরিষ্কার হবে। আমরা যদি একবার বিচার করে দেখি, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে সবাই শাস্ত্র কথা শুনতে আসছি, খুবই ভালো কাজ কোন সন্দেহ নেই। এখানে সাধ্যটা কি? শাস্ত্র শুনতে চাইছি। শাস্ত্রকথা শোনার জন্য আমাদের বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে। ভর্তি হওয়ার জন্য ন্যূনতম একটা ডিগ্রী চাই আর টাকা চাই। ডিগ্রী নেওয়ার জন্য আমাকে আগে স্কুলে ভর্তি হতে হবে। যদি স্বাধীন না থাকে তাহলে স্বামী বা বাবার কাছ থেকে অনুমতি চাই। তিনি আবার অনুমতি দেবেন না বলে তাঁকে খুশি করতে হবে। সাধ্য সাধনের সিরিজ চলতেই থাকবে। শাস্ত্রকথা শোনাটা একটা ধর্মীয় কাজ, তার জন্য এত রকমের প্রস্তুতি।

আচার্য শঙ্কর ঠিক এই জায়গাটাকে কেটে দিচ্ছেন। যার একটু চিন্তা-ভাবনা জেগেছে, সে দেখে এই জন্ম আর গত গত যত জন্ম হয়েছে, এর সমস্ত যে resultant force যেটা এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এই সাধ্য আর সাধন থেকে সে বিরক্ত হয়ে যাবে। সে তখন বলবে, আমার ভাই সাধ্যও লাগবে না, সাধনও লাগবে না, আমি এবার শ্মশানে যাব। আমার ভালো আসছে আসুক, মন্দ আসছে আসুক, আমি কোন সাধনে যাচ্ছি না। কারণ আমার কোন সাধ্য নেই। এটাই আচার্য বলতে চাইছেন, উপনিষদ অধ্যয়ন করার অধিকারী কে? যে এগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরক্ত হয়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে যাওয়াকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে বলা হয়। বেদান্তসার এটাকে sum up করে বলছেন, *ইহামুত্রফলভোগবিরাগ*, এই জগতে যার কোন ফলের ইচ্ছা নেই আর স্বর্গলোকের ভোগেরও কোন কামনা নেই। এই জগতের আর পরলোকের সব কামনা যাঁর শূন্য হয়ে গেছে তিনিই উপনিষদ পাঠ করার যোগ্য রূপে বিবেচিত হবেন। আচার্য শঙ্কর একটার পর একটা ভাষ্য লিখছেন, তিনি কোথাও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করবেন না। এই জিনিসটাকেই এক জায়গায় একভাবে উপস্থাপন করছেন, আরেক জায়গায় অন্য ভাবে উপস্থাপন করছেন। তাই আচার্য শঙ্করের একটা উপনিষদ পড়লে উনি কি বলতে চাইছেন এই আইডিয়াটা পেয়ে যাব কিন্তু তাঁর সব রকম অভিব্যক্তি পাওয়া যাবে না।

এখানে তিনি নিয়ে আসছেন আগের আগের জন্ম। আগের আগের জন্মে যে নানান রকম কর্ম হয়েছে, কর্ম মানেই সাধ্য সাধন। একটা লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্য পুর্তির জন্য একটা পথ আছে, কিন্তু এটাই একটা সাধ্য সাধন। সাধ্য আর সাধন আলাদা বলে কিছু হয় না, এটাকে বোঝানর জন্য তিনি এখানে এতগুলো কথা বলছেন। একবার ভালো করে বিচার করে যদি দেখি আমি এত কিছু কেন করছি? ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়, সত্যিই তো কেন করছি! একটা লম্বা মজার কাহিনীতে একটা চরিত্র আছে যার চব্বিশ পঁচিশ বয়স হয়ে গেছে। তার সৎ মা তাকে বসতে বললে বসে, উঠতে বললে ওঠে। ছেলেটি আবার একটি মেয়েকে ভালোবাসে। সৎ মা তাকে বলে দিয়েছে, ওই মেয়েকে বিয়ে করা চলবে না। ছেলেটি হতাশ হয়ে একটা হোটেলের চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা দিয়ে আছে। ওর এক বন্ধু সব শুনে ওকে বলছে, 'তুমি তোমার সৎ মায়ের কথা শুনছ কেন'? ছেলেটি বলছে, 'উনি সৎ মা কিন্তু বাড়ির মালকাইন'। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কত টাকা আছে'? 'আমি তো কোটিপতি'। 'কার এ্যাকাউন্টে টাকা আছে'? 'আমার এ্যাকাউন্টেই আছে'। 'এ্যাকাউন্ট চালানোর ক্ষমতা কার হাতে'? 'আমার হাতেই আছে'। 'তাহলে তুমি ওই মহিলার কথা শুনছ কেন'? হঠাৎ ছেলেটি চিন্তা করে বলল,

তাই তো আমি সৎ মার কথা শুনছি কেন! আমি তো এক্ষুণি প্যারিস চলে যেতে পারি। তাই করল, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে নিয়ে প্যারিস চলে গেল।

আমাদের ঠিক এই ছেলেটির মত অবস্থা। আমরা সবাই সম্পূর্ণ স্বাধীন, আর আমাদের সবারই যে কী ক্ষমতা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। যতক্ষণ জীবনে কষ্ট না পাচ্ছে, দুঃখ না পায় আর কঠিন দুরবস্থা যতক্ষণ না এসে থাকে, কেউ বুঝতেও পারবে না তার কী অসম্ভব ক্ষমতা। হিমাচলের দিকে গেলে রাস্থার ধারে ধারে একটা বিস্কুটের হোর্ডিং সবারই নজরে আসবে। পুরো পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল, চণ্ডীগড়ের দিকে শুধু এই কোম্পানির বিস্কুট, কেক, পেস্ট্রি চলে। ওই সব অঞ্চলের হেন দোকান, হেন রেঁস্তোরা, হোটেল নেই যারা এই কোম্পানির জিনিস ব্যবহার করে না। কোম্পানির ইতিহাসটা খুবই মজার। একটা খুব সাধারণ পরিবার ছিল। পরিবারের যে কর্তা সে হঠাৎ মারা যায়। তার স্ত্রী কপর্দক শূন্য হয়ে রাস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটি পয়সা নেই। আমি বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বাঁচব কি করে! তখন মহিলাটি বিচার করে দেখল, আমি তো রান্নাটা ভালো জানি। এরপর কিভাবে কিভাবে মহিলাটি পাউরুটি বানাতে শুরু করল। প্রথমে পাড়া প্রতিবেশীদের দিতে শুরু করল। সবারই পাউরুটি পছন্দ হয়েছে। এরপর মহিলাটি বিস্কুট বানাতে শুরু করল, এরপর একটার পর একটা আইটেম বাড়িয়েই যাচ্ছে, তারপর প্যাকেজিং শুরু করল। মহিলাটি এখনও বেঁচে আছে, পাঞ্জাব, হরিয়ানার এখন সে অন্যতম ধনী মহিলা। কোম্পানির জিনিসগুলোর কোয়ালিটি এত উন্নতমানের আর দাম এত ন্যায্য যে, ওই এলাকার পুরো মার্কেটটা পেয়ে গেছে। এখন আর একটা দুটো নয়, প্রচুর কারখানা চলছে। ভদ্রমহিলা একটা বিরাট বড় কোম্পানির মালিক আর একা চালিয়ে যাচ্ছে।

W. Somerset Maugham খুব নামকরা গল্প লেখক ছিলেন। ওনার একটা কাহিনীতে একজন পাদরী ছিল, সেই পাদরী একেবারে অশিক্ষিত ছিল। বাইবেলের কথাগুলো মুখস্ত করে রেখেছে। গ্রামের ছোট্ট একটা চার্চ, চার্চের সামনে ছোট্ট একটা মাঠ, বাচ্চারা মাঠে খেলা করে, পাদরি খুব সহজ সরল, সবাইকে দেখাশোনা করে। যদিও প্রোটেস্টান্টরা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু সে বিয়ে করেনি। একদিন আর্চ বিশপ এসেছে। বিশপ এসে নিয়ম করে দিল, অশিক্ষিত কোন পাদরি থাকতে পারবে না। বেচারা পাদরির চাকরিটা চলে গেল। খুব কান্নাকাটি করেছে। গ্রামের লোকের মিলে আর্চ বিশপের কাছে পিটিশন করল যে, এর ব্যবহার, কাজকর্মে আমরা খুব খুশি, দয়া করে একে সরাবেন না আর এই পাদরি এত দিনে আমাদের গ্রামের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু আইন হয়ে গেছে, যেতেই হবে। আর্চ বিশপ কারুর কথা শুনল না। চাকরি তো চলে গেল, কিন্তু এখন যাবে কোথায়! হাতে তো একটা পয়সা নেই। তার জীবনের বড় একটা অংশ চলে গেছে যীশুর সেবাতে। চল্লিশ পয়তাল্লিশ বয়স হয়ে গেছে, কোন কাজ জানে না, শিক্ষা নেই, কিছু নেই। কাঁদতে কাঁদতে সে বেরিয়ে এলো। গ্রামের লোকেরা তাকে ছাড়তে এসেছে। ওখান থেকে লণ্ডনে চলে এল। এখন সে কি করবে, কি খাবে, দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে। একদিন সে হিসেব করে দেখল, বড় রাস্থার ধারে একটা কোণে ছোট্ট একটা টোবাকো দোকান আছে, এই পাড়ায় যারা থাকে তাদের অত দূর গিয়ে টোবাকো কিনতে হয়। তখন সে ওই জায়গাতে একটা ছোট টোবাকো শপ দিল। এতদিনের ধর্মিক জীবন কাটিয়েছে, খুব সৎ। লোকেদেরও সুবিধা হল। সে আবার দেখল লোকেরা পেপার কিনতে অন্য দিকে যায়, সে পেপার আর টোবাক দুটোই রাখতে শুরু করল। এখন যে পেপার কিনতে আসে সে টোবাকও কেনে, যে টোবাক কিনতে আসে সে পেপারও কেনে। কিছু দিনের মধ্যে ওর এত চাহিদা বেড়ে গেল যে তার পাশে সে আরেকটা দোকান দিল। এই করে তিন নম্বর, তারপর চার নম্বর, লোক রাখতে শুরু করল। এবার ওর পয়সা হতে শুরু হয়েছে। কিছু দিন পরে দেখল পনের কুড়ি হাজার পাউণ্ড হয়ে গেছে। তখন ওর এক পরিচিত এসে ওকে বলছে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! এত পাউণ্ড তুমি ঘরে রাখছ, কোনদিন খুনটুন হয়ে যাবে, ব্যাঙ্কে রাখবে চল। ওকে ব্যাঙ্কে ধরে নিয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার দেখছে একটা বোচকা করে আটা আনা, চারা আনা সব খুচরো করে এতগুনো টাকা নিয়ে এসেছে। পনের কুড়ি হাজার পাউণ্ড মানে আমাদের টাকায় কুড়ি পঁচিশ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলছে, এত টাকা আপনি ঘরে রেখে দিয়েছিলেন!

ঠিক আছে, এই ফর্মে সই করুন। লোকটি বলল, আমি তো সই করতে জানি না। নিরক্ষর কিনা। আঙঠা দিন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বলছে, নিরক্ষর তাতেই এই, অক্ষর হলে কী হত! লোকটি তখন বলছে, অক্ষর জ্ঞান থাকলে ওই গ্রামের পাদরি হতাম।

সামারসেট তাঁর গল্পে সব সময় খ্রীশ্চান ধর্মকে গালাগাল দিয়ে গেছেন। কিন্তু মূল কথা একই, মানুষের ক্ষমতার কোন শেষ নেই। দরকার শুধু একটা ধাক্কা। নদীর প্রবাহকে যে পাথরটা আটকে রেখেছে, ওই ধাক্কাটা যখন লাগে তখন পাথরটাকে সরিয়ে দেয়, আর নদীর প্রবাহ তীব্র বেগে ছুটে যায়। স্বামীজী যে বলছেন, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি, স্বামীজী কিছু বাড়িয়ে বলছেন না, এটাই সত্য। আমরা এখানে দুটো তিনটে কাহিনী বললাম, এই রকম একটা দুটো নয়, শত শত হাজার হাজার এই রকম ঘটনা আছে। একটা দুটো ঘটনা শুনে মনে করছি এগুলো ব্যাতিক্রম, কিন্তু কোন ব্যাতিক্রম নয়, আমি আপনি যে গাধার মত বসে আছি এটাই ব্যাতিক্রম। স্বামীজীর কথাটাই সত্য, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি, তোমার মধ্যে অনন্ত জ্ঞান।

জীবন চালানোর জন্য আমাদের বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন দর্শন আছে, এইসব পথ ও দর্শনকে জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুযোগের ব্যাপারটাও দরকার। একজনের কাছে ভালো জীবন দর্শন থাকলেই যে তিনি সেই জীবন দর্শন অনুযায়ী নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, তা হয়ে ওঠে না। শাস্ত্র সাধুসঙ্গের কথা বলছে কিন্তু সবাই সাধুসঙ্গ করতে পারে না। তুলসীদাস সাধুসঙ্গকে এক চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, বিনু শতসঙ্গ বিবেক ন হঈ, ঈশ্বরের প্রতি যে বিবেক এই বিবেক সাধুসঙ্গ না করলে হয় না। তারপরেই বলছেন, রামকৃপা বিনু সুলভ ন সুঈ, শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা না হলে সাধুসঙ্গ হয় না। মূল কথা, ঈশ্বরের কৃপা না হলে সাধুসঙ্গ হয় না, আর সাধুসঙ্গ যদি না হয় হাজার শাস্ত্র পড়ুক, তপস্যা করুক, ঈশ্বরের প্রতি বিবেক হবে না। কার সাধুসঙ্গ হয়, কেন হয়, কার সাধুসঙ্গ হয় না, কেন হয় না, কেউ জানতে পারে না। যদি সুযোগ থাকে আর ইচ্ছা থাকে, সব সময় ইচ্ছা থাকলেই যে সুযোগ হবে তা তো নয়, আর সুযোগ থাকলেই যে ইচ্ছা থাকবে তাও হয় না।

জীবনের অনেক ব্যর্থতা, হতাশায় অবসাদগ্রস্থ হয় শ্রীশ্রীমাকে একদিন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া বলছে, মা আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। মা তাকে বলছেন, খুব খাটতে হয়, প্রচুর সাধন-ভজন করতে হয়। এই কথা বলার পর মা তাকে বলছেন, এই জীবনটা সোনা দিয়ে কিনে যেতে পারতিস। আসলে মা বলতে চাইছেন, জগজ্জনীর কাছে কাছে থাকার এই দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে, সেখানেও তার ভেতরে অবসাদের ভাব। সেটাই বলা হচ্ছে, সুযোগ সুবিধা থাকলেই যে মানুষ ঈশ্বরের পথে আসবে তা হয় না। সেখান থেকে আমরা আবিষ্কার করলাম, কিভাবে বিভিন্ন থাকের লোক হয়। একজন কারুর জীবন-দর্শন আছে, তিনি খাটলেন, সেখান থেকে তাঁর জ্ঞান হয়ে গেল। আবার অনেকে আছেন যাঁরা নিষ্কাম ভাবে সাধন-ভজন করে বা ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করে তাঁরা ক্রমমুক্তির দিকে এগিয়ে যান। এদের যে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়ে যায় তা নয়, তবে ঈশ্বরের সাথেই সব সময় থাকেন। আবার ভক্তিশাস্ত্রে বলে মুক্তি বলে কিছু হয় না, তাঁরা বলেন যত যাই সাধন-ভজন করুক সে ঈশ্বরের কাছাকাছিই থাকবে, ওটাই সর্বোচ্চ অবস্থা। আমরা যে অর্থে মুক্তি বলি ইসলাম ধর্মও সেই অর্থে মুক্তি বলে মানে না।

এখন আমি ইসলামের কথা বা ভক্তিশাস্ত্রের কথা নেব নাকি উপনিষদের কথা নেব, এটা নির্ভর করবে যার যার মানসিক গঠনের উপর। তবে খুব উচ্চ অবস্থায় গিয়ে সবাই দেখেন উপনিষদ যা বলছে, ভক্তিশাস্ত্রও একই কথা বলছে। মুক্তি হয় কি হয় না, ঈশ্বরের সাথে বাস করাটাই শেষ কথা কিনা, নাকি ঈশ্বরের সঙ্গে লয় হয়ে যাওয়াটা শেষ কথা, এই জিনিসগুলো এত জটিল আর এত বেশি শাস্ত্র সাপেক্ষ যে আমাদের পক্ষে আলোচনা করা, তর্ক করা বৃথা। যখন যে শাস্ত্র পড়া হবে তখন সেই শাস্ত্র যেমনটি বলছে তেমনটিই নিতে হয়। নিজে সাধন-ভজন করলে ঠাকুর নিজেই দেখিয়ে দেন শেষ কথা কোনটা। তার আগে যতক্ষণ যে শাস্ত্র যা বলছে ওটাই ঠিক। শুধু জেনে নিতে হয় আমার কাছে আচার্য কে। যদি

শঙ্করাচার্যকে আমার আচার্য বলে গ্রহণ করি, তাহলে উনি যা যা বলছেন সেটাই ঠিক। যদি রামানুজ আমার আচার্য হন তাহলে তিনি যা বলছেন সেটাই ঠিক। এরপর সাধন-ভজন করতে করতে নিজের ভাবা পাকা হতে শুরু হয়, ঠাকুরই তখন দেখিয়ে দেন কোনটা সত্য। কাকে কিভাবে দেখাবেন, জানার কোন পথ নেই। কারণ তিনি অসীম, তাঁর অনন্ত ভাব, অনন্ত রূপ, তিনি কখন কাকে কোন পথ দিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করবেন আমাদের জানা নেই। আমাদের কাছে হল ঠাকুরকে ভালোবাসা, আমি ঠাকুরকেই চাই। তখন আবার খুব ছোট্ট একটা জিজ্ঞাসা আসে, আমার এই জীবন দর্শনটাই যদি ভুল হয়? এখানেই শাস্ত্র আমাদের রক্ষা করেন। ভুল বলে কিছু হয় না। কেউ যদি সব স্বার্থ ত্যাগ করে খুব নিষ্ঠার সাথে ঈশ্বর চিন্তন করে, সেখানে তার হয়ত ঈশ্বরের অবধারণায় ভুল থাকতে পারে, কিন্তু একটা সময় কেউ না কেউ এসে তার ভুলভ্রান্তি গুলো ঠিক করে দেন। ঠাকুর যেমন বলছেন, কেউ পুরী যাবে বলে বেরিয়ে ভুল পথে চলতে শুরু করল, তখন কোন না কোন লোকের সাথে তার দেখা হয়ে যায়, যে তাকে ঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দেয়। সেইজন্য আধ্যাত্মিক পথের যে যাত্রা হয় তার সাথে সংসারের কোন কিছুই মেলে না। আর আমাদের মাথায় সংসার গিজগিজ করছে, আর সংসারের সব কিছুর সাথে আধ্যাত্মিকতাকে মেলাতে যাই বলে কিছুই মেলে না। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, আমাদের বিভিন্ন জীবনের উদ্দেশ্য বা জীবনধারা অনুযায়ী পুনর্জন্ম হয় বা হয় না। পুনর্জন্ম নির্ধারিত হয় তার জীবন দর্শন আর কেমন সাধনা করেছে।

আচার্য শঙ্কর বিভিন্ন শাস্ত্র উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করছেন। আচার্য বলছেন যাঁর সাধ্য সাধন থেকে বিরক্ত হয়ে গেছে, আচার্য একটা শব্দ এনে বলছেন, *বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তু নিষ্কামস্যৈব*, এইটুকু বলে তিনি এর ব্যাখ্যা করছেন। বাক্য শেষ করার আগে বলছেন, *প্রত্যগাত্মবিষয়া জিজ্ঞাসা প্রবর্ততে*। বিশুদ্ধসত্ত্ব, নিষ্কাম আর প্রত্যগাত্ম, বাক্যের এই তিনটে শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই কটি শব্দ দিয়ে বলে দিচ্ছেন, উপনিষদ অধ্যয়ন করার অধিকারী কে। আজ ছাপাখানার দৌলতে, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আগমনের ফলে আর কিছুটা ইংরেজদের সৌজন্যে আমরা উপনিষদ পড়তে পারছি। আগেকার দিনে অধিকারী ছাড়া কাউকেই উপনিষদ পড়তে দেওয়া হত না। ঠাকুর বলছেন, কলিযুগে নারদীয়া ভক্তি। উপনিষদ পড়তে দেওয়াই হবে না। আমরা প্রায়ই বলি ব্রাহ্মণরা সব বিদ্যাকে কুক্ষিগত করে নিজেদের কাছে আটকে রেখেছিল। কিন্তু একেবারেই তা নয়। আচার্য প্রথমেই বলছেন, যে বিষয়কে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, এর বিষয় হল প্রত্যগাত্মা। আত্মা মানে আমি, এই আমি ভাব সবারই আছে। একটা এ্যমিবারও আমি ভাব আছে, একটা পিঁপড়েরও আমি ভাব আছে, একটা হাতিরও আছে। যে ঘোর বিষয়ী তারও আছে আর যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে তাঁরও আছে। শুধু 'আমি'র সংজ্ঞাটা পাল্টায়, বিষয়াসক্তদের কাছে আমি বলতে শরীর, এদের থেকে আরেকটু উঁচুতে চলে গেলে, দেখা যায় তারা নিজের বাইরের জিনিসগুলোর সাথে একাত্ম বোধ করে, যেমন স্ত্রী স্বামীর সাথে, মা সন্তানের সাথে নিজের আমিত্বকে জড়িয়ে রাখে। সোমনাথ মন্দিরে যখন মহম্মদ ঘোরি আক্রমণ করল তখন মন্দিরের ব্রাহ্মণ পূজারীরা সবাই শিবলিঙ্গের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে। ঘোরি গদা দিয়ে সব পূজারীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। পূজারীদের কাছে শিবের গুরুত্ব সব থেকে বেশি। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে, এরা কত আহাম্মক, একটা পাথরকে বাঁচানোর জন্য নিজের অমূল্য প্রাণ দিল। তাঁরা একটা পাথরকে বাঁচানোর জন্য প্রাণ দেননি, একটা আদর্শের জন্য প্রাণ দিলেন, আদর্শকে বেশি ভালোবাসে। কেউ নিজের দেহের সাথে আমিকে জুড়ে দিচ্ছেন, কেউ আদর্শের সঙ্গে আমিকে জুড়ে দিচ্ছেন, কেউ বিদ্যার সাথে, কেউ নিজের মনের সাথে, বুদ্ধির সাথে জুড়ে দিচ্ছেন, কেউ ভক্তি ভাবের সাথে জুড়ে দিচ্ছেন, কিন্তু এগুলো সবই আত্মা, এই আত্মাকে বলছেন পরাক আত্মা, পরাক মানে বহিরাত্মা। পরাক আত্মার বিপরীত প্রত্যগাত্মা। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির পারে যে আমিত্ব ভাব এটাকেই প্রত্যগাত্মা বলে। যেমন ঠাকুরের ছিল, বলছেন আমার মা আছে, যীশু বলছেন Father in Heaven, মহম্মদ বলছেন আল্লা, ভগবান বুদ্ধ নির্বাণের অবস্থার সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছেন, এনাদের এর বাইরে কোথাও আর কিছু নেই। শঙ্করাচার্য সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সাথে নিজের আমিত্বকে জুড়ে রেখেছেন।

উপনিষদের বিষয়বস্তু প্রত্যগাত্মা, যেটা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির পারে যে আমার আমিত্ব, সেই আমিত্বে কিভাবে পৌঁছানো যায়, সেই আমিত্বের সাথে কিভাবে একাত্ম হওয়া যায়, এটাই উপনিষদের বিষয়বস্তু। এর বাইরে উপনিষদে যদি কেউ কিছু খুঁজতে যায় কিছুই পাবে না।

যদি জিজ্ঞেস করা হয় উপনিষদ পড়ে আমার সাংসারিক কিছু কি লাভ হবে? তাঁরা বলে দেবেন, হবে না, উপনিষদ তোমার জন্য নয়। তবে অন্যান্য জায়গায় সরাসরি না বললেও গ্রন্থস্তুতি করার সময় বলবেন, যারা এটা করে তাদের এই এই হয়। উপনিষদের পথে আসার জন্য দুটি শর্ত লাগে, বিশুদ্ধ সত্ত্ব, এখানে সত্ত্ব মানে বুদ্ধি, যার বুদ্ধি একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় শর্ত নিষ্কাম, কোন কামনা-বাসনা নেই, মন একেবারে নির্মল। আপাত ভাবে আমরা এই মুহুর্তে মনে করতে পারি যে আমার কোন কামনা-বাসনা নেই। জীবনে যাকে আমরা ভালোবাসি, তাকে যদি হারাতে হয়, তখন হঠাৎ মনে হয় আমার জীবনের সব কিছুই চলে গেল, এই জীবনে আমি আর কিছু চাই না। তারপর দেখা যায় অন্য একটা কিছুকে অবলম্বন করে জীবন চলছে। সেইজন্য বলছেন, এই জন্ম আর আগের আগের জন্মের যত কর্মের বোঝা জমে আছে, সবটাকেই পুড়িয়ে দাও। হিন্দু পরম্পরা এই জিনিসগুলিকে তুলে ধরার জন্য বাচ্চাদের জন্য, সাধুদের জন্য অনেক রকম প্রচলিত কাহিনী তৈরী করা হয়েছে। একজন সাধু হয়ত মনে করছেন তিনি একটা উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, সেখান থেকে হঠাৎ কিভাবে কিভাবে তাঁর পতন হয়ে যায়। তাই প্রথমেই বলে দিচ্ছেন, বিষয় বাসনা একটুও যদি থাকে তাহলে উপনিষদ পড়ে তার কোন লাভ হবে না। উপনিষদ তার কাছে কতকগুলো শব্দ হয়েই থাকে যাবে।

জগদ্ধাত্রির বর্ণনা করতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, মন তো নয় যেন মত্ত হাতি। মত্ত হাতিকে মাথায় ডাঙস মেরে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। উপনিষদের দৃষ্টিতে আরও অনেক এগিয়ে নিয়ে বলছে, মন যেন একটা ক্রিস্টালের বস্তা। ওই ক্রিস্টালকে যদি শুদ্ধ করতে হয় তাহলে জলে ফেলতে হবে, জলে দিলে গলে যাবে। গলে যাওয়ার পর আগুনের উপর রাখলে দেখা যাবে জলে আরও ফিটকিরি নিতে পারছে। নিতে নিতে আর যখন ওর নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না তখন তাকে বলে super saturated solutation। এরপর আর একটাও ফিটকিরি নিতে পারবে না। এবার বাইরে থেকে একটা যদি ক্রিস্টাল দেওয়া হয়, তাহলে ভেতরে যা কিছু আছে সব সেই ক্রিস্টালের সাথে মিশে স্ফটিক তৈরী করে দেয়। বাইরে থেকে যে ক্রিস্টাল দেওয়া হচ্ছে, তার পিওরিটি যেমন হবে, এখানেও ঠিক সেই রকম পিওরিটি হয়। তার মানে, বিভিন্ন রকমের সাধনা করে করে মন তার শুদ্ধ হয়ে গেছে, তার সাথে নিষ্কাম আর তার সাথে বার বার যাচাই হচ্ছে। কিভাবে যাচাই হয়?

নদীর প্রবাহের সাথে সাঁতার কাটলে সে আরামসে ভেসে চলে যাবে। আর যদি সে প্রবাহের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে যায়, দু-চারবার হাত চালিয়ে এগিয়ে যেতে না যেতেই দম শেষ হয়ে আসবে। সংসারের গতি ঠিক এই রকম। যখন প্রবাহের সাথে যাচ্ছে, সংসারের গতির সাথে চলছে তখন আরামসে চলতে থাকবে। যেমনি সে বলবে এবার আমি এর বিপরীতে যাব, শুধু আধ্যাত্মিক নয়, যে কোন ব্যাপারে, যেমন গান্ধীজী বললেন আমি সত্য আর অহিংসাকে নিয়ে চলব, পুলিশ লাঠি দিয়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিল। নেতাজী খুব সাধারণ জিনিস বললেন, আমার স্বাধীনতা চাই, এটা আমার দেশ, স্বাধীনতা আমার অধিকার। নেতাজীর কি দুরবস্থা হয়ে গেল। অধ্যাত্ম ছেড়ে দিন, একটা ছোট্ট আদর্শকে নিয়েছে, ঠাকুর বলছেন, সত্য হল কলির তপস্যা, একটু কেউ চেষ্টা করে দেখুক তার কি হয়! লোকেদের এটাই নিয়ম, যেমনি কেউ একটা আদর্শ নিয়ে চলতে শুরু করবে, সবাই তাকে পিষে দেবে। সত্য কথা বলার আদর্শ নিলে শুধু সমাজের শক্তি ঝাঁপাবে, কিন্তু যদি কেউ বলে আমি অধ্যাত্ম পথে চলব, এবার প্রকৃতির সমস্ত শক্তি তার বিরুদ্ধে নেমে যাবে। তখন বেলুড় মঠের গঙ্গার স্রোতের বিপরীত যেতে হবে না, গঙ্গোত্রীতে যে তীব্র বেগে গঙ্গা নামে ঐ স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে শুরু হয়ে যাবে। তখন বলবে, মাগো! আগেই ভালো ছিলাম। বেশির ভাগ লোক তখন বলে যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকি। যেখানে একটু ঘুর্ণির মত পেয়ে গেল, ওর মধ্যেই আরামসে ঘুরতে থাকে, তাতেই কেউ বাবাজী বা

মহাত্মা হয়ে গেল। কিন্তু ওই ঘুর্ণির মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। শ্রীমাকে একজন সন্ন্যাসী বলছেন, ঠাকুর যখন আবার আসবেন তাঁর সঙ্গে আমার আসার খুব ইচ্ছে। মা তাঁকে বলছেন, সে কি বাবা! সংসারে আছেটা কি, ঠাকুর তো শুধু শাকভাত খেয়েই কাটিয়ে দিলেন। অনেকেই আছে যাদের সংসারের সুখ হয়ত ভালো লাগে না, সংসারের সুখ যদি ভালো লাগত তাহলে কি শনি রবিবার এত কষ্ট করে এখানে কেউ শাস্ত্রের কথা শুনতে আসত! কিন্তু স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার জন্য খাটনির দরকার, সেই খাটনি নেওয়ার দম থাকে না।

উপনিষদ সেইজন্য বলছেন, *কশ্চিদ্ধীর প্রত্যগাত্মনৈক্ষদ্*, কদাচিৎ কখন কোন ধীর পুরুষের ইচ্ছে হয় যে আমি প্রত্যগাত্মাকে জানব। আচার্য ধীর কে বলতে গিয়ে বলছেন, যে বলছে আমি একেবারে গঙ্গাসাগর থেকে ঠেলে সোজা গঙ্গোত্রী চলে যাব। এই রকম যার মনের জোর সেই ধীর। তা নাহলে যেতে পারবে না, দম বেরিয়ে যাবে। ঠাকুর বিশালক্ষীর দয়ের কথা বলছেন। নদীর কিছু জায়গায় দহের সৃষ্টি হয়, সেখানে যে মাছগুলো ঢুকে পড়ে জলের ঘুর্ণির আওয়াজ তাদের কাছে খুব মিষ্টি মিষ্টি লাগে। সংসারটাও ঠিক বিশালক্ষীর দয়ের মত, এখানে স্ত্রীর মিষ্টি মিষ্টি কথা, ছোট ছোট বাচ্চার মিষ্টি কলকলানি মানুষকে আকর্ষিত করে সংসারে টেনে রাখে, ওই আকর্ষণ থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। সংসারে থেকে জপধ্যান করা মানে গ্যাসে দুধ বসিয়ে জপ করতে বসা। মন কি তখন জপে থাকবে নাকি দুধ না উথলে পড়ে এই চিন্তাতে থাকবে? এদিকে জপধ্যান করারও ইচ্ছে আছে, কিন্তু সংসারটাও তো দেখতে হয়। এটা যে শুধু দায়ীত্ব বোধের প্রশ্ন আসবে তা নয়, যার কোন দায়ীত্ব নেই সেও একটা দায়ীত্ব তৈরী করে নেবে। তা নাহলে মানুষ থাকতে পারবে না, জীবন চালানো খুব কঠিন হয়ে যাবে।

সেইজন্য বলছেন *বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তু নিষ্কামস্যৈব*। নিষ্কাম কখন হয়? যখন তার কোন depressive tendency নেই, তার সঙ্গে কামনা-বাসনা শূন্য। এমনকি আমি কর্মে ব্যস্ত থাকতে চাই, সেই বাসনাও নেই। ঠাকুর বলছেন হিঞ্চের শাক শাকের মধ্যে নয়, ঈশ্বর লাভের কামনা কামনার মধ্যে নয়। ওর বাইরে যে কোন কামনা থাকা মানে আর নিষ্কাম ভাবে হবে না। উপনিষদ কারা শুনতে পারে? যারা এই রকম নিষ্কাম। আচার্য একেবারে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন। যদি তোমার মন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র না থাকে, কারুর প্রতি তোমার কোন বিরূপ ভাব, বৈর ভাব নেই। কিন্তু তার সাথে কারুর সাথে তোমার বিশেষ বন্ধুত্বের ভাবও নেই। এর সাথে কথা বলতে ভালো লাগে, ওর থেকে আমি দূরে থাকতে চাই, এই ধরণের মানসিকতা নেই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি কোন বস্তুর প্রতি নেই, কোন ব্যক্তির প্রতি নেই, কোন পরিস্থিতির প্রতি নেই, ভবিষ্যতের প্রতি নেই, ভূত কালের প্রতি নেই। তার মানে তার অবস্থা এখন super saturatedএর অবস্থায় চলে গেছে। এরপর যেমনি উপনিষদের কথা আচার্যের কাছ থেকে শুনবে তার জ্ঞান হয়ে যাবে। যত জন মহাপুরুষ হয়েছেন, এনাদের আসল সাধনা খুব সংক্ষিপ্ত, তৈরী হয়েই এসেছেন। একটা শব্দ গিয়ে পড়ল, জ্ঞান হয়ে গেল। ঠাকুর স্বামীজীকে ছুঁয়ে দিচ্ছেন, স্বামীজীর জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের এমন প্রস্তুতি হয়েই ছিল যে, তোতাপুরী বললেন এখানে ধ্যান কর, ব্যস! ঠাকুর নির্বিকল্পে চলে গেলেন। সেইজন্য এখানে আচার্য বলছেন, বিশুদ্ধ চিত্ত, নিষ্কাম পুরুষরাই এদিকে এগোতে পারেন।

বাক্যের শেষে বলছেন, *জিজ্ঞাসা প্রবর্ততে*। এখনও জ্ঞানের কথা দূরের, আমি আত্মার ব্যাপারে জানতে চাই, এই জিজ্ঞাসা ঠিক ঠিক কখন হয়? যখন ওই অবস্থায় চলে যায়। তার আগে উপনিষদ পড়তেই দিতেন না। উপনিষদ পড়লেই জ্ঞান হবে, কারণ উপনিষদ পড়ে যদি জ্ঞান না হয়, তাহলে তোমার জিজ্ঞাসাতে কিছু সমস্যা আছে। জিজ্ঞাসাতে সমস্যা থাকা মানেই বুদ্ধি শুদ্ধ নয় বা মন এখনও নিষ্কাম হয়নি। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়? একটা নিছক কৌতহূল, জিনিসটা কি? যেমন ঠাকুরের ভক্তরা বেলুড় মঠের মন্দিরে ভক্তি ভাব নিয়ে যান, যতক্ষণ পারেন জপধ্যান করেন। আবার ট্যুরিস্ট বাসে অনেক ট্যুরিস্ট আসে, বাস থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে এটা কি, ওটা কি, এটা কার মন্দির। সব দেখে শুনে হিন্দু সংস্কার বশতঃ প্রণাম করে চলে গেল, জীবনে আর কোন দিন আসবে কিনা কেউ জানে

না। আমাদের উপনিষদ পড়া ঠিক এই ট্যুরিস্টদের মত। ঠিক ঠিক জিজ্ঞাসা, আমি জানতে চাই, জানার জন্য যা যা ছাড়তে হবে আমি ছেড়ে দেব। এটার জন্য বিশুদ্ধসত্ত্ব হওয়া দরকার, নিষ্কাম হওয়া দরকার। শুনে মনে হবে কত কঠিন, কতই না জটিল। এটা সবারই জেনে রাখ দরকার যে, যে জিনিস যত সহজ সেই জিনিস তত কঠিন। যে কোন শাস্ত্রই পড়ি না কেন, বাইবেল হোক, গীতা হোক, কথামৃত হোক, পড়লেই মনে হবে কত সহজ, মনে হবে সব বুঝে ফেলেছি। তার মানে কিছুই বুঝতে পারেনি। যদি পড়ে মনে হয় আমি সব বুঝতে পারছি, তার মানে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। কারণ এর তত্ত্ব এত গভীর যে ওই গভীরতা ধরার ক্ষমতাই আমাদের নেই। ঐ গভীরতা আসে বিশুদ্ধসত্ত্ব আর নিষ্কাম থেকে। বৈষ্ণব পরম্পরায় একটা কথা খুব প্রচলিত, জীবে দয়া, নামে রুচি আর বৈষ্ণব সেবা। ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে এই কথাই একজনকে বলছিলেন, সেখানে আরও অনেকের সাথে নরেনও উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ঠাকুর জীবে দয়া বলেই, থু থু করে বলছেন, জীবে দয়া! জীবে দয়া করার তুই কে, জীবে সেবা। নরেন বাইরে এসে বলছেন, আজ একটা নতুন কথা শুনলাম, যদি কোন দিন সুযোগ হয় আমি এই কথাকে সত্য করে দেখাব। ভবিষ্যতে যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হবে, আর তার যে মূলমন্ত্র হবে, সেটারই প্রস্তুতি এভাবে সেদিন হয়ে গেল। সেখানে আরও তো অনেকে বসে ছিলেন আর তারাও সবাই ঠাকুরের ভক্ত, তাঁরাও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঠাকুরের কথা শুনছেন, তাঁদের তো কারুর মনে হল না ঠাকুরের এই কথার মধ্যে দিগ দিগন্ত ব্যাপী এক নতুন সম্ভবনা লুকিয়ে আছে। মনে হওয়ার কথা নয়, কারণ প্রস্তুতি নেই। ঠাকুরের কথা শুনে একমাত্র স্বামীজীই অবাক হয়ে যেতেন। দ্বিতীয় যিনি অবাক হতেন তিনি হলেন শ্রীমা, দরমার আড়াল থেকে ঠাকুরের কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে যেতেন। কারণ প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছিল। প্রস্তুতি হয়ে গেলে একটা কথা ভেতরে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টাল হয়ে যাবে।

ঠাকুর বলছেন, আমি মেঝে করা ফরাস, মেঝের নীচে কত কি আছে জানার উপায় নেই। একটা পাথরের মেঝে করা হয়ে আছে, সেই মেঝের নীচে কত রকম মাল আছে এখন আর জানার উপায় নেই। বিজ্ঞানের অনেক নামকরা ইক্যুয়েশান আজকাল ক্লাস সেভেন এইটে পড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ওই এক একটা ইক্যুয়েশানের পেছনে বিজ্ঞানীদের কত খাটতে হয়েছে জানার কোন পথ নেই। ওই বিষয়ের উপর যদি ইতিহাস পড়া হয় তখন একটু ধারণা হয়। উপনিষদও ঠিক তাই, এক একটা মন্ত্রের পেছনে ঋষিদের কত তপস্যা, কত পরিশ্রম লেগে আছে আমাদের জানার কোন উপায় নেই। আচার্য খুব সহজ করে বলে দিলেন, যার মন বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে গেছে, নিষ্কাম হয়ে গেছে তিনি আত্মার জ্ঞানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসু হন। মাত্র তিনটে শব্দ, একজন পণ্ডিত খুব জোর ব্যাখ্যা করে দেবেন বিশুদ্ধসত্ত্বের সত্ত্বগুণ কোন শব্দ থেকে এসেছে, যার সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। এই তিনটে কথা দিয়ে কি বলতে চাইছেন সেই জিনিসটাকে বোঝা।

কেনোপনিষদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আচার্য বেদ ও অন্যান্য উপনিষদ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি নিয়ে আসছেন, তার সাথে দেখাচ্ছেন উনি যে কথাগুলো বলছেন এগুলো তাঁর নিজের কথা নয়, এগুলো শাস্ত্রেরই মত। তখন তিনি কঠোপনিষদের নামকরা মন্ত্র '*পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ*' উল্লেখ করছেন, আবার মুণ্ডকোপনিষদ থেকে '*পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্*' মন্ত্রের উল্লেখ করছেন। এগুলো দিয়ে তিনি বিচার করার কথা বলছেন। ঠাকুর বলছেন বিচার করে দেখ জগতে কি আছে, আমড়া, আঁটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল। বিচার করে করে ত্যাগ করতে হয়। বিচার না করে যে ত্যাগ করে ওই ত্যাগের কোন দাম নেই, দাম নেই এই অর্থে যে সময় লাগবে। সন্ন্যাসীরা কুড়ি একুশ বছরে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। অনেকে সন্ন্যাসীদের এসে বলে, কুড়ি বছর বয়সে আপনি জগৎ সংসারের কি দেখেছিলেন যে, সংসার ত্যাগ করলেন? সত্যিই তাঁরা ওই বয়সে কিছুই দেখেননি, সেইজন্য ভুগতেও হয়। কারণ আশ্রমে এসে সংসার দেখছেন আর ত্যাগও করছেন। আর যাঁরা বিচার করে, অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে নিজেকে নিংড়ে নিয়ে সন্ন্যাসী হন, তাঁদের এক স্ট্রোকে ত্যাগ হয়ে যায়। সেইজন্য মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্*, সব কিছু বিচার করে করে দেখে নেওয়ার পর গুরুর কাছে যেতে হয়। আচার্য এখানে দুটো উপনিষদ থেকে দুটো মন্ত্র উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন, যাঁরা

উপনিষদের জ্ঞান পেতে চান বা যাঁরা প্রত্যগাত্মার জ্ঞান পেতে চাইছেন, কিভাবে তাঁকে নিজের ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করতে হয় আর কোন ধরণের কামনা-বাসনা থাকবে না।

সাধনা বলতে যা বোঝায় এখানে ঠিক সেই জিনিসটাকে বলতে চাইছেন না। এনারা ধরেই নিয়েছেন, সাধনা করে করে সে অনেক উপরে চলে এসেছে। কি করে উপরে চলে যায় সেটা আরও মজার। আজকের দিনে যে বাচ্চারা আছে এরা যদি ত্যাগ করতে যায় প্রতি পদে পদে লড়াই করতে হবে। কিন্তু উপনিষদের সময় বা একশ বছর আগেও পদে পদে লড়াই করতে হত না। কারণ, বিশেষ ব্রাহ্মণরা যাঁরা উপনিষদ পড়তেন তাঁরা তাঁদের বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়ে দিতেন যে, ওদের পক্ষে মাছ, মাংস, মদ এগুলো খাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারত না। এমন প্রশিক্ষণ পেয়ে যেত যে ভোগের স্পৃহাটা আপনা থেকেই নষ্ট হয়ে যেত। আগেকার দিনে বড় বাড়ির কোন ছেলের সাথে ঝগড়া-টগড়া করে বাড়িতে এসে বললে উল্টে তাকেই বড়রা চড় লাগিয়ে দিতেন, কত দিন বলেছি বড় বাড়ির ছেলেদের সাথে কথা বলবে না। শাসনের একটা বেড়া দেওয়া ছিল, বড়লোক বাড়ির ছেলেদের সাথে মিশবে না। শুধু শাসনেই নয়, বাচ্চা বয়স থেকে এমন ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হত তাদের ভোগের দিকে মন যাবেই না। কিন্তু বর্তমান কালে এখন সব কিছু খুলে দেওয়া হয়েছে। ঘরে ঘরে টিভি ঢুকে গেছে, সবার হাতে স্মার্টফোন এসে গেছে, সবাই সব কিছু করছে, সবাই সবার সাথে মেলামেশা করছে। দুশমন যেন আমার কেল্লার ভেতরে ঢুকে গেছে। সেইজন্য এখন প্রত্যেক পদক্ষেপে লড়াই করতে হয়। তখনকার দিনে তাই লড়াইটা সহজ ছিল। তখন শুধু ছিল পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। বিত্ত তো ব্রাহ্মণদের জুটতই না, দক্ষিণা রূপে যা একটু কিছু পেতেন, আর তার সাথে এই আশা একটু ছিল আমার যেন একটা দুটো পুত্র সন্তান হয় আর মৃত্যুর পর আমি যেন ভালো স্বর্গে যাই। সেইজন্য বলতেন, ওই দুটো থেকে পুত্রৈষণা আর লোকৈষণা থেকে কোন রকমে বেরিয়ে এসো। বাকি যা সুখ আছে ওগুলোতে ব্রাহ্মণরা যেতেনই না। বাকি জাতিদের তাঁরা তাই বেদ পড়াতে চাইতেন না, তোমার ভেতরে কত অঙ্কট-বঙ্কট আছে আমার জানা নেই, তাই আমি তোমাকে বেদ পড়াতে পারব না। ইদানিং আমরা যে বেদ বা উপনিষদ পড়ি এটা পড়ার জন্য পড়া, সাধনার জন্য পড়ছি না।

আচার্য এই দুটো মন্ত্রের উল্লেখ করে বলছেন যে, *এবং হি বিরক্তস্য প্রত্যগাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শ্রোতুং মন্তুং বিজ্ঞাতুঞ্চ সামর্থ্যমুপদ্যতে*। সব কিছু থেকে এই ধরণের যখন বিরক্তি এসে যায়, এই যে বলছেন *কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্*, নদীর ধারার বিপরীত যাব, এই ইচ্ছা এসে গেছে। আর *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণঃ*, এই লোকের বা পরলোকের কোন কিছুই আমার লাগবে না, এই ধরণের বিরক্তি যখন এসে যায় তখনই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন্ করতে বলেন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন্ উপনিষদেরই সাধনার প্রাথমিক পদ্ধতি। আচার্যের কাছে শাস্ত্রের কথা শুনছে, শুনিয়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে বলে দিলেন, এটাই তোমার জন্য আদেশ। এবার ওটাকে মনন করে, মনন করা মানে, ওটাকে নিয়ে সারাদিন চিন্তা-ভাবনা করা। এরপর মন যখন পুরো একাগ্র হয়ে যায় তখন ঐ একটা চিন্তাতে গিয়ে মন একেবারে বসে যায়, এটাকে বলছেন নিদিধ্যাসন্। এটাকে ঠিক ধ্যান বলা যায় না, একটা চিন্তাকে নিয়ে মন চিন্তন করতে করতে সেই চিন্তাকে কেন্দ্র করেই মন একাগ্র হয়ে যায়। ধ্যান জিনিসটা অন্য লাইনে চলে যায়। আচার্য বলছেন, এই রকম হলে তখনই আত্মজ্ঞান হয়। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, সুতোর একটা আঁশ থাকলে ছুঁচের ভেতরে যাবে না। শুনতে কত সহজ, অথচ এর পেছনে যে ভাব রয়েছে সেই ভাব কত গভীর। তার সাথে বলছেন, একমাত্র ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্ম বিজ্ঞানের যখন কামনা হয়, এই যে ব্রহ্ম বিজ্ঞান, আত্মার ব্যাপারটা আমি জানতে চাইছি, এই ইচ্ছাটা যখন ঠিক ঠিক জাগে। পরের দিকে যত বেদান্ত শাস্ত্র হয়েছে তাঁরা এর ব্যাখ্যা করে বলছেন, এই জানার ইচ্ছাটা হবে *তপ্তশিরোবৎ*। চুলে আগুন লেগে গেলে মানুষ যেমন জলের দিকে দৌড়ে যায়, ঠিক সেই রকম ইচ্ছা জাগে, আমি এই জ্ঞান পেতে চাই, এই জ্ঞান না পেলে আমি মারা যাব।

তখন কি হয়? তখনই সমস্ত কর্মের যে প্রবৃত্তির কারণ আর যে সংসার বীজ, যার মূলে অজ্ঞান, এর নাশ হয়ে যায়। বেদান্ত মতে আত্মা আছেন, আর আত্মজ্ঞান আছে, আত্মজ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হয়ে আছে। অজ্ঞান জিনিসটা কখনই সত্য হয় না, অজ্ঞান অজ্ঞানই, সত্যিকারের এর অস্তিত্ব হয় না। এই বিষয়টা আমি জানি না, না জানাটা চলে যাবে বিষয়টা জেনে নিলে। না জানাটা কখনই তাই বন্ধন রূপে আসে না, তার কাজ বন্ধন স্বরূপ হতে পারে। যেমন আমি বাড়ির ফিউজ লাগাতে জানি না, জেনে নিলে ফিউজ লাগাতে আমার কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু আমার বাড়িতে ইলেক্ট্রিসিটিই নেই, সেটা একটা অন্য জিনিস আর ফিউজ লাগাতে না জানাটা, সুইচ অন্ করা না জানাটা অন্য জিনিস। ওনাদের মতে আত্মতত্ত্ব চিরন্তন, সব সময়ই আছে কিন্তু অজ্ঞানে ঢাকা।

অজ্ঞানটা কি? সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রমিত, কামনা-বাসনা গিজগিজ করছে, ফলে অজ্ঞানের ওই পর্দা সরাতে দেয় না, কারণ ঐটাই অজ্ঞান, কামনাটাই অজ্ঞান। কামনা সমূহ কর্মকে জন্ম দেয়, কারণ কামনা পুর্তির জন্য মানুষকে কাজ করতে হয়। সেইজন্য ওনারা এই তিনটেকে একসাথে বলেন, অবিদ্যা, কাম, কর্ম। নিজের স্বরূপকে না জানাটা অজ্ঞানের জন্য বা অবিদ্যার জন্য হয়। অবিদ্যার জন্য নিজেকে অপূর্ণ মনে হয়, যিনি অপূর্ণ তিনি নিজেকে পূর্ণ করতে চান। এই যে চান, এটাকেই বলে কাম। তখন তাকে ক্রিয়ায় নামতে হয়। একজন বলল, আমি ভাই সুখে নেই। তোমার কিসে সুখ হবে? আমার একটা বাড়ি লাগবে, ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। অপূর্ণ, মনে কামনা জাগল, এবার সে চেষ্টা করবে, কোথায় ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়া যাবে, জমি খুঁজবে, প্ল্যান করবে, পুরোদমে কর্ম শুরু হয়ে গেল। কর্ম শুরু করার পর যুক্তিতে মনে হবে কর্ম করলে কামনাটা মিটে যাবে, কিন্তু একটা কর্ম শুরু হলে সেখান থেকে আরও কর্মের শুরু হয়ে যাবে। গাছ কাটতে গেলে তার বীজ মাটিতে পড়বে, সেখান থেকে আরও গাছ বেরোবে। তখন ওই গাছগুলোকেও কাটতে হবে, ওটাকে কাটতে গেলে তার থেকে আবার বীজ পড়বে। যত কাটা হবে তত জঞ্জাল আগাছা হতেই থাকবে। কামনা যত বাড়ে কর্ম তত বাড়ে, কর্ম যত বাড়ে অজ্ঞান তত বাড়ে, অজ্ঞান যত বাড়ে কামনা তত বাড়ে, কামনা যত বাড়ে......। এই জিনিস চলতেই থাকবে, ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যাবে। মানুষ বুঝতেই পারে না, প্রবৃত্তিতে কত কিছুর কামনা ঢুকে গিয়ে তাকে নাচাতে থাকে। ঠাকুর বলছেন, মহামায়া বেড়াল পুষিয়েও সংসার করিয়ে নেন।

জ্ঞানের ইচ্ছা, আমি এটাকে জানব। সেখান থেকে আসে আমি ভালো ভাবে জানব, সেখান থেকে হবে কলকাতার আমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হব। সেখান থেকে হবে বিশ্বের আমি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হব। অজ্ঞান তাকে ফাঁসিয়ে দিল, আর তাকে বেরোতে দেবে না। এই অজ্ঞানকে মারার একটাই পথ, ব্রহ্মবিজ্ঞান। ব্রহ্ম তত্ত্ব জিজ্ঞাসা যদি মনে এসে যায়, এটাই অবিদ্যা অজ্ঞান নাশের ওষুধের কাজ করতে শুরু করবে। এখনও জ্ঞানের কথা আসেনি, শুধু জিজ্ঞাসা নিয়ে বলছেন। যার মনে সত্যিকারের জিজ্ঞাসা এসে গেছে, এবার তার অজ্ঞানের সাথে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এখান থেকে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে, কবে নিয়ে যাবে, আমরা জানি না কিন্তু এটা জানা যায় যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

সব বলার পর আচার্য ছান্দগ্যো ও ঈশোপনিষদ থেকে কয়েকটা নামকরা মন্ত্র '*তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ*', আবার '*তরতি শোকমাত্মবিৎ*', '*ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ*' উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন যাঁরা জ্ঞান পেয়ে যান তাঁরা কিভাবে একত্ব দেখেন, কিভাবে তাঁরা সব শোক মোহের পারে চলে যান। আর যাঁরা এই পথে, অর্থাৎ জ্ঞানের পথে নেমে গেছেন, এনারাও জ্ঞানী, গীতার ভাষ্যে আচার্য ঠিক এই কথাই বলছেন। ইংলিশে যারা স্কুলে পড়ে তাদের স্কলার বলা হয়, কলেজে যারা পড়ে তাদেরও স্কলার বলা হয় আর যাঁরা পণ্ডিত তাঁদেরও স্কলার বলা হয়। আচার্যও ঠিক সেই রকম বলছেন, যাঁদের মনে ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা জেগেছে, যাঁরা এই পথে নেমে পড়েছেন তাঁরাও জ্ঞানী। আবার যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তাঁকেও জ্ঞানী বলছেন। এরপর দর্শন সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন আসে।

পূর্বপক্ষ থেকে প্রশ্ন ওঠে, আপনি যে এত কথা বলছেন, যাঁর মন বিশুদ্ধ, নিষ্কাম তাঁরাই উপনিষদের জ্ঞানের অধিকারী, এর বাইরে কেউ অধিকারী হবে না, কিন্তু *কর্মসহিতাদপি জ্ঞানাদেতৎ*,

কর্মের সাথেই যদি জ্ঞান লাভ করা যায় তাতেও তো হয়ে যাবে? এখানে কয়েকটা কথা জানার আছে। উপনিষদের সময় একটা খুব প্রচলিত দর্শন ছিল, তা হল কর্মের সঙ্গে জ্ঞান। এই কর্ম আর জ্ঞান আর বর্তমান যুগে স্বামীজী যে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা বলছেন দুটো এক নয়, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে কর্ম বলতে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের কথা বলছেন। কর্মের অনেকগুলো শ্রেনী বিভাগ আছে, প্রথমটাকে বলে নিত্যকর্ম, দ্বিতীয় নৈমিত্তিক কর্ম, তৃতীয় কাম্য কর্ম, চতুর্থ প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আর পঞ্চম নিষিদ্ধ কর্ম। নিষিদ্ধ কর্ম মানে, বেদ যে কর্ম করতে নিষেধ করে দিয়েছে, এই এই কর্ম করা চলবে না। নিষিদ্ধ কর্মের তালিকা কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টাতে থাকে। কোরানে যেমন বলে দেওয়া হয়েছে এই এই করা যাবে না, ওই তালিকা থেকে আর কেউ সরতে পারবে না। হিন্দুদের তালিকা পাল্টাতে থাকে। তবে যে সময় যে স্মৃতিকে পালন করা হবে সেই সময় সেই স্মৃতি যেগুলোকে নিষিদ্ধ কর্ম বলে দিয়েছে সেই কর্ম কোন মতেই করা যাবে না। মানুষের মনে অনেক রকম কামনা থাকে, সেই কামনার পুর্তির জন্য যে কাজ করা হয় তাকে বলছেন কাম্য কর্ম। শাস্ত্র আমাদের নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, কোন কোন জিনিসকে কাম্য করা যাবে আর কোন কোন জিনিসকে কাম্য করা যাবে না। যেমন ব্রাহ্মণদের জন্য মনুস্মৃতি বলে দিল, পয়সার বিনিময়ে ব্রাহ্মণ শিক্ষা দেবে না, দক্ষিণা রূপে যা আসবে সেটা দিয়েই ব্রাহ্মণকে জীবন নির্বাহ করতে হবে। এমনকি যদি কোন ব্রাহ্মণ পয়সা উপার্জনের জন্য চাকরি করে বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাকে ব্রাহ্মণ রূপে গণ্য করা যাবে না। কাম্য কর্মে সে কি কি চাইতে পারে তারও একটা তালিকা দেওয়া আছে। দৈনন্দিন জীবনে চলতে গিয়ে এবং আগের আগের জন্মে জান্তায় বা অজান্তায় মানুষ অনেক রকম দোষযুক্ত কর্ম করেছে। ওই দোষ গুলোর শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। রাস্থায় দিয়ে চলতে চলতে পায়ের তলায় কত পোকামাকড় মরছে আমরা জানতেও পারছি না। শাস্ত্রকাররা সেইজন্য বলে দেন যে মাঝে মাঝে তীর্থ দর্শনে যেতে হয়, দান করতে হয়, একাদশী ব্রত করতে হয়, এই ধরণের কিছু প্রায়শ্চিত্ত কর্মের বিধান দিয়ে দিলেন। নৈমিত্তিক কর্ম হল, যেগুলো আমাদের দায়ীত্ব রূপে এসেছে সেই দায়ীত্বগুলো আমাদের পালন করতে হবে। যেমন ছেলের উপনয়ন, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, বাবা-মার শ্রাদ্ধকর্ম, পিণ্ডদান এগুলো সব নৈমিত্তিক কর্ম। নিত্যকর্ম সবাইকে রোজ করতে হবে। জপধ্যান, পূজাদি, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, এগুলো রোজ করতে হবে। আগেকার দিনে জপের ব্যাপারটা ছিল না, তখন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করা হত, অগ্নিতে আহুতি দিতেন, সেগুলোই পরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যাগায়ত্রীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সেখান থেকে আজকের দিনে জপধ্যানে এসে গেছে। নিত্যকর্মের ব্যাপারে বেদ বলে দিয়েছে অকরণে প্রত্যবায়, যদি না করা হয় তাহলে পাপ। এটাই বেদবাক্য, সবাইকেই করতে হবে। এই জায়গাতে এসে উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত, আচার্যের যে সিদ্ধান্ত, তার সাথে সরাসরি সংঘাত লেগে যায়। সন্ন্যাসীরা জ্ঞানপথ, উপনিষদের পথ নিয়ে নিয়েছেন। সন্ন্যাসীরা কি কি কর্ম করবে, এই প্রশ্নটা এসে যাচ্ছে। কাম্যকর্ম গৃহস্থদের জন্য বোঝা গেল আর নৈমিত্তিক কর্মও না হয় গৃহস্থদের জন্য, কিন্তু নিত্যকর্ম আর প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সন্ন্যাসীদের করা উচিৎ, তার সাথে নিষিদ্ধ কর্ম যেন না করেন। এই কথা কর্মকাণ্ডীরা বলেন। নিত্যকর্ম তো ছাড়া যাবেই না, অকরণে প্রত্যবায়, বেদ আদেশ করছে, নিত্যকর্ম না করলে পাপ হবে।

আচার্য আগে বলে দিলেন শুদ্ধ মন আর নিষ্কাম, কোন কামনা নেই। এখন নিত্যকর্ম কোন কামনার মধ্যে পড়বে কি পড়বে না? এগুলোকে নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক, আলোচনা চলে। কিন্তু এই জায়গায় বলছেন, তোমাদের কর্মকে নিয়েই তো আপত্তি, ঠিক আছে কাম্য কর্ম করো না। আর খুব হলে নৈমিত্তিক কর্মও ছেড়ে দাও। আর তুমি নিজেকে খুব শুদ্ধ পবিত্র মনে করছে, ঠিক আছে প্রায়শ্চিত্তটাও ছেড়ে দাও। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদির মত নিত্যকর্ম তো ছাড়াই যাবে না, কোন প্রশ্নই উঠছে না। আচার্যকে কর্মকাণ্ডীরা বলছে, তুমি খুব জ্ঞানের কথা বলছ, ঠিক আছে দেবতাবিষয়ক উপাসনা, সাম উপাসনাদি কর। ঈশোপনিষদ তো কর্ম আর দেবতাবিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতেই কয়েকটা মন্ত্রকে নিয়ে এসেছে। তখনকার দিনে এটা একটা বিরাট দর্শন ছিল। একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে দেখেছেন, তিনি এবার সেটাকে কেন্দ্র করে একটা দর্শন দিলেন। আমাদের কাছে দর্শন মানে

way of life, আর পাশ্চাত্যের কাছে দর্শন মানে চিন্তা-ভাবনা করা। সেইজন্য দর্শন শব্দটা শুনলে আমাদের গোলমাল লেগে যায়, অর্থটা পরিষ্কার থাকে না। আমাদের এখানে দর্শনে চিন্তা-ভাবনার কোন স্থান নেই। কোন ঋষি সত্যকে এভাবে দেখেছেন, তুমিও এভাবে জীবন-যাপন কর তুমিও এই সত্যকে পেয়ে যাবে। সেইজন্য ওনারা বলছেন, তুমি নিত্যকর্ম কর আর তার সাথে উপাসনাও কর। ঈশোপনিষদেও এই কথা বলছে। আচার্য এটাকে খণ্ডন করে বলছেন, এর কোন কিছুই করা চলবে না।

আচার্য বিভিন্ন উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলছে, যারা কোন ফল পেতে চায়, কি রকম ফল, যেমন '*জায়া মে স্যাৎ*', আমি যেন স্ত্রী পাই, সেইজন্য জ্ঞান সহিত কর্মের সাধন। কি রকম মজার জিনিস, ঈশোপনিষদে বলছেন, দেবতাবিষয়ক জ্ঞান আর কর্ম এক সঙ্গে করতে হয়, আর কোথায় সেই বৃহদারণ্যক উপনিষদ, সেখানে একটা মাত্র বাক্য বলছেন, যাঁরা কর্ম আর জ্ঞান একসাথে করেন আর তারা যদি ভাবেন 'জায়া মে স্যাৎ', আমি যদি একটা ভালো স্ত্রী পাই, তাহলে তার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়। আচার্য এই জায়গাটাকে ধরছেন, উপনিষদ বলছে ঠিকই দেবতাবিষয়ক জ্ঞান আর কর্ম একসাথে করতে, কিন্তু এর বিপরীত ফল দেখিয়ে দিচ্ছেন। তার মানেই হল কর্মযুক্ত জ্ঞান যদি হয় এই জ্ঞান কখনই মুক্তির দিকে বা আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে না। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এই কর্ম আর স্বামীজী যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলছেন সেটা নয়। আর স্বামীজী যে জ্ঞানযোগ বলছেন সেই জ্ঞানও নয়, এটা দেবতাবিষয়ক জ্ঞান। দেবতাবিষয়ক জ্ঞান উপনিষদে কিছু কিছু উপাসনা রূপে আসে। আমরা যেমন ঠাকুরের পূজা অর্চনা করছি, ঠাকুরের জপধ্যান করছি, এখানে কিন্তু সেই কথা বলছেন না, এটা কিন্তু তা নয়। এই জিনিসগুলো উপনিষদের সময় ছিল, এখন আর নেই। তাহলে আমরা কেন এই নিয়ে আলোচনা করছি? একটা আইডিয়া দেওয়া হল, আমাদের পূর্বজরা জিনিসগুলোকে কিভাবে দেখতেন।

ওনাদের কাছে ছিল, তুমি নিয়মিত যজ্ঞ কর, নিয়মিত পূজা কর আর তার সাথে দেবতাদের যে উপাসনার কথা বলা হয়েছে সেগুলো কর, তাতেই সব কিছু হবে। কিন্তু এখানে খুব উচ্চ দর্শন, খুব উঁচু আদর্শের কথা চলছে। এর আগে আমরা বীজের কথা বলছিলাম, এই যে সংসার, এই যে সৃষ্টি, এর বীজ থিক থিক করছে, এর সম্পূর্ণ উৎখাত করতে হবে। *জায়া মে স্যাৎ*, আমার সুখ হোক, আমার প্রাচুর্য হোক, উপনিষদের উদ্দেশ্য এটা নয়। যাদের এই উদ্দেশ্য তারা অন্য জায়গায় যাবে। এখানে হল এই রকম দৃঢ়তা, ত্রিভুবনকে আমি উল্টে ফেলে দেব। গীতাতেও ভগবান এই কথা বলছেন, *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা*, এই সংসার বৃক্ষকে যে কেটে উপড়ে ফেলতে চায়, তাকে অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা কাটতে হবে। অসঙ্গ কি করে হবে? ব্রহ্মাত্ম জ্ঞান ছাড়া অসঙ্গ কখনই হয় না। কেউ যদি মনে করে আমি নিজেকে সব কিছু থেকে আলাদা করে নিচ্ছি, দুদিনের মধ্যে তার মাথাটা পুরো খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু ব্রহ্মাত্ম যখন আসে তখন চেষ্টা করে সব কিছু থেকে আলাদা হতে হয় না, আপনা থেকেই নিজে অসঙ্গ হয়ে যায়। পূর্বদিকে যত এগোবে পশ্চিম দিক নিজে থেকেই পেছেনে থেকে যায়। যে চেষ্টা করে করে অসঙ্গ হতে চেষ্টা করবে তার মাথাটা খারাপ হবেই এই ব্যাপারে নিশ্চিত। যেমনি কেউ ত্যাগ তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করল, সে সন্ন্যাসীই হোক, গৃহীই হোক, তার মাথা খারাপ হবেই। এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন ব্রহ্মাত্ম জ্ঞান, আমাকে সেই জ্ঞানটা পেতে হবে যে জ্ঞান দিয়ে সংসার বীজকে উপড়ে ফেলা যায়। এই ইচ্ছা জাগলে তখন আলাদা করে চেষ্টা করতে হয় না, নিজেই খসে পড়ে যায়। ঠাকুরের যখন সাধনার ঝড় চলছে তখন তিনিও চেষ্টা করছেন সাধারণদের মত স্বাভাবিক ভাবে থাকতে, কিন্তু পারছেন না। কাপড় কোথায়, পৈতে কোথায়, খাবার কোথায়, দিন কি, রাত কি কোন কিছুরই ঠিক নেই, সব খসে পড়ে যাচ্ছে। ওনাকে বলা হচ্ছে, তিনিও বলছেন আমি চাইছি কিন্তু পারছি না। আমি আপনি যদি ঠাকুরের মত কাপড়, পৈতে ফেলে চেষ্টা করি, লোকেরা পাগলা গারদে পুরে দেবে। কারণ এর পাশাপাশি আরও কিছু কিছু জিনিস ও আচরণ থাকে, যেগুলো দিয়ে বোঝা যাবে সত্যিই তার ওই অবস্থা হয়েছে কিনা। আবার শান্ত ভাবের সাধনাও আছে, যেখানে এই ধরণের উদ্দাম জিনিস দেখা যাবে না। আচার্য একেবারে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন জ্ঞান আর কর্ম একসাথে চলতে পারে না।

বৃহদারণ্যক থেকে আচার্য আবার একটা খুব নামকরা মন্ত্র নিয়ে আসছেন, *‘পুত্রেণায়ং লোকো জয্যো, নান্যেন কর্মণা। কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ’*। কর্মের দ্বারা মানুষ পিতৃলোক পায় আর দেবতাবিষয়ক উপাসনা দ্বারা দেবলোক পায়। এই সব বলার পর আচার্য আবার উপনিষদ থেকেই বলছেন, যে উপনিষদে বলছেন কর্ম দিয়ে পাওয়া যায়, জ্ঞান দিয়ে পাওয়া যায়, সেখানেই আবার বলছেন, যাঁরা আত্মজ্ঞান পেতে চাইছেন তাঁরা এষণাত্রয় ত্যাগ করে দেন। এষণা মানে খুব বলশালী ইচ্ছা, ইচ্ছাই আবার way of life হয়ে যায়। সাধারণ লোকের যে নানা রকমের ইচ্ছা থাকে সেই ইচ্ছাগুলো ঠিক এষণার মধ্যে আসে না। ঠিক ঠিক এষণা হয় সব ইচ্ছার জননী। সব ইচ্ছার জননীকে উপনিষদের সময় তিনটে এষণাতে নিয়ে এসেছেন, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা, সন্তানের ইচ্ছা, টাকা-পয়সার ইচ্ছা আর বিভিন্ন লোকের ইচ্ছা। বাকি যত ইচ্ছা সবই এই তিনটে এষণার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। এই যে বলা হয় নিত্যকর্ম সব সময় করবে, আচার্য তাঁর বাক্যভাষ্যে একটা খুব জাগতিক যুক্তি এনে এর বিরুদ্ধে বলছেন, যে মানুষ নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা নিয়েছে, নদী পার হয়ে যাওয়ার পর সে কেন আর নৌকা বয়ে বেড়াবে। ঠিক তেমনি যে কর্ম দিয়ে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে নিয়েছে, সে কর্মের জন্য আবার কেন ফেরত যাবে। আচার্যের মূল বক্তব্য হল, কর্ম বা কাজের সাথে আত্মজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। একমাত্র সম্পর্ক হল, যে কোন কাজ, বিশেষ করে যজ্ঞাদি কর্ম নিষ্কাম ভাবে যদি করা হয় অর্থাৎ নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয় না, তখন সেই কর্ম চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে যাঁরাই দীক্ষা নেন, গুরু তাঁদের বলে দেন, নিয়মিত যে জপ করবে জপ করার পর জপের ফল সমর্পণ করবে। জপের ফল তুমি নিতে পারো না, এটাই নিষ্কাম কর্ম। এটাই যখন তন্ত্র সাধনায় যায় তখন ওনারা আগে ফল অভিষ্ট করে নেন, অর্থাৎ একটা সঙ্কল্প নিতে হয়, এই সঙ্কল্পের জন্য আমি এই পূজা করছি। গৃহস্থরা সঙ্কল্প করেন গৃহস্থের মঙ্গল হোক, মঠে যে দূর্গাপূজাদি হয় সেখানে এই সঙ্কল্প নেওয়া হয়, সঙ্ঘের ভালো হোক, জগতের মঙ্গল হোক, এইভাবে নিঃস্বার্থ ভাবে করা হয়।

এই কথা বলে আচার্য আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা যুক্তির ব্যবহার করছেন, এই যুক্তিটাই অনেকবার ঘুরে ঘুরে আসবে। সাধারণ একটা লজিক আছে, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম লজিক। যে জিনিসটা স্বতঃসিদ্ধ, সেটাকে সিদ্ধ করার দরকার পড়ে না। স্বতঃসিদ্ধ মানে নিজেই প্রমাণিত। হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে, হাতে যদি কারুর একটা বালা থাকে সেটাকে যাচাই করার জন্য তাকে আয়নার সামনে যেতে হবে না, স্বতঃসিদ্ধি, নিজের চোখ দিয়েই দেখা যাচ্ছে হাতে বালা আছে। স্বতঃসিদ্ধ মানে যেটা চিরনন্তন সত্য, সব সময়ই আছে, ওটাকে যাচাই করার জন্য কখনই কোন প্রমাণের আবশ্যক হবে না। পূর্বমীমাংসকরা কর্ম আর জ্ঞানের কথা দিয়ে যুক্তি নিয়ে এলেন। কর্মের সব সময় একটাই উদ্দেশ্য, অপ্রাপ্ত জিনিসকে পাওয়া। কিন্তু যে জিনিসটা আগে থেকেই আমার কাছে আছে সেটাকে প্রাপ্ত করার জন্য তো আমি কোন চেষ্টা করতে যাব না। যার চোখ ঠিক আছে সে কখনই চোখের ডাক্তারের কাছে যাবে না। এখানে বক্তব্য হল, যখনই কিছু করা হয় তখন তার পেছনে একটা অপ্রাপ্য জিনিসকে পাওয়ার ইচ্ছা থাকে। অথবা একটা জিনিস আছে সেটা বাস্তবিক তার নয়, সেটা হারানোর ভয়। যেমন একজনের বহু সাধ্য সাধনা করে একটা সন্তান হয়েছে, মা-বাবার মনে সব সময় এই দুশ্চিন্তা, আমার সন্তানের যেন কিছু না হয়ে যায়, কত রকম মাদুলি, তাবিজ দিচ্ছে। একটা জিনিস কাছে আছে সেটাকে হারানোর ভয়, আরেকটা জিনিস আছে যেটা কাছে নেই, সেটাকে পাওয়ার ইচ্ছা। এরই নাম শোক ও মোহ। কিন্তু যেটা আমার সব সময়ই আছে, চিরদিন থাকবে, সেটাকে পাওয়ার জন্য কেন কর্ম করতে হবে! খুব হলে বলা যেতে পারে, খুঁজে নিতে হতে পারে। রাজার ব্যাটা, তার বিরাট খাজানা, তাকে আর থোড়াই কাজ করতে হবে! খুব হলে নিজের ঐশ্বর্যকে বুঝে নেবে, তার বেশি আর কিছু না। আত্মার যে সংজ্ঞা আর আত্মজ্ঞানের যে সংজ্ঞা, তাতে বলা হয় এটা স্বতঃসিদ্ধ, আত্মা সব সময় আছেন, self evidence, নিজেই প্রমাণিত, আত্মাকে প্রমাণ করার দরকার পড়ে না। সেইজন্য আত্মার জন্য কোন কর্ম করতে হয় না। বলছেন, আত্মা এমন কিছু নয় যে আমার বাইরে। আমার বাইরে থাকলে তবেই তো আমি পাওয়ার

চেষ্টা করব। আর বাইরের জিনিস হলে তবেই তা হারানোর ভয় থাকে। যেটা আমি নিজে, আমি নিজেকে কি করে হারিয়ে দেব। আত্মা মানে আমি নিজে, আমার যেটা সার, তাই আত্মার জন্য কোন কর্ম করার দরকারই নেই, আর প্রমাণ করারও কোন দরকার নেই।

উপনিষদ কি বলতে চাইছেন যদি এটাই আমাদের জানতে হয় তাহলে বই পড়লেই আমরা জেনে যেতে পারি। কিন্তু এই জানাতে কিছুই হয় না। উপনিষদের বক্তব্য ধারণা করা যে কত কঠিন, এটাকে যদি কেউ বুঝতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে এবার সে ধারণা করার জন্য তৈরী হয়েছে। ঠাকুর এই জিনিসগুলোকে ধারণা করাবার জন্য কথামৃতে কত ধরণের উপমা নিয়ে এসে বলছেন। একবার বলছেন বোবার সন্দেশ খাওয়া, তার থেকে আরও মজার উপমা দিচ্ছেন, একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কয়েকদিন পর নিজের বাড়িতে আসার পর তার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করছে স্বামী সুখ কি রকম। মেয়েটি তার সখীদের হেসে বলছে, তোর যখন স্বামী হবে তখন বুঝবি। তার মানে যতক্ষণ নিজে না অনুভব করছে ততক্ষণ এই জিনিসটা ধারণা করা যাবে না। এই ব্যাপারটা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়। বিংশ শতাব্দীর ফিজিক্সের ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, আজকে যাঁরা পূজনীয় বিজ্ঞানী, আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, পলি, ম্যাক্সপল, নতুন আইডিয়া গুলো যখন আসছে এনারা কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তারপরে দেখা যাচ্ছে ওর উপর কাজ করে অন্য একজন নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন। ওনারা কাঁদছেন, আমার এমন সব অধ্যাপকরা ছিলেন তাঁরা সর্বনাশ করে দিয়েছেন। এই ধরণের প্রচুর ঘটনা আছে। এনারা সবাই নামকরা, নিজেরাও নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আর ১৯২০ থেকে ১৯২৫এর মধ্যে আইনস্টাইন তো outdated হয়ে গেছেন। ফিজিক্সের মূল স্রোত থেকে তিনি পুরো আলাদা হয়ে গেলেন। উনি বুঝতেই পারতেন না, নতুন এরা কি করছে, কোয়ান্টাম ফিজিক্স তো উনি কিছু বুঝতেনই না। একজন বিজ্ঞানী এসে আইনস্টাইনকে বলছেন, আপনার $E=MC^2$ দিয়ে এ্যটম তৈরী করা যায়। আইনস্টাইন রেগেমেগে তাঁকে বলছেন, গণিতে তুমি ভালো কিন্তু ফিজিক্সের কিছু বোঝ না। তার কয়েক বছরের মধ্যে এ্যটম বোমা ফাটল। এনারা সবাই নামকরা বিজ্ঞানী, সব নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানী। শুধু এনাদের দেখার জন্য লোকেরা ওই সব ইউনিভার্সিটিতে যেত, এই লোকগুলো কেমন যাঁরা world viewকে পাল্টে দিয়েছেন। সেখানে অন্যরা যখন নতুন থিয়োরী দিচ্ছেন তখন এনারা বলছেন, তোমার বকবকানি বন্ধ করবে! ঠিক এই ভাষা ব্যবহার করছেন। তারপর দেখা যাচ্ছে, হয় সে ওটাকে নিয়ে নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে, আর তা নাহলে সেই বেচারি হয়ত হতাশ হয়ে তার থিয়োরীটা ছেড়ে দিয়েছে, তখন ওই থিয়োরীকে নিয়ে অন্য একজন নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন। সেখানে এমন একটা বিষয় যদি হয়, যে বিষয়ের কোন ধারণাই নেই, সেই বিষয়কে নিয়ে যদি বলা হয় তখন কি হবে? যদি তাঁকে ভালোবাসেন তাহলে বলবেন, ও যখন বলছে ঠিকই বলছে। সেখানেই শেষ, এর আগে আর যাবে না।

আচার্য বলছেন কর্ম দিয়ে কখন আত্মজ্ঞান হতে পারে না। তার জন্য যুক্তি আনছেন, যেটা স্বতঃসিদ্ধ, যেটা সত্য, সেটার জন্য প্রমাণের কি আবশ্যকতা আছে! মানেকশ যখন আর্মির চিফ ছিলেন সেই সময় ওনার একজন বড় অফিসার টাকা-পয়সার গোলমাল করত। মানেকশ সেই অফিসারকে ডেকে কিছু একটা বলতেই অফিসার বলছে, are you hinting that I am corrupt? মানেকশ বলছেন, I am not hinting, I am telling that you are corrupt। আমরা কথায় কথায় বলি প্রমাণ কি, এটাই আচার্য বলছেন, যখনই বলছ প্রমাণ কি, আমাদের যে সাধারণ দৈনন্দিন জীবন সেখানে প্রমাণ লাগে। প্রমাণ বলতে বোঝাচ্ছে একটা জিনিসকে জানার পদ্ধতি। সব থেকে নামকরা প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইন্দ্রিয়, মন দিয়ে যা কিছু জানছি এটাকে বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দ্বিতীয় অনুমান প্রমাণ, যুক্তি দিয়ে, বিচার করে জানার নাম অনুমান প্রমাণ। তৃতীয় খুব নামকরা প্রমাণ হল শাস্ত্র প্রমাণ, যেটা একমাত্র শাস্ত্র দিয়েই জানা যায়। কিন্তু আত্মা স্বয়ংজ্যোতি। স্বয়ংজ্যোতি মানে, যেটাকে দেখার জন্য আলোর দরকার হয় না। দীপের আলোতে আমরা ঘরের সব কিছু দেখতে পারি, অন্ধকারে জিনিসগুলোকে দেখা যেত না। কিন্তু সূর্যোদয় হলে সেই সূর্যকে দেখার জন্য দীপ লাগে না, সূর্যের

আলো স্বতঃপ্রমাণ। সূর্যের আলোতে বাকি সব কিছু আলোকিত হয়, তাই সূর্য স্বয়ংজ্যোতি। ঠিক সেই রকম আত্মা হলেন স্বতঃসিদ্ধ, আত্মার জন্য কোন প্রমাণ লাগে না।

লোকেরা বলবে আমি তো আত্মার ব্যাপারে জানি না, আমার কাছে তো স্বতঃসিদ্ধ নয়। এই জায়গাতে এসে গোলমাল লাগে। তখন বলা হয়, তোমার জানা নেই ঠিকই কিন্তু যাঁরাই আত্মজ্ঞান পেয়েছেন তাঁরা সবাই আত্মাকে এভাবেই দেখেন। যেহেতু তুমি আমাদের কাছে শিক্ষা নিতে এসেছ সেইজন্য তোমাকে সত্যটা বলে দেওয়া হল। এরপর তুমি যখন সাধনা করবে, সাধনা করে তোমার যখন জ্ঞান হবে তখন তুমি দেখবে, আত্মার জন্যই বাকি সব কিছু হয়েছে, আর স্বতঃসিদ্ধ। আমি কেন জানতে পারছি না? এইজন্যই জানতে পারছ না কারণ নিজের উপর ক্রিয়ার অভাব। যেমন তোমার ডান হাত দিয়ে তুমি নিজের ডান হাত ধরতে পারবে না, তোমার চোখ দিয়ে তুমি নিজের চোখ দেখতে পাবে না। যিনি একমাত্র জ্ঞাতা তাঁকে কী দিয়ে জানবে, সেইজন্য তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। ধ্যানের গভীরে গিয়ে ধ্যাতা, ধ্যান আর ধেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক হয়ে যায়। তখন জ্ঞান হয় না, তখন বোধে বোধ হয়। গভীর নিদ্রা থেকে হঠাৎ জেগে গেলে বুঝতে পারে না, আমি কোথায় আছি। কিছুক্ষণ পর যখন চেতনা হয় তখন বোধ হয়, ও এটা আমি। আত্মজ্ঞানে ঠিক তাই হয়। জন্মজন্মান্তরের যে অজ্ঞান, এই অজ্ঞান যখন কাটে তখন বুঝতে সময় লাগে। সেইজন্য ওটা কোন প্রমাণ লাগে না। প্রমাণ শব্দ মা দিয়ে হয়, মা মানে মাপা। যখন একটা জিনিসকে মাপা, কোন বিষয়কে যেটা দিয়ে মাপা হয় সেটাই জ্ঞান। আচার্য এই ব্যাপারে একেবারে দৃঢ় হয়ে বসে আছেন, যেটা স্বয়ংসিদ্ধ, সেটাকে প্রমাণ করার দরকার হয় না। যদি কারুর আত্মজ্ঞান না হয়ে থাকে সে কোন দিন আত্মার অস্তিত্ব মানবে না। এনারা যুক্তি দিয়ে নিয়ে গিয়ে সবই দেখাবেন কিন্তু যুক্তিগুলো এত সূক্ষ্ম স্তরে চলে যে, ওই সূক্ষ্মকে ধরার ক্ষমতা আমাদের নেই। মানুষের মন এতই স্থূল যে এগুলো কী বুঝবে। গান যখন শুনবে গানের সাথে উদ্দাম নৃত্য না হলে গান জমবে না। আর এত জোরে আওয়াজ করে মাইক্রোফোন চালাবে যে শুধু নিজের পাড়াতেই নয়, তিনটে পাড়া ছাড়িয়েও লোকেরা শুনতে পাবে। এদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনারও ক্ষমতা নেই। ঠাকুরের সামনে চুপচাপ বসে একটু জপ করবে তাতেও হাত নাড়বে, কান চুলকাবে, পা নাড়বে, শান্ত হয়ে বসে থাকার ক্ষমতা নেই। আত্মার ব্যাপারে উপনিষদের যে কথা, তার উপর আচার্যের যে যুক্তি বিশ্লেষণ চলছে, এগুলো বুঝতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি দরকার। সূক্ষ্ম বুদ্ধি মানেই আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ক্রিয়া সব কিছুকেই ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম করতে হবে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে এগুলো যে সূক্ষ্ম জিনিস এটাও বুঝতে পারে না। এমনই সূক্ষ্ম যে যিনি আত্মকথা বলবেন তাঁকেও অত্যন্ত গভীর মনের হতে হবে, তা না হলে তাঁর কথাগুলো শ্রোতাদের মনে গিয়ে ধাক্কা মারবে না।

যাই হোক, আচার্য ওটাই বলছেন, যেটা স্বতঃসিদ্ধ সেটাকে কেউ অন্য কোন প্রকারে, যেখানে কর্তা কর্মের সম্পর্ক আছে, সেটা দিয়ে জানা যাবে না। খুব স্থূল ভাবে বলা যেতে পারে, যে ঘুমিয়ে আছে তাকে আমি ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতে পারব, কিন্তু ঘুমনোর ভাণ করে যে জেগে আছে তাকে আমি কিভাবে জাগাবো? ক্রিয়া আর কর্মের সম্পর্ক তখনই হয় যখন দুটো আলাদা হয়। আর শুধু তাই না, এটা আত্মস্বরূপ, এটা তুমি নিজে। সেইজন্য আত্মা নিত্য প্রাপ্ত, সব সময়ই সামনে আছে। ঈশ্বরের ব্যাপারে বেশির ভাগ মানুষের একটা খুব সাধারণ ধারণা যে, ঈশ্বর উপরে কোথাও আছেন, তিনি সেখান থেকে সব কিছু দেখছেন, তিনি কৃপা করছেন। কিন্তু তা নয়, তিনি নিত্য প্রাপ্ত, সব সময়ই তিনি আমাদের হৃদয়ে আছেন। তিনি বাইরেও আছেন ভেতরেও আছেন, সব জায়গায় ব্যপ্ত হয়ে আছেন। নিত্য প্রাপ্ত মানে চব্বিশ ঘন্টা তিনি আছেন, এমন কোন ক্ষণ হয় না যে তিনি উপলব্ধ হন না। তিনি শুধু নিত্য প্রাপ্ত নয়, তিনিই কাম্য। ঠাকুর বলছেন, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আচার্য যেখানে সুযোগ পাবেন সেখানেই বার বার বলবেন, এটাকে জানো, এটাকে জানলে বাকি সব ঠিক হয়ে যাবে।

তার সাথে আবার বলছেন এই জগতটা আত্মার বিকার। আমরা প্রায়ই বলি ঈশ্বরই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যাঁরা বেদান্তী, যাঁরা আত্মাকে মানেন, তাঁদের কাছে এগুলো সব আত্মারই বিকার, এগুলো সবই নাম আর রূপের বিকার। এই যে জগৎ এর কোন কিছুই, এর কোন নাম রূপ কখনই ইষ্ট হতে পারে না। যদি এই বিকার, এই যে পরিবর্তন, এটা যদি বাস্তব হত তাহলে আমরা দেখতাম। মালিকের ছেলে যদি কাজের লোকের বাড়ি যায় সেও সেখানে খুব আদর যত্ন ও খাতির পায়। আগেকার দিনে দেখা যেত, নতুন বিয়ে হয়ে কোন মেয়ে শ্বশুড় বাড়ি এসেছে, আর কিছু দিন পর যদি বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে কেউ আসে, তাকে নিয়ে তার কি আনন্দ হত ভাবাই যায় না। যাকে আমরা ভালোবাসি, তার সম্প্রসারিত যেটা আর যেটাতে যেটাতে তার প্রকাশ, দুটোর প্রতিই আমাদের ভালোবাসা থাকে। আত্মার যদি বিকার হত তাহলে সেটা ইষ্ট হত, কারণ আত্মা নিত্য প্রাপ্ত আর আত্মাই একমাত্র প্রাপ্তব্য। তাই যিনি আত্মাকে ভালোবাসেন তিনি আত্মার যে বিকার সেটাকেও ভালোবাসবেন। কিন্তু বলছেন আত্মা তো অবিকারী, আত্মার বিকার হতেই পারে না। সেইজন্য এই বিকার গুলো ফালতু, আত্মার সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। সেইজন্য এটার দিকে যাওয়াই যাবে না, তাকাবার কোন প্রশ্নই নেই। এখানে এসেই জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গ আলাদা হয়ে যায়।

আচার্যও এই জায়গাতে আলাদা করে দিচ্ছেন। ভক্তিমার্গীদের কাছে জগতে যা কিছু আছে সব ঈশ্বরেরই রচনা বা ঈশ্বর নিজেই সব কিছু হয়েছেন। সেইজন্য ভক্ত নাম রূপকে ভালোবাসতেই পারে, চাইতেই পারে, কারণ সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে। ঈশ্বরকে যে ভালোবাসে তার কাছে ঈশ্বরের সৃষ্টিটাও ভালোবাসার জিনিস হবে। ওই রূপান্তরটা যদি সত্য হয়, যদি সৃষ্টিটা বাস্তব হয়, তাহলে সত্যিই তাকে ভালোবাসা যাবে। এখন যে শাস্ত্র বা যে আচার্য আত্মাকে ব্যাখ্যা করছেন, তাঁরা চারটে শব্দে বলে দিচ্ছেন, আত্মা নিত্য, আত্মা অবিকারী, আত্মা অবিষয়ী আর আত্মা অমূর্ত। যিনি নিত্য, সনাতন তিনি কখনই extinguish করবেন না, যিনি অবিকারী সেখানে বিকার আসবে না, যিনি অবিষয়ী ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যাবে না আর যিনি অমূর্ত তাঁর কখন মূর্ত রূপ হবে না। তার মানে, আমাদের সামনে যা কিছু আছে, যাঁরা এখানে বসে আছেন, এদের সবাইকে কি ভালোবাসা যাবে? বেদান্ত বলবে, না, ভালোবাসা যাবে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, মানুষ যখন কাউকে বা কোন কিছুকে ভালোবাসে তখন সে নিজের আত্মাকেই ভালোবাসছে। স্ত্রী রূপে, সন্তান রূপে, স্বর্ণ রূপে, ধর্ম রূপে নিজেরই প্রকাশ। উদ্দেশ্য হল ওই বিকারকে না ভালোবাসা, এটা জানো যে বিকারটাও আসলে আত্মাই। সাধনা মানে বিকারকে ছেড়ে তার পেছনে যে সত্য সেটাকে ভালোবাসা। এনারা তাই নেতি নেতি সাধনা নিয়ে আসেন, এটা বিকার, এটাকে ছাড়ো, এগুলো সব মায়া, মায়া মানেই বিকার, বিকারের দিকে যেও না। জ্ঞানমার্গের এই নেতি নেতি সাধনা খুব কঠিন পথ। গীতাতেও ভগবান বলছেন *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্*, অব্যক্তের দিকে যাঁরা যান তাঁদের ক্লেশের আর অন্ত থাকে না। ঠাকুর জ্ঞানীর কথা বলতে গিয়ে বলছেন, তাঁর হাত কেটে গেছে দরদর করে রক্ত পড়ছে কিন্তু বলছেন, কই আমার তো কিছু হয়নি। তাঁর নিজের শরীরের সঙ্গেও কোন আসক্তি নেই। শুধু শরীরকেই নয়, সমস্ত রকম জাগতিক সম্পর্ক, ভালোবাসা, রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা সব কিছুকে ছেড়ে দিয়েছেন। সেইজন্য বলা হয় উপনিষদ সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। বেশির ভাগেদের জন্য ভক্তি পথ, ভক্তি এর থেকে আরেকটু সহজ করে দেয়। এখানে যেমন বলছেন সবটাই মায়া, সবটাই বিকার, তেমনি ভক্তিতে বলেন সবটাই ঈশ্বরেরই রূপ। ভক্তিতেও বলা হয়, ঈশ্বরকেই দেখ, বিকারটাকে ভালোবেসো না, তার পেছনে যেটা নিত্য সেটাকে ভালোবাসো। ঠাকুরও তাই বলছেন, ভাইপোর দিকে মন যায়, ভাইপোর মধ্যেই গোপালকে দেখ। তোমার ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সেবা যে মনোভাব নিয়ে করবে, ওই মনোভাবে ভাইপোর সেবা করবে। একই জিনিস, খেলা থেকে টেনে সরিয়ে আসল বস্তুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, তাই আত্মাকেই জানতে হবে। কিভাবে জানবে? তোমার ভেতরে যে জিনিসটা নিত্য, শাশ্বত আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যিনি নিত্য যিনি শাশ্বত, এই দুটো এক। কেনোপনিষদ এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করবেন, তোমার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এগুলো কিছু না। এর পেছনে

একটি আছে যেটা নিত্য, সনাতন, ওটাই বাস্তব তত্ত্ব। আর জানবে, তুমি সেটাই। দ্বিতীয় জানবে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যিনি আছেন তিনিই ব্রহ্ম। আর এই যে আমাদের শরীরের ভেতরে আত্মা আর সেই ব্রহ্ম এক, দুটো আলাদা কিছু নয়। যেটাই আত্মা সেটাই ব্রহ্ম। মুখে বললে হয়ে যাবে না, এটাকে জানতে হবে। এই জানাকে আটকে রেখেছে অজ্ঞান, অজ্ঞানের জন্য জানা যাচ্ছে না। তাই অজ্ঞানের নাশ ছাড়া জীবনের উদ্দেশ্য আর কিছু হতে পারে না। আমাদের ভেতরে আত্মা আছেন এটা স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যে ব্রহ্ম আছেন এটা স্বতঃসিদ্ধ, আর তুমিই সেটা এটাও স্বতঃসিদ্ধ। শুধু অজ্ঞান সেখানে বাধক হয়ে আছে। শ্রীশ্রীমা নলিনীদিকে বলছেন 'বুঝলি! খাটতে হয়'। খাটা মানে জপধ্যান করার কথা বলছেন। খাটলে জানতে পারবে তোমার ভেতরে যিনি আছেন, দুলি-বাগদির ভেতরেও তিনিই আছেন, তবেই তো বিনয় জন্মাবে। ওরা সবাই ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত। শ্রীমার সবার প্রতি কেমন ভালোবাসা ছিল, আমরা তার কত বর্ণনা পাই। মা সবাইকে নিজের সন্তান দেখছেন, সন্তানের প্রতি মায়ের তো ভালোবাসা হবেই। কিন্তু এরও গভীরে একটা অন্য জিনিস রয়েছে, যেটাকে আমরা ধরতে পারি না। শ্রীশ্রীমা যে বলছেন, খাটতে হয়, খাটলে পরে জানতে পারে আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনিই দুলি-বাগদিদের ভেতরেও আছেন, তবেই তো বিনয় আসবে। গীতা একই কথা বলছেন, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনিঃ।।* বিদ্বান, বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর, চণ্ডাল সবারই ভেতরে সেই আত্মাই আছেন, শুধু বাইরের খোলটা আলাদা। যতক্ষণ মানুষ এটা সাক্ষাৎ অনুভব করছে ততক্ষণ কিন্তু ভেতর থেকে বিনয় আসে না। আচার্য বলছেন, এই জ্ঞান কোন ক্রিয়া দিয়ে হয় না, কারণ যেটা স্বতঃসিদ্ধ সেটার জন্য ক্রিয়া কি করে হবে! স্বতঃসিদ্ধ কি? তোমার ভেতরে চৈতন্য সত্তা। আর স্বতঃসিদ্ধ কি? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে চৈতন্য সত্তা। এটাও যা ওটাও তাই, দুটো আলাদা চৈতন্য সত্তা বলে কিছু হয় না। ক্রিয়ার দ্বারা এই জ্ঞান আসবে না বলে দিলেন, তাহলে আসবে কিভাবে?

অজ্ঞানের নাশ করে দিলে জ্ঞান হয়ে যাবে। তাহলে একমাত্র উদ্দেশ্য হল, অজ্ঞান নিবৃত্তি। অজ্ঞান নিবৃত্তি কিভাবে হয়? ঠাকুর বলছেন, একজনের একটা চিঠি এসেছে, চিঠিটা হারিয়ে গেল। অনেক খুঁজে খুঁজে চিঠিটা পাওয়া গেল, দেখে চিঠিতে লেখা আছে পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাতে বলেছে। চিঠিতে কি লেখা আছে জেনে নিয়ে এবার সন্দেশ কাপড় জোগাড় করতে নেমে পড়ল। এরপর চিঠির আর কোন দরকার নেই। যখন এটা জানা হয়ে গেল, আমাদের উচ্চতম তত্ত্ব হল আত্মতত্ত্ব। আমার যে বাস্তব সত্তা, যেটা স্বতঃসিদ্ধ, যেটা সনাতন সত্য, এটা সেই আত্মা। দ্বিতীয়, যেটা শ্রীশ্রীমা বলছেন, দুলি-বাগদির ভেতরে, অর্থাৎ তুমি যাকে হেয় মনে করছে তার ভেতরেও তিনি আছেন। কুকুর, শূয়োর, পাখি, পিঁপড়ে সবের মধ্যে তিনিই রয়েছেন। এটাকে জেনে গেলে তোমার মধ্যে একটা বিনয় আসবে। কিন্তু যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ওটাকে শাব্দিক রূপে করে যাও। ঠাকুর হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণের গল্প বলছেন। বলার পরে বলে দিচ্ছেন মাহুত নারায়ণের কথা শুনতে হবে। কারণ এখনও সে ওই উচ্চস্তরে পৌঁছায়নি। যখন পৌঁছে যাবে তখন তুমি জীবন-মৃত্যুর পারে চলে গেলে, এরপর তুমি বেঁচে থাক আর মরেই যাও তাতে তোমার আর কিছু আসবে যাবে না।

মূল কথা হল, এটা স্বতঃসিদ্ধ, যুক্তি দিয়ে এর কথা বোঝান যাবে না আর কোন ক্রিয়া দিয়ে এটাকে পাওয়া যাবে না। অজ্ঞান নিবৃত্তিটাই একমাত্র পথ যেটা দিয়ে এই আত্মতত্ত্বকে জানা যায়। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ না হয় বুঝলাম কিন্তু আত্মা আর ব্রহ্ম তো আলাদা, যেমন জীব আর ঈশ্বরের ভেদ। তখন আচার্য বলছেন, সমস্ত শাস্ত্র বলছে আত্মা ও ব্রহ্ম এক। আত্মা ও ব্রহ্ম যেহেতু এক তাই কোন ক্রিয়া হতে পারে না। কারণ কর্ম মানেই দুই, কর্তা ও কর্ম। দুই যেখানে নেই সেখানে তাই ক্রিয়া হতে পারে না। আর ব্রহ্মকে বলছেন সমস্ত ভেদরহিতম্, ব্রহ্মে কোন ধরণের ভেদ নেই, তাই ব্রহ্মে কর্তা কর্মের ভেদ হতে পারে না।

এরপর আচার্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট নিয়ে বলছেন। দৃষ্ট মানে জগতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সেটার যা সুখ, আর যেটা দৃষ্ট নয়, যেমন আমরা স্বর্গলোক দেখিনি, কিন্তু স্বর্গলোকের সুখের কামনা করছি। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সুখ থেকে যিনি বেরিয়ে এসেছেন, আর সমস্ত রকমের বাহ্য সাধ্য সাধন থেকে বেরিয়ে এসে বলছেন আমার কিছু লাগবে না। তাঁদের জিজ্ঞাসা কেমন হয় সেটাই কেনোপষিদ প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্র দিয়ে আলোচনা শুরু করছেন। এই ধরণের আলোচনা গুলো যেহেতু খুব কঠিন হয়, সেইহেতু সহজ করার জন্য গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে পুরো জিনিসটাকে উপস্থাপনা করা হচ্ছে। বেদে বেশির ভাগ মন্ত্রই সরাসরি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপনিষদের মন্ত্র খুব কঠিন, তাই একটু বিস্তার করার চেষ্টা করেন। তত্ত্বকে তো বিস্তার করা যাবে না, কিন্তু উপস্থাপনাটাকে বিস্তার করে নিয়ে যাচ্ছেন। উপস্থাপনাকে বিস্তার করার জন্য কঠোপনিষদে যমরাজ-নচিকেতার কাহিনী নিয়ে আসা হয়ছে। ঠিক তেমনি কেনোপনিষদের প্রথম দুটো অধ্যায় গুরু-শিষ্যের কথোপকথন। শেষের দুটো অধ্যায়ে একটা আখ্যায়িকা নিয়ে আসছেন যাতে লোকেদের বুঝতে একটু সুবিধা হয়।

আচার্য আবার কঠোপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন '*নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া*' তুমি যদি মনে কর যুক্তিতর্ক দিয়ে, বই পড়ে এই জ্ঞান বুঝে নেবে, সেটা কখনই হবে না। কিভাবে জ্ঞান হবে? মুণ্ডকোপনিষদ থেকে আচার্য বলছেন '*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*'। ওই জ্ঞান যদি পেতে হয় তাহলে তোমাকে গুরুর কাছে যেতে হবে। কিভাবে যেতে হবে? শ্রদ্ধার সাথে, হাতে সমিধ নিয়ে বা দক্ষিণা নিয়ে গুরুর সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করতে হবে, আপনি আমাকে এই জ্ঞান দিন। কিন্তু তার আগে কি করতে হবে? '*পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো*', ভালো করে, পরীক্ষা করে বিচার করে দেখে নিতে হবে যে এই জগতের কোন কিছুই আমার লাগবে না। যদি তোমার মনে হয় এখনও তোমার জগতের অনেক কিছু লাগবে, তাহলে হবে না। তবে গুরুর কাছে পোঁছে গেলে, গুরু তাকে কাজে লাগিয়ে দিতেন, কাঠ নিয়ে আস, গরু চড়াও ইত্যাদি। তাকে দিয়ে প্রচুর কর্ম করাতেন।

কর্ম আগুনের মত, কর্ম মানুষের মনের অনেক অঙ্কট-বঙ্কট, আবর্জনাকে পুড়িয়ে দেয়। বুদ্ধি দিয়ে এই জ্ঞান হবে না, গুরুর কাছে গিয়ে শরণাগত হতে হবে, যেটা গীতায় বলছেন '*তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*'। এই ভাব নিয়ে কেনোপষিদ শুরু করছেন। আগেকার দিনে শিষ্যরা ঘরবাড়ি ছেড়ে গুরুগৃহে যেত। এরপর আট বছর, বারো বছর, ষোল বছর গুরুর দরবারে পড়ে আছে, গুরু তাকে খুব করে খাটিয়ে নিতেন। কাজ করছে, গুরুর সেবা করে যাচ্ছে। গুরুমা ভালোবেসেই কাছে রাখতেন, সব শিষ্যদের তিনি সন্তানের মত দেখাশোনা করতেন। গুরু ও গুরুমা যেমন খাওয়া-দাওয়া করতেন শিষ্যরাও তাই খেত। মাঝে মাঝে শিষ্যরা কেউ প্রশ্ন করত। প্রশ্ন করলে গুরু তাকে আরও কাজে লাগিয়ে দিতেন। কদাচিৎ গুরু দু-চারটে কথা বলতেন। জেন মাস্টারদের নিয়ে খুব মজার মজার কাহিনী আছে, যদিও আমাদের পরম্পরা থেকেই কাহিনীগুলো গেছে। কেউ যদি গিয়ে জেন মাস্টারকে কিছু প্রশ্ন করে, তিনি উত্তর না দিয়ে বলবেন, 'তুমি চা খেয়েছ'? 'হ্যাঁ খেয়েছি' বা বলবে 'না খাইনি'। 'যাও চা খেয়ে এসো'। চা খেয়ে এসেছে? বলবেন, 'যাও চায়ের কাপটা ভালো করে ধুয়ে রেখে এসো'। উত্তর দিতে চাইছেন না। কারণ প্রশ্ন করার জন্য পাত্রতা তাই। তোমার প্রশ্ন করার পাত্রতা কি আছে? নেই। দ্বিতীয়, পাত্রতা হয়ে গেলেও উত্তর পাওয়ার পাত্রতা তোমার আছে কি? দুটোরই পাত্রতা থাকা চাই। শিষ্যের মধ্যে সেই পাত্রতা এসে গেছে, পাত্রতা এসে যাওয়ার পর শিষ্য গুরুর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করছেন, এই প্রশ্ন দিয়েই কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ড শুরু হয়।

প্রথম খণ্ড

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ,
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি,
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।।১/১।।

(এই মন কার ইচ্ছায় ও কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে নিজের বিষয়ে গিয়ে পতিত হয়? কার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে প্রথম (প্রধান) প্রাণ চলে? কার ইচ্ছানুসারে প্রাণীরা বাণী বলে? এবং কোন দেবতা চক্ষু ও শ্রোত্রকে প্রেরিত করে।)

কেনেষিতং, *ঈষিতং* শব্দের অর্থ ইচ্ছা, *কেনেষিতং* কাহার ইচ্ছা মাত্র। *পততি প্রেষিতং মনঃ*, এখানে ধাবিত না বলে বলছেন পততি, পততি মানে পতন হয়ে যাওয়া। কার পতন হয়? মনের। কোথায় পড়ে যায়? সবিষয়ে, সবিষয়ে এখানে উল্লেখ না থাকলেও যোগ করা আছে। *কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ*, মন কার ইচ্ছায় প্রেরিত হয়ে (স্ববিষয়ে) পতিত হয়? *কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ*, প্রথম প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ যে কাজ করছে বা চলছে কার ইচ্ছাতে চলছে? *কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি*, আর মুখ, ওষ্ঠদ্বয় আর বাণী কার ইচ্ছাতে চলে? *চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি*, চোখ, কান কোন দেবতার দ্বারা নিযুক্ত হয়?

খুবই সাধারণ প্রশ্ন, আমার মন, প্রাণ, বাণী, চোখ, কান কার ইচ্ছায় কাজ করে? কার ইচ্ছায় আর চলবে, আমার ইচ্ছাতেই চলে। এটাই আমাদের সহজ উত্তর। কিন্তু এই সহজ উত্তরের জন্য আচার্য শঙ্কর উপনিষদের উপর আগে এত বড় ভাষ্য-ভূমিকা দিতেন না, আর আমরা এর উপর এত দীর্ঘ আলোচনা করতাম না। কঠোপনিষদে যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের বর্ণনা আছে সেখানে অনেক ভাবে বর্ণনা করছেন। যেমন বলছেন *আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ*, ভেতরে বসে আছেন কিন্তু দূরে চলে যাচ্ছেন, শয়ন করে আছেন কিন্তু সমস্ত জায়গায় ব্যপ্ত হয়ে আছেন। আবার বলছেন *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ*, এই ভাবে বলে বলে শেষে গিয়ে বলছেন *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*। এক একটা জিনিসকে নিয়ে বলে যাচ্ছেন, এটা থেকে এটা শ্রেষ্ঠ, সেটা থেকে আবার এটা শ্রেষ্ঠ, যেমন এই বস্তুগুলো আছে এর থেকে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, কারণ ইন্দ্রিয় বস্তুকে মেপে নিতে পারে। ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি থেকে আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মার উপরে আর কিছু হয় না, তাই বলছেন *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*।

কিন্তু এই পুরো জিনিসটাকে গীতায় একটা শ্লোকে খুব সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।* গীতার এই শ্লোকটা মনে রাখলে কেনোপনিষদ বুঝতে আর কোন অসুবিধা হবে না। এই দেহের ভেতরে যিনি পরঃ, যিনি শ্রেষ্ঠতম, তিনিই সবার অন্তর্যামী। তিনি কি করেন? উপদ্রষ্টা, তিনি superviser, সব কিছুর সাক্ষী আর অনুমন্তা, অনুমোদন করেন। সাংখ্যের সিদ্ধান্তে প্রকৃতি সমস্ত ক্রিয়া করে, পুরুষ যিনি চৈতন্য, তিনি আছেন বলে বাকি সব কিছু হয়। সাংখ্যের এই সিদ্ধান্তকে ঠাকুর একটা গল্পের উপমা দিয়ে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, কাজের বাড়িতে বাড়ির গিন্নী সব দিকে দৌড়াদৌড়ি করে কাজ করে যায় আর কর্তা এক জায়গায় বসে ভুরুর ভুরুর করে তামাক খেতে থাকে, আর মাঝে মাঝে গিন্নী এসে খবরাখবর দিয়ে যাচ্ছে, কর্তা শুধু ঘাড়টি নেড়ে দেয়। আত্মা যখন দেহের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তাঁর উপস্থিতি মাত্রেই দেহের সমস্ত ক্রিয়া হয়। আমরা ঈশ্বর বলি, ব্রহ্ম বলি বা আত্মাই বলি, চৈতন্য সত্তা যিনি এই জগতের পেছনে আছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত কিছু চলছে। ইচ্ছা কেন? কারণ তিনি না থাকলে আর কিছু হবে না। আত্মার মূল হল তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা, তিনি সব কিছু লক্ষ্য রাখছেন আর সব কিছুর অনুমোদন করেন। পুরো কেনোপনিষদ এই অনুমন্তা শব্দকে নিয়েই চলেছেন। কেনোপনিষদে শিষ্য প্রশ্ন

করছেন, কার ইচ্ছায়। অনুমন্তা আর কার ইচ্ছায় একই কথা, অনুমন্তা হলেন সেই আত্মা, যিনি এই দেহের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে বিরাজমান।

এনারা অনেকগুলো যুক্তি ও দৃষ্টান্ত নিয়ে আসেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, আমি একটা বস্তুকে বা কাউকে কিভাবে দেখছি, বিজ্ঞান তখন বলবে, আলো বস্তুর উপর পড়ছে, সেই ফোটনগুলো বস্তুর উপর পড়ছে, বস্তুর ভেতর থেকে নতুন স্ফোটনগুলো বিভিন্ন তরঙ্গের মাত্রাতে ছিটকে আমার চোখে ঢুকছে, সহজ ভাষায় বস্তুতে আলো প্রতিফলিত হয়ে সেই আলো আমার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে। আমার চোখে প্রতিফলিত হওয়ার পর আমার অপ্টিক্যাল নার্ভসগুলো উত্তেজিত হয়ে যায়। এরপর যখন মস্তিষ্কে যায় তখন মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু জানা কিভাবে হচ্ছে, এর উত্তর আজও বিজ্ঞানের কাছে নেই। বেদান্ত বলবে, একটা প্রতিফলন এলো, একটা আওয়াজ এলো, কোন শব্দ কানের পর্দায় ধাক্কা দিতেই আমি জানলাম আমাকে কেউ ডাকছে। এই জানাটা কিভাবে হয়? অত্যন্ত আশ্চর্যের এখনও কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর নেই, মানুষ জানে কিভাবে? স্বামীজী উপমা নিচ্ছেন, মনকে যদি একটা জলাশয়ের মত মনে করা হয়, আর সেই জলাশয়ে যদি একটা পাথর ছুড়ে ফেলা হয়, তখন ওই পাথর জলের উপর গিয়ে একটা ধাক্কা মারল, এই ধাক্কাকে সামলাবার জন্য জলাশয়ে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঠিক সেই রকম ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন কিছু মস্তিষ্কে যাওয়ার পর মন তখন একটা reaction ছাড়ে, এই reactionটাই জ্ঞান। স্বামীজী জিনিসটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করছেন।

বেদান্ত কিন্তু এভাবে নিচ্ছেন না, বেদান্ত বলছে কান, চোখ এগুলো তো এক একটা অঙ্গ। চোখ কানের পেছনে মস্তিষ্কে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, মস্তিষ্কের ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রগুলো খুব সূক্ষ্ম। মস্তিষ্কের অপারেশন করে কোন কিছুই পাওয়া যাবে না। এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ দিয়েই আমাদের সূক্ষ্ম শরীর নির্মিত। মৃত্যুর সময় মন এই সূক্ষ্ম শরীরকে নিয়ে স্থূল শরীর থেকে বেরিয়ে আরেকটা শরীর ধারণ করে নেয়। এতসব কিছুর মধ্যে আত্মাই একমাত্র চৈতন্য। সেই চৈতন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে বেরিয়ে আসে, ইন্দ্রিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় আত্মার স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুকূল হয়ে যায়। চৈতন্য সত্তা ইন্দ্রিয়গুলির পেছনে থাকার জন্য ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির জন্ম এক সঙ্গে। যমজ ভাইরা যেমন এক অপরকে ভালোবাসে এরাও পরস্পরকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। চোখ অগ্নি তত্ত্ব থেকে নির্মিত আর দৃষ্টি বা আলো এটাও অগ্নিতত্ত্ব দ্বারা নির্মিত, যমজ ভাইয়ের মত এক অপরের দিকে দৌড়ায়, চোখ দৃষ্টির দিকে, আলোর দিকে দৌড়ায়। জিহ্বা অপ ধাতু থেকে নির্মিত, নাক পৃথিবী তত্ত্ব থেকে নির্মিত। ফলে যেমনি কোন জিনিসের গন্ধ আসে, ওই অনুভূতির তরঙ্গ চোখেও যাচ্ছে, কানেও যাচ্ছে, নাকেও আসছে, কিন্তু খ্যাঁচ করে নাক গন্ধকে ধরে নেয়, এ আমার যমজ ভাই। যার ফলে চোখ দিয়ে আমরা কোন দিন গন্ধ বুঝতে পারব না আর নাক দিয়ে কোন দিন সৌন্দর্যকে জানতে পারব না। ইন্দ্রিয়গুলো শুধু নিজের বস্তুর দিকে যেতে পারে, কারণ এদের প্রপার্টিটাই এই রকম, এরা পরস্পর যমজ ভাই। দৃশ্য যেখানে চোখ সেখানে ছুটে যাবে, কারণ দুটোই অগ্নিতত্ত্ব দিয়ে নির্মিত।

এত দূর না হয় বোঝা গেল, কিন্তু জানাটা কিভাবে হয়? বলছেন, চৈতন্য সত্তা থাকার জন্য এরা চৈতন্যবান হয়ে যায়, চৈতন্যবান হয়ে যাওয়ার পর এরা কার্যে প্রবৃত্ত হয়। যার জন্য দেখা যায়, মারা যাওয়ার পর মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মস্তিষ্ক সব কিছুই আছে কিন্তু কোন reaction হয় না। একটা কিছু এমন তত্ত্ব আছে, যেটা শরীরকে যদি ছেড়ে দেয়, স্বামীজী যে reactionএর কথা বলছেন সেই reaction আর হয় না, জ্ঞানও আর হয় না। বেদান্ত ঠিক ওই জায়গাটাকে ধরছেন। যদি ইন্দ্রিয়, মন এদের জানার ক্ষমতা থাকত তাহলে মানুষ মরে গেলেও ইন্দ্রিয়, মন জানতে পারত, এটা হল প্রথম। দ্বিতীয় এই ক্ষমতা যদি থাকত তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি এক অপরকে জেনে যেত, নাক চোখের ইন্দ্রিয়কে জানতে পার, চোখ নাকের ইন্দ্রিয়কে জানতে পারত। কিন্তু ওরা তা পারে না, ওরা পারে শুধু নিজের কাজটুকু করতে।

তার থেকেও বড় কথা, পাঁচখানা জিনিস কখনই fundamental হতে পারে না। আগে আমরা unifying principle নিয়ে বলেছিলাম, unify যেখানে হয় সেখানেই তত্ত্ব। কর্মেন্দ্রিয়কে নিলে দশটা ইন্দ্রিয় হয়ে যায়, কোথাও গিয়ে এদের সবাইকে unify হতে হবে। বলবেন যে, কেন মনে গিয়ে unify হয়ে যাচ্ছে।

গত একশ বছরে বিজ্ঞান যেভাবে বিস্তার করেছে, তাতে দেখা যায় বিজ্ঞানের সব শাখাই কোথায় যেন unify হয়ে যাচ্ছে। যেমন জেনেটিকস্ এসে গেছে, এখন বলছেন প্রজাতিতে কোন বিবর্তন হয় না, জিনের বিবর্তন হয়, জিনকে আবার একটা ফর্মুলা দিয়ে ব্যাখ্যা করছে। আরও আশ্চর্যে, এ্যাটমের ভেতরের পার্টিকেলস্ গুলো যে সিদ্ধান্তে চলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পর থেকে যা কিছু চলছে ওই একই সিদ্ধান্তে চলছে। বিজ্ঞানও বলছে, বৃহৎকে জানতে হলে অনুতে যাও। স্বামীজী বলছেন microcosom and macrocosom are built in same plan। স্বামীজীর এই থিয়োরী নতুন নয়, এই থিয়োরী আমাদের পরম্পরাতেই চলে এসেছে, যেখানে বলছেন *যৎ ব্রহ্মাণ্ডে তৎ পিণ্ডাণ্ডে*। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান না আসা পর্যন্ত আমরা এটা জানতাম না, যে নিয়মে গ্রহ, তারা, নক্ষত্র, ছায়াপথ, ধূমকেতু তৈরী, এই একই নিয়মে এ্যাটমের ভেতরটা তৈরী। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবন ওই একই সিদ্ধান্তে চলে না। শেষ পর্যন্ত কোথাও unifying জিনিসটা এসে যায়। উপনিষদ একই জিনিস করছে, ভক্তিশাস্ত্রও তাই করে, একত্রিকরণ। এই সব কিছু কোথা থেকে এলো? যখনই বলছি কোথা থেকে এলো, তখন বহু হতে পারে না, *নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন*, এখানে নানা হতে পারে না, কোথাও একটা উৎস আছে। Evolutionary Biologyর বিজ্ঞানীরাও বলছেন, There was one single lady, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মানুষ যে মহিলা থেকে এসেছে সে নাকি আফ্রিকার কোন মহিলা ছিল। এদের সব কথা বিশ্বাস করা না যেতে পারে কিন্তু এনারাও একটা উৎস দেখছেন, যেখান থেকে সব কিছু বেরিয়ে আসছে, ঐটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ঋষিরা জড়ের একত্বের অনুসন্ধানের দিকে কোন দিন যাননি, ওনারা চৈতন্যের দিকে চলে গেলেন। আমি বুঝতে পারছি, এই শরীরটা আমার, এর দশটি ইন্দ্রিয় আছে, মন রয়েছে। তাহলে তাদের unification কোথায়?

এখন যে জায়গাটায় unification হয় সেই জায়গার কথা শিষ্য হয়ত কোথাও শুনেছে বা তারও মনে হচ্ছে, আমি কোন জিনিসকে দেখতে ভালোবাসি, কোন জিনিসকে দেখতে ভালোবাসি না, তাহলে কিছু একটা ব্যাপার আছে, যে জায়গাতে গিয়ে ইয়েস নো এই ব্যাপারটা এসে যায়। ইয়েস নো ব্যাপারটা যদি এসে যায়, তার মানেই হল কোন একটা শক্তি আছে যে ওটাকে গিয়ে unify করছে। এই জিনিসটাকে নিয়েই এবার আমরা আলোচনা করছি।

এই যে এখানে কয়েকটি শব্দ বলা হল, মন, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, এগুলোকে আচার্য বলছেন, প্রবৃত্তি রূপ লিঙ্গ, লিঙ্গ মানে চিহ্ন, এদের প্রবৃত্তি হয়। কখন করে কখন করে না, চোখ কখন দেখে কখন দেখে না। আমি যখন কাউকে বলি, এদিকে তাকাও। সে আমার দিকে তাকালো, বা বলে দিল আমি তাকাবো না। আমার কথা মন দিয়ে শুনবে, যাকে বলা হল, সে বলতে পারে আমি শুনব না, বা হ্যাঁ শুনছি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ক্রিয়া হচ্ছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির কখন প্রবৃত্তি হচ্ছে, কখন নিবৃত্তি হচ্ছে। এই জায়গাতে খুব সূক্ষ্ম একটা যুক্তি আসে। যে জায়গাতে গিয়ে unification হবে সেটা steady হবে, ওর চাঞ্চল্য থাকবে না। এই যে কখন প্রেরিত হচ্ছে, আবার কখন প্রেরিত হচ্ছে না, তার মানে কিছু গোলমাল আছে। বেদান্ত ঠিক এই পয়েন্টে ধরে, এই তোমার ইচ্ছে করছে আবার এই ইচ্ছে করছে না, তুমি এই তাকাচ্ছ, এই তাকাবে না, এই খাবে আর এই খাবে না। যেখানেই প্রবৃত্তি আছে, তার মানে তার স্বাধীনতা নেই। আচার্য শঙ্কর পরে আরও বলবেন। আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, মনই রাজা। বিজ্ঞান বলছেন মনে গিয়ে সব unify করছে। কিন্তু তা কি করে হবে! ভালো ভালো, উচ্চমানের মানুষরাও ঠিক করে আমি ওরকমটি আর করব না, কিন্তু তাও করে।

আচার্য ঠিক এই জিনিসটাকে ধরবেন। যদি একটা জিনিস সে করতে চাইছে না তা সত্ত্বেও করছে, তার মানে তার স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আমি জীবনে উন্নতি করতে চাই, কিন্তু দাঁড়াতেই দিচ্ছে না। সে চাইছে, চেষ্টা করছে কিন্তু উন্নতি হতে দিচ্ছে না, তার মানেই ইচ্ছাশক্তি দুর্বল। তার পেছনে কিছু একটা শক্তি আছে যে মনকে নিজের মত চলতে দেয় না। তাই না, খারাপের দিকেও যদি যেতে চায় যেতে দেবে না। একটা spectrum বাঁধা, ওর ওদিকেও যেতে দেবে না, এদিকেও যেতে দেবে না। প্রবৃত্তি হওয়া মানেই তার স্বাধীনতা নেই। আমরা এই জগতেই দেখি যেখানে অচেতন জিনিসগুলো আছে, গাড়ি, মেশিন, এগুলোকে চালানোর জন্য চৈতন্য লাগে। আমাদের মনে রাখতে হবে এটা উপনিষদের প্রশ্ন, এটা কোন casual প্রশ্ন নয়। যে শিষ্য প্রশ্ন করছে, সে যে একেবারেই কিছু জানে না তা নয়, কিছু কিছু জিনিস জানে। চৈতন্য বা আত্মার ব্যাপারে কিছু শুনে থাকবে বা মনে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে। যাই হোক, আখ্যায়িকা রূপে, গুরু-শিষ্য সংবাদ রূপে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন। বাচ্চারা মাঝে মাঝে এমন এমন প্রশ্ন করে যে মা-বাবারা বকে দেন। আমাদের কে করেছে? শিব ঠাকুর করেছেন। শিব ঠাকুরকে কে করেছেন? শিব স্বয়ম্ভূ। স্বয়ম্ভূকে কে করেছে? এত প্রশ্ন করবে যে বিরক্ত করে ছাড়বে, বলতে বাধ্য হবে, এই চুপ কর। অথচ বিজ্ঞানে বলে প্রশ্ন করার মানসিকতা না থাকলে, বিজ্ঞান কোন দিন এগোতেই পারবে না। শিষ্যের মনেও একটা জিজ্ঞাসা এসেছে, আমার কান স্বাধীন, চোখ স্বাধীন, কিন্তু এতগুলো স্বাধীন জিনিস কি করে আসবে? কিছু তো একটা আছে যে এগুলোকে চালাচ্ছে।

কিন্তু আরও মজার যে, মনকে প্রথমেই এনে দিচ্ছেন, যাতে কেউ ডানদিক বামদিক না যেতে পারে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে তাহলে শিষ্যের মনে এই প্রশ্ন কি করে হতে পারে? আচার্য এই যুক্তিটা দেবেন। মানুষ ইচ্ছা করলেও তার ইচ্ছা পূরণ হয় না, তাতেই বোঝা যাচ্ছে মনের স্বাধীনতা নেই। আচার্য একটা শব্দ ব্যবহার করছেন, *অনুমাপক*, অনুমাপক মানে অনুমান করছে। যখন যে কোন জিনিসকে আমরা দেখি, একটা গাড়ি, একটা বাড়ি দেখি, আমরা জানি যে এটাকে ব্যবহার করার জন্য আরেকজন চৈতন্য কেউ আছে। ঠিক তেমনি চোখ, কান এগুলোকে কাজে লাগাবারা জন্য নিশ্চয় কেউ আছেন যাঁর চৈতন্য আছে। আমরা চেতনাকে সামান্য ভাবে জানি, কিন্তু চৈতন্যকে বিশেষ ভাবে জানাটাই উদ্দেশ্য। চেতনা আর চৈতন্যের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আমরা প্রথমের দিকে আলোচনা করেছিলাম। বিজ্ঞান যেটাকে consciousness বলে, সেটা কিন্তু চেতনা। একটা জিনিসের ব্যাপারে সচেতন হওয়া, awareness আর consciousness দুটো আলাদা জিনিস। চেতনা হল awareness আর consciousness হল শুদ্ধ চৈতন্য। বলছেন, আমরা সামান্য ভাবে জানি যে আমার শরীর কাজ করছে, আমি জীবন্ত মানুষ, আমার চেতনা কাজ করছে। কিন্তু বিশেষ ভাবে বিস্তারিত ভাবে গিয়ে ভেতরে গিয়ে জানা, এটা জানা নেই, এটাকে জানতে এসেছি। এবার বিশেষ ভাবে জানা হবে।

প্রথম শব্দ *কেনেষিতং*, কার ইচ্ছাতে। যখন কাউকে আদেশ করা হয় তুমি এটা কর, যেমন গুরু শিষ্যকে আদেশ করেন, রাজা কর্মচারীকে আদেশ দেন, এখানে বলে দিচ্ছেন উপনিষদ পড়তে গিয়ে এই ভুলটা যেন না হয়ে যায়। এখানে *কেনেষিতং*, *ঈশিতং*, ইচ্ছা, গুরু যেমন ইচ্ছা করেন, শিষ্যকে আদেশ করেন, এই ইচ্ছা সেভাবে নয়। এখানে *উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ*, অনুমন্তা শব্দটাকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, তা নাহলে কেনোপনিষদ বুঝতে পারা যাবে না। তিনি আছেন, তাই বাকি সব কিছু চলছে। তিনি না থাকলে কিছু হবেই না। ভাগবতে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টি হওয়ার পর ইন্দ্রিয়, বস্তু সব কিছুর সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলো কোন কাজ করতে পারছে না। ইন্দ্রিয়গুলো বস্তুর কাছে যেতেই পারছে না। তখন ইন্দ্রিয়রা ভগবানের কাছে গিয়ে বলছে, আমরা তো কাজ করতে পারছি না, আমরা আমাদের বিষয়কে জানতে পারছি না। তখন ভগবান একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে! এবার তিনি নিজেই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। তারপর থেকে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করতে সক্ষম হয়ে গেল।

চৈতন্য আছে বলে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করতে পারছে, তাই বলে মনে করো না যে ওখানে হাত-পাওয়ালা কেউ বসে আছেন, আর আদেশ করে যাচ্ছেন। তিনি শুধু আছেন, তাঁর থাকাতেই সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। কঠোপনিষদে বলছেন, *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*, তাঁর ভয়ে সবাই যে যার কাজ করে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয়রা একটু যে ডানদিক বামদিক করে দেবে, চোখ বলল আজকে আমি একটু বিশ্রাম করব তুমি আমার কাজটা করে নাও, তা হবে না, তোমার যে কাজ সেটাই তোমাকে করতে হবে, অন্য কেউ এসে তোমার কাজ করে দেবে না। ইন্দ্রিয়গুলি নিজের মত কাজ করে, আর আত্মা, যিনি চৈতন্য, তাঁর সাথে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। এরা সবাই নিজের মত চলে, কিন্তু তিনি আছেন বলেই চলছে, আর এক অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না।

প্রথম মন্ত্রের বক্তব্য খুব সহজ। এনারা জানতে চাইছেন ultimate source কি। এনাদের কাছে ultimate source হল যেখান থেকে সব কিছু বেরিয়েছে। আমাদের জীবন দর্শনও বিভিন্ন source থেকে আসে। বিজ্ঞানও একটা দর্শন, আর প্রত্যেক দর্শনের একটা practical application আছে। বিজ্ঞানের যে আজ পর্যন্ত যা কিছু প্রগতি হয়েছে, সেই প্রগতির পেছনেও দর্শন রয়েছে। দর্শনের কিছু কিছু সিদ্ধান্তকে নিয়েই তাঁরা এগিয়ে গেছেন। দর্শনের একটা ধারণা হল, যে জিনিসটা যেটাকে জন্ম দেয় সেটার সাথে সে এক। এই ধারণার উপর একজন কাজ করতে শুরু করলেন। তখন তার মনে হল, তাই তো, যে যেটাকে জন্ম দিয়েছে দুটো এক। যেমন হাত ঘষলে হাত গরম হয়, তার মানে motion heat produce করে, তাহলে motion আর heat এক, দুটোকে ইক্যুয়েশানে দেওয়া যায়। সেখান থেকে প্রথম unification আসে, যেটাকে Joules Law (J=Wh) বলে। দর্শন মূলত বেশি unification এর দিকে যায়, কিন্তু দর্শনের কিছু observations থেকে এলো নিটোরিয়ান মেকানিক্স, যেটা বিজ্ঞানকে বেশি প্রভাবিত করল, সেখানে কিন্তু subject আর object পুরো আলাদা।

এমনিতে খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্ম হল দ্বৈতবাদী ধর্ম, তাদের কাছে ঈশ্বর আর সংসার দুটো আলাদা সত্তা। দ্বৈতবাদ অনেক সমস্যা তৈরী করেছে। রেনে ডেকার্টস (Rene Descartes) নামে একজন ফরাসী দার্শনিক এসেছিলেন, পাশ্চাত্য দর্শনে যাঁর প্রচুর অবদান আছে। গ্রাফ জিনিসটা ডেকার্টসের অবদান, মানচিত্রের ব্যবহার ডেকার্টস থেকেই এসেছে, ওর নামই কার্ডিওগ্রাফি। উনি এক্স কোর্ডিনেট আর ওয়াই কোর্ডিনেট আনলেন, লম্বা দিকে যাচ্ছে সেটা এক্স আর উপরের দিকে যেটা যাচ্ছে সেটাকে ওয়াই বলে। এটাকেই বলে কার্টেশিয়ান ডিভাইড, এর সিদ্ধান্ত হল দুটো জিনিস সব সময় চিরদিনের জন্য আলাদা। এক্স একদিকে ওয়াই অন্য দিকে। বিজ্ঞানীদের সব সময় চেষ্টা হল এই কার্টিশিয়ান ডিভাইডকে কতটা কম করা যেতে পারে। যেমন বলা হল, মন আর বস্তু এই দুটো কার্টিশিয়ান ডিভাইড, মন আলাদা বস্তু আলাদা। মন চলে ওয়াই এক্সে আর বস্তু চলে গেল এক্স এক্সে। সেইজন্য মন আর পদার্থ কখনই এক হবে না। ঠিক তেমনি ঈশ্বর আর সংসার, এও কার্টিশিয়ান ডিভাইড। ডেকার্টস একাধারে কিছুটা দার্শনিক, অংশতঃ বৈজ্ঞানিক আবার অংশতঃ গাণিতজ্ঞ, সব মিলিয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগতকে এমন বিশ্রি ভাবে প্রভাবিত করেছে যে, আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের দর্শনে, ধর্মে প্রচুর সমস্যা থেকে গেছে। প্রায়ই আমরা শুনি লোকেদের প্রশ্ন করতে, বিজ্ঞান আর ধর্ম কি এক, ধর্ম কি যৌক্তিক হয়? এই চিন্তা-ভাবনা আর এর ফলশ্রুত সমস্যা এসেছে ডেকার্টের জন্য। নিউটনও যে পদার্থ বিজ্ঞান দিলেন তাতেও subject আর object আলাদা হয়ে যায়, আমি আলাদা তুমি আলাদা। বাইবেল থেকেই আসছে ভগবান আলাদা সৃষ্টি আলাদা। কিন্তু তার মধ্যেও বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছেন কিভাবে এগুলোকে unify করা যায়, কোথাও একটা basic থাকতে হবে, মূল যেখানে unify হবে। বেদান্তের কাছে ছিল issue of unifcation, অনেকবার এই নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আর পরেও অনেকবার আলোচনা হবে। দুটো শব্দ দিয়ে বললে জিনিসটা পরিষ্কার হয় যাবে।

বেদান্তের প্রথম যুক্তি আর এটাই বেদান্তের মূল, তা হল যেখানেই দুই সেটা কখনই মৌলিক হতে পারে না। দ্বিতীয়, যেটা একাধিক বস্তুর সংমিশ্রণে নির্মিত, সেটাও কখন মৌলিক হতে পারে না।

এই দুটোকে আধার করে বেদান্ত টানতে শুরু করে এমন জায়গায় চলে যাবে, যেখানে গিয়ে মানুষের সব ধারণা এলোমেলো হয়ে যাবে, কোন ধারণাই মিলতে চাইবে না। তখন বেদান্ত তৃতীয় আরেকটা শব্দ নিয়ে আসবেন, এই জিনিসগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম সেইজন্য ধারণা করা খুব কঠিন। একটু যাতে মানুষ ধারণা করতে পারে তাই ওনারা এদিকে থেকে সেদিক থেকে নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলবেন। প্রত্যেকটি উপনিষদ একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবেন। আচার্য শঙ্করও তাই বলবেন, এই তত্ত্বটা খুব কঠিন, সেইজন্য গুরু কৃপা করে শিষ্যকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি বলছেন? যেখানেই দুই সেটা মূল হতে পারে না, কোথাও একটা unification থাকতে হবে আর যে কোন মিশ্র পদার্থ, দুই না হলে কখনই মিশ্র হবে না, সেইজন্য সেটা কোন অবস্থাতেই মৌলিক হতে পারে না। তাহলে এই শরীর, শরীরের চোখ, কান, নাক কত কিছু আছে, তার মানে এটা মৌলিক হতে পারে না। এসব বলেই মাঝে মাঝে বলবেন, কিন্তু সাধারণ জনেরা যে জিনিসটাকে বেশি দেখে, বেশি অনুভব করে, দীর্ঘ দিন যে জিনিসের সঙ্গ করে, সেই জিনিসটাকেই সত্য বলে মনে করে। কারণ এমন ভাবে তার সাথে বড় হয়েছে সে আর কিছু দেখতে পায় না, একটা hypnotic spellএর মধ্যে চলে যায়। কলকাতাতেই যার জন্ম, কর্ম, বসবাস তার কাছে কলকাতার মত শহর দুনিয়ায় হয় না। কিন্তু কলকাতার বাইরে আরও কত ভালো ভালো শহর আছে জানার জন্য তাকে বাইরের দুনিয়ার অনেক শহর ঘুরতে হবে। এই hyponotic spellকে কাটাবার জন্য, সমস্ত উপনিষদ, বেদান্ত শাস্ত্র এই দুটো কথাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন, যেখানেই দুই সেটা কখন সত্য হতে পারে না, দ্বিতীয় যেটাই মিশ্র পদার্থ সেটা কখনই সত্য হতে পারে না, এ ছাড়া উপনিষদে বা বেদান্তে আর কিছু নেই। কেউ বলতে পারে সত্য হোক আর নাই হোক, এসবে আমার কিছু যায় আসে না, আমি ও আমার স্ত্রী বা স্বামী দুই কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে বা স্বামীকে ভালোবাসি। থাকো, কেউ আপত্তি করবে না। যখন তোমার চোখের জল বেরোবে তখন তোমাকে আমি দেখাব দুই কখন চরম সত্য হতে পারে না, চরম সত্যে যতক্ষণ তুমি না যেতে পারছ ততক্ষণ তোমার চোখের জল পড়া বন্ধ হবে না। পুরো বেদান্ত সাহিত্যের একটাই উদ্দেশ্য জীবনে শান্তি কিভাবে আসবে। জীবনে শান্তি পেতে গেলে মৌলিক জিনিসকে অর্থাৎ মূলকে ধরতে হবে। মূল মানেই সেখানে দুইয়ের কোন স্থান নেই, মিশ্রণের কোন স্থান নেই।

ঠিক আছে আমি মানছি যে আমার শরীরটা চোখ, কান, নাক, রক্ত, মজ্জা, মাংস বিভিন্ন জিনিসের মিশ্রণ, তাহলে চোখটা কি মৌলিক? কারণ চোখ তো এক। তাহলে এই প্রশ্নটা কেন উঠছে, চোখকে কে চালায়? এনারা তখন একটা খুব সহজ যুক্তি নিয়ে আসেন, এতগুলো ইন্দ্রিয় আছে, চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক, এদের পেছনে একটা কোন শক্তি আছে যে শক্তি সব কটা ইন্দ্রিয়কে চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধেও বলা যায়, ইন্দ্রিয়গুলো নিজের নিজের মত আছে, ইন্দ্রিয় রূপে চোখের নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রথমেই এখানে ধরবে, যেমনি তুমি পাঁচটি ইন্দ্রিয় দেখছ তাহলে কিন্তু কোন গোলমাল আছে। আচ্ছা ঠিক আছে সেটাও না হয় বাদ দেওয়া গেল, পাঁচটা ইন্দ্রিয় যখন তখন তারা কেউ মূল নয়। তাহলে মনই সব কিছু। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পুরোপুরি মনকে নিয়েই চলে। বেদান্ত বলবে, মনকেও নেওয়া যাবে না, কারণ মন যেমনটি চলতে চায় তেমনটি চলতে পারে না। তাহলে এমন কোন শক্তি আছে যে মনকেও চালাচ্ছে।

আচার্যও এই জায়গাতে একটা যুক্তি দিচ্ছেন, দেখা যায় যে মন নিজের ইচ্ছে মত সব কিছু করতে পারে না, তাতেই বোঝা যায় যে মন স্বাধীন নয়। যদিও আচার্য এখানে বোঝানর জন্য যুক্তির ব্যবহার করেছেন, আসলে এটা কিন্তু যুক্তি দিয়ে চলে না, এটা intensely practical। যোগে সাধনের কথা বলতে গিয়ে একটা বস্তুর উপর ধ্যান করার কথা বলছেন। ধ্যান ছাড়া কখনই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। শ্রীমা বলছেন জপাৎ সিদ্ধি, জপ করতে করতেও সিদ্ধি হয় বলছেন ঠিকই কিন্তু শুধু জপ দিয়ে সরাসরি সিদ্ধি হয় না। জপ করতে করতে মন নিজে থেকেই জপের মন্ত্রের যে অর্থ সেই অর্থে চলে যায়, সেই অর্থ থেকে অর্থের যে ভাবনা সেই ভাবনাকে আশ্রয় করে মন এক গভীর রাজ্যে চলে যায়, এইভাবে স্বাভাবিক ভাবেই ধ্যান হয়ে যায়। কিন্তু হাতে জপের মালা নিয়ে জপও করছে, ঝগড়াও

করছে আবার মাছের দরও করে যাচ্ছে, তাতে যদি কেউ মনে করে সিদ্ধি হয়ে যাবে, তাহলে আর কিছু বলার নেই, কিছুই হবে না। শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় ধ্যানের দ্বারাই হয়। গুরু যেভাবে ধ্যান করতে বলে দেন সবাইকে সেই ভাবেই ধ্যান করতে হয়। লক্ষ জপেও কিছু হবে না, যতক্ষণ না নিজেকে ধ্যানের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। পতঞ্জলি বলছেন, *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্*। ধ্যান কিভাবে হয়? তাঁর নাম যদি জপ করা হয় আর জপের অর্থের যদি ধ্যান করা হয়।

ধ্যান দুই প্রকার, নেতি নেতি ধ্যান আর ইতি ইতি ধ্যান। প্রথম ধ্যান বেদান্তীরা অর্থাৎ জ্ঞানমার্গিরা করেন, তাঁরা *অহং ব্রহ্মাস্মি*কে নিয়ে ধ্যান করেন, আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণ ব্রহ্মের বাইরে যা কিছু আছে, যেটাই আত্মা নয়, যেটা অনাত্মা সেটাকে ত্যাগ করে দেন। ইতি ইতি ধ্যানে একটা বস্তুকে নিয়ে ধ্যান করা হয়। সেই বস্তু যে কোন কিছুই হতে পারে, সূর্যোদয়ের ধ্যান, প্রস্ফুটিত পদ্মের ধ্যান বা বিরাট সমুদ্রের ধ্যান, যে কোন জিনিসের ধ্যান করা যেতে পারে। আর যার দীক্ষা হয়ে গেছে, গুরু যে ইষ্টকে দেখিয়ে দিয়েছেন, শিব, কালী, দূর্গা, কৃষ্ণ যে কোন রূপের ধ্যান করা যেতে পারে। যোগশাস্ত্রে ওনারা পুরো codify করে দিয়েছেন আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি কিভাবে হয়। ফুলের উপর কেউ ধ্যান করছে, ফুলের উপর ধ্যান করতে করতে ধ্যান এমন গভীর হয়ে যাবে সে ফুলকে বাস্তব দেখতে পারবে। দ্বিতীয় ধাপে যে ফুলের ধ্যান করছিল সেই ফুলের ধ্যান না করে, স্থান কালকে সরিয়ে দিয়ে ফুল জিনিসটার উপর ধ্যান করা হয়। ফুল জিনিসটা কি, ঈশ্বর যখন ভাবছেন ফুল জিনিসটা হোক, সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে হয়ে বিভিন্ন রকমের ফুল হয়ে গেল। ঈশ্বরের মনে যে ফুলের ধারণা, ওটাই দেশ কালের পারে। এর উপর যদি ধ্যান করে মন একাগ্র হয়ে যায় তখন ফুল জিনিসটার উপর তার কর্তৃত্ব এসে যাবে। এর পরের ধাপ হল ফুল যে যে তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী সেই সেই তন্মাত্রার উপর ধ্যান হয়। তন্মাত্রা অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ, আমাদের ভাষায় এ্যটম বলতে পারি। এই ধ্যানেও যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখন তার তন্মাত্রার মালিক হয়ে যাবে। যখন তন্মাত্রারও মালিক হয়ে গেল, সে এবার যেটাই চাইবে সেটাই হয়ে যাবে। এর পরের ধাপে তন্মাত্রাকে ছেড়ে দিয়ে, সব ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, যে সৃষ্টি দেশ কালের পারে তার উপর ধ্যান করে। এইভাবে একটা একটা করে ছেড়ে এগোতে থাকে তখন দেখে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা বিরাট মন। বাস্তবিকই দেখেন আর একজন দুজন দেখছেন না, সব যোগীরাই এভাবে দেখেন। এখানে এসে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত মন আছে সব মনের মালিক হয়ে যান। উনি যে মনকে জানতে চাইবেন সেই মনের সব কিছু জেনে নিতে পারবেন। এখান থেকে আরও এগিয়ে যাওয়ার পর যোগী সৃষ্টির পেছনে যে মূলা শক্তি সেই শক্তিকে জেনে যান, ঠাকুর যেমন মা কালীকে জেনে গেলেন। ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসাটা অসম্ভব হয়ে যায়। বেশির ভাগ যোগী পারেনও না আর ওনাদের দরকারও হয় না। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ বলছেন, এনারাই হলে প্রকৃতিলীন পুরুষ। প্রকৃতিলীন পুরুষ প্রকৃতির সাথে এক হয়ে গেছেন, এনারা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার যা ক্ষমতা এনাদেরও সেই ক্ষমতা হয়ে যায়, ইনি চাইলে নতুন কোন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু করেন না। কারণ ইচ্ছা জিনিসটাই তাঁদের ভেতর থেকে চলে যায়।

কিন্তু কেউ কেউ আছেন যিনি ওখানে পৌঁছেও সন্তুষ্ট হতে পারেন না, বা কোন কারণে তারও পারে চলে যান। তিনি যে ওই স্তরটাকেও ছেড়ে দেন তখন কি হয় কেউ জানে না। ওই জায়গাতে গিয়ে মূল একত্বটা হয়। কারণ যখন প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যান তখন তিনি বুঝতে পারেন সমস্ত সৃষ্টি এখান থেকে এসেছে। সমস্ত সৃষ্টি যদি এখান থেকেই এসে থাকে তাহলে এই প্রশ্ন কেন আসছে যে, এটাই কেন শেষ কথা নয়? ওই জায়গাতেও সন্দেহ থেকে যায় যে এটাই মূল একত্ব নয়, এখানে একত্ব হতে পারে না, কারণ আমি তুমি ভাবটা থেকে যায়, আমি ভক্ত তুমি ইষ্ট এই ভাব থাকে। যিনি এটাতে সন্তুষ্ট, মা আছেন আর আমি আছি, ঠাকুর যিনি আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুটি সত্তা, তিনি আর আমি, মা আর আমি আছি, এরপর আমার আর কিছু লাগবে না, দরকারও নেই।

কিন্তু বেদান্তিক শিক্ষা যদি হয়ে থাকে, তখন ওই আমি তুমির ভাবটাকেও ছেড়ে দেন। ওই দুই বোধকে যখন ছেড়ে দিল অর্থাৎ আমি আর তুমি, তুমিটা যখন ছেড়ে দিল তখন তুমি থাকে না, আমি থাকে না, যা থাকে তাই থাকে। ওটাকে দুই বলা যাবে না, এক বলা যাবে না, শূন্য বলা যাবে না, সেইজন্য ওটাকে বলে অদ্বৈত। অদ্বৈত মানে যেখানে দুই নেই। তাহলে কি এক আছে? এক মানেই তো দুই। ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, উপরে সূর্য আছে আর নীচে দশটি জলপূর্ণ পাত্র আছে তাতে সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। তাহলে মোট কটি সূর্য হল? উপরে আসল সূর্য আর নীচে দশটি প্রতিবিম্বিত সূর্য, মোট এগারোটি সূর্য। একটা পাত্রকে ভেঙে দেওয়া হল, কটি সূর্য থাকল? উপরে আসল সূর্য নীচে নয়টি প্রতিবিম্বিত সূর্য, মোট দশটি সূর্য। এই করে করে একটি পাত্র থাকল, এবার কটি সূর্য? উপরে আসল সূর্য নীচে একটি প্রতিবিম্বিত সূর্য মোট দুটি সূর্য। শেষ পাত্রটিও ভেঙে দেওয়া হল, এবার কটি সূর্য থাকল? তখন যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল সে বলল, একটি সূর্য। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বলছেন, না বাবা, যা আছে মুখে বলা যায় না, সেইজন্য ওটা এক নয়। অদ্বৈত মানে এটাই। যদি বলে দেন এক, তাহলে তিনি ইসলাম ধর্মে চলে গেলেন, কারণ ইসলাম ধর্ম একেশ্বরবাদ মানে। আমাদের হয় অদ্বৈত আর তা নাহলে সোজা দ্বৈত। আমাদের গণনা শূন্য দিয়ে শুরু হয় না, শূন্য দিয়ে শুরু হলে বৌদ্ধ হয়ে যাবে, এক দিয়ে শুরু হলে মুসলমান হয়ে যাবে, আমাদের গণনা দুই দিয়ে শুরু হয়। দুইয়ের আগে কি আছে মুখে বলা যাবে না।

যোগীরা ধ্যানে এটাকে বাস্তব দেখেন, এখানে কোন থিয়োরেটিক্যাল নেই একেবারে প্র্যাক্টিক্যাল। যাঁরাই সাধনা করেছেন, যে পথ দিয়ে সাধনা করেছেন সবাই একই জিনিস দেখেছেন, শুধু তাঁদের বর্ণনাগুলো আলাদা। ঠাকুর যেমন মা কালী দেখছেন, মহম্মদ দেখছেন আল্লা, যীশু দেখছেন গড্ কিন্তু দুই থাকবে না। ঋষিরা যাঁরা ষড়দর্শন দিয়েছেন তাঁদেরও একই রকমের ভাবনা। এনারা উপর থেকে শুরু করেন, উপরে পুরুষ, পুরুষ মানে সচ্চিদানন্দ। পুরুষকে আমরা বলি অদ্বৈত, বলি ঈশ্বরই আছেন, যেখানে আমি তুমি বোধ নেই। এখন কি কারণে হয় কেউ জানে না, কোন কারণে ওই পুরুষ বা সচ্চিদানন্দে একটা বিভাজন রেখা এসে যায়। এই বিভাজন রেখা কেন আসে, কিভাবে আসে কেউ জানে না। এই বিভাজন রেখাকে বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন নামে বলেন। সাংখ্য দর্শন এটাকে বলছে প্রকৃতি, বেদান্তীরা অবিদ্যা বলেন, তন্ত্র দর্শনে শক্তি বলছেন, খ্রীশ্চান ধর্মে God’s will বলে। যেমনি will এসে গেল, আমি এক আমি বহু হব, এক বহু হবেন, এটা সচ্চিদানন্দের ইচ্ছা, এই ইচ্ছাটাকেই এনারা বিভাজন রেখা বলেন। এনারা বলেন তুমি সাধনা করে করে এই লাইন পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে, কিন্তু লাইনের ওপারে কি আছে জানার কারুর উপায় নেই। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেলে, সমুদ্রে নামতেই সে গলে গেলে, তার আর খপর দেওয়া হল না। ওখানে আমিত্ব থাকে না। এবারা ওখান থেকে যখন ফেরত আসেন তখন এই ডিভাইডিং লাইন থেকে ধীরে ধীরে সৃষ্টির রচনা করেন।

ডিভাইডিং লাইনের এখানে কোন বস্তু নেই, কোন কিছুই নেই, মন পর্যন্ত নেই। শুধু তিনটে শুদ্ধ গুণ আছে, শুদ্ধ গুণ কি হয় আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না। আমরা যে লাল রঙ বলছি, গোলাপের লাল রঙ হয়, লাল রঙের শাড়ি হয়, কিন্তু শুদ্ধ লাল রঙ কি হতে পারে আমাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব না। ঠিক সেই রকম শুদ্ধ গুণও আমাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। তিনটে শুদ্ধ গুণকে ব্যাখ্যা করা যাবে না, যিনি বোঝার তিনি বুঝে নেবেন। এছাড়া কাউকে বোঝান যাবে না। প্লেটো, সক্রেটিস এনাদের গুণের উপর অনেক আলোচনা আছে। শুদ্ধ গুণ হল পুরোপুরি একটা মৌলিক জিনিস। এনারা বলেন এই ডিভাইডিং লাইনে তিনটে শুদ্ধ গুণ আছে, একটা হল রজস যে ক্রিয়া করছে, আরেকটা হল তমস যে রজসকে টেনে আটকে দিচ্ছে আর তৃতীয় হল সত্ত্ব, যে রজস ও তমস দুটোকে সাম্য অবস্থায় রাখছে। জগৎ মানেই এই তিনটে গুণের মিশ্রণ। তিনটে শুদ্ধ গুণ যেমনি এসে যায় এবার আমি তুমি এসে যাবে। সাধারণ অবস্থায় এই তিনটে গুণ $^1/_3$ করে সমান ভাবে সাম্য অবস্থায় থাকে। কোন কারণে

এই সাম্য অবস্থাটা বিগড়ে যায়, এটাই সাংখ্য, বেদান্ত ও যোগের মত। কেন এই সাম্য অবস্থা বিগড়ে যায়? ঈশ্বরের ইছা, তিনিই জানেন কেন বিগড়ে যায়। বিগড়ে গেল মানে, এবার সৃষ্টি শুরু।

সাম্য অবস্থা বিগড়ে যাওয়ার পর প্রথম যেটা আসে সেটা হল মহৎ। মহৎ মানে সমষ্টি মন। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তার সমষ্টি মন। সমষ্টি মন খুব শক্তিশালী, কারণ সমষ্টি মন তখন পুরুষের একেবারে কাছে আছে। কিন্তু আগে যে প্রকৃতি বলা হল, এই প্রকৃতি আসলে কি? প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। যাঁরা তন্ত্র বা শক্তি মতে চলেন তাঁদের মতে পুরুষ আর প্রকৃতি এক। সৃষ্টির সময় যখন হয় পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা হয়ে শিব আর শক্তি বা শিব আর কালী হয়ে যান। আমরা যেমন শ্রীমায়ের প্রণাম মন্ত্রে বলি *যথাগ্নের্দাহিকা শক্তি*। মা কেমন? অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি এক, তেমনি ঠাকুর ও মা অভেদ। অথচ জগতে যখন অবতীর্ণ হচ্ছেন তখন দুটো আলাদা শরীর নিয়ে আসছেন, কিন্তু দুজন এক। গীতায় ভগবান এই দুটোকে পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি বলছেন। পরা প্রকৃতি পুরুষকে বলছেন আর প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলছেন, কিন্তু দুটো এক। দুটো এক, কিন্তু যখন বলেন আমি আলাদা হব, সঙ্গে সঙ্গে আলাদা হয়ে যান। একটা তখন শুদ্ধ চৈতন্য রূপে দেখান, অন্যটাকে জড় রূপে দেখান। কিন্তু জড় এই জন্যই নয় কারণ সেখানে সত্ত্ব, রজ ও তম রয়েছে, জড় মানেই সক্রিয়। আর সাম্য অবস্থা বিগড়ে গেছে মানে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়া মানে ওটাকে আর জড় বলা যাবে না। কারণ ওই অবস্থায় যদি কেউ পৌঁছে যান তখন দেখবেন জিনিসটা নিজের মত চলছে। নিজের মত চলার জন্য প্রকৃতিকেও চৈতন্য বলেই মনে হয়। কিন্তু আসলে চৈতন্য নয়, কারণ দুটো চৈতন্য থাকতে পারে না।

মহৎ প্রকৃতি থেকে আরও স্থূল হয়ে গেল, ওর মধ্যে এখন মনের বোধ আসতে শুরু হল, কিন্তু তার মধ্যেও সত্ত্ব, রজ ও তম বিদ্যমান। মন যেমনি এসে গেলে ওর আমিত্বের ভাব এসে গেল। গভীর নিদ্রা থেকে ওঠার সময় প্রথম আসে চেতনা, তারপর এক এক করে প্রত্যেকটি অঙ্গের নড়াচড়া শুরু হয়। গভীর নিদ্রা থেকে জাগার পর আমি ভাবটা পরে আসে, চেতনাটা আগে আসে। মহৎও আগে আসে, আর এটাকে বলে অহঙ্কার। এই অহঙ্কার কিন্তু বাংলা বা হিন্দীর অহঙ্কার নয়, এই অহঙ্কার মানে এই যে সমষ্টি তার আমিত্বের ভাব। এগুলো থিয়োরী কিছু নয়, সাংখ্য বা যোগ বলছে বলে নয়, ধ্যানের গভীরে যখন যোগীরা যান তখন ঠিক এই পথ ধরেই ওনার উপরে যান। এক একটা ধাপে এক এক রকম অনুভূতি হবে। তখন গতি চলতে থাকে বলে অহঙ্কারের এবার খণ্ডিত হতে শুরু করে। তিনটে গুণ এক অপরের সাথে মিশছে, কিন্তু এক অপরকে দাবাতে থাকে। যতই এক অপরকে দাবাক না কেন, আলাদা কেউ থাকবে না, তিনটেই আগাগোড়া একসাথে থাকবে। জগতে যা কিছু আছে সবের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম মিশে আছে, কিন্তু অনুপাতে তারতম্য থাকবে।

অহঙ্কার থেকে আসে পাঁচটি সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্রা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ। এবার যেন একটু বোঝা যাচ্ছে। এগুলো হল অনুভূতি, যে গুণ গুলো ছিল সেখান থেকে এসে গেল অনুভূতি। এখানেও পুরো motionএ আছে, যার ফলে নানান রকম মিশ্রণ হতে থাকে। এবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের সমষ্টির যদি শুধু সত্ত্বটুকু নিয়ে নেওয়া হয়, সেই সত্ত্ব দিয়ে নির্মিত হয় মন। শুধু এর সমষ্টি রজ থেকে আসে প্রাণ। মন আর প্রাণ এসে গেল। সব কটা সত্ত্বগুণ দিয়ে মন নির্মিত বলে মন একসাথে পাঁচটাকেই ধরতে পারে। প্রাণও তাই, পাঁচটারই রজোগুণ তার আছে, তার ফলে সব জায়গায় প্রাণ প্রবেশ করে যেতে পারে। আর এর এক একটা থেকে যেমন শব্দের যে সত্ত্বগুণ সেই সত্ত্বগুণ থেকে হয় কর্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর শব্দের রজোগুণ থেকে হয়ে কর্ণের কর্মেন্দ্রিয়, তেমনি রূপের সত্ত্বগুণ থেকে চোখের জ্ঞানেন্দ্রিয় আর রজোগুণ থেকে চোখের কর্মেন্দ্রিয় তৈরী হয়।

পাঁচটি সূক্ষ্মভূত গুলো আবার নিজেদের মধ্যে মিশ্রণ হতে থাকে। মিশ্রণের একটা আলাদা পদ্ধতি আছে, নিজের অর্দ্ধেক আর বাকিদের আট ভাগের এক ভাগ নিয়ে তৈরী হয় পাঁচটি স্থূলভূত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের মিশ্রিত হওয়াকে বলে পঞ্চীকরণ। শব্দ

নিজের অর্ধেক আর বাকিগুলো থেকে আট ভাগের এক ভাগ নিয়ে জন্ম দিল আকাশ। তেমনি স্পর্শ নিজের অর্ধেক আর বাকিদের থেকে আট ভাগের এক ভাগ নিয়ে জন্ম নেয় বায়ু। ঠিক সেইভাবে রূপ থেকে অগ্নি, রস থেকে জল আর গন্ধ থেকে পৃথিবী স্থূলভূত গুলোর জন্ম। এবার পঞ্চভূত এসে গেছে, পঞ্চভূত থেকে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন তৈরী হয়ে গেল তার সাথে এসে গেল ইন্দ্রিয়ের বিষয় পঞ্চ স্থূলভূত। সৃষ্টি এবার পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। চোখ হল জ্ঞানেন্দ্রিয়, রূপের সত্ত্বগুণ দিয়ে নির্মিত। চোখের কাজ রূপকে ধরা, আবার রূপের অর্ধেক এবং বাকি চারটের আট ভাগের এক অংশ নিয়ে অগ্নি তত্ত্ব তৈরী, তাই যেখানেই আলো থাকবে চোখ স্বাভাবিক ভাবেই তাকে গিয়ে ধরবে। কারণ চোখ আর আলো দুটো একই জিনিস দিয়ে নির্মিত। একটা পুরোপুরি সত্ত্বগুণ দিয়ে তৈরী, আরেকটা নিজের অর্দ্ধ আর চারটের আট ভাগের এক ভাগ নিয়ে তৈরী। সেইজন্য চোখ সব সময় দৃশ্যের দিকে যাব, কান সব সময় শব্দের দিকে, জিহ্বা সব সময় রসের দিকে যাবে, ত্বক সব সময় স্পর্শের দিকে যাবে, নাক গন্ধের দিকে যাবে। কারণ এরা তৈরী একই জিনিস দিয়ে। শুধু ইন্দ্রিয়গুলো তৈরী হয়েছে সত্ত্বগুণ দিয়ে আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলো নির্মিত হয়ে সব কিছুর মিশ্রণে।

বিজ্ঞান বলবে, আপনি যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল, বায়ুর কথা বলছেন, আমরা তো জানি হাইড্রোজেন আছে, অক্সিজেন আছে আর কার্বন আছে। বিজ্ঞানের হাইড্রোজেন অক্সিজেন এই পাঁচটি তত্ত্বের মধ্যে কোন জায়গা পাওয়া দূরে থাক, এদের ইলেক্ট্রন প্রোটনও কোন জায়গা পায় না। আজ পর্যন্ত ফিজিক্স একশ বারো কি চোদ্দটা elementএর হিসাব দিতে পেরেছে, সেগুলো আবার ইলেক্ট্রন প্রোটন দিয়ে তৈরী। পৃথিবী বলতে এই পৃথিবীর কথা বলছেন না, এটা তত্ত্ব, তেমনি জল মানে এই জল নয়, জল একটা তত্ত্ব। ভূমি আর জল তত্ত্ব যখন মিশবে তখন বিভিন্ন রকম combination তৈরী হবে। কোনটা জল হয়ে যাবে কোনটা পেট্রল হয়ে যাবে। ওই combinationকে নিয়ে ঋষিরা আলোচনা করবেন না, তাঁরা ওই জায়গাটা ছেড়ে দেন। ঋষিরা সবই জানতেন, এ্যাটমসকেও খুব ভালো ভাবেই জানতেন। বৈশাষিক দর্শন দাঁড়িয়েই আছে অণুর উপর, ওনারা অণু পরমাণু নিয়েই চলেন।

ঋষিদের বক্তব্য হল সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার কাজ পদার্থ বিজ্ঞানের। আমার কাজ হল কিভাবে আত্মজ্ঞান পাওয়া যাবে, কিভাবে একত্বের অনুসন্ধান করতে হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে একশ খানা কি দুশো খানা element থাকুক তাতে ঋষিদের কিছু আসে যায় না। তোমার যত elementই থাকুক আমার যা কিছু জানার থাকে তাকে আমি জানব আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে। যদি কোন এমন element থাকে যাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, তাকে কেউ কোন দিন জানতে পারবে না। যেমন ইলেক্ট্রন প্রোটন, তাদের মধ্যে এই পাঁচটি প্রপার্টি নেই, তাই আমরা জানতেও পারছি না। ইলেক্ট্রন প্রোটন আছে কি নেই তাতে আমার তো কিছু আসে যায় না। বিজ্ঞানের কাছে আসে যায়, সেটা তারা বুঝবে। উদ্দেশ্য যদি হয় আত্মোপলব্ধি, উদ্দেশ্য যদি হয় আত্ম কল্যাণ, আমাকে তখন দেখতে হবে, এই যে জগৎ, এই জগৎ আমার ভেতরে কি করে ঢুকছে। আপনার একটা কেল্লা আছে, আপনি সেই কেল্লার রাজা, কেল্লায় কোথায় কোথায় ফোকর আছে, ওই ফোকর দিয়ে কোন কোন শত্রু কিভাবে আসছে, সেটাকে আপনি আটকাবেন। এই বিশ্বের কত সৈন্য আছে, কত কি আছে তাতে আপনার কি দরকার। প্রথমে দেখতে আমাকে কি কি সামলাতে হবে, আমার কেল্লাকে আমি কিভাবে রক্ষা করব। ওনারা বলছেন, জগতে যা কিছু আছে, যত কিছু আছে সব আমার কাছে আসছে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। ওই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর আমার যে কার্য হবে, তার থেকেও বেশি যে প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা হবে কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যেম। গুরুত্ব হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের, এর বাইরে আর কোন কিছুকে নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই। পিওর হাউড্রোজেনকে আমরা কোন কিছু দিয়ে অনুভব করতে পারব না, স্বাদ বিহীন, গন্ধ বিহীন, রঙ বিহীন, কিন্তু আছে। আবার ক্লোরিন গ্যাসের রঙ হলুদ হয়, দূর থেকেই বোঝা যায়, কিন্তু কোন গন্ধ নেই, খুব বিষাক্ত। ক্লোরিনের রঙ আছে, গন্ধ নেই আর বাতাস থেকে আড়াই গুণ বেশি ভারি। ল্যাবরটরিতে যদি ক্লোরিন গ্যাস লিক হয়ে যায়,

ফুসফুসে ওই গ্যাস ঢুকে তার ভেতরের সমস্ত বাতাসকে বার করে দিয়ে নিজে গিয়ে বসে যাবে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওখানে যারা থাকবে সবাই মারা যাবে।

এখানে এসে এনারা শুরু করেন। হাইড্রোজেন গ্যাসের এমনিত আমার কাছে কোন গুরুত্ব নেই, কারণ স্বাদ নেই, জিহ্বা দিয়ে বুঝতে পারবে না, নাক দিয়ে কোন গন্ধ পাবে না, রঙ নেই তাই চোখ দিয়ে জানা যাবে না, কান দিয়ে শুনতে পারব না। তাহলে কি হাইড্রোজেন গ্যাস নেই? হ্যাঁ আছে, একটা স্ফুলিঙ্গ পেলেই বুম্ করে জ্বলে উঠবে। আওয়াজ এসে গেল, আলো এসে গেল আর অক্সিজেনের সাথে মিশ্রণ হবে বলে জল তৈরী হয়ে যাবে। এবার আমি তার প্রপার্টি জেনে যাব। হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনের তফাৎ আনা হল এটা বোঝানর জন্য যে, যদি হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার দরকার আত্মজ্ঞান, আমি যদি ইন্দ্রিয় দিয়ে নাই জানতে পারি তাহলে এটার আমার কোন উপযোগিতাই নেই। আমার যা কিছু চলে সব কিছু শেষ পর্যন্ত চলে আমার মন দিয়ে। মন প্রতিক্রিয়া সেটারই করবে যেটা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতিতে পাবে, আর সেটাকে দিয়ে প্রতিক্রিয়া ছাড়বে। একটা ছেলে একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখল, রূপসী মেয়েকে দেখে সে উন্মত্ত হয়ে গেল, না চাইলেও তার পা তাকে টেনে মেয়েটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কেন? কারণ মেয়েটির যে চেহারা তার যে সৌন্দর্য রূপ হয়ে তার চোখ দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। মেয়েটির মিষ্টি মিষ্টি কথা কান দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। ঠাকুরের কথায় মেয়েটির গায়ে যদি বোটকা গন্ধ থাকে, সেই গন্ধ নাক দিয়ে ঢুকলে ছেলেটি ওখান থেকে ছিটকে আসবে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ছাড়ছে। তারপর দেখা যাচ্ছে মেয়েটি খুব বুদ্ধমতী, ভালো গান করে, কিন্তু গায়ে বোটকা গন্ধ। এরপর যে ছেলেটি তাকে দেখে উন্মত্ত হয়ে গেছে সে তার কাছে যাবে কি যাবে না? মেয়েটির হয়ত কোন অভিশাপ আছে, সাবান, পারফিউম, ডেওড্রেন দেওয়ার পরেও তার বোটকা গন্ধটা যাচ্ছে না। দেখা যাবে কদিন পর ছেলেটি মেয়েটিকে ছেড়ে দেবে। তার কারণ হল, ওর ইন্দ্রিয় দিয়ে বিভিন্ন ভাবে যা কিছু ভেতরে ইনপুট হচ্ছে তাতে impression তৈরী হচ্ছে কিন্তু ওর উপর যে কাজ হবে সেটা হবে কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে। কর্মেন্দ্রিয় মানে, মেয়েটি স্পর্শ করতে চাইবে, আলিঙ্গন করতে চাইবে কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটির শরীরের দুর্গন্ধ নাক দিয়ে ঢুকছে সেটা তাকে ঠেলে মেয়েটির কাছে থেকে সরিয়ে দেবে।

ওনাদের বক্তব্য হল, তোমার সৃষ্টি বিগ ব্যাঙ দিয়েই হোক, তোমার একশ খানা element থাকুক আর ষাট খানা মৌলিক পদার্থ থাকুক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। শেষ পর্যন্ত আমার যা কিছু জানার হবে আমি আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জানব আর যা কিছু করব সবই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দিয়েই করব। সেইজন্য আমি যেভাবে এগুলোকে ভেতরে নেব সেগুলো ছাড়া আমার কাছে আর কোন কিছুর গুরুত্ব নেই। আমার আধ্যাত্মিক অভিযান সেইজন্য এখান থেকে শুরু। এনারা যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করেন তা পুরোপুরি আমাকে নিয়ে, কেন্দ্র হলাম আমি। আমি কেন্দ্র, আমার গুরুত্ব বেশি, আমার মুক্তির গুরুত্ব বেশি। পুরো সৃষ্টি তত্ত্ব, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, হিন্দু দর্শন এই সিদ্ধান্তকে নিয়েই চলে। যখন আমি জেনে গেলাম যাবতীয় যা কিছু আছে সবই আমার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় important, এবার আমি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে ধ্যান শুরু করলাম। সেখান থেকে এবার এগোতে শুরু করলাম। পরের ধাপে জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে প্রথমে যাবে মনের উপর। সব কটার জন্ম তন্মাত্রা থেকে। এবার যে জিনিসটার উপর ধ্যান করছে, ওই জিনিসটাকে ছেড়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এগুলোর উপর ধ্যান হয়। যখন এই সূক্ষ্ম ভূতকেও জয় করে নিল তখন শুধু আমিত্বের উপর ধ্যান হয়। আমিত্বকেও জয় করার পর সমষ্টি মনের উপর ধ্যান করে। তখন দেখে এই জগতে তন্মাত্রাও নেই আর আমিত্বও নেই, মনও নেই, শুধু তিনিই আছেন, যিনি ওই সত্ত্ব, রজো আর তমোর আড়ালে আছেন, তাই তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। ঠাকুর বলছেন ছুঁই ছুঁই অবস্থা, কাঁচের লণ্ঠনের ভেতরে আলো জ্বলছে, সেই আলোর শিখাকে দেখা যাচ্ছে, সবই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু কাঁচের ব্যবধান আছে বলে ছোঁওয়া যাচ্ছে না। এখানে এই ব্যবধান হল প্রকৃতি। যদি কোন ভাবে ঐটাকে ছুঁয়ে দিতে পারে তখন কি থাকবে? এতক্ষণ সে মন দিয়ে ধ্যান করছিল। মন হল সত্ত্ব, রজো ও তমো। ধ্যানের গভীরে গিয়ে সে সত্ত্ব, রজো ও তমোকে ছুঁয়ে দিয়েছে, ওখানেই তখন সত্ত্ব,

রজো ও তমোর নাশ হয়ে গেল। সত্ত্ব, রজো ও তমোই যদি না থাকে তাহলে মন কোথা থেকে থাকবে! এটাকেই বলে মনোনাশ, কারণ সত্ত্ব, রজো ও তমোর এলাকাটাই নাশ হয়ে গেছে। তখন কি থাকবে, যিনি জানেন একমাত্র তিনিই জানবেন। আর যে জানতে পারে না, সে কোন দিন জানতে পারে না।

এখন শিষ্য প্রশ্ন করছে *কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ*, কোথাও তো একটা unification আসবে, এতগুলো তো থাকতে পারে না। আর কোথাও হয়ত আগে শুনেছে যে মনই সব কিছুকে পাঠায়, মনই সব কিছুর রাজা। যিনি আচার্য, তিনি এই তত্ত্বকে জানেন, এবার তিনি শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছেন। প্রশ্নের পেছনে আমরা যে লম্বা একটা আলোচনা করলাম, কারণ এর পেছনে লম্বা একটা দর্শন রয়েছে, দুম্ করে প্রশ্ন করা হয়নি আর দুম্ করে উত্তরও দেওয়া হচ্ছে না। এখানে শব্দটা হল *পততি*, ইন্দ্রিয় মন এরা পড়ে যায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, আলো, ধ্বণি, গন্ধ এগুলো আমাদের কাছে আসে। কিন্তু ঋষিদের বক্তব্য তা নয়। ভেতরে যিনি চৈতন্য আছেন, যাঁকে পুরুষ বা আত্মা বলা হচ্ছে, তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আর ফোকর গুলো, কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে এসে নিজের নিজের জিনিসকে ধরে নেন। আমাদের ভেতরের চৈতন্য সত্তা সর্বব্যাপী, কিন্তু আমার যে ব্যক্তিত্ব, তার মাঝখান দিয়ে এসে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে সেই রূপ খুঁজতে থাকে। যেমনি রূপ পেয়ে গেল, তার সাথে এক হয়ে গেল। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা চোখ আর কানের তুলনায় কম, সেইজন্য দূরের জিনিসের গন্ধ নিতে পারে না। জিহ্বার ক্ষমতা আরও কম আর স্পর্শ অর্থাৎ ত্বক নিজের জায়গা ছেড়ে একেবারেই যেতে পারে না। যার জন্য ত্বকের সাথে স্পর্শ না হওয়া পর্যন্ত জানতে পারবে না। বেদান্তের এটাই মত, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যখন চেতনা বেরিয়ে আসে তখন চেতনা এভাবেই কাজ করে।

এই যে বলা হয় চোখ বাইরে যাচ্ছে। আবার প্রশ্ন হবে যে চোখ কোথায় যায়? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চোখে আলো লাগল, নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কের কেন্দ্রে গেল, সেখানে গিয়ে জ্ঞান হয়ে গেল। বেদান্ত এটাকে মানবে না। বেদান্ত বলে, আলো এসে ধাক্কা মারছে ঠিকই, কিন্তু জ্ঞান কিভাবে হয়? ধাক্কা মারা আর জ্ঞান দুটো আলাদা। যেমনি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কিছু এসে মস্তিস্কে ধাক্কা মারে তখন মস্তিষ্ক একটা প্রতিক্রিয়া ছাড়ে। চলো দেখি কি ব্যাপার, কোথা থেকে এই আওয়াজটা আসছে? এবার তিনি চললেন। একই পথে তিনি যান যার জন্য আমরা এই সব কিছু মাপতে পারি, টিউব লাইট কত দূরে আছে, চেতনা গিয়ে তাকে ঘিরে নেয়। এটাই বেদান্তের মত। আমরা যখন বলি, আমি তারা দেখছি, মূলতঃ আমরা তারা দেখি না, দেখি তারার আলোকে। এখন তারা আছে কি নেই আমাদের জানা নেই, কিন্তু তারার আলোটা আছে। সত্যিকারের আমাদের চেতনা তারার আলোকেই ধরে। সেইজন্য বলছেন *পততি*, চক্ষু ইন্দ্রিয় চলছে, কর্ণেন্দ্রিয় চলছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় চলছে। এগুলো যে চলছে এরা কি নিজের ইচ্ছায় চলে? নাকি এদের কেউ চালায়? তাহলে কি মন চালায়? না, মন নিজেই স্বাধীন নয়।

দ্বিতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হল *ঈশিতং* আর *প্রেষিতং*। *প্রেষিতং* মানে পাঠান হয় আর *ঈশিতং* মানে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে আর পাঠায়। এই জায়গায় আচার্য বলছেন, সাবধান! এটাকে শাব্দিক অর্থে নিতে যেও না। গুরু যেমন শিষ্যকে আদেশ করেন, মা যেমন সন্তানকে বলে বাবা এটা কর, গুরু ইচ্ছা করলেন আর শিষ্যকে পাঠালেন, মায়ের ইচ্ছা হল সন্তানকে পাঠাল। এভাবে এখানে তা হয় না। আত্মা আছেন, তাতেই এই জিনিসগুলো আছে। কিন্তু যে শিষ্য প্রশ্ন করছে সে এখনও এত কিছু বোঝে না, সেইজন্য প্রশ্নটা ওই অর্থে করছেন। যখন এই জিনিসটাকে একটা কাব্যিক ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, তখনও কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে, এখানে আসলে আদেশ করা হচ্ছে না। যার জন্য আমরা আগে গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলাম, *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ*, তিনি আছেন বলেই ইন্দ্রিয়গুলো নিজের নিজের কাজ করছে। আর তিনি আছেন বলেই চোখ শুনতে যায় না আর কান দেখার কাজ করতে যাবে না। এমনিতেই তাদের এভাবে করা সম্ভব নয়, কারণ তাদের যেভাবে তৈরী করা হয়েছে, যেমন চক্ষু অগ্নির সত্ত্ব অংশ দিয়ে তৈরী, সেইজন্য চোখ কোন দিনই কানের কাজ করতে পারবে না। শ্রবণের জন্য আকাশ তত্ত্বের দরকার। চোখে আকাশ তত্ত্ব নেই, তাই চোখ কোন দিন

শোনার কাজ করতে পারবে না। আমরা মজা করে বলি, রাজা কর্ণেন পশ্যন্তি, রাজা কান দিয়ে দেখেন, এখানে একটা জিনিসকে স্পষ্ট করার জন্য এভাবে বলা হচ্ছে। রাজার যে গুপ্তচররা রয়েছে তাদের মাধ্যমে রাজা সব খবর শোনেন, তাতেই তার দেখার কাজ হয়ে যায়। শাব্দিক অর্থে জিনিসটা দাঁড়াবে না, কারণ কান কোন দিন চোখের কাজ করতে পারবে না, কারণ দেখার জন্য যে তত্ত্বের দরকার ওই তত্ত্বটাই কানে নেই। আচার্য আবার বলছেন, ইন্দ্রিয়ের স্বতঃ প্রবৃত্তি, নিজের ইচ্ছায় একমাত্র কাজ হল *বিষয় প্রকাশন্*। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় সমূহকে প্রকাশিত করে। প্রকাশিত করা মানে, আমাদের গোচরে নিয়ে আসে, আমাদের যে জ্ঞানের সীমা, সেই জায়গাতে নিয়ে আসে। ইন্দ্রিয়গুলি যদি না থাকত তাহলে আমরা বিষয়কে জানতে পারতাম না। ঠাকুরের মত মহাপুরুষরা পারবেন, কারণ ইন্দ্রিয় যে সূক্ষ্ম তন্মাত্রায় কাজ করছে, তিনি তারও বাবা, তাঁরা সেই মহৎকেও জয় করে আছেন, তাঁকে কিছু জানার জন্য ইন্দ্রিয়ের দরকার হবে না। তিনি সরাসরি জানতে পারবেন, কিন্তু আমাদের মত লোকেরা পারবে না, আমাদের জানার জন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতে হবে। এই জগতে যে কোন বস্তুর যদি রূপ, রস, গন্ধ না থাকে, আমরা সেটাকে কোন দিন জানতে পারব না। আমরা গাণিতিক ভাবে একটা ধারণা করে নিতে পারি বা তার কার্য দিয়ে জানতে পারি, সরাসরি আমরা কোন দিন জানতে পারব না। কারণ যে কোন বিষয়, যে কোন বস্তু যতক্ষণ না ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের সীমায় যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ ওটাকে জানতে পারব না, ইন্দ্রিয় না হলে কোন দিন জানা যাবে না।

হিন্দু শাস্ত্রে বা বেদান্তে যে সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনা করা হয় সেখানে তাঁরা বলে দেন, সৃষ্টি তত্ত্বকে জানার জন্য তোমাকে কয়েকটি মূল জিনিসকে জেনে নিতে হবে। তার মধ্যে প্রথম হল তিনি আছেন, তাঁকে তুমি ঈশ্বর বল, ব্রহ্ম বল, সচ্চিদানন্দ বল কিছু আসে যায় না, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে বলে। যেহেতু আমরা উপনিষদ অধ্যয়ন করছি তাই ব্রহ্ম বলে মানছি। ব্রহ্মই শেষ কথা, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। কিন্তু আমি যখন জগতকে দেখছি তখন কত কিছু দেখছি। কোথাও এমন কিছু হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য সেই এক এত কিছুতে পাল্টে যাচ্ছে। ব্রহ্মকে ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি কোন বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করি সৃষ্টি কিভাবে হল, তখন তিনি বলবেন, আমি ঠিক নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছি না, তবে জানি এনার্জি আছে। সেই এনার্জি এত ছোট্ট আকারে আর এতটাই জমাট হয়ে আছে যে, যেমন টর্চের আলো দিয়ে দেওয়ালের ওপারে কি আছে জানা যায় না, তেমনি আলো দিয়ে এনার্জিকে দেখা যাবে না। কোন কারণে ওই জমাট ছোট্ট এনার্জিটা ফেটে যায়। কেন ফাটে, কিভাবে ফাটে আজও এর উত্তর বিজ্ঞানের কাছে নেই। বিজ্ঞানই বলে আমাদের যত সিদ্ধান্ত সব ওই জায়গায় গিয়ে fail করে যায়। যে কোন পদার্থ বিজ্ঞানী বলবেন, শেষ কথা কি আমার কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর জানা নেই, তার মানে এই নয় যে ওটাই ব্রহ্ম। বিজ্ঞান বলছে, ওই জায়গাতে কি হয়, কিভাবে হয় আমাদের জানা নেই, কারণ ওখানে গিয়ে সমস্ত mathematical equations fail করে যায়।

যখন ফাটে তখন নানা রকম জিনিস হতে শুরু হয়ে যায়। আর সব কিছু এত দ্রুত হয় যে কল্পনাও করা যায় না, এক সেকেণ্ডকে যদি এক কোটি বিভাজন করা হয়, তার মধ্যেই অনেক কিছু হয়ে যায়। সেখান থেকে আমাদের হিসাবে যখন এক সেকেণ্ড হতে যাচ্ছে ততক্ষণে সেখানে অনেক ধরণের পরিবর্তন হতে শুরু হয়ে যায়। ওই এনার্জি গুলো ছোট ছোট পার্টিকেলসে হয়ে যায়, তারা নিজেরা পরিষ্কার থাকে না। সেখান থেকে যখন এক মিনিট হল, দু মিনিট হল, তিন মিনিটে কি কি হল এই নিয়ে ফিজিক্সের খুব নামকরা বই আছে First Three Minutes, পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যায়। কিছুই বোঝা যায় না কি বলতে চাইছেন। বক্তব্য হল, নিউট্রন, প্রোটন, ইলেক্ট্রন আর কিছু কিছু পার্টিকেলসের জন্ম হয়ে যায় যেখান থেকে খুব হাই এনার্জি পার্টিকেলস বা এ্যাটমস তৈরী হয়। সেখান থেকে তারা এক অপরের সাথে মিশতে থাকে, কারণ পেছনে এনার্জি আছে বলে মেশায়। যত মেশায় তত জটিল জটিল এ্যাটমস তৈরী হয়, এ্যাটমস গুলো আরও ভারী থেকে আরও ভারী হতে থাকে। বর্তমান কালে আমরা যে পৃথিবীকে দেখছি বা আমাদের চারিপার্শ্বে যে জিনিসগুলো দেখছি এর মধ্যে তিনটে জিনিস এসে যায়, এনার্জি এসে যায়, sub-atomic partilces এ্যাটমের ভেতরে যে

পার্টিকেলস থাকে তাকে sub-atomic particles বলে আর তৃতীয় এ্যটম যেটা complete হয়ে যায়, যেটাকে নিয়ে বিজ্ঞান experiment করতে পারে, যেমন ক্লোরিনের কথা আগে বলা হয়েছে। মোটামুটি এই তিনটে জিনিস নিয়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরী। জগৎ যেটা চলে তাতে এই তিনটে এক অপরকে ধাক্কা মারতে থাকে। এ্যটমগুলো এক অপরের সাথে মিশে কখন এ্যটমই থেকে যায় আবার কখন মলিক্যুল হয়ে যায়। ওই মলিক্যুলগুলো ধীরে ধীরে আরও বড় মলিক্যুল হয়, সেখান থেকে হতে হতে আরও যৌগিক জিনিস হতে শুরু হয়। এরপর বিজ্ঞান বলে, সেখানে কোথা থেকে একটা জীবন ঢুকে পড়ে। কোথা থেকে চেতনা আসে, জীবন আসে, বিজ্ঞানের কাছে এখনও কোন উত্তর নেই। প্রথম যখন জীবন এসে গেল তখন সেটা কোন ভাইরাস জাতীয় কিছু হবে, যেটা জড়ও নয় আবার প্রাণীও না। কোন অবস্থায় প্রাণীর মত মনে হবে আবার কখন কোন অবস্থায় জড়ের মত মনে হবে। সেখান থেকে তার বিবর্তন হতে শুরু হয়। এরপর ঠিক ঠিক এক কোষী প্রাণীর উদ্ভব হল। এখানেও ওটা কি কোন উদ্ভিদ নাকি প্রাণী ঠিক ভাবে জানা যায় না। এরপর সেখান থেকে কিছু উদ্ভিদের দিকে চলে যায়, কিছু প্রাণীর দিকে চলে যায়। সেখানেও এরা এক অপরের সাথে মিশতে থাকে, এই মেশাটা কখনই বন্ধ হয় না। এইভাবে চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে মানুষের সৃষ্টি হয়ে গেল। আমরা হলাম মলিক্যুলস, এ্যটমস দিয়ে তৈরী। এ্যটমস থাকলে সাব-এ্যটমিক পার্টিকেলস থাকবে। যেমন টিউবলাইট যখন জ্বলে তখন তার থেকে আমাদের গায়ে ক্রমাগত ফোটন মেরে যাচ্ছে, ফোটন হল সাব-এ্যটমিক পার্টিকেলস। লাইট জিনিসটাই সাব-এ্যটমিক পার্টিকেলস। ফোটন যখন আসছে তখন ওর মধ্যেও কিছু এনার্জি আছে, আমি যখন খাচ্ছি সেখানেও কিছু এনার্জি হচ্ছে, কথা বলছি আমি এনার্জি তৈরী করছি। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এনার্জির সমুদ্রে ভাসছে। তিনটে জিনিস, এনার্জি নিজে, সাব-এ্যটমিক পার্টিকেলস আর এ্যটম। এর মধ্যে কোথায় চেতনা আসে, জীবন আসে বিজ্ঞানের জানা নেই। বিজ্ঞান বলেই দেয় এটা আমাদের বিষয় নয়।

এগুলো সবই মূলতঃ এক একটা মডেল। মডেল মানে জগতকে ব্যাখ্যা করার একটা উপায়। মডেল আর থিয়োরীর মধ্যে তফাৎ হল থিয়োরীতে কোন experimental verification নেই, কিন্তু মডেল মানে কাজ করছে, থিয়োরী থেকে উঁচু। থিয়োরী মানে এখনও কাজ করা শুরু করেনি। আগামীকাল বিজ্ঞান যখন আরও এগিয়ে যাবে, ওরা তখন এই মডেলটাকে পাল্টে দেবে। নিউটনের সময় বিজ্ঞানীরা জানতেনই না যে এতটা ভাঙা যায়, তখন মডেল অন্য রকম ছিল। আইনস্টাইন আসার পর মডেল পাল্টে গেল। কোয়ন্টাম মেকানিক্স আসাতে আরও পাল্টে গেল। আগামী দিনে মডেল আরও পাল্টাবে। এইভাবে কোন একদিন বিজ্ঞান হয়ত জানতে পারবে চেতনার উৎস কোথায়, তখন মডেল আরও পাল্টে যাবে। চিন্তা ভাবনা করে, experiment করে, mathematics র সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞান যে মডেল পেয়েছে, সেটা দিয়ে এভাবে জগতের ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম আমার যে অস্তিত্ব, এই অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করে। এখানে উদ্দেশ্য জগতকে ব্যাখ্যা করা নয়, উদ্দেশ্য আমাকে নিজেকে জানা, যেটাতে আমার পরমার্থ সিদ্ধি হয়। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যা দেখেছেন, দেখার পর তাতে যে যুক্তি লাগিয়েছেন, তাই দিয়ে তাঁরাও একটা মডেল নিয়ে এসেছেন। তাঁদের মডেলটাই যে perfect হবে তা নয়। বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন মডেল আমরা দেখতে পাই। সবাই কিন্তু একটা মডেলকে নিয়েই চলেন না, তবে ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মে একটা মডেলই চলে। কি সেই মডেল? ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন, তিনি সৃষ্টি করলেন, এই সৃষ্টি করলেন, সেই সৃষ্টি করলেন; ব্যস্ এখানেই সব শেষ। হিন্দু ধর্মে এভাবে সৃষ্টি হয় না, তবে হিন্দু ধর্মে এত রকম মডেল আছে যে যার যেমন মডেল পছন্দ সে সেই মডেল এখানে পেয়ে যাবে। এবার আমরা সাংখ্য, বেদান্ত, যোগ এদের যে খুব পরিচিত মডেল, যে মডেল দিয়ে উপনিষদ বোঝা যায়, সেই মডেলের ব্যাখ্যাতে যাচ্ছি। এটাও একটা মডেল, এই মডেল্টাই ultimate truth নয়। কিন্তু আত্মানুভূতিকে মাথায় রেখে আমরা যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে ঋষিরা যেটা অনুভূতিতে দেখেছেন, আর তাকে যদি যুক্তিতে ফেলে দেওয়া হয়, তখন জিনিসটা এই রকমই দাঁড়ায়।

ঠাকুর শিব, মা কালীর দর্শন পেয়েছিলেন। তোতাপুরী এসে ঠাকুরকে অদ্বৈত জ্ঞান দিলেন, ঠাকুর তিন দিন সমাধিতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানে ঠাকুরের কি হয়েছিল, কি দেখেছেন আমাদের কাছে জানা নেই, তবে এর পরে পরে ঠাকুর যা কিছু বক্তব্য রাখছেন তাতে একটাই সার কথা বেরিয়ে আসে, তা হল, একমাত্র চৈতন্যই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। একমাত্র চৈতন্যই আছেন এটাকেই উপনিষদে ব্রহ্ম বলছেন। এই ব্রহ্ম বা চৈতন্যকে ঠাকুর অনুভব করেছেন, স্বামীজী অনুভব করেছেন, শঙ্করাচার্য অনুভব করেছেন, শত শত ঋষিরা অনুভব করেছেন। তাহলে বিজ্ঞান তার থিয়োরীতে যত যাই বলুক, এই জিনিসটাকে তো বাদ দেওয়া যাবে না। যদি আপনি ঠিক ঠিক বিজ্ঞানী হন, আপনার যদি ঠিক ঠিক বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে থাকে, তাহলে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে যদি একজনও জ্ঞাতা এসে যায়, যেটা তাঁর দেওয়া থিয়োরীতে ফিট করছে না, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে নিজের থিয়োরীকে modify করেন। তাহলে ঠাকুরের এই নির্বিকল্প সমাধি কোথায় যাবে? খুব সোজা উত্তর, ঠাকুরের মনের ভুল। স্বামীজীও যখন নরেন ছিলেন তখন তিনিও ঠাকুরকে বলছেন আপনার মনের ভুল। স্বামীজীর পরে যেটা হল সেটা কি হবে? মনের ভুল। তারও আগে শঙ্করাচার্যেরটা কি হবে? মনের ভুল। ভগবান বুদ্ধের যেটা হল? মনের ভুল। যীশুর যেটা হল? মনের ভুল। সারা বিশ্বের হাজার হাজার ঋষিদের সবারই মনের ভুল, একমাত্র তোমারই মন ঠিক! সেইজন্য ধর্ম অযৌক্তিক নয়, বিজ্ঞানই অযৌক্তিক। লোকেদের এগুলো বোঝার ক্ষমতা নেই। বিজ্ঞানই অযৌক্তিক, কারণ তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে ডাটা হিসাবে গ্রহণ করতে পারছে না, এটাই বাস্তব। জগতকে আমরা পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়েই নিচ্ছি, বিচার করেই নিচ্ছি। তাহলে ঠাকুর নির্বিকল্পের এত কথা বলছেন, স্বামীজী বলছেন, শঙ্করাচার্য বলছেন, এগুলোকে আমরা নেব না? শত শত ঋষিরা ওই অবস্থার বর্ণনা করছেন, মহম্মদও বলছেন একমাত্র আল্লাই আছেন, সবই ধাপ্পা? আর তুমি কাল দুটো অঙ্ক শিখে যেটা বলবে সেটাই সত্য? কার্ল মার্ক্স, ডারউইনকে কোট করলে সেটা সত্য আর ঠাকুরকে কোট করলে আমি অযৌক্তিক হয়ে যাব? এরা কিসের যুক্তিবাদী! ধর্ম কখনই অযৌক্তিক নয়, বিজ্ঞানই অযৌক্তিক। কারণ জ্ঞানের যে একটা বিরাট এলাকা সেটাকেই তারা গ্রহণ করতে পারছে না।

ঋষিরা বলছেন, যখন কোন কিছু থাকে না তখন তিনিই থাকেন, সমাধির অবস্থাতেও তিনিই থাকেন। ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধি থেকে নেমে আসার পর সেই আলাদা হয়ে গেলেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দির আলাদা, নরেন আলাদা। ব্রহ্মকে বলছেন undivided consciousness, এক দুইয়ের পার। অথচ সমাধি থেকে মন নেমে আসার পর জগতের বহুত্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। আর এই যে বহু, এর মধ্যে জন্ম আছে মৃত্যু আছে। তাহলে এগুলো এলো কোথা থেকে? এই প্রশ্নটা থেকেই যাবে। ব্রহ্ম এক দুইয়ের পারে অদ্বৈত, তাহলে সেখান থেকে দুই কোথা থেকে এলো? শুধু দুই না, বহু। আর যদি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস থাকে তাহলে দেবী, দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, দৈত্য সবাই চলে আসছে, কোথা থেকে এলো? এটাকে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এই জায়গাতে কিছুটা যুক্তি লাগাতে হয়, আর ধ্যানের গভীরে কিছু কিছু ঋষিরা চেষ্টা করছেন, তিনি যেভাবে একটা বস্তুর উপর ধ্যান করে ধীরে ধীরে উঠছেন, ঐটাকে ধরে আর কিছুটা যুক্তিকে ধরে আর যাঁদের পরমার্থ জ্ঞান হয়ে গেছে কিছুটা তাঁদের উপলব্ধিকে মিলিয়ে মিলিয়ে তাঁরা একটা মডেল দাঁড় করিয়েছেন।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম এর উপর আমরা দিব্যি খেতে পারি, আত্মাই আছেন এটার উপর দিব্যি খাওয়া যায়, ঠাকুর বলছেন মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আমি কিচ্ছু জানি না, এটার উপর দিব্যি খাওয়া যায়, কিন্তু আমরা যে সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি এর উপর দিব্যি খাওয়া যাবে না। এটাও একটা মডেল, কাল যদি আরেকজন একটা আরও ভালো মডেল নিয়ে আসে তখন এই মডেলটা সরে যাবে। কারণ এই মডেলে কয়েকটা জিনিস মিশে আছে, একটা হল ধ্যানে যেমন যেমন অনুভূতি হচ্ছে, উপনিষদে নির্বিকল্পের যে রকম বর্ণনা আছে সেটাকে বিবেচ্য রূপে নিয়েছেন আর যুক্তিকে নিয়েছেন।

অদ্বৈত থেকে যে দ্বৈতে আসছে, এর যে বিভাজন রেখা, এর অনেকগুলো নাম হয়। এর একটা নাম শক্তি, একটা নাম ঈশ্বরের ইচ্ছা, একটা নাম প্রকৃতি এই ধরণের অনেক রকম নাম আছে। যিনি যে দর্শনের তিনি সেই মত এর নামকরণ করেন। এই যে অদ্বৈত, এই অদ্বৈতকে এবার ম্যাজিকের মত কোটি কোটি রূপে দেখান। যিনি অদ্বৈত মায়ার দরুন তিনি এবার অনন্ত রূপে দেখায়। একটা আয়নার মধ্যে ছোট ছোট গ্লাশ আছে, সেখানে একটা মানুষ, আয়নার দরুন হাজারটা মূর্তি হয়ে যাচ্ছে। একটা আয়নাকে টুকরো টুকরো করে দিলে যত কটা টুকরো হবে তত কটা ইমেজ এসে যাবে। ফ্রীজে বরফের ট্রেতে এক বোতল জল দিলে যত কটা খাঁচ থাকবে তত কটা বরফের টুকরো হয়ে যাবে, এক বোতল জল থেকে কতগুলো বরফের টুকরো এসে গেল। বরফের টুকরো তাও সত্য কিন্তু এই যে বহু দেখাচ্ছে আসলে এগুলো সত্য নয়। এর কিছুটা উপমা নেওয়া যেতে পারে। আগেকার দিনে সিনেমার প্রজেক্টরের সামনে থাকত আলো আর তার সামনে এসে গেল একটা ছবি, ওই আলোটাই এখন নানা রকম ছবি রূপে দেখাচ্ছে। আর ওর রীল যখন চলতে শুরু করে তখন লোকজন, গাড়ি সব দৌড়াচ্ছে, অথচ কিছুই হচ্ছে না। এটাই মায়া, রীল শেষ হয়ে গেল, তখন শুদ্ধ আলো ছাড়া আর কিছু থাকে না। তখন প্রশ্ন হয়, এর কিছু তো প্রপার্টি আছে যার জন্য এই রকম দেখায়? এনারা বলেন হ্যাঁ আছে। সাধারণ অবস্থায় এটা ব্রহ্মের সাথে এক। অজ্ঞান, মায়া, প্রকৃতি আমরা যাই বলি না কেন আর একমাত্র সত্ত্ব, রজো আর তমো আছে, এছাড়া আর কিছু নেই। সত্ত্ব, রজো ও তমো এমন সাম্য অবস্থায় থাকে যে এদের কিছু বোঝা যায় না যে আদৌ কিছু আছে কিনা। ঠাকুর যেমন বলছেন, সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ আর হেললে দুললেও সাপ। এখন এতে কোন তির্যক গতি নেই, চুপ করে বসে আছে। ব্রহ্ম যখন বসে আছেন তখন জানার উপায় নেই মায়া আছে কি নেই, জানার উপায় নেই শক্তি আছে কি নেই। আগুন গরম কিনা কি করে জানা যাবে? স্পর্শ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ জানার কোন পথ নেই। স্পর্শ করলে জানা যাবে এটা আগুন। ব্রহ্মের মায়াও ঠিক তাই। মায়াকে ততক্ষণ জানা যাবে না যতক্ষণ মায়া ক্রিয়াশীল না হয়। আগুনে দাহিকা শক্তি সব সময়ই আছে, কিন্তু আমরা জানতে পারব না। সত্ত্ব, রজো ও তমো যখন সাম্য অবস্থায় থাকে তখন জানার কোন উপায় নেই যে প্রকৃতি আছে কি নেই।

সত্ত্ব, রজো ও তমোর সাম্য অবস্থা কেন ভেঙে যায় জানার কোন উপায় নেই। এতটুকু আমরা জানি যে প্রকৃতির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। বেদান্তের কাছে প্রকৃতি জড়, প্রকৃতি না বলে বলছেন মায়া, যার অস্তিত্ব নেই বা বলেন অজ্ঞান, যার কোন ক্ষমতাই নেই যে কিছু করতে পারবে। মূল কথা, ওই যে বিভাজন রেখার কথা বলা হল, ওর কিছু করার ক্ষমতা নেই। যিনি সচ্চিদানন্দ, যাঁর মধ্যে চিৎ, অর্থাৎ চিন্তা শক্তি আছে, তিনি যতক্ষণ না বলেন আমি এক আমি বহু হব ততক্ষণ কিছু হবে না। এই যে বহু হওয়ার ইচ্ছা, তিনি বহু হন না, দেখায় যেন বহু। ওই এক, যিনি বহু রূপে দেখাতে শুরু করলেন, এবার কিন্তু তাঁর আর চৈতন্যের শুদ্ধ রূপ থাকল না, একটা আবরণ এসে গেছে। এই আবরণকে বলছেন মহৎ, পুরো জিনিসটা এখন গতিতে এসে গেছে। মহৎ থেকে এল অহঙ্কার, আমি বোধ এসে গেল। অহঙ্কার থেকে পাঁচটি সূক্ষ্ম তন্মাত্রা এসে গেল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই তন্মাত্রা থেকে এবার দুটো ভাগ হয়ে যায়, একদিকে চলে যায় চেতন আর অন্য দিকে চলে যায় জড়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হল প্রপার্টি, এই দিয়ে জগৎ হবে না। এই প্রপার্টি গুলো যখন এক অপরের সাথে মেশে তখন আসে পঞ্চভূত, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। এই পাঁচটাকে আমরা এবার এ্যাটম হিসাবে ভাবতে পারি। পদার্থ বিজ্ঞানে বলে একশ দশটা এ্যাটম আছে। বেদান্ত মতে বলে, আমি আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা জানতে পারব তার বাইরে আমার জেনে কাজ নেই। ইন্দ্রিয়ের দিক দিয়ে আমাদের পাঁচটি এ্যাটম, এই পাঁচটির সৃষ্টি হতেই এরাও এক অপরের সাথে অতি দ্রুত মিশতে থাকে।

এই মেশামেশির ফলে আবার কিছু জিনিস তৈরী হয়। কোনটা প্রথম তৈরী হয় বলা মুশকিল। তবে আমাদের ভাষায় প্রথম তৈরী হয় স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। যেটা হাল্কা সেটা স্বর্গ, যেটা একটু ভারি সেটা মর্ত্য, যেটা আরও ভারী সেটা পাতাল। মূলতঃ তিনটি লোক তৈরী হয়। স্বর্গ আবার কিন্তু তিন নয়, স্বর্গ সাত – ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ ও সত্য, ধীরে ধীরে হাল্কা হয়ে হয়ে আরও হাল্কা হয়ে

যাচ্ছে। ঠিক তেমনি পাতালও ধীরে ধীরে ভারী হতে হতে সাতটা হয়ে যাচ্ছে, তল, বিতল, সুতল, অতল, তলাতল ও পাতাল এই করে সাতটা হয়ে যায়। এই ভাবে চোদ্দটি লোক হয়ে গেল, যাকে বলা হয় চতুর্দশ ভুবন। মর্ত্যলোককে আমরা পৃথিবী বা ভূঃ বলি।

একটা মতে বলে তিনটে লোক, ভূঃ, ভূবঃ ও স্বঃ। নীচে পৃথিবী উপরে স্বর্গ আর মাঝখানের জায়গাটাকে বলে ভূবঃ বা অন্তরীক্ষ। চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র সব ভূবঃ বা অন্তরীক্ষে অবস্থিত। কিন্তু এই জায়গাতে এসে অনেক ধরণের গোলমাল হতে শুরু হয়ে যায়। সেইজন্য এগুলোকে খুব আক্ষরিক ভাবে নেওয়া যায় না। সূর্য, চন্দ্র, তারা এগুলোকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে পাই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যদি হয় তাহলে সবটাই ভূঃ লোক হওয়ার কথা। এই জায়গাতে এসে আমাদের পৌরাণিক রচয়িতারা একেবারে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন। এমন তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন যে ওখান থেকে আমাদের বেরোবার কোন পথ নেই। সূর্যলোক, চন্দ্রলোক এগুলো আদপেই ভূবঃ নয়, কারণ যেটাই চোখ দিয়ে দেখা যাবে সেটাই ভূলোক। ভূবঃ লোককে আরও হাল্কা আরও সূক্ষ্ম হতে হবে।

আমাদের একটা প্রচলিত ধারণা হয়ে আছে যে, আমরা আছি, আমাদের মাথার উপর সূর্য চন্দ্র আছে, উপরে যেতে যেতে যেখানে তারা আছে তারও উপরে গেলে স্বর্গ, ওখানে ভগবান বসে আছেন। তাহলে পৃথিবী থেকে একটা রকেট নিয়ে যদি যাওয়া যায়, যেতে যেতে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, আলোর গতিবেগকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি। এভাবে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছাব? স্বর্গলোকে পৌঁছাব? আজ্ঞে না, যেখান থেকে শুরু করে ছিলাম সেখানেই পৌঁছাব। পৃথিবীতে যদি পূব দিকে যেতে থাকি ঘুরে ঘুরে সারা পৃথিবী ঘুরে নিজের জায়গাতেই ফিরে আসবে। স্পেসেও তাই হয়, কারণ স্পেস হল কার্ভ। আইনস্টাইন আসার আগে লোকেরা এটাই জানত যে কোন জিনিস স্পেসে চলতে থাকলে সে আর কোন দিন নিজের জায়গায় ফিরে আসবে না। কিন্তু আইনস্টাইন এসে ভুলটা ভেঙে দিলেন। সেইজন্য ভূবঃ স্বঃ এর ধারণা গোলমেলে। ঋষিরা যেটা বলতে চাইছেন তা হল, এগুলো হল সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিস, যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে কোন দিন জানা যাবে না। স্বর্গলোক হোক, বিষ্ণুলোক হোক আর রামকৃষ্ণলোকই হোক সবটাতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ থাকবে। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য আমাদের পুরাণাকাররা বলেন, ইন্দ্রলোকে সুন্দরী অপ্সররা সব সময় নৃত্য করছে। লোক যদি হয়ে থাকে সেখানে কামনা-বাসনা থাকবে, কামনা-বাসনা পূরণের জন্য এই পাঁচটাও থাকবে। আর ভূলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছু তৈরী হবে, হাইড্রোজেন এ্যাটম হোক, অক্সিজেন এ্যাটম হোক তারা এই পাঁচটা জিনিসকে বিভিন্ন অনুপাতে রাখতে বাধ্য। যদি না থাকে তখন এনারা বলবেন এগুলোকে আমাদের হিসাবে নেওয়ার কোন দরকার নেই। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যদি থাকে তবেই আমরা হিসাবে নেব। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধরণের বস্তু আছে আর প্রত্যেকটি বস্তুর এই পাঁচটি তন্মাত্রা থাকবে, এছাড়া আর কিছু নেই।

এতক্ষণ জড়ের সব কিছুর বর্ণনা চলছিল, এবার চেতন বা প্রাণের কথা বলছেন। চেতনের আবার দুটো প্রকার, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, যেমন জঙ্গল আর গাছ। একটি গাছ যা জঙ্গলও তাই, কিন্তু জঙ্গলটা সমষ্টি। যেমন এক ফোঁটা জল আর মহাসমুদ্রে কোন তফাৎ নেই, তেমন ব্যষ্টি ও সমষ্টিতেও কোন তফাৎ নেই। ব্যষ্টিতে যা হয় সমষ্টিতেও তাই হয়। প্রথমে সেই সচ্চিদানন্দ ছিলেন, তিনি ইচ্ছা করলেন আমি এক আমি বহু হব, তিনি হয়ে গেলেন বহু। যিনি এক তিনি বহু হয়ে যাওয়ার পর তাঁর দুটি প্রপার্টি এসে গেল, প্রথমটা তিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আর দ্বিতীয় তিনি অজ্ঞানে আবৃত। অজ্ঞান এসে যাওয়াতে সচ্চিদানন্দকে এখন বহু দেখাচ্ছে। ওই বহুর মধ্য থেকে যদি একটাকে তুলে নেওয়া হয় তখনও তার দুটো প্রপার্টি থাকবে, তাঁর ভেতরের প্রপার্টি হল শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, আর বাইরের প্রপার্টি হল অজ্ঞানাবৃত। এই অজ্ঞানাবৃত যিনি তাঁকে বলা হয় জীবাত্মা। আর সমষ্টিকে বিভিন্ন শাস্ত্রে কেউ বলে হিরণ্যগর্ভ, কেউ বলে ঈশ্বর। ঈশ্বরই সমষ্টি চৈতন্য, ঈশ্বরের আমি বোধ থাকতে হবে, আমি বোধ থাকা মানেই অজ্ঞান এসে গেছে। আমরা দিনরাত বলছি ঠাকুর কৃপা করবেন, ঠাকুর কৃপা করবেন মানেই ঠাকুরের ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপারটা এসে গেল, আমিত্ব এসেই যাবে। সেইজন্য জীব আর ঈশ্বর কোন দিন এক হবে

না। জীব ব্রহ্মের সাথে এক, ঈশ্বরের সাথে কখনই এক হবে না। আমি আর ঠাকুর কোন দিন এক হতে পারব না। যেমন এক বিন্দু জলও যা সমুদ্রও তাই, কিন্তু বিন্দু কোন দিন বলতে পারবে না আমি সমুদ্র আর সমুদ্রও বলবে না আমি জলের একটি বিন্দু। তফাৎ হল জীবের উপর অজ্ঞান চাপানো হয়ে গেছে কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছাতে আবরণটা নেন। তিনিও কিন্তু অজ্ঞানকে ছাড়তে পারবেন না। ঠাকুর বলছেন, অবতারও শক্তির অণ্ডারে। তিনি যদি আবরণ ছেড়ে দেন তাহলে সৃষ্টির নাশ হয়ে যাবে। ঈশ্বর মানে সমষ্টি অজ্ঞান ছেড়ে দেওয়া মানেই যত জীব আছে তারাও ছেড়ে দিল, জীব তো আর সমষ্টির বাইরে নয়। উনি কোন দিন আবরণকে ছাড়তে পারবেন না, সেইজন্য ওই জায়গাতে ঈশ্বরও বাঁধা। ঈশ্বরের কিন্তু কর্মের দিক দিয়ে বন্ধনে নেই, তিনি নিজের ইচ্ছায় এই বন্ধন চাপিয়ে নিয়েছেন। সেইজন্য কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারবে না, সৃষ্টি এতদিন চলবে, এতদিন আগে হয়েছে, এর আগে ছিল না। বলা যাবে না কারণ এগুলো মনের এলাকা, ঈশ্বরের মন হয় না, শুধু আমি বোধ।

শুদ্ধ আত্মার উপস্থিতিতেই প্রকৃতির খেলা চলছে। এর মধ্যে তন্মাত্রা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তন্মাত্রা একদিকে সমস্ত লোকের জন্ম দেয় আর অন্য দিকে ওই যে জীবাত্মা, যিনি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য, তার উপর একটা আবরণ দিয়ে দেয়। জীবাত্মার বাস্তবিক স্বরূপ হল শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, প্রথমে অজ্ঞানের দরুন তার আমিত্ব বোধ এসে গেল, যেটা হবার কথা নয়। এরপর তন্মাত্রা থেকে মন এসে গেল, মনেরও আবার দুটো রূপ বুদ্ধি আসবে। এক এক করে এবার প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় আর তন্মাত্রা নিজে এসে বসে গেল, জীবাত্মাকে পুরোপুরি অজ্ঞানে আবৃত করে দিল। জীবাত্মার কোন কারণই নেই যে অজ্ঞানের সাথে জড়াবে। কিন্তু জড়িয়ে গেছে, জড়ানো হয়ে গেছে, কিছু করার নেই। মন, বুদ্ধি আর তার সাথে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এই সতেরোটাকে মিলিয়ে বলা হয় জীব/সূক্ষ্ম শরীর। মানুষ মারা যাওয়ার সময় এই সব কটিকে নিয়ে জীবাত্মা বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে কোথায় যায়? ওই যে চৌদ্দটি লোকের কথা বলা হল, ওর মধ্যে কোন একটা জায়গায় সে থাকবে।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীরে থাকা অবস্থায় কিছু করতে পারবে না, তার জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, কর্মেন্দ্রিয় আছে, প্রাণ আছে, সবই আছে কিন্তু কিছু করতে পারবে না। আরও খারাপ যেটা তা হল, জীবাত্মা যে ভোগের জন্য স্থূল শরীর ধারণ করেছিল, সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে তার আর কোন ভোগ হবে না। হোটেলে খেতে গেলে আগে বলবে অর্ডার প্লেস করুন। অর্ডার প্লেস করার পর খাবারের আইটেম গুলো আসতে শুরু করবে। জীবাত্মাকেও অর্ডার প্লেস করতে হয়, পুরো একটা নিয়মে যেতে হয়। বাবার মাধ্যমে যখন মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে তখন সে হয়ে গেল জীব, এ কিন্তু জীবাত্মা নয়। জীবাত্মা হলেন যিনি শুধু অজ্ঞানে আবৃত, জীব হল প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন সব নিয়ে। জীবের সাথে আরেকটা reality থাকছে, জীবের সাথে থেকে যাচ্ছে চোদ্দটি লোক। চোদ্দটি লোক আলাদা সৃষ্টি হয়েছিল, আর জীব আলাদা সৃষ্টি হয়েছে। এবার জীব আর এই চোদ্দটি লোকের খেলা চলতে থাকবে। এটাই হল সংসার, জীব+চতুর্দশ ভুবন=সংসার। জীব অনন্ত, লোকও অনন্ত। চোদ্দটি লোক তো আমরা একটা ব্রহ্মাণ্ডে বলছি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত লোক হবে। তবে এগুলো সব এক একটা মডেল। এটুকু বলা যায়, আর ঠাকুরও বলছেন, ঈশ্বরের ইতি করা যায় না।

এবার জীব, জীব মানে যার সূক্ষ্ম শরীর আছে, সূক্ষ্ম শরীর মানে জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, কর্মেন্দ্রিয় আছে আর প্রাণ আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জীব স্পর্শ করে আর কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তার উপর সে কাজ করে আর প্রাণ সব কটাকে চালাচ্ছে তার সাথে মন ও বুদ্ধিও আছে। জীবাত্মা যেমন যেমন কর্ম করে সেই অনুসারে এবার সে কখন ইন্দ্রলোকে যাচ্ছে, কখন পৃথিবীতে যাচ্ছে, কখন পাতালে যাচ্ছে, কখন তির্যক যোনিত জন্ম নিচ্ছে, কখন উদ্ভিদ হয়ে জন্মাবে। যিনি শুদ্ধ আত্মা এখন কোথাও সাপ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোথাও শূয়োর হয়ে আবর্জনা খাচ্ছেন। তাতেই তাঁর আনন্দ, সমস্ত জগতের আবর্জনা ঘঁৎ ঘঁৎ করে খাচ্ছে আর আনন্দে গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা দিয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয় এই শরীর দিয়ে যেমনটি ভোগ করতে চাইবে মৃত্যুর পর ঠিক সেই উপযোগী শরীর পাবে, যাতে সেই শরীর দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলো তার মনের মত

জিনিস ভোগ করতে পারে। যার মাংস খাওয়ার খুব ইচ্ছে, মরে সে বাঘ সিংহ হবে, তখন খুব করে মাংস খাবে। কারণ মানব শরীরে দিয়ে সেই রকম মাংস খাওয়া যাবে না। এইভাবে জীব বিভিন্ন লোকে শরীর ধারণ করে। শরীরধারী জীবের দশটি ইন্দ্রিয় আর মন আছে। ইন্দ্রিয়গুলো তার বিষয়ের দিকে সব সময় ধাবিত হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন হল ইন্দ্রিয় যে বিষয়ের দিকে যায়, তাকে কে পাঠাচ্ছে? আমার চোখ কি দৃশ্যের দিকে নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছে, নাকি কেউ তাকে পাঠায়?

আমরা যে মডেলের কথা বললাম, বেদান্ত সৃষ্টিকে কিভাবে দেখে, প্রথম কথা এটা সবাই জানে না। যে শিষ্য গুরুর কাছে গেছে, সে এখনও জানে না। দ্বিতীয় কথা হল এই মডেল গুলো পরে পরে আরও বিবর্তিত হয়েছে। সব কিছু বিচার করলে দেখা যাবে এই প্রশ্ন হওয়াটা স্বাভাবিক, ইন্দ্রিয়গুলো কিভাবে বস্তুর দিকে যায়? এরা নিজেরা যায়, নাকি এর পেছনে অন্য কোন শক্তি আছে? এর আগে বলা হল মন চালাতে পারে না, কারণ মন নিজেই স্থির নয়, কখন যাচ্ছে, কখন যাচ্ছে না, তার মানেই মন স্বাধীন নয়। যিনি এর সব কিছুর পেছনে আছেন তিনি নির্বিকার। কিন্তু তিনি থাকা মাত্রই সব কিছু হয়। এখানে মন, প্রাণ, বাক্, চক্ষু ও কর্ণকে নিয়ে বলছেন, এরা কার ইচ্ছামাত্র প্রেরিত হয়। কিন্তু প্রাণ না বলে বায়ু হওয়া উচিত ছিল, কারণ নাসিকা দিয়ে আমরা বায়ু নিচ্ছি। কিন্তু প্রাণ বলাতে দোষ এই জন্য নেই কারণ প্রাণ সব কিছুর মূলে। এমনকি মন যে কাজ করে প্রাণ আছে বলেই করে। প্রাণ না থাকলে মানুষের মনও কাজ করবে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দিক থেকে যদি দেখা হয়, নাসিকা দিয়ে যে বায়ুর কার্য হয় এটাকেই প্রাণ দিয়ে বলছেন। গুরু এবার শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এই লোকে যারা বাস করছে, এই লৌকিক পুরুষদের যে নানান রকম ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়ার প্রেরণা কোন দেবতা করেন?

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।১/২।।

(*যিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, মনেরও মন আর বাণীরও বাণী, তিনিই প্রাণেরও প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু, এটাকে জেনে ধীর পুরুষ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে এই লোক ত্যাগ করার পর অমর হয়ে যান।*)

এর অর্থ খুব সহজ, যিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, মনেরও মন, বাণীরও বাণী, যিনি প্রাণেরও প্রাণ আর চক্ষুরও চক্ষু, তাঁকে জেনে ধীর পুরুষরা এই লোক থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব পেয়ে যান। *প্রেত্যাস্মাল্লোকা*, মানে মৃত্যুর পর তিনি অমর হয়ে যান, এর আগে যত লোকের কথা বলা হল, কোন লোকেই আর তাঁকে আসা যাওয়া করতে হয় না। তার মানে, যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাচ্ছেন তাঁকে জেনে গেলে আর তাঁকে এই জগতে ফেরত আসতে হয় না।

জীবাত্মা যেমনি মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় পেয়ে গেল, শুধু যে পেয়ে যাচ্ছে তা না, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, প্রাণাদির সাথে যোগাযোগ হওয়াতেই জীবাত্মা মনে করে, তুমিও যা আমিও তাই, তুমি আর আমি এক, এই বোধটা জীবাত্মার মধ্যে এসে যায়। প্রকৃতির পেছনে সচ্চিদানন্দ আছেন বলে সত্ত্ব, রজো আর তমো এক অপরকে জড়াচ্ছে, সেখান থেকে ইন্দ্রিয় হচ্ছে, প্রাণ হচ্ছে। তাহলে ইন্দ্রিয় জড়, মন জড়, কারণ তাদের জন্ম প্রকৃতি থেকে। সবটাই জড়, সচ্চিদানন্দ আছেন বলে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো আর তমোর সাম্য অবস্থা ভেঙে গেল। কিন্তু চৈতন্য যিনি, যাঁর উপর অজ্ঞান আবরণ এসে গেছে, তিনি স্বভাবতই চৈতন্য স্বরূপ। চৈতন্য যখন জড়কে বলে আমি আর তুমি এক, তখন এক অপরের ধর্ম পেয়ে যায়। যার ফলে চৈতন্যকে জড় বলে মনে হয় আর জড়কে চৈতন্য বলে মনে হয়। তখন জীবাত্মা নিজেকে মনে করে আমি সুখী, আমি দুখী। কিন্তু যিনি চিৎ, যিনি সৎ, যিনি আনন্দ স্বরূপ তাঁর আবার কিসের দুঃখ হবে! অথচ তাঁর মনের মধ্যে দোদুল্যমানতা এসে যায়। তাতো হওয়ার কথা নয়, তিনি তো অনন্ত, তিনি তো

সুখের নিধান, সুখের অনন্ত সাগর, তাঁর দুঃখ কিসের! কিন্তু জড়ের সাথে চৈতন্য নিজেকে এক করে নিয়েছেন। জড়ের সাথে চৈতন্যের এত গভীর ভালোবাসা হয়ে যায় যে, সে বলে তুমি যা বলবে আমি তাই করব, তোমার মনের মতই সব করব, আমার মনে বেদনা দিও না। ইন্দ্রিয় বলছে আমার নোংরা পচা খেতে ভালো লাগে। চৈতন্য বলে, ঠিক আছে আমি শূয়োর শরীর ধারণ করব। ঠাকুর মেছুনির কথা বলছেন, সে গেছে বন্ধুর বাড়ি যে আবার ফুল বেচে। ফুলের গন্ধে মেছুনির ঘুম হচ্ছে না, তখন সে আঁশ চুপড়ি এনে তাতে জল ছিটিয়ে মাছের আঁশটে গন্ধে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সবাই এক বংশের, সব প্রকৃতি থেকে জন্ম নিয়েছে, জীবের সাথে আত্মা জুড়ে গিয়ে যে জীবাত্মা হয়ে গেল এবার এরা যা যা বলবে আত্মাকে তাই তাই করে যেতে হবে, ওরা যেদিকে যাবে জীবাত্মাকে সেই দিকে যেতে হবে। আধ্যাত্মিকতায় যে যত পিছিয়ে তার তত বাজে অবস্থা। বৌদ্ধিক স্তরে সে বিরাট হতে পারে, বৌদ্ধিক দিয়ে উন্নত মানে তার মন, বুদ্ধি অনেক সক্রিয়, যে যত উন্নত সে তত প্রকৃতির এলাকায় ঢুকে আছে। কারণ মন, বুদ্ধি প্রকৃতির এলাকার। মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় যেখানে জীবাত্মাকে যত আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে সেখানে সে তত প্রকৃতির এলাকায় ঢুকে আছে। আর যাঁদের মনে হচ্ছে আমি এই মন, প্রাণ থেকে একটু আলাদা, এনারা এবার হলেন পুরুষের বা চৈতন্যের এলাকার। কেউ দেবতা হয়ে যেতে পারেন, তাই বলে তিনি যে আধ্যাত্মিক হয়ে যাবেন তা নয়। আবার যিনি অসুর, দৈত্য তিনি যে আধ্যাত্মিক হবেন না তাও না। প্রহ্লাদ দৈত্য বংশের ছিলেন। ভালো বংশে জন্ম নিলেই যে তার মধ্যে গুণ থাকবে আর নীচ বংশে জন্ম নিলেই যে তার মধ্যে দুর্গুণ থাকবে তা নয়, গুণ বা নির্গুণ হওয়াটা ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপার। জীব কোন পরিস্থিতিতে, কোথায়, কেন কোন শরীরে চলে যাবে আমাদের জানা নেই। এরপর দেখতে হবে, তার পূর্ব পূর্ব সংস্কার, তার যে সাধুসঙ্গ, গুরুজনের সঙ্গ, নানা ধরণের মানুষের সঙ্গ হওয়াতে তার চেতনাটা জাগে কিনা। কিসের দিকে চেতনা জাগার কথা বলা হচ্ছে? কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণের দিকে। প্রাণ নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করে। জীবাত্মার মধ্যে চেতনা জাগাবার জন্য একজন তৃতীয় ব্যক্তির দরকার, আমরা তাঁকে গুরু বলি। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ এরা সব একটা গ্রুপ, এরা দলবাজি করে। জীবাত্মা তাকে এমন ভালোবেসেছে ফলে জীবাত্মা এখন সংসারের মত ব্যবহার করে আর ইন্দ্রিয়গুলো চৈতন্যের মত ব্যবহার করে। ইন্দ্রিয়গুলো মনে করে আমরা স্বাধীন, আমাদের কে আবদ্ধ করবে! বাগেন্দ্রিয়টা তোমার স্বাধীন বুঝতে পারলাম, কিন্তু মন তোমার নিয়ন্ত্রণে আছে কি? তুমি স্বাধীন অবশ্যই কিন্তু আত্মা রূপে, অন্য সব দিকে তুমি বাঁধা।

গুরু তাই শিষ্যকে বলছেন, যিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, মনেরও মন, বাকেরও বাক্, প্রাণেরও প্রাণ আর চক্ষুরও চক্ষু। শুধু যে বলছেন তিনি কে তা নয়, ওই জিনিসটাকে তুমি জানতে পারবে। কোনও ভাবে যদি সে জেনে যায় আমি জীব নই আমি জীবাত্মা, সে এবার একটা সময় ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাবে। আর যদি সে জেনে যায় আমি শুদ্ধ আত্মা তখন সে ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যাবে। তুমিও যদি জেনে যাও *প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি*, আর তোমাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খেতে হবে না। কিন্তু যত দিন তুমি জীবাত্মা, তোমার মন ইন্দ্রিয় রয়েছে, তত দিন তুমি এই লোক থেকে সেই লোক জন্ম-মৃত্যুর চক্র দিয়ে ঘুরতে থাকবে।

বেদান্ত কিভাবে সৃষ্টি তত্ত্বকে দেখে এর উপর আগে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হল, বিজ্ঞান যেভাবে সৃষ্টির সব কিছুকে দেখে সেটা ঋষিদের যে অজানা ছিল তা না, ওনারাও জানতেন জিনিসগুলো সব আলাদা। ঋষিরা জানতেন সব কিছু অণু দিয়ে তৈরী। ওনাদের যে অণুর ধারণা আর গ্রীকদের যে এ্যটমিক ধারণা, যেটা পরে বিজ্ঞান নিয়েছে, এই দুটো ধারণার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। হিন্দুদের ষড়দর্শনের একটা নামকরা দর্শন বৈশাষিকরা কিভাবে অণু দিয়ে সব কিছু তৈরী হয় তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বেদান্তের একটা মূল হল, সৃষ্টিকে কোন দিন ব্যাখ্যা করা যাবে না, উদ্দেশ্য হল নিজের মুক্তি। নিজের মুক্তির জন্য আমার ভেতরে যেটা আসছে আর আমার ভেতর থেকে যেটা বাইরে বেরোচ্ছে, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা। জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জিনিসগুলো ভেতরে আসে, কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে জিনিসগুলো বাইরে যায়।

আচার্য শঙ্কর, এই উপনিষদে, অন্যান্য উপনিষদে এবং গীতাতে একটা খুব মৌলিক যুক্তিকে সব সময় ব্যবহার করেন। এই যুক্তিকে যদি কেউ মাথায় বসিয়ে নিতে পারে তাহলে তার পক্ষে যে কোন ধর্মের পুরো ধর্ম তত্ত্ব বোঝা খুব সহজ হয়ে যাবে। যুক্তিটা হল যৌগিক কখনই মৌলিক হতে পারে না, মৌলিক মানেই মৌলিক, মৌলিক কখনই যৌগিক হবে না। জল আর শরবৎ, জল মৌলিক আর শরবৎ যৌগিক বা মিশ্রিত। বিজ্ঞানের দিক থেকে জলও মৌলিক নয়, তার মধ্যে হাউড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশ্রিত আছে। সৃষ্টির উৎসকে কেউ যদি পেতে চায়, সেই এককে পেতে হবে, এক মানেই মূল, যেখান থেকে সব জিনিস বেরিয়ে আসছে। তাহলে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, কোথাও গিয়ে এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় মিলছে, পাঁচটা ইন্দ্রিয় তাই মূল হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বলতে পারে পাঁচটা ইন্দ্রিয় মনে গিয়ে মিলছে। আমরা মানতে রাজি আছে, কিন্তু দেখা যায় যে মন কখন ভালো থাকে, কখন মন খারাপ থাকে, ভাবছে এক রকম করছে আরেক রকম, চেষ্টা করেও অনেক কিছু করে উঠতে পারে না। তাহলে মনও মৌলিক হতে পারে না, যদি মৌলিক হত তাহলে মনের এই রকম দোদুল্যমানতা হত না।

আচার্যের এই যুক্তিকে আধার করে এবার প্রশ্ন করা হল, হে আচার্য! তাহলে চোখকে কোন দেবতা প্রেরিত করে, কানকে কোন দেবতা প্রেরিত করে? এর উপর আমরা আগে আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা যখন অমুক দেবতা বলি তখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পাঁচজন দেবতা হয়ে যায়, তাহলে তো এক হচ্ছে না। বেদের মন্ত্রে বলছেন *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*, বহুধা যখন বলছেন, বিভিন্ন দেবতার নাম নেওয়া হচ্ছে, সৎ বলতে অর্থাৎ ঠিক ঠিক ঈশ্বর বলতে যেটা বোঝায়, সেটাকে এক হতে হবে। কিন্তু এখানে তাও না, যদি কোন দেবতা থাকেন তাহলে কোন দেবতা চালাচ্ছেন? বিজ্ঞানের দিকে থেকে সাধারণ বুদ্ধিতে এর উত্তর খুব সহজ, মন। আর যদি আমরা অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখি এর উত্তর হবে আত্মা বা চৈতন্য। কিন্তু এখানে আচার্য কয়েকটা প্রশ্ন নিজেই তুলছেন, এর একটা বিশেষ নাম হল পূর্বপক্ষ। বলছেন *শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং*, কানেরও যিনি কান, এটা কি ধরণের উত্তর হল! আপনি বলুন, অমুক দেবতা যাঁর এই এই গুণ, তিনি প্রেরিত করেন, সেটা না বলে উত্তর দিচ্ছেন কানেরও যিনি কান।

প্রশ্ন আর প্রশ্নের উত্তর দেখে উপরে উপরে মনে হবে ব্যাপারটা কি রকম বোকা বোকা। কিন্তু কি মারাত্মক সূক্ষ্ম স্তরে যে জিনিসগুলো চলে, যখন পুরো উপনিষদ পড়া হয়ে যাবে তখন মনে হবে, আরে তাই তো এটা ওই জায়গায় আলোচনা করা হয়েছিল। আর এখানে যে শুধু শিষ্যের আপত্তি তা তো নয়, আপত্তি আসছে পূর্বপক্ষ থেকে। প্রশ্নটা ছিল *কেনেষিতং*, কার ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গুলো চলে, আর তার উত্তর হল যিনি কানেরও কান, চক্ষুরও চক্ষু, এটা কি ধরণের উত্তর হল। যদি বলা হয়, অমুক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই রকম কেন করলেন, তখন সে বলল মুখ্যমন্ত্রীরও যিনি মুখ্যমন্ত্রী, মানে প্রধানমন্ত্রী। এখানে বলছেন কর্ণেন্দ্রিয়কে কে চালায়, বলছেন যিনি কর্ণেন্দ্রিয়েরও কর্ণ, এটা কি ধরণের উত্তর হল! যদি বলে দিতেন অমুক দেবতা আছে তাঁর এই এই গুণ তিনি কর্ণেন্দ্রিয়কে পাঠান, উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে যেত। আমরা যখন বলি ঠাকুর আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন, উত্তর খুব স্পষ্ট। ঠাকুর বেলুড় মঠে বা উপরে কোথাও বসে আছেন তিনি সেখান থেকে আমাকে রোবটের মত চালাচ্ছেন, খুব সহজ উত্তর হয়ে যাবে। তিনি করিয়ে নিলেন। কি করে করিয়ে নিলেন? কেন, তাঁর হাত, পা, চোখ সর্বত্র, তিনিই করিয়ে নেন। কত সহজ উত্তর। আপনিও উত্তর বলে দিন, এদেরকে ভগবান প্রেরিত করেন। কিন্তু উপনিষদের ঋষি এই ধরণের উত্তর না দিয়ে বলছেন, যিনি কানেরও কান।

এর সূক্ষ্ম ব্যাপারটা একদিকে না বোঝাটা কিছু নয়, তেমনি অন্য দিকে ধারণা করা খুব কঠিন। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটাও নড়ে না। ঠাকুরের এই কথাকে আমরা আমাদের মত ধারণা করে নিই। তিনি উপরে কোথাও বসে আছেন, তিনি ইচ্ছা করলেন আর গাছের পাতা নড়তে শুরু করল। একজন দেবতা বা ঈশ্বর বলে দিলে তাঁর গুণেরও বর্ণনা হয়ে যাচ্ছে, তাঁকে আমরা *সহস্রশীরসা* রূপেই নিই বা *সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং* নিই, তাঁর হাজারটা চোখ, হাজারটা মাথা,

হাজারটা চোখ, কান, এগুলো ব্যাখ্যা করে দিলে লোকেরা একবার বুঝে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু উপনিষদ বলছে, তিনি কানেরও কান।

আচার্য তখন বলছেন, *নৈষ দোষঃ*, এতে দোষের কিছু নেই। এখানে এসে ভক্তিশাস্ত্র, তন্ত্র, লোকায়িত ধর্ম থেকে উপনিষদ আলাদা হয়ে যায়। আচার্য বলছেন, এই কারণেই দোষের কিছু নেই, ইন্দ্রিয়গুলির যিনি প্রেরক, তাঁর যে কোন বিশেষ রূপ থাকবে, তাঁর যে কোন বিশেষ গুণ থাকবে এই রকমটি কোথাও দেখা যায়নি, জানা যায়নি, সেইজন্য তাঁকে কোন বিশেষ রূপে জানা যায় না। আর আত্মার যখন গুণের কথা বলা হয় তখন তাঁকে নির্গুণ নিরাকার রূপেই বলা হয়। আত্মাকে কোথাও সগুণ সাকার বলছেন না। তিনি যদি নির্গুণ নিরাকার হন তাহলে আমরা কি করে বলব যে ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্গুণ নিরাকার চালাচ্ছেন! তাহলে বলতে হয় কিছু নেই। কিছু নেই তাও বলা যাবে না, কারণ তাহলে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করত না। তাহলে কিছু একটা আছে। তাই এই উত্তর সম্পূর্ণ ঠিক উত্তর।

মহাভারতে আছে, ধৃতরাষ্ট্র সনক সুজাতীয় ঋষিকে প্রশ্ন করে বলছেন, আপনি বলেন মৃত্যু বলে কিছু নেই, অজাতবাদ নিয়ে বলেন। ঋষি তখন উত্তর দিচ্ছেন, মৃত্যু বলে তো কিছু নেই, মৃত্যুর রূপ আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি, যার রূপ দেখাই যায়নি তার রূপ আমি গ্রহণ করব কি করে। কিন্তু ঋষি সেখান থেকে ধীরে ধীরে অন্য একটা দর্শনের দিকে চলে যাচ্ছেন, যেখান থেকে অজাতবাদের মত তত্ত্ব, সৃষ্টিই আদপে হয়নি সেই দিকে নিয়ে গেছেন। মজা করে আমরাও বলতে পারি ভগবানকেও তো দেখা যায় না, তাহলে ভগবানও নেই। যদি দেখা যেত একটা কিছু চালানোর পেছনে অন্য কোন যন্ত্র আছে, তাহলে ঋষির উত্তরটা ভুল হত। কিন্তু সেতো দেখা যায়নি। যেমন, একটা হেলিকপ্টার চলছে। আমার জিজ্ঞাস্য হল, জিনিসটা চলে কি করে। একজন খুব বুদ্ধিমান লোক খুলে দেখল ভেতরে ইঞ্জিন আছে, আমিও দেখছি এভাবে ঘোরালে এই হবে, সেভাবে ঘোরালে ওটা হবে ইত্যাদি। তার মানে হেলিকপ্টারের মধ্যে যে ইঞ্জিন আছে সেটা দিয়ে সব কিছু চলে। কিন্তু এখানে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই যে এত ঋষি মহাত্মারা কখন দেখেননি যে ভগবান আমাদের ভেতরে ঢুকে হাত পা নাড়াচ্ছেন। সেইজন্য উত্তরটা যদি indirectly দেওয়া হয় তাতে দোষের কিছু নেই। আচার্য বলছেন, এই শ্রোত্রাদির যিনি নিযুক্তা তাঁকে যদি দেখা যেত তাহলে এই রকম উত্তর দেওয়াটা ঠিক হত না।

এখানে আচার্য উপমা দিচ্ছেন, ঘাস যখন কাটা হয় তখন যে কাটছে তার হাতে কাস্তে থাকে, তখন তিনটে জিনিস এসে যাচ্ছে, একজন ঘাস কাটছে, ঘাস আর কাস্তে, তখন এই প্রশ্নটা করা যায়। আত্মার স্বরূপ কেউ কোন দিন দেখেনি আর কোথাও দেখা যায় না, সেইজন্য আত্মা ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রেরিত করেন, এই উত্তর হয় না। আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা সরাসরি জ্ঞান কখন হয় না। তবে ইন্দ্রিয়ের কার্য দ্বারা আত্মার অবস্থানের জ্ঞান হয়। এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার জন্য শাস্ত্র কয়েকটি জিনিস নিয়ে এসেছেন। কিছু কিছু জিনিস হয় যার কার্যকে আমরা দেখতে পাই, তার কারণকে দেখা যায় না। জঙ্গলের মাঝখান থেকে ধুয়ো উঠছে, এটা হল কার্য, কারণ হল নীচে আগুন। আগুনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কার্যকে দিয়ে কারণকে অনুমান করে নেওয়া হল। এনারা বলছেন কার্যের পেছনে কারণ থাকবেই, কারণ অর্থাৎ কর্তা থাকবেই, তা নাহলে কার্য হবে না। যেমন যে কোন ধুয়োর পেছনে আগুন আছে। ইন্দ্রিয়গুলোর যে সঞ্চালন হচ্ছে, তার মানে তার পেছনে একজন কোন কর্তা আছেন, এটা হল আপত্তির বিরুদ্ধে প্রথম যুক্তি।

এখানে প্রশ্ন হল, কোন গুণ বিশিষ্ট কাউকে না বলে দুম্ করে এই রকম উদ্ভট উত্তর উপনিষদে কেন দেওয়া হচ্ছে? উত্তরে বলছেন, তার কারণ এই জগতে সেই গুণ বিশিষ্ট কিছু জানা যায় না। যে জিনিসকে যদি জানাই না যায় সেই জিনিসকে নিয়ে কেন আলোচনা করা হচ্ছে? এইজন্যই আলোচনা করা হচ্ছে, তাঁর কার্য দেখে তাঁকে বোঝা যায়। এখানে কার্য হল ইন্দ্রিয়গুলির প্রবৃত্তি, এদের প্রবৃত্তি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এর পেছনে একটা শক্তি আছে। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, নীচে আগুন আছে বলে আলু-পটল গুলো লাফায়। আলু-পটল লাফানোটা কার্য, কার্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে নীচে কিছু

আছে। ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়গুলো লাফালাফি করছে মানে এদের পেছনে অন্য কিছু আছে। কিন্তু তাই বলে আমি যদি মনে করি, যেমন একজন কাস্তে নিয়ে ঘাস কাটছে, সেই রকম কোন একজন কেউ ভেতরে বসে ইন্দ্রিয়গুলোকে নাচাচ্ছেন, না এই ধরণের কিছু নেই।

নিওরোলজি নিয়ে যারা পড়াশোনা করে তারা এগুলোকে নিয়ে খুব মজার মজার কথা বলে। আমরা কোন জিনিসকে দেখছি, জানছি, এটা কিভাবে হয়? এদের কাছে এখন পর্যন্ত এর পরিষ্কার কোন উত্তর নেই। বেদান্তের দিক দিয়ে দেখলেও কোন দিন এনারা এর উত্তর পাবেনও না। কারণ চৈতন্য জিনিসটা পুরো আলাদা আর জড়ের সাম্রাজ্য পুরো আলাদা। বলছেন, সেইজন্য তুমি যে এই প্রশ্ন করছ, উত্তরটা এই রকম উদ্ভট কেন, কর্ণেন্দ্রিয়েরও কর্ণ, এই উত্তরে দোষের কিছু নেই। এটাই সঠিক উত্তর। কারণ তিনি কোন দেবতা হন, ঈশ্বর হন, যিনিই হন, তাঁর কোন স্বরূপ দেখা যায়নি, যিনি এই ইন্দ্রিয়গুলিকে চালিত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলো চলছে, তার মানেই কিছু একটা আছে। মূল কথা দুটি, কোন মানুষ, কোন চৈতন্য পুরুষ, কোন ঈশ্বর, কোন দেবতার স্বরূপকে দেখা যায়নি যিনি এগুলোকে চালান। দ্বিতীয়, অথচ ইন্দ্রিয়গুলো চলছে, তার মানে এদের পেছনে কোন শক্তি আছে। দুটো যুক্তি, প্রথম যুক্তি কোন হাত-পাওয়ালা ঠাকুরকে ভেতরে দেখা যায়নি বা কেউ জানে না যে এমন কেউ আছেন যিনি এগুলোকে থেকে থেকে চালান। দ্বিতীয় যুক্তি, অথচ ওই জিনিসগুলো হচ্ছে। এখানে এটা বলছেন না যে বাতাস কে চালাচ্ছেন, এখানে বলছেন ইন্দ্রিয়গুলিকে কে চালাচ্ছেন। কারণ সেখানে চেতনার প্রকাশ, চেতনার প্রকাশ হচ্ছে বলে ধরছেন। যদিও কঠোপনিষদে বলছেন *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*, তার মানে ইন্দ্রিয়ের বাইরে যা কিছু আছে সব কিছুকেই নিয়ে আসা হয়েছে। দেখাচ্ছেন সব কিছুর পেছনে সেই আত্মা রয়েছেন বলে সব কিছু ঠিক মত চলছে।

এরপর আচার্য বলছেন, *স্বব্যাপারেণ বিশিষ্টঃ*, নিজের কাজের জন্য এক বিশিষ্ট কেউ, যিনি এই সব কিছুকে চালাবেন তাঁকে দেখা যায় না। তখনই তিনি ঐ যুক্তিটা নিচ্ছেন, যখনই আমরা কোন যৌগিক জিনিস দেখি বা যেখানে একটা সমষ্টি দেখি, যেমন বাড়ি, বাড়িতে অনেক কিছু আছে, ইট, সিমেন্ট, বালি তার সাথে দরজা জানলা, এই যে নানা রকমের মিশ্রণ, তখন বোঝা যায় একজন লোক নিজের ব্যবহারের জন্য অনেকগুলো জিনিসকে একত্র করেছেন। আচার্য বলছেন, *সংহতানাং পরার্থত্বাদবগম্যতে*, যখনই জিনিসগুলো একত্র করা হয়েছে, সংহত করা হয়েছে বা একজোট করা হয়েছে, তখনই বুঝতে হবে এগুলোর পেছনে কোন একটা কারণ আছে। কোন কারণ যদি না থাকে, কোন কর্তা যদি না থাকেন তাহলে নানা রকম বস্তু সংহত হবে না বা একত্রিত গোছান অবস্থায় দেখা যাবে না। সেইজন্য ঋষির এই উত্তরটা সঠিক।

আচার্যের সময় পদার্থ বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না, কিন্তু এখন ফিজিক্সে একটা নিয়ম এসেছে, যার নাম সেকেণ্ড ল অফ থার্মো ডায়নামিক্স, তাতে বলছেন entropy increases with time। Entropy মানে, যেমন বেলুড় মঠে সুন্দর মন্দির আছে, সেখানে এক বছর ধরে মেরামত চলছে। যে কোন বস্তুর একটা স্বভাব হল ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে হতে বিযুক্ত হয়ে যায়, নিজের তার যে মৌলিক ভাব সেই দিকে চলে যাওয়া। Entropy মানেই হয়, disorder in a system। আমরা গুছিয়ে নিয়ে এলাম, কিন্তু যেমন যেমন সময় যাবে ধীরে ধীরে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে, এর কখন বিপরীত হয় না। পাশ্চাত্যে randomness একটা থিয়োরী আছে, তারা বলে অনেক বানরকে যদি টাইপরাইটারে টাইপ করতে দেওয় হয়, দেখা যাবে অনেক বছর পর ওদের টাইপ থেকে সেক্সপিয়ারের কোন উপন্যাস বেরিয়ে এসেছে। একটা দ্বীপে কয়েকজন পৌঁছে গেছে, এর আগে পর্যন্ত ওই দ্বীপে কেউ যায়নি। হঠাৎ তারা সেখানে একটা রোলেক্স ঘড়ি দেখতে পেল। দেখে বলছে, এই যে random combination এটা infinite combination সেখান থেকে একটা রোলেক্স ঘড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। রোলেক্স ঘড়ি দেখে আমাদের কি মনে হবে? ওর যে সূক্ষ্মতা, ওর যে সব কিছু সুন্দর ভাবে গোছান ভাব, ওর মধ্যে যে একটা অর্ডার রয়েছে সেটা দেখেই বোঝা যায়, এই ঘড়ি কেউ তৈরী করেছে। কারণ জগতের নিয়ম হল

বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়া। যেখানে কোন বিশৃঙ্খলতা নেই সেখানে বুঝতে হবে অন্য কোন এক বাইরের শক্তি এসে জিনিসটাকে গুছিয়ে দিয়েছে। দেশে যদি অনীতি, অনাচার চলে তখন বুঝতে হবে এটাই স্বাভাবিক। এটাকে ঠিক করার জন্য দরকার বাইরে থেকে একটা চাপ সৃষ্টি করা। সেইজন্য আমরা বলি, অবতার না এলে সমাজকে ঠিক করা যায় না। এখন জিনিসগুলো যেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এগুলো সব সময় ছড়িয়ে ছিটিয়েই থাকবে। একটা কাঁচের গ্লাশ টেবিলে রাখা আছে, একজন গ্লাশটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, মাটিতে পড়ে গ্লাশটা ভেঙে গেল। এই ঘটনাটাকে সে ভিডিও করে নিয়েছে। এবার যদি ভিডিওটাকে উল্টো চালিয়ে দেওয়া হয়, তখন দেখবে, কাঁচের টুকরো মাটিতে পড়েছিল, টুকরোগুলো ধীরে ধীরে জুড়ে একটা গ্লাশ হয়ে গেল। আমরা তখনই বলব এটা গোলমেলে ব্যাপার, এখানে চালাকি করা হয়েছে। জিনিসটা এভাবে হয় না, এর উল্টোটাই হয়। কারণ আমরা জানি বিশৃঙ্খল থেকে শৃঙ্খল নিজে থেকে হয় না, শৃঙ্খল থেকে বিশৃঙ্খল নিজে থেকে হয়, এটাই জগতের নিয়ম। আচার্য এটাই বলছেন, যেখানে সংহতি দেখা যাবে, যেখানে দেখা যাবে সব কিছু একত্রিত আছে, বুঝতে হবে ওটা নিজে থেকে হয়নি, এর পেছনে অন্য কোন শক্তি আছে। আচার্য এই যুক্তি উপনিষদ, গীতা সব জায়গায় নিয়ে আসবেন। সব কিছুই অসম্বদ্ধ, কিন্তু এক জায়গায় এসে জুটে গিয়ে সম্বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার মানেই এটা কারুর ভোগের জন্য, কারুর কাজে লাগাবার জন্য এগুলো একত্রিত করা হয়েছে।

তখন এই তরফ থেকে বলবে, আচ্ছা এটা না হয় মানলাম, কিন্তু একটা শ্রোত্র যে বলা হল পরেই আবার আরেকটা শ্রোত্রের কথা কেন বলা হল? একটা আলোকে দেখার জন্য আরেকটা আলোর দরকার লাগে না। কোন নাম করা লেখকের ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে একজন বলছিলেন, সেই সময় তখনও কলকাতায় বিদ্যুতের আলো আসেনি, রাস্তায় প্রদীপ জ্বালানো থাকত। কোন একটা রাস্তায় প্রদীপ জ্বালানো আছে, প্রদীপের আলো এতটাই যে আলো ছাড়া প্রদীপ দেখা যায় না। ওই আলোকে দেখার জন্য আরেকটা আলো লাগবে, ব্যঙ্গ করে বলছেন। এটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা যেতে পারে কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। একটা আলোকে দেখার জন্য আরেকটা আলোর দরকার হয় না। বলছেন *শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং*, তাহলে হঠাৎ একটা কানের জন্য আরেকটা কান লাগবে কেন? প্রথম যে যুক্তি সেটা সব জায়গাতে প্রযোজ্য। আচার্য বলছেন, এতেও কোন দোষ নেই। এইজন্যই দোষ নেই যে, এই যে ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে, তাদের যে সামর্থ, সেটা তখনই আসে যে *নিত্যেহসংহত*, চিরন্তন আলাদা, চিরন্তন মুক্ত। *নিত্যেহসংহত* আত্মার নামে বলছেন, আচার্যের শব্দ চয়ন দুর্ধর্ষ। আত্মার কখন কারুর সাথে সম্বন্ধ নেই, সব সময় আলাদা। তিনি আছেন বলেই তারা নিজের নিজের কাজ করছে। সেইজন্য এটা বলা, যিনি শ্রোত্রিয়েরও শ্রোত্রিয়, এতে কোন দোষ নেই।

এর খুব স্থূল উপমা এভাবে নেওয়া যেতে পারে, গ্রামের কোন বিডিও যদি কাউকে চিঠি লেখে তখন লিখবে, the Government has ordered, সই করছে বিডিও, কিন্তু লিখছে the Government has ordered। দিল্লীতে সরকার আছে, সেখান থেকে চ্যানেল হয়ে হয়ে বিডিওর কাছে সরকারের ক্ষমতা আসছে। এটা বিডিওর ক্ষমতা না, ক্ষমতাটা সরকারের, সরকারেরও ক্ষমতা বলা যাবে না, সরকারের ক্ষমতা আসে লোকসভা থেকে, লোকসভার ক্ষমতা আসে সংবিধান থেকে। ক্ষমতা ওই জায়গা থেকে বিভিন্ন চ্যানেল হয়ে হয়ে বিডিওর কাছে আসছে। দিল্লীতে সরকার আছে বলে বিডিও কাজ করছে। দিল্লীতে যদি অরাজকতা হয়ে যায়, এখানেও অরাজকতা এসে যাবে। এখানে বলছেন, সরাসরি করে না ঠিকই, কিন্তু তিনি আছেন বলেই করছে। আর তাঁর স্বভাব কি? তিনি *নিত্যেহসংহত*, সেইজন্য তুমি যদি মনে কর তিনি সত্যিকারের শুনছেন, কিন্তু তা নয়। কারণ তিনি যদি সত্যিকারের শোনেন তাহলে তিনিও সংহত হয়ে যাবেন। আত্মার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, আত্মা চিরমুক্ত, চির আলাদা, কারুর সাথে যোগ নেই। তাহলে কাজ করে কি করে? শুধু তাঁর উপস্থিতিতে। তিনি আছেন তাতেই সব কিছু হয়ে যাবে। আত্মা ইন্দ্রিয় দিয়েও কাজ করান না, আত্মা কাজ করান জীবাত্মাকে দিয়ে। জীবাত্মা যদি শরীর ছেড়ে চলে যায় তাহলে শরীর পড়ে থাকবে, সে আর নিঃশ্বাসও নিতে পারবে না,

শুনতেও পারবে না দেখতেও পারবে না। কারণ আত্মা যখন কাজ করেন তখন তিনি সরাসরি করেন না, জীবাত্মার মাধ্যমে কাজ করেন। সেইজন্য *শ্রোত্রিয়স্য শ্রোত্রং* বলার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

বলার পর আচার্য পর পর অনেকগুলো কোটেশান নিয়ে আসছেন, কঠোপনিষদ থেকে বলছেন '*তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি*', গীতা থেকে বলছেন '*যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্*', আবার গীতা থেকেই বলছেন '*ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত*'। কোটেশান এনে আচার্য দেখাতে চাইছেন, গীতা ও অন্যান্য উপনিষদের অন্যান্য জায়গাতেও এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এরপর আচার্য আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি নিয়ে আসছেন, সাধারণ যে মানুষ, তার যত পড়াশোনা থাকুক আর যাই থাকুক, তার ধারণা এটাই যে আমি আমার এই চোখ দিয়ে দেখি, আমার কান দিয়ে শুনি। আমরা যে শুধু বাচ্চাদের ভাষাতেই বলি তা নয়, আমরা মনে প্রাণে জানি যে আমরা আমাদের চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি। এই ভ্রান্তিকে নিরাকরণ করার জন্যই উপনিষদ পড়া হচ্ছে। এটা কোন সাধারণ শাস্ত্র নয়। এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের জন্ম থেকে শুরু করে আজকে বড় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একেবারে মাথায় বসে আছে। এই ভ্রান্ত ধারণাকে আচার্য এবার বোমা মেরে উড়াচ্ছেন, সেইজন্য ওই ভাষাতে বলছেন। এক কথাতেই তো বলে দেওয়া যেত, সব কিছুকে আত্মা চালান। কিন্তু এত সহজে তো জিনিসটা হবে না। অত্যন্ত জটিল জিনিস, আচার্য পরে বলবেন এই জিনিসটাকে ধারণা করা যে কত জটিল তাই একই কথা বার বার ঘুরে ঘুরে বলতে হবে। ঠাকুরকে হৃদয়রাম বলছে, মামা তুমি একই কথা বার বার বলো কেন? ঠাকুর বলছেন, বেশ করব তাতে তোর কিরে শালা।

তাহলে তো এখন সত্তা দুটো হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ লোকের ধারণা আমি মন, আমি বুদ্ধি, আমি ইন্দ্রিয় আর আমার চোখ দেখে, কান শোনে। আর উপনিষদ বলছেন '*তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি*', তিনি আছেন বলে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি সব প্রকাশমান, চোখ তাই দেখে, কান তাই শোনে। তাহলে তো দুটি সত্তা হয়ে গেল। পুরো পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ঠিক এই জায়গাতে এসে মারামারি করতে শুরু করে দেয়। এই জায়গা থেকে ঠাকুরের ইচ্ছা আর স্বাধীন ইচ্ছা শুরু হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা কতটুকু আর স্বাধীন ইচ্ছা কতটুকু এই নিয়ে এই জায়গাতে এসে লড়াই বাঁধে। একবার দিল্লীর এক ভদ্রলোক কোন সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছা কতটুকু আর স্বাধীন ইচ্ছা কতটুকু? সাধুটি বললেন, সাতদিন পর এসো তখন বলব। সাত দিন পর এসে হিসেব করে বললেন তেত্রিশ শতাংশ স্বাধীন ইচ্ছা আর ষাটষট্টি শতাংশ ঈশ্বরের ইচ্ছা। সাধারণ মানুষ মনে করছে আমার এই চোখ দেখছে, মানে আমিই দেখছি, কে শুনছে, আমার কান শুনছে। উপনিষদ বলছেন, তিনি দেখছেন, তিনি শুনছেন, কারণ তিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্র। তাহলে আসলে কে দেখছে? একজন বিষয়ী মানুষ তার যে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তাতে বলবে আমি দেখছি। কে মারা যাবে? আমি মরব। আর যিনি ঈশ্বরের শরণাগত ভক্ত, তিনি বলবেন, তিনিই সব কিছু করছেন। আর আমার আপনার মত লোক সাধুবাবার মত শতকরা হিসাব বার করতে থাকবেন, আমার ইচ্ছা কতটা আর তাঁর ইচ্ছা কতটা।

এর উত্তর হল, দুটোর মধ্যে একটা নিতে হবে। যার এই বোধ হচ্ছে, আমি খাচ্ছি, আমাকে চেষ্টা করতে হবে, তাকে এই বোধ নিয়েই চলতে হয়, আমিই সব কিছু করছি। কিন্তু মনে রাখতে হয় আমি করছি ঠিকই, কিন্তু আসলে আমি করি না। যদি আমি মনে করি তিনিই সব করান, তখন আমি আবার একটা ভুল করছি, কারণ আমি যে কর্তা, সেই কর্তার পেছনে আমি আরেকটা কর্তা নিয়ে আসছি। উপনিষদের উত্তর হল, আত্মা আছেন বলে এগুলো কাজ করে। তার মানে আত্মার ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না, আত্মা মানে নিত্য অসংহত চৈতন্য। কথাটা হল, চৈতন্যের ইচ্ছা ছাড়া জড় নড়তে পারে না। সেই চৈতন্যকে আমরা ঈশ্বর বলতে পারি, ভগবান বলতে পারি, আত্মা বলতে পারি, ব্রহ্ম বলতে পারি, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন যাই হোক না কেন, তার সাথে এই তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই। আচার্য এটাই এখানে বলছেন। মানুষ মাত্রই জানে ও ভাবে আমার ইন্দ্রিয় সব কাজ করে, আমি কাজ করি। আমাদের এই ভ্রান্ত অবধারণাকে কেটে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য এভাবে বলছেন, যিনি

চোখেরও চোখ, কানেরও কান। তাতে এটাই বোঝাচ্ছে, তোমার চোখ কাজ করে না, তোমার কান কাজ করে না, এদের পেছনে আরও কিছু আছে। সরাসরি যে একটা কথায় বলে দেবেন আত্মার উপস্থিতিতে এরা কাজ করছে, ঠাকুর ইচ্ছায় এরা কাজ করছে, তা বলছেন না। কারণ আমাদের মনে দেহাত্ম ভাব এমন ভাবে ঢুকে আছে, বোমা মেরে না উড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত এই ভাব বা ধারণা যাবে না।

দর্শন বা যে কোন বিষয়ের সাথে আমাদের জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। বিষয়কে আমরা যদি জানতে চাই আমরা জেনে নেব, দুই যোগ দুই চার হয় জেনে নিলাম, হয়ে গেল, ভারতের রাজধানী দিল্লী জেনে নিলাম, হয়ে গেল। উপনিষদ, গীতা বা যে কোন মোক্ষশাস্ত্র এভাবে চলে না। মোক্ষশাস্ত্রের কাছে শব্দ হল গৌণ কিন্তু আমাদের জীবনকে পাল্টানোটা মুখ্য। বেদরাশি বললেই বোঝায় জ্ঞান, জ্ঞানটাই বেদ, বেদের শব্দগুলো বেদ নয়। *ওঁ ভূর্ভবঃ স্বঃ*, এটা শব্দ, ওই শব্দের পেছনে যেটা আছে সেটাই বেদ। উপনিষদ বলতেও তাই, উপনিষদের শব্দের পেছনে যে জ্ঞান আছে সেটা উপনিষদ। ঐটাকে ধাক্কা মারার জন্য নানান ভাবে বলছেন, প্রথমে উপনিষদ বলছেন, তার পেছনে ভাষ্য চলছে, বিভিন্ন ভাবে ধাক্কা মেরে বোঝানর চেষ্টা করছেন, তুমি যে জন্মজন্মান্তর ধরে ভেবে চলেছ তুমি ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে সব কিছু জানছ, জিনিসটা তা নয়। যাকে তুমি রাজা মনে করছ, তারও রাজা আছে, যাকে তুমি মহৎ মনে করছ, সেই মহতেরও মহৎ বসে আছেন। এটা ভালো করে সবাইকে জেনে রাখতে হবে, জড়ের কোন সত্তা নেই, সত্তা একমাত্র আছে চৈতন্যের। চৈতন্য সত্তা ছাড়া কোন কিছুই জগতে চলবে না। গাছের পাতা কেন নড়ে? বাতাস আছে বলে। বাতাস কেন চলে? এনার্জি আছে বলে। এনার্জি কেন আছে? শুদ্ধ আত্মা আছেন বলে।

একটা খুব স্থূল উপমা নেওয়া যেতে পারে। যদিও স্থূল উপমা কিন্তু ব্যাপারটাকে খুব সহজে ধারণা করিয়ে দেওয়া যায়। যারা ইলেক্ট্রিসিটির ব্যাপারে কিছু জানে, তারা জানে, ট্রান্সফর্মারে যখন ডিভিসি থেকে দুটো তারে বিদ্যুৎ আসে ওটাকে বলে প্রাইমারি সার্কিট। ওখানে আবার সেকেণ্ডারী থাকে, স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার হয়, হাই ভোল্টেজকে নামিয়ে লো ভোল্টেজে করে দেয়। দুটো তার পাশাপাশি রাখা থাকে, দুটো তারে কোন বিদ্যুৎ থাকে না। ডিভিসি থেকে যে বিদ্যুৎ আসছে সেখানে একটা কয়েল দেওয়া থাকে, ফলে ওখানে ম্যাগনেট তৈরী হয়ে যায়। ওর পাশেই আবার অনেকগুলো কয়েল থাকে, ওই কয়েলগুলো এই ম্যাগনেটকে ধরে নেয়। অল্টারনেট কারেন্টে কারেন্ট আসে যায়, ওই আসা যাওয়াতে ম্যাগনেট সৃষ্টি হয় আর দ্বিতীয়তঃ ম্যাগনেট কারেন্টে যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। অল্টারনেট কারেন্টে বিজ্ঞানী টেক্সলার বিরাট বড় অবদান। ডিরেক্ট কারেন্ট অন্য ভাবে চলে। যার জন্য ডিরেক্ট কারন্ট লম্বা দূরত্বে পাঠানো যায় না, অল্টারনেট কারেন্ট পাঠানো যায়। মূল হল প্রাইমারি সার্কিট আর সেকেণ্ডারী সার্কিট, ডিভিসি থেকে যে বিদ্যুৎ ট্রান্সফর্মারে আসছে এখানে দুটো কয়েলে কোন কানেকশান থাকে না। ডিভিসির কারেন্ট আছে বলে ওটা আপনা থেকেই চার্জ হয়ে যায়। আমাদের ঘরে যে টিউব লাইট জ্বলছে, এখানে লোকাল ট্রান্সফর্মার থেকে বিদ্যুৎ আসছে। আসলে বিদ্যুৎ আসছে ডিভিসি থেকে। ডিভিসি আর লোকাল ট্রান্সফর্মারে কোন কানেকশান নেই। ডিভিসির কারেন্ট আছে বলে ট্রান্সফর্মার চলছে। ডিভিসির বিদ্যুৎ যদি বন্ধ হয়ে যায় এখানেও বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু তাই না, লোকাল ট্রান্সফর্মারও যদি বন্ধ হয়ে যায়, ডিভিসির বিদ্যুৎ সাপ্লাই থাকলেও টিউব লাইট বন্ধ থাকবে। দুটোর মধ্যে কোন সংযোগ নেই অথচ ঘরে ঘরে টিউব লাইট, পাখা, ফ্রিজ, এসি সব চলছে। আত্মা আর ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক অনেকটাই এই রকম। আত্মা আছেন বলে ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাঝখানে জীবাত্মাও চঞ্চল হয়ে ওঠে, জীবাত্মা বেরিয়ে যাওয়া মানে কারেন্ট চলে গেল, ইন্দ্রিয়গুলো থাকলেও আর কিছু করতে পারবে না। শুদ্ধ আত্মা বা চৈতন্য যদি না থাকতেন তাহলে পুরো জিনিসটাই বিকল হয়ে যেত। সেই চৈতন্য সত্তাকে কেউ ঈশ্বর বলছে, কেউ ভগবান বলছে, কেউ আত্মা বলছে, কেউ ব্রহ্ম বলবে আবার কেউ কালী, কৃষ্ণ, ঠাকুর বলবে, বলাটা যার যার নিজের ব্যাপার। এসব কথা আমরা যতই শুনে যাই না কেন আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে না, যখন হবে তখন নিজে থেকেই হবে। যাঁরা বোঝেন তাঁদের কাছে খুব সহজ জিনিস, যাঁরা বোঝেন না তাঁদের কাছে খুব কঠিন। কঠোপনিষদে

আত্মার যে ব্যাখ্যা করছেন, *অণোরনিয়াণ মহতো মহীয়ান্*, ছোট থেকে ছোট আবার বৃহৎ থেকেও বৃহৎ, ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন।

সাধারণ লোকেদের যে সাধারণ ধারণা, দেহ-ইন্দ্রিয়ের সংঘাত এটাই আমার আত্মা, এই ভ্রান্তিকে দূর করার জন্যই এত কথা বলছেন। বলছেন, জিনিসটা তা নয়। তাহলে আত্মা কি? এই ইন্দ্রিয়গুলিকে যিনি সামর্থ দেন। আচার্য এখানে বলছেন *বিদ্বদ্বুদ্ধিগম্যং*, যাঁরা বুদ্ধিমান পুরুষ, যাঁর ধীমান্, শুধু তাঁরাই জানতে পারেন, সাধারণ লোকেরা এখানে যে আত্মাকে নির্দেশ করে বলা হচ্ছে, তাঁকে জানতে পারে না। তিনি থাকাতে ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের বিষয়ের কাজ করে, বেশির ভাগ মানুষ তাঁকে বুঝতে পারেন না, জাননে না বলে এই নয় যে তিনি নেই, তিনি আছেন। *বিদ্বদ্বুদ্ধি* মানে পণ্ডিত নন, সমাধিবান পুরুষ, তিনি আত্মাকে বোধে বোধ করেন। কারণ তিনি *সর্বান্তরতমং*, সবারই অন্তরতম, ভেতরে চৈতন্যজ্যোতি রূপে তিনিই আছেন, কারণ তিনি না থাকলে শরীর কাজ করবে না। অথচ তিনি কূটস্থ, কূটস্থ মানে, রাশিকৃতের মত, যাঁকে নাড়ানো যায় না, কোন কিছুতে বিচলিত হন না।

কূটস্থের সাথে বলছেন, *অজরমরমৃতমভয়ং*, *অজর*, তাঁর জন্ম হয়নি, *অমর*, তিনি চিরন্তন, *অমৃতম্* আর অভয় রূপ, অর্থাৎ তাঁর থেকে কারুর ভয় নেই। *তৎসা-মর্থ্যনিমিত্তমিতি*, শ্রোত্র, চক্ষুর যে সামর্থ, এই সামর্থ হয় তিনি আছেন বলে। এখানে বলতে চাইছেন, ইন্দ্রিয়গুলি যে স্ব স্ব বিষয়ে কাজ করে কারণ তাদের পেছনে এক সত্তা আছে। সেই সত্তাকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। কারণ সাধারণ মানুষ যে বস্তুকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেটাকেই আত্মা মনে করে। এই সত্তাকে সন্দেহ করা যায় না, উচিতও নয়, কারণ যাঁরা বিদ্বজ্জন্, জ্ঞানী পুরুষ তাঁরা নিজের বুদ্ধিতে এই সত্তাকে বোধ করেন। সেই তিনি কেমন, যিনি এদের প্রেরিত করেন? তিনি কূটস্থ, কোন কিছুতে তাঁর চলন নেই, চলন নেই বলে চালনও নেই, তিনি চলেন না বলে কাউকে চালাতেও পারবেন না। তার সাথে তিনি অজর অমর, কোন ধরণের বিকার তাঁর মধ্যে পাওয়া যাবে না। আর তিনি আছেন বলেই সবাই স্ব স্ব বিষয়ে গমন করে। এই জিনিসটাকে ধারণা করা সত্যিকারেরই কঠিন, অসম্ভব প্রায়। এই জিনিসটাকেই ভাগবতে খুব সুন্দর একটা কাহিনী রূপে নিয়ে আসা হয়েছে। ভগবান সৃষ্টি করতে শুরু করলেন, তন্মাত্রাদির সৃষ্টি হয়ে গেল, পদার্থাদির সৃষ্টি হয়ে গেল। ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়ে গেল, বস্তুর সৃষ্টি হয়ে গেল, কিন্তু ইন্দ্রিয় আর বস্তু মিলতে পারছে না। ইন্দ্রিয় তার বিষয়ের সাথে মিলতে পারছে না দেখে খুব দুঃখ নিয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে হাজির হল। হাজির হয়ে ভগবানকে তারা বলছে, আপনি আমাদের সৃষ্টি করলেন, আমরাও তৈরী হলাম। কিন্তু আমরা কেউই স্ব স্ব বিষয়ে যেতে পারছি না। দুটো জড় পদার্থকে যদি কাজে লাগাতে হয় তাহলে একজন চৈতন্যবান সত্তাকে আসতে হবে তাদের কাজে লাগাবার জন্য। যে কোন ইঞ্জিনকে যদি নেওয়া হয়, ইঞ্জিনে আছে লোহা আর পেট্রল। লোহা আর পেট্রলকে একসাথে রেখে দিলে কিছুতেই কিছু হবে না। একজন বুদ্ধিমান এসে লোহাকে এমন ভাবে সাজিয়ে দিচ্ছে আর পেট্রলকে এমন ভাবে সাপ্লাই দিচ্ছে যে একটু ধাক্কা মারলেই এনার্জি তৈরী হতে শুরু করে। ইন্দ্রিয়গুলো তৈরী, বস্তুগুলোও তৈরী, ঘাসও আছে কাস্তেও আছে কিন্তু ঘাস কাটার কোন লোক নেই। ভগবান তখন মিষ্টি করে একটু হাসলেন, হেসে ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। এবার ইন্দ্রিয়গুলো জীবন্ত হয়ে বস্তুর দিকে দৌড়াতে শুরু করে দিল, জগৎ সংসারের খেলাও শুরু হয়ে গেল।

ভাগবত কাহিনী রূপে একটা সত্যকে ব্যাখ্যা করছেন কিন্তু এর বাস্তব দিক হল, আত্মতত্ত্ব আছেন বলেই ইন্দ্রিয়গুলো তাদের বিষয়ের দিকে দৌড়ায়। আত্মতত্ত্ব যে কোন থিয়োরী, তা নয়, বিদ্বদ্বুদ্ধি সম্পন্ন মণীষীরা এটাকে বোধ করেন, জানতে পারেন। সেইজন্য যদি শব্দার্থও নেওয়া হয় তাতেও কোন সমস্যা নেই, কারণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলো নিজের নিজের কাজে যায়, যেহেতু নিজের কাজে যায়, সেইজন্য আত্মাকে এটা বলা যেতে পারে যে, তিনি চোখেরও চোখ, কানেরও কান, এতে দোষের কিছু নেই। এসব বলার পর এবার বলছেন, যে যুক্তি কর্ণের ক্ষেত্রে লাগানো হল, একই যুক্তি মনের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও লাগানো হচ্ছে। কারণ চৈতন্যজ্যোতি যদি না থাকতেন, তাহলে অন্তঃকরণ,

মানে মনেরও কাজ হত না। মনের কাজ হল সঙ্কল্প-বিকল্প, তার কাজ হল অধ্যবসায় অর্থাৎ একটা জিনিসকে নিয়ে লেগে থাকা।

এখানে অনেক রকম আলোচনা করে আচার্য আবার উপনিষদাদি থেকে উদ্ধৃতি এনে দেখাচ্ছেন শাস্ত্রেও এই কথাই বলা হয়েছে। আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে। এখানে মন্ত্রে বলছেন *শ্রোত্রস্য শ্রোতং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ*। প্রশ্ন হল আপনি বলছেন কানেরও কান, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য তাহলে *প্রাণস্য প্রাণঃ* কেন বলা হচ্ছে, প্রাণ না বলে *ঘ্রাণস্য ঘ্রাণঃ* বলাটাই উচিৎ ছিল? ঘ্রাণ না বলে প্রাণ কেন বলছেন? আচার্য এখানে এই যে শঙ্কাটা উত্থাপন করেছে, জিনিসটা খুবই মজার। এর দুটো কারণ। আচার্য দেখাচ্ছেন, উপনিষদের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যকেও প্রশ্ন করা যেতে পারে। প্রথম কথা হল, যদিও এটা অজ্ঞানের জন্যই হয়, কিন্তু প্রশ্ন করা যায়। দ্বিতীয় কথা, বেদ বা উপনিষদে যদি কোন বক্তব্য যুক্তি দিয়ে না উপস্থাপিত করা হয়, মনে তখন শঙ্কা জাগে। এটা এমন তো নয় যে ঘ্রাণ হওয়ার কথা? কারণ চোখ, কান, বাক্ এই কথাগুলো তো বলা হচ্ছে, তাহলে ঘ্রাণ না বলে প্রাণ কেন বলছেন? আচার্য এই বলে এর শঙ্কা নিবারণ করছেন, প্রাণ বললে দোষের কিছু হয় না। কারণ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়া প্রাণ দিয়েই হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পেছনে যে এনার্জি আছে তার জন্যই ইন্দ্রিয়গুলি চলে। আর আঘ্রাণের ক্ষেত্রেও প্রাণ লাগে। প্রাণ বললে সব কটি ইন্দ্রিয়কেই ধরে নেওয়া হয়। শরীরের সব ক্রিয়া প্রাণের সাহায্যে চলছে। আমরা যে খাদ্য খাচ্ছি, ওই ভুক্ত খাদ্য এনার্জিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই এনার্জি আবার ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাচ্ছে। এই এনার্জির যে পদ্ধতিতে এগুলোকে চালাচ্ছে সেটাই প্রাণ, এই প্রাণেরও প্রাণ তিনি। শুধু ঘ্রাণই নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে এর মধ্যে ধরে নেওয়া হল।

এবার সব কিছুকে মিলিয়ে বলছেন, ওই যে ইন্দ্রিয়গুলির বস্তুগুলি রয়েছে, বস্তুগুলিকে প্রকাশিত করার, বস্তুগুলির স্বরূপকে ধরার যে ক্ষমতা, সেটা আত্মচৈতন্য ভেতরে আছে বলেই সম্ভব হচ্ছে। এখানে আরও একটা যুক্তি ব্যবহার করেন। আত্মা তো সরাসরি কিছু করেন না, অজ্ঞানের আবরণ হয়, সেখান থেকে জীবাত্মার সৃষ্টি। জীবাত্মা আর আত্মার মধ্যে ভেদ কিছু নেই, জীবাত্মা নিজেকে আমি মনে করে, আত্মা নিজেকে আমি মনে করে না, এছাড়া আত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কোন ভেদ নেই। মানুষ মরে গেলে জীবাত্মা শরীরটা ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তখন শরীরটা পড়ে থাকে। ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে, brain dead, heart dead, যদি তোমার মস্তিষ্কই সব কিছু হয়, তাহলে replace করে দাও শরীর চলতেই থাকবে। কিন্তু চলছে না, আমরা যাই করে দিই না কেন, কিছু দিন চালিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু জীবাত্মা একবার যদি শরীর ছেড়ে দেয় তারপর আর শরীরের কিছুই চলবে না। বলছেন, *চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ*, এই জিনিসটাকে জেনে, এখানে এটা উহ্য রয়েছে, সেই আত্মতত্ত্ব যিনি চোখেরও চোখ, কানেরও কান, বাণীরও বাণী, যিনি এটাকে জেনে যান তিনি এই সংসার থেকে মুক্তি লাভ করে অমর হয়ে যান।

এই আত্মতত্ত্ব লাভ একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই হয়, কোন ক্রিয়া দিয়ে হয় না। মানুষ জীবধর্ম ত্যাগ করে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তখনই জ্ঞান হয়। যখন মানুষ চোখ, কান, মন, বাণীতে আমিত্ব ভাব বা আত্মভাব নিয়ে আসে তখনই মানুষ মরে, তখনই মানুষ জন্মায়। যে ধীমান্ পুরুষ দেহ, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিকে ত্যাগ করে জেনে গেছেন আমি *চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্*, তাঁদের মৃত্যু বলে কিছু হয় না। আর এতে পাওয়া বা হারানোর কিছুই হয় না, এটা শুধু জ্ঞানের ব্যাপার। *অতিমুচ্য* মানে অতিক্রম করা, দেহ আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে আত্মভাব রয়েছে এটাকে অতিক্রম করা। কিভাবে আর কোন জিনিসটাকে অতিক্রম করে যান? যাদের এই ভাব রয়েছে, আমার এটা চোখ, এটা আমার কান, এটাই দেহাত্মভাব, এই দেহাত্মভাবকে কেউ যখন অতিক্রম করে যায়। কিভাবে অতিক্রম করেন? তত্ত্বটাকে জেনে। কিভাবে তত্ত্বটাকে জানেন? চক্ষুরও যিনি আত্মা, শ্রোত্রেরও যিনি আত্মা, এই জ্ঞান যখন হয়ে যায় তখন দেহাত্মভাব থাকে না।

আত্মতত্ত্ব জানার ব্যপারে আমাদের খুব সাধারণ ধারণা হল ঈশ্বর দর্শন, জাদুকরের মত ঈশ্বর সামনে এসে যান, এটাই বোকা বোকা ধারণা। ঠাকুরের যে মা কালীর দর্শন হয়েছে, তাতে কি হয়েছে?

ঠাকুরের সংসার জ্ঞানটা বিলোপ হয়ে গেছে। আবার কোন কোন অবস্থায় ঠাকুর সংসারও দেখছেন মা কালীকেও দেখছেন, আর কখন কখন তিনি সংসারেও আছেন। স্বামীজী দেশে বিদেশে ঘুরে কত কিছু করলেন, একটা নবজাগরণ আনলেন। তারপর কাশ্মীরে গেলেন, সেখানে এক ফকির স্বামীজীকে এমন বাণ মারল যাতে তাঁর রক্ত আমাশা হয়ে ওখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। রক্ত আমাশা হল, স্বামীজীকেও চলে আসতে হল। স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে গিয়ে বলছেন, মা! কই ঠাকুর তো আমাকে রক্ষা করতে পারলেন না। মা হাসছেন, হেসে বলছেন, বাবা! শক্তি মানতে হয়, তিনি ভাঙতে আসেননি তিনি গড়তে এসেছেন। যাঁরা নতুন এই পথে এসেছেন তাঁদের পক্ষে স্বামীজীর এই খেদোক্তি বা তার উত্তরে শ্রীশ্রীমার এই কথাই শুধু নয়, যে কোন ধর্মতত্ত্ব ধারণা করতে অনেক সময় লাগে। তাঁদের মনে হতে পারে, ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীর হাত কেটে গেছে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু তিনি বলছেন, কই আমার তো কিছু হয়নি। অথচ স্বামীজীর মত একজন জ্ঞানীর রক্তামাশা হওয়াতে মায়ের কাছে এসে অভিযোগের সুরে বলছেন। নব্য সন্ন্যাসীরা এই সংশয় নিয়ে কোন সিনিয়র মহারাজের কাছে যখন ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে যান তখন তাঁরা একটা কথাই বলেন, তাতে কি স্বামীজীর আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের নাশ হয়ে গেল? সিনিয়র মহারাজের এই কথারও কোন অর্থ না বুঝতে পেরে আবার তাঁরা জিজ্ঞেসে করেন, তিনি একই উত্তর দেন, তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর দেন। কিছুই বুঝতে না পেরে বোঝার ভান করে ঘাড় নেড়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসেন। ধাতু স্পর্শ করলে ঠাকুরের আঙুল বেঁকে যেত। নরেন বিছানার তলায় ঠাকুরের অজান্তে মুদ্রা রেখে দিলেন। ঠাকুর বিছে কামড় দেওয়ার মত ছটফট করতে লাগলেন, ঘুমোতে পারছেন না। মারোয়ারি লক্ষ্মী নারায়ণ ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা দিতে এলে তিনি তাকে বার করে দিলেন। আবার টাকা মাটি মাটি টাকা করে যখন দুটোই গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন তখন আবার তাঁর ভয় হল, মা লক্ষ্মী যদি রেগে গিয়ে খ্যাঁট বন্ধ করে দেন! তখন আবার বলছেন, মা তুমি আমার হৃদয়ে বাস কর। এবার আসছি একেবারে শেষের দিকে, ঠাকুর কাশীপুরে আছেন, শরীর খারাপ, কোন টাকা-পয়সা নেই, বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাচ্ছে না। যা টাকা দক্ষিণেশ্বর থেকে আসত তাতে কিছুই হয় না। এবার ভক্তদের কাছে চাঁদা নেওয়া হবে। যিনি অবতার, তাঁর সেবা শুশ্রুষার জন্য ভক্তদের চাঁদা তুলতে হচ্ছে। কয়েকজন আবার চাঁদার হিসাবে চাইছেন। ঠাকুর কাঁদছেন, নরেনকে বলছেন, তুই আমাকে যেখানে রাখবি আমি সেখানেই থাকব। ঠাকুরের জীবনের এই অধ্যায়টা খুবই বেদনাদায়ক। অনেক ভাবে এর ব্যাখ্যা হয়। মা লক্ষ্মীকে চটিয়ে দিয়েছিলেন, শক্তিকে চটাতে নেই। আরেক জায়াগায় ঠাকুর বলছেন, আমি অনেক শক্তিকে চটিয়েছি। আরেকটা হতে পারে, যখন শক্তি থাকে তখন তিনি আরেক ভাবে করেন। আরও সহজ হল লীলা রূপে ব্যাখ্যা। এখানে একটা পয়েন্টকে অনেকেই ধরতে পারেন না, ঠাকুর একবারও কিন্তু বলছেন না যে, আমি আগে যেটা বলেছি সেটা ভুল, একবারও বলছেন না যে কামিনী-কাঞ্চনেরও দরকার আছে। তাঁর জীবন চলছে না, ওই কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে পাল্টাচ্ছেন না, তাঁর আত্মভাব চলে যাচ্ছে না। নরেন একেবারে শেষ অবস্থায় বলছেন, এখনও যদি উনি বলেন আমি অবতার তাহলে বিশ্বাস করি। ঠাকুর বলছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ, সেই এই দেহে রামকৃষ্ণ। এটাকেই বলে *অতিমুচ্য*। এটাকেই বলে দেহ, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের আমিত্ব ভাবকে অতিক্রম করে যাওয়া। জ্ঞানীর হাত কেটে রক্ত বেরোচ্ছে, দেহের তো ব্যাথা যন্ত্রণা হবেই, কিন্তু জ্ঞানী দেখছেন দেহের ব্যাথা করছে, আমি তো দেহ নই, আমি শুদ্ধ আত্মা। এগুলো খুবই সূক্ষ্ম, ধর্মতত্ত্ব খুব সূক্ষ্ম, বেশির ভাগ মানুষ এর ধারণাই করতে পারবে না।

শিষ্যের প্রশ্ন ছিল *কেনেষিতং*, কে এই ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রেরিত করেনে, উত্তর হল তিনি, তারপরে আসে তাঁকে জেনে কি হয়। আত্মতত্ত্বকে জেনে নেওয়ার পর আর তাঁকে জাগতিক কোন কিছুই বেঁধে রাখতে পারে না। আমরা দুটো ভাগে বলতে পারি, একটা হল তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না আর দ্বিতীয়টা হল তিনি স্বাধীন হয়ে যান বা তিনি তাঁর পারে চলে যান, একই জিনিস। বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া, অতিক্রম করা যেমন একই শব্দ, ঠিক তেমনি এখানে *অতিমুচ্য* একই অর্থে বলা হচ্ছে। *অতিমুচ্য* শব্দের আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য বলছেন এষণাত্রয়, পুত্রৈষণা, লোকৈষণা আর বিত্তৈষণা, এই

তিনটে এষণার ত্যাগ। পুত্রৈষণা, আমার একটি সন্তান হোক, সন্তান আমার পিতৃকর্মাদি করবে এবং আমিও স্বর্গে সুখে থাকতে পারব। বিত্তৈষণা, সংসারে থাকতে গেলে টাকা-পয়সার দরকার। লোকৈষণার অর্থ হল, মৃত্যুর পর উচ্চ স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা, তার সাথে এই লোকে মান-সম্মান পাওয়ার ইচ্ছাকেও লোকৈষণার সাথে জুড়ে দেওয়া যায়।

এর আগে একটা আলোচনায় বলা হয়েছিল আমাদের জীবন নদীর ধারার মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। গঙ্গা নদী দিয়ে মরা জীবজন্তু, ফুল, কচুরিপানা কত কিছু ভেসে যাচ্ছে। আমরাও ভেসে চলেছি। ভেসে যেতে যেতে আমি কিছু জিনিসকে হাত দিয়ে একটু সরিয়ে দিলাম, মনের মত কিছু হলে সেটাকে একটু কাছে টেনে নিলাম। হঠাৎ কিছু অপ্রিয় জিনিস চলে এলে, জোর ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিচ্ছি। বিশেষ কিছু প্রিয় জিনিস ভেসে যাচ্ছে, কলার কাঁদি ভেসে যাচ্ছে সেটাকে টেনে নিলাম। এটাই স্পেস। সবাই আমরা ভেসে চলেছি, যাকে ভালোবাসি তাকে কাছে টেনে নিচ্ছি, যাকে অপছন্দ করি তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। সত্যিকারের সুখের জীবন তো তাই। সুখের জীবন মানে প্রিয়কে কাছে টানা, অপ্রিয়কে দূরে ঠেলা, একটা স্পেস তৈরী করে নিলাম। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করে এসেছি সবই শুধু প্রিয় জিনিসকে কাছে টেনে নেওয়া, আর অপ্রিয় জিনিসকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া। আমার ভেসে থাকার যে স্পেসটুকু রয়েছে তার বাইরে যেন অপ্রিয় জিনিসগুলো, ব্যক্তিরা সরে যায়, এর বাইরে আমরা কিছুই করিনি। এবার আমি মনে করলাম, নদীর প্রবাহে আমি অনেকদিন ভেসে চলেছি, এবার আমাকে নদীর প্রবাহের বিপরীতে হিমালয়ের দিকে এগোতে হব। উৎসের দিকে মুখ ফেরানো মানেই আমার স্পেসে প্রিয় অপ্রিয় যা কিছু ছিল সব ছেড়ে দিতে হবে। কারণ তারা তো আমার সাথে উৎসের দিকে ফিরে যেতে চাইবে না। এবার নদীর যত আবর্জনা, নোংরা সব আমাকে ধাক্কা মারতে শুরু করল, কারণ ওরা সবাই প্রবাহের অনুকূলে চলছে আর আমি চলেছি প্রতিকুলে। ওর মধ্যেই আমাকে সাঁতরে উৎসের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সব থেকে খারাপ যেটা হবে, আমার যে স্পেস, তথাকথিত আমার যে একটা সুখের সংসার ছিল, সেটা আমার থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ওদিক থেকে যারা আসছে তারা আমাকে দেখে হাসছে, এ কি করছে! সুখের সংসারে আমরা কেমন ভেসে চলেছি। আমার এখন কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। অনেক দিন চেষ্টা করে করে আমি হয়ত সাঁতরে ফরাক্কা পর্যন্ত পৌঁছালাম। কিন্তু এখনও সেই জল, সেই জঞ্জাল, সেই পানা, শেষ আর হয় না। তখন কি করবে? আবার সংসারে নামবে, আবার চলতে শুরু করবে। তবে আধ্যাত্মিক জীবনে যতটুকু দূরত্ব এগিয়ে এসেছে, সেটুকু তার নষ্ট হয়ে যাবে না। সন্ন্যাসীর সাধনায় কখন পতন হয় না, যোগভ্রষ্ট বলে ঠিকই, কিন্তু যে জমিটুকু জয় করে নিয়েছে সেই জমিটুকু তাঁদের হারায় না। কিছুক্ষণের জন্য হয়ত তার যাত্রাটা থেমে যায়, একটা হতাশা আসে ঠিকই কিন্তু তার ভেতরে কিছু একটা আছে যা তাকে আবার ওইদিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইবে। যেখানে থেমে যাবে, সেখান থেকেই আবার সে চলতে শুরু করে, পতন হয়ে যে ফরাক্কা থেকে আবার হাওড়া ব্রীজের তলায় চলে আসবে, সেটা হবে না। গীতাতেও ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন। লড়াই করতে করতে, হয়ত আশা ছেড়েই দিয়েছে যে হিমালয় বলে, গঙ্গোত্রী বলে কিছু আছে। এই করে করে এবার সে হরিদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। হরিদ্বারে পৌঁছে তার বিস্ময়ের ভাব আসে, যত এগোয় তত এখন সে অবাক হয়ে যায়।

এটা একটা উপমা ঠিকই, উপমার সব কিছু নেওয়া যায় না আর নেওয়াটাও ঠিক নয়, তবে আধ্যাত্মিক পথের যাত্রা বাস্তবিক এভাবেই হয়। অতিমুচ্য মানে এটাই, সব এষণার ত্যাগ। এষণাকে নিয়ে চলাটাই প্রবাহের সাথে চলা, আমার একে ভালো লাগে, তাকে ভালো লাগে না, কিন্তু এবার সে বলে দিল আমি আর প্রবাহের সাথে যাব না, অতিমুচ্য মানেই এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ঠাকুরকে একজন বলছেন, মশাই! সংসারে থাকলে কি হয় না? ঠাকুর কি বলবেন! গৃহস্থ মানুষ, একেই সংসারের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার উপর যদি বলি দেন, সংসারে থাকলে কখনই হবে না, বেচারা হতাশায় ভেঙে পড়বে। ঠাকুর তাই বলছেন, হবে না কেন, তিন দিন নির্জনবাস কর। কেউ যদি তিন দিন নির্জনবাস করে তখন সে নিজেই বুঝবে। বুঝে গেলে পরের বার এক সপ্তাহ থাকবে, তারপর এক

মাস থাকবে। থাকতে থাকতে সত্যিকারের শক্তি এসে গেলে তখন সে সব কিছু ফেলে দেবে। আসল যেটা হওয়ার সেটা সংসারে থেকে কখনই হয় না। কিন্তু সংসারে থেকেই সবাইকে শুরুটা করতে হয়। ঠাকুরই হন আর ভগবান বুদ্ধই হন, যিনিই হন না কেন, সবাইকেই মাতৃগর্ভ দিয়ে আসতে হয়। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও বাবা-মার মাধ্যমেই আসতে হয়, এটাই সংসার। কিন্তু তারপরে কত তাড়াতাড়ি বিপরীত মুখী হয়ে প্রবাহের বিরুদ্ধে কত তীব্রতার সাথে যেতে শুরু করছে, সেটার উপরই নির্ভর করে উপলব্ধি কবে হবে। অতিমুচ্য বলতে এখানে এটাই বলতে চাইছেন।

এরপর আচার্য বলছেন যাঁরা বিশিষ্ট বুদ্ধিমত্তার, তার মানে যাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর যাঁদের মধ্যে ধৃতি অর্থাৎ লেগে থাকার ক্ষমতা আছে, এনারাই হলেন বিশেষ বুদ্ধিমান। আমাদের খুব ভালো করে জেনে রাখা দরকার, প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলে আধ্যাত্মিক জীবন কখনই হবে না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানে এই নয় যে তাঁকে বিরাট গাণিতজ্ঞ, কম্প্যুটারের বিশেষজ্ঞ হতে হবে। বলা হয় মস্তিষ্ক হবে ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ ধারালো। ঠাকুর বলছেন, পল্টু চটপট সব কিছু ধরে নেয়। এই চটপট ধরে নেওয়া, সূক্ষ্ম জিনিসকে ধরে নেওয়ার জন্য দরকার সূক্ষ্ম বুদ্ধি। ধী মানে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান সব আবর্জনাকে কেটে ওর মধ্য থেকে আসল জিনিসটাকে ধরে নেন। সহজ দৃষ্টিতে যে জিনিসগুলো উপলব্ধ হয়, নিজের দেহ, স্ত্রী-পুত্র এগুলোর প্রতি যাদের আত্মভাব আছে তাদের দ্বারা হবে না। যারা গুরু কৃপায় শাস্ত্রের কথা শুনে নিল, শোনার পর হঠাৎ তার মনে হল বাস্তবে এগুলো আমার কিছু নয়। কথামৃতে ঠাকুর কত ছোট ছোট গল্প বলে দেখাচ্ছেন, যাকে তুমি আপন মনে করছ, সে কখনই তোমার আপন নয়। যদি কেউ জেনে থাকে আমার একজন আছে, বুঝে নিতে হবে তার দ্বারা হবে না, এই জন্মে সে আর তাকে বেরোতে দেবে না। নতুন নতুন ফন্দি ফেঁদে তাকে বেঁধে রাখবে। আর মহামায়া যদি তার উপর কৃপাদৃষ্টি দেন তাহলে তিনি এমন একটা কিছু করে দেবেন সে যাকে ভালোবাসে হয়ত সে তাকে ছেড়ে চলে যাবে। দ্বিতীয় আরেক ধরণের হয়, একজনের হয়ত সত্যিই এই জগতে কেউ নেই, কিন্তু সে মনে করছে ও আমার। তাতেও একই দুরবস্থা হবে। এই দুজনের মধ্যে একটু ভালো যদি কেউ হয়, মা তাকে দেখিয়ে দেন যে আছে সে ছেড়ে চলে যাবে আর যে ভালোবাসে সে চলে যাবে। আর তা নাহলে দেখিয়ে দেবেন, যে আছে সে কত স্বার্থপর, নোংরা ধরণের। যদি এতে কেউ শিক্ষা পেয়ে যায় তো ভালো, আর শিক্ষা যদি না পায়, মহামায়া আরও তার দিকে ঠেলে দেবে। সেও ধাক্কা মারবে, এও ধাক্কা দেবে, তাতে কি হয়েছে, তু নহি তো ঔর কঈ সহি। যেদিন মন হবে, সত্যিই জগতে আমার কেউ নেই, যার জন্য আমি আমার জীবন দিতে পারি বা আমার জন্য জীবন দিয়ে দেবে, এই বোধটা যার এসে গেছে আর এই বোধের উপর যে দৃঢ়, এই দুটো গুণ যার মধ্যে আছে তাকে বলা হয় ধী। ধী মানে তাই, যিনি বুঝে নিয়েছেন এই দেহ, গেহ এগুলোতে কিছু নেই, এগুলোর মধ্যে নিজেকে দেখাটা বেকার।

এই রকম যাঁরা বুদ্ধিমত্ত, ধী, তাঁদের কি হয়? *প্রেত্য,* মৃত্যুর পর এনারা অমর হয়ে যান। জীবনমুক্তির একটা অবস্থা হয়, জীবদ্দশায় যাঁর জ্ঞান হয়ে যায়, এখানে তাঁদের কথা বলছেন না, কিন্তু এর ভাবটা এখানে প্রযোজ্য, এটাই আবার অন্য জায়গায় আসবে। যাঁরা আত্মাকে জেনে নেন, যাঁদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা যত দিন দেহে থাকবেন তখন কিভাবে থাকবেন তার বর্ণনা করছেন না, যদিও অন্যান্য শাস্ত্রে এর বর্ণনা আছে। কিন্তু এই দেহের পতন হয়ে গেলে এনারা আর ফেরত আসবেন না। তাঁরা অমর হয়ে যান, অনন্তের সাথে এক হয়ে যান। আচার্য এখানে একটা খুব সহজ যুক্তি দিচ্ছেন, দেহ ধারণ করার কোন কারণ না থাকার জন্য আর তার দেহ ধারণ হয় না। মরণধর্মা আর অমৃতকে খুব সহজ একটা ব্যাখ্যা দিয়ে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, মরণধর্মা মানেই যেখানে কোন ধরণের এষণা থেকে গেছে। কোন কিছুর একটা ইচ্ছা যদি থেকে যায়, সেই ইচ্ছা পুর্তির জন্য, আত্মা তো কিছু করতে পারবে না, কিছু করার জন্য আত্মার শরীর দরকার, আত্মা সরাসরি শরীরের জন্য কিছু করতে পারে না, সেইজন্য জীবাত্মার দরকার, মানে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ এগুলো দরকার। কিন্তু তাঁর আর দরকার নেই, কারণ তাঁর এষণাত্রয় ত্যাগ হয়ে গেছে, তাই দেহ ধারণেরও কোন প্রয়োজন নেই। যারই দেহ ধারণ হয়েছে, বুঝতে হবে যে তার একটা কোন প্রবল এষণা ছিল। এখন সবাই রাজা হতে চায়, কিন্তু রাজা

হতে চাইলেই তো রাজা হওয়া যায় না। একটা গল্প আছে, কাশীতে একটা কুয়া আছে, কেউ যদি কুয়াতে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চায় সে তখন যা ইচ্ছা করবে মৃত্যুর পর তাই হবে। এক মুচি ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। কুয়াতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে দেখে পাণ্ডারা দৌড়ে এসে তাকে ধরেছে। ধরে বলছে, আগে বলো মৃত্যুর পর তুমি কি হতে চাও? আগে আমাদের পরিষ্কার করে বলতে হবে, তারপর ঝাঁপ মারবে। মুচি বলছে, মরে আমি ব্রাহ্মণ হতে চাই। পাণ্ডারা বলছে, ঠিক করে ভেবে বল। মুচি তখন ভাবছে, ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মালে ভোরবেলা উঠতে হবে, স্নান করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, পড়া না করতে পারলে পণ্ডিত বেত মারবে, বাচ্চা বয়স থেকে এই দুরবস্থা। নাঃ, আমার ব্রাহ্মণ হয়ে কাজ নেই। তারপর ভাবছে, মৃত্যুর পর আমি ক্ষত্রিয় হব, রাজা হব। তখন আবার দুশ্চিন্তা এলো, যুদ্ধ হলে যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধে মরে যেতে পারি, মরেই যদি যাই তাহলে ক্ষত্রিয় হয়ে লাভ কি হল! তার থেকে ভালো আমি বৈশ্য হব, প্রচুর টাকা-পয়সা হবে। হঠাৎ তার মনে হল, তার গ্রামে একজন বৈশ্য ছিল তার ব্যবসাতে লোকসান হয়ে সব টাকা ডুবে গেছে, পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। অনেক হিসেব করে দেখল, দিনে দুটো করে জুতো তৈরী করে দিতে পারলে আমার খাওয়া-পড়া ভালোই চলে যায়। পাণ্ডারা জিজ্ঞেস করছে, তাহলে মরে তুমি কি হতে চাইছ? মুচিই হব। মুচি তো তুমি এখনই আছ, ঝাঁপ মারার কি দরকার। বাস্তবিক আমাদের সবারই এই অবস্থা। অপরকে দেখে আমরা মনে করি ওর মত অবস্থা হলে আমার ভালো হত। বিচার করে দেখলে তখন দেখা যাবে তার সাথে এই এই ধরণের সমস্যাও জড়িয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, আজকে আমি যা আছি, এর বাইরে আমার অন্য কোন কিছু করার পথ নেই। এখন আমি যে অবস্থায় আছি এটাই আমার পক্ষে উপযুক্ত। এখন যিনি অতিমুচ্য হয়ে গেছেন, যাঁর সব এষণা ত্যাগ হয়ে গেছে, তাঁর তো আর কিছু লাগবে না, তিনি আর শরীর ধারণ করতে যাবেন কেন! যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যায় সে আর কেন শখ করে জেলে যেতে চাইবে। নিজের স্ত্রী-পুত্রদের দেখাতে যেতে পারে, এই জেলে আমি এত বছর কাটিয়ে ছিলাম। কিন্তু এই জ্ঞানে শুদ্ধ আত্মা ছাড়া তো আর কেউ নেই, সেইজন্য কাউকে দেখাবারও কিছু নেই। সংসারে ফিরে না আসার এটা একটা দিক গেল, এরপর আরও অনেক যুক্তি দেখান হবে যে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না তার সংসারে ফিরে আসার।

প্রথম যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমাদের চোখ, কান, নাক এই ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব বিষয়ে কে প্রেরিত করেন, তার উত্তরে বললেন, যিনি পাঠান তিনি এদেরও ইন্দ্রিয়। তাঁকে সবাই জানতে পারে না, ধী পুরুষরাই জানতে পারেন। যে ধী পুরুষ তাঁকে জেনে নেন মৃত্যুর পর তিনি আর এই জগতে ফেরত আসেন না। প্রশ্নটা মূলতঃ ছিল ইন্দ্রিয়গুলিকে কে প্রেরিত করেন। উত্তরে শুধু এটা বলছেন না যে কে পাঠান, তাঁকে জানলে কি হয় সেটাও বলে দিলেন, এখনও কিন্তু আত্মার কথা বলেননি। আমরা আমাদের তরফ থেকে বলে যাচ্ছি। গুরু ধীরে ধীরে শিষ্যকে নিয়ে যাচ্ছেন, যাতে শিষ্যের মনে জানার আরও কৌতুহল জাগে। *শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং*, এই ভাবে বলে যাঁর কথা বলা হল, যাঁকে জানলে আর পুনর্জন্ম হয় না, এবার তাঁর ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন –

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো বিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।।১/৩।।

(সেখানে (ব্রহ্মে) চক্ষু যেতে পারে না, বাণী যেতে পারে না, মনও যেতে পারে না। সুতরাং শিষ্যকে যেভাবে এই ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া উচিৎ আমার জানা নেই, সেই ব্রহ্ম এই রকমটি এভাবেও আমি জানি না। সেই ব্রহ্ম জ্ঞাত বস্তু হতেও ভিন্ন এবং অজ্ঞাত বস্তু হতেও ভিন্ন বলেই আমরা পূর্ব পূর্ব আচার্যদের কাছে শুনে এসেছি, যে আচার্যরা আমাদের কাছে স্পষ্ট ভাবে ব্রহ্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতেন।)

মাঝে মাঝে চিন্তা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়, কেউ হয়ত সংস্কৃত জানে অথচ উপনিষদের ভাবের সাথে কোন পরিচয় নেই আর তার সাথে যদি আচার্যের ভাষ্য নিয়ে প্রথম উপনিষদ পড়তে যায় তখন তার মনে কি রকম সংশয় উৎপন্ন হতে পারে! প্রশ্ন হল কেন, কার দ্বারা, উত্তরটা বলছেন যিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, যাঁর দ্বারা তাঁকে জানতে পারলে কি হয় আর এখানে এসে বলছেন *ন তত্র*, সেখানে। নিজে থেকে পড়ে কেউ কোন দিন এগুলোকে মেলাতে পারবে না। তিনি যিনি আর সেখানে, অর্থাৎ তিনি আর সেখানে এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তার মানে তিনি যা তাঁর অবস্থাও তা, তিনি আর তাঁর পদ, বিষ্ণু আর বিষ্ণুপদ এক, দুটো আলাদা কিছু নয়। এভাবে দেখা যেতে পারে, অমুক মহারাজ কোথায় থাকেন? ইউনিভার্সিটিতে থাকেন। খুব ভালো, তবে এখানে মহারাজ আলাদা ইউনিভার্সিটি আলাদা। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু যা বিষ্ণুপদটাও, বিষ্ণুলোকও তাই। সেইজন্য বলছেন *তদবিষ্ণো পরমং পদম্*, পরম অবস্থা সেটা, এটা যে কোন লোক, কোন রূপধারী ভগবান তা নয়। এটা একটা অবস্থা, এই অবস্থার সাথে এক শুধু জ্ঞানের অবস্থায় হয়, তাছাড়া অন্য কোন কিছুতে হয় না। তিনি আলাদা, তাঁর অবস্থান আরেকটা আর তাঁর কার্যটা আরেক, তা নয়, তিনটেই এক। তিনি যা, তাঁর অবস্থানও তাই, তাঁর কার্যটাও তাই। প্রশ্ন হল কে, আর উত্তরটা হল সেখানে, কারণ দুটো আলাদা কিছু নয়, দুটো এক।

সেইজন্য বলছেন *ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ*। আশ্চর্যের যে, আগের মন্ত্রে বলছেন তিনি ইন্দ্রিয়গুলিরও ইন্দ্রিয় অথচ এখন বলছেন *ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি*, সেখানে চক্ষু যেতে পারে না, *ন বাগ্‌গচ্ছতি*, শব্দ সেখানে যায় না, *নো মনঃ*, মন সেখানে যেতে পারে না। আর তার সাথে বলছেন, চোখ যায় না মানে চোখ দিয়ে দেখা যাচ্ছে না, মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারছে না, সেইজন্য বাণী দিয়ে প্রকাশ করতে পারছে না। একটা জিনিসকে আমি দেখলাম, মন দিয়ে সেই জিনিসটাকে গ্রহণ করলাম আর বাণী দিয়ে বললাম জিনিসটা এই। কিন্তু যাঁর কথা বলা হচ্ছে তাঁকে চোখ দিয়ে জানা যাবে না, চোখ দিয়ে জানা যায় না বলে দিয়ে সব ইন্দ্রিয়কেই বলা হয়ে গেল, জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন কাজ করছে না তখন মন কাজ করবে না। মন যদি তাঁকে ধারণা করতে না পারে বাণী আর তাঁর ব্যাপারে কি বলবে! সেইজন্য গুরু শিষ্যকে বলছেন *ন বিদ্মো ন বিজানীমো*, এই অবস্থায় আত্মতত্ত্বকে তোমাকে আমি কিভাবে বোঝাব জানি না। *ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে*, এই জ্ঞান আমার নিজের নয়, পরম্পরায় আমরা এই জ্ঞানের কথা শুনে আসছি। কি জ্ঞানের কথা? আমাদের আগের আগের গুরুদের কাছে আমার শুনে এসেছি, *অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি*, তিনি বিদিতেরও পারে আবার অবিদিতেরও পারে।

তাই বলে তুমি মনে করো না যে কিছু নেই। কারণ যে জিনিসটা আদপেই নেই তাকেই চোখ দেখতে পায় না, মন ধারণা করতে পারে না, বাণী বলতে পারে না। সেইজন্য আমি তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে পারব না জিনিসটা ঠিক কি। তাই বলে কিছু নেই মনে করে তুমি শূন্য ভেবে নিও না। Objectকেই জানা যায়, কিন্তু তিনি যে কোন object থেকে আলাদা, যে জিনিসগুলোকে জানা যায় না, মায়া বা অবিদ্যা, তারও তিনি পারে। গুরু এখানে নিজের কথা বলছেন না, *ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং*, পূর্বে পূর্বে যে ঋষিরা ছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই আমি এই জ্ঞানের শিক্ষা পেয়েছি। এখানে ভাষা দেখেই বোঝা যায় কেনোপনিষদ অতি প্রাচীন উপনিষদের মধ্যে একটি। কেনোপনিষদ আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগেকার আর তখনকার ঋষিই বলছেন, আমরা পরম্পরায় এই জ্ঞানের কথা এভাবেই শুনে এসেছি। তাহলে এই পরম্পরা কত যুগ ধরে চলে আসছে আমরা কল্পনাই করতে পারব না।

সাধারণ ভাবে দর্শন বলতে আমরা বুঝি যেখানে নিজস্ব একটা মতকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আচার্য শঙ্করকে অনেকে দার্শনিক বলেন, কিন্তু আচার্য দার্শনিক নন, মূলতঃ তিনি ভাষ্যকার। ভাষ্যকারের অর্থ, জিনিসটা যেমন আছে তার অর্থকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া। আচার্যের যদি সত্যিই কিছু থাকে, যেখানে তিনি দর্শন লিখছেন, সেটা একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। উপনিষদ আর গীতাতে তিনি দার্শনিক নন, তিনি এর ব্যাখ্যা করে গীতা উপনিষদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। গীতায় তিনি

বলেই দিচ্ছেন, গীতার অনেক ভুলভাল অর্থ করা হয়, এই ভুলগুলিকে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য এর সহজ অর্থ করে দিলাম। যিনি ব্যাখ্যাকার তিনি অনেকগুলো জিনিসকে সত্য রূপে ধারণা করে নেন আর এটাও তিনি ধরে নেন যে যারা শুনছে তারা কিছু জানে। আচার্য গীতা উপনিষদের ব্যাখ্যা করছেন মণ্ডন মিশ্রের মত শিষ্যদের কাছে। সেইজন্য বলাই হয়, আচার্যকে অধ্যয়ন করা মানে তিনি আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক স্তরে অনেক উন্নত। আচার্য ব্যাখ্যা করার সময় অনেকগুলো শব্দকে যোগ করে দিচ্ছেন, কিছু শব্দকে সরিয়ে দিচ্ছেন, ব্যাখ্যা করার সময় এই জিনিসটা করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে এসব কিছু নেই, পুরোপুরি যুক্তির উপর চলবে, এই রকম হলে সেই রকম হবে, এই ধরণের কোন assumption নেই। এখানে আচার্য নিজের মত বলছেন, যিনি এগুলোকে প্রেরিত করছেন তিনিই ব্রহ্ম, একমাত্র ব্রহ্মই এই জিনিসগুলো করতে পারেন। একমাত্র চৈতন্যই এই কাজ করতে পারে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি চৈতন্য তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে কোন ইন্দ্রিয়, মন জানতে পারে না।

আগে বলা হল তিনি ইন্দ্রিয়েরও ইন্দ্রিয়, এখন বলছেন তাঁকে জানা যাবে না। কেন জানা যাবে না? *স্ব ক্রিয়া অভাবঃ*, নিজের উপর ক্রিয়া করা যায় না। যুক্তিতে বলা হয়, আগুন যেমন সব কিছুকে জ্বালাতে পারে, প্রকাশিত করে কিন্তু নিজেকে জ্বালাতে পারে না, নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে না। যেমন আমার ডান হাত দিয়ে জগতের সব কিছুকে ধরে নিতে পারব কিন্তু ডান হাতকে কোন দিন ধরতে পারব না। কারণ নিজের উপর ক্রিয়া হয় না। একটু আগে বলা হল, তিনি শ্রোত্রিয়েরও শ্রোতা, সেইজন্য তাঁকে শোনা যাবে না। চক্ষু ইন্দ্রিয়েরও তিনি দ্রষ্টা, সেইজন্য তাঁকে দেখা যাবে না। কারণ চোখ নিজেকে দেখতে পায় না। তাহলে যিনি চোখেরও চোখ তাঁকে চোখ কি করে দেখবে! তিনি চক্ষুরও আত্মা, নিজেকে দেখা যাবে না। কানেরও তিনি শ্রোতা, কান সব কিছু শুনে নিতে পারবে কিন্তু নিজেকে কোন দিন শুনতে পারবে না। এটাকেই এখানে বলছেন *স্ব ক্রিয়া অভাবঃ*। স্ব ক্রিয়া অভাবের যুক্তি কেন আনছেন? দ্বিতীয় মন্ত্রে আগেই ওটাকে আটকে দিয়েছেন, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিরও জ্ঞাতা। ইন্দ্রিয়গুলিতো নিজের উপর কাজ করতে পারে না, আর তিনি তো ইন্দ্রিয়েরও বাবা, তাঁর উপর ইন্দ্রিয় কাজ করার কোন প্রশ্নই নেই, খুব সহজ যুক্তি নিয়ে আসছেন। চোখ যেমন চোখকে দেখতে পারে না, তাহলে চোখেরও যিনি চোখ তাঁকে কে দেখতে পারবে, কারণ নিজের উপর তো ক্রিয়া হয় না। কাস্তে সবাইকে কেটে দেবে, নিজেকে কখনই কাটতে পারবে না। তাহলে যিনি দ্রষ্টা তাঁকে কে দেখবে? দেখার কোন প্রশ্নই নেই। চোখ কোন জিনিসের রূপকে গ্রহণ করে নেয়, কোন জিনিসের রূপ যদি না থাকে চোখ সেই জিনিসকে ধরতে পারবে না। ব্রহ্মের তো কোন রূপ নেই, তাই চোখের ধরার কোন প্রশ্নই হয় না। দ্বিতীয়তঃ তিনি চোখেরও চোখ, স্ব ক্রিয়ার অভাব এসে যাচ্ছে। সেইজন্য ব্রহ্ম বা আত্মাকে কোন দিক দিয়েই জানার পথ নেই। কারণ ইন্দ্রিয়গুলো নিজের নিজের বিষয়কেই একমাত্র ধরতে পারে, দ্বিতীয় নিজের উপর ক্রিয়া হয় না।

বাণী যখন কোন কিছু উচ্চারণ করে তখন সেটা হয়ে যায় বাচ্য, যেমন গ্লাশ বললাম, গ্লাশকে চোখ দিয়ে দেখলাম, মনের মধ্যে গ্লাশ জিনিসটা এলো, এবার আমি মুখ দিয়ে গ্লাশ বললাম। বাচ্য এখানে গ্লাশ আর গ্লাশ শব্দটা বাণী রূপে উচ্চারিত হল। কোন জিনিসকে ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরার পর যখন তার জন্য যে শব্দ উচ্চারিত হল তাকে কাব্যিক বা দার্শনিক ভাষায় বলা হয়, বাণী ওই বস্তু পর্যন্ত পৌঁছাল। ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলছেন, ব্রহ্ম আজ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয়নি। শুনে বিদ্যাসাগর বলছেন, আজ একটা নতুন কথা শুনলাম। উচ্ছিষ্ট হওয়া মানে, মন যে বস্তুকে ধারণা করে নিল আর মুখ থেকে যখন ওই বস্তু শব্দ রূপে বাচ্য হয়ে বেরিয়ে আসে তখন ওই বস্তুটা উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মকে মন কখনই ধারণা করতে পারে না, কারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটির সত্ত্বগুণ দিয়ে মন নির্মিত। কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে ওই পাঁচটার কোনটাই নেই, মন তাই এই পাঁচটার বাইরে কোন কিছুই ধরতে পারবে না। তফাৎ হল ইন্দ্রিয়গুলো আলাদা আলাদা ভাবে ধরে আর মন একসাথে পুরোটাকে ধরে। ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যে এই পাঁচটা নেই, সেইজন্য বলছেন ব্রহ্ম *অবাঙ্মনসোগোচরম্*। পরে এর উপর আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।

শব্দ আর শব্দ দিয়ে যে জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে, আর তাই না, যে ইন্দ্রিয়গুলো তার সাথে যুক্ত হয়ে আছে, ব্রহ্ম বা আত্মা এর সব কটার সার, সেইজন্য বাক্ কোন দিন সেখান পর্যন্ত যেতে পারবে না। আচার্য এখানে আত্মাকে নিয়ে বলছেন, আত্মা হলেন সব কিছুর সার, আত্মা বলতে তিনি বলছেন তার ভেতরটা। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের কাজ সবই বহির্গামী আর আত্মা হলেন অন্তর্নিহিত। সেইজন্য বহির্গামী জিনিস দিয়ে অন্তরকে কখন ধরা যাবে না। আচার্য এখানে অগ্নির উপমা নিয়ে আসছেন, অগ্নি সব কিছুকে জ্বালাতে পারে কিন্তু নিজেকে জ্বালাতে পারে না। অগ্নি সব কিছুকে আলোকিত করে কিন্তু নিজেকে আলোকিত করতে পারে না। ঠিক তেমনি নিজের আত্মাকে কেউ জানতে পারে না। আত্মার উপর আত্মার কোন কাজ হয় না। মনের কাজ হল সঙ্কল্প-বিকল্প করা, তার সাথে নিশ্চয় করে। তার মানে বিচার করে করে নিশ্চয় করে, মনের এটাই কাজ। কিন্তু মনও নিজেকে নিয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প করতে পারে না, কোন বস্তুকে নিয়ে করবে, কোন আইডিয়াকে নিয়ে করবে।

রিচার্ড ফাইনম্যান খুব নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী। বিদেশে নিয়ম আছে, যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন তাঁদের বাধ্যতামূলক ভাবে দর্শন পড়তে হত। দর্শনের প্রফেসর একদিন সব ছাত্রদের একটা রচনা লিখে নিয়ে আসতে বললেন। রিচার্ড ফাইনম্যান দর্শনের কিছুই বোঝেন না, পদার্থ বিজ্ঞানের বাইরে কিছু জানেন না। রচনা জমা দেওয়ার শেষ দিন, ওই দিন পেপার জমা না দিলে ফেল করে যাবেন, তখন ফাইনম্যান লিখলেন I think, তারপর লিখলেন I think that I think, আমি ভাবছি যে আমি ভাবছি, তারপরে লিখলেন, আমি ভাবছি যে আমি ভাবছি যে আমি ভাবছি। এই করে পঁচিশ পর্যন্ত হয়ে যাওয়ার পর ওই পেপারটা জমা দিলেন। দর্শনের অধ্যাপক ফাইনম্যানকে ফুলমার্ক্স দিয়ে বাকি ছাত্রদের বললেন, পেপার যদি লিখতে হয় তাহলে এটাকেই বলে পেপার। রিচার্ড ফাইনম্যান ফিলজফিকে কোন দিন গুরুত্ব দিতেন না, ওনার বক্তব্য হল ফিলজফি এভাবেই চলে। এই যে আমি বলছি আমি ভাবছি, তার মানে আমি আমার মনের কার্যকে জানার চেষ্টা করছি, কিন্তু মনকে কখনই জানা যাবে না। মন বাকি সব কিছুর দিকে দৌড়াবে, কিন্তু মন নিজেকে নিয়ে ভাববে, নিজেকে জানা, এই ব্যাপারটা কখনই সম্ভব নয়। ফাইনম্যান যে বলছেন আমি ভাবছি, আমি ভাবছি যে আমি ভাবছি, একটার পেছনে একটাকে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ওখানে পৌঁছাতে পারছেন না। কোটি কোটি বার যদি বলে আমি ভাবছি যে আমি ভাবছি তাহলেও তারপরে আরেকটা আমি ভাবছি লেগে যাবে। মনকে যত জানার চেষ্টা করে যাচ্ছি তখনও কিন্তু মন নিজে আছে, মন কিন্তু থামছে না। সেইজন্য শ্রুতি বলছেন, যেখানে মন থেমে যায়, *যদা পর্যাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ*, না থামা পর্যন্ত মনকে জানা যাবে না। যতক্ষণ মন ক্রিয়া করবে ততক্ষণ মনকে জানা যাবে না। মন থামে কখন? যখন আত্মজ্ঞান হয়। আত্মজ্ঞান ছাড়া মনকে জানা যায় না। কিন্তু যখনই বলছি আত্মজ্ঞানে মনকে জানা যায়, তাহলেও তো মন মনকে জানতে পারল না, কারণ তখনই তো মনের নাশ হয়ে গেল। যে কোন জিনিস নিজের উপর কাজ করতে পারে না। ব্রহ্ম মনেরও আত্মা, তাই মন কি করে ব্রহ্মের ধারণা করবে। চোখের ক্ষেত্রে যে যুক্তি নিয়ে এসেছেন এখানেও সেই একই যুক্তি চলছে। মূল একটা কথাই বলছেন, কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না, মন দিয়ে ধারণা করা যায় না আর বাণী দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করা যায় না।

আচার্য আরেকটা ব্যাপারকে নিয়ে বলছেন, যে কোন জিনিসকে যদি জানতে হয় তাহলে জাতি, ক্রিয়া ও গুণ এই বিশেষণ দিয়ে জানতে হয়। আরও কিছু বিশেষণ আছে, কিন্তু আচার্য যখনই বলেন তখন এই তিনটেতে বেঁধে দেন। জাতি মানে, যেমন ঘোড়া, ঘোড়া রূপে একটা বিশেষ জাতি, গরু আরেকটা বিশেষ জাতি, জাতি রূপে ঘোড়া আর গরু আলাদা হওয়াতে জাতি দিয়ে আমরা জানতে পারছি, এটা ঘোড়া, এটা গরু। দ্বিতীয় ক্রিয়া, জিনিসটা কেমন ক্রিয়া করে সেই ক্রিয়া দিয়ে জানা যায়। আর গুণ, প্রত্যেক জিনিসের কয়েকটা বিশেষ গুণ থাকে, গুণ দিয়ে জিনিসটাকে জানা যায়। যেমন একটা ঘোড়া, ঘোড়া গরু থেকে আলাদা, এই ঘোড়াটা বেশি দ্রুত বেগে দৌড়াতে পারে আর এই ঘোড়াটা লাল রঙের। বিশেষণের যতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে সব বৈশিষ্ট্যকে মোটামুটি জাতি, ক্রিয়া ও গুণ

এই তিনটের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়। এই মোবাইলটা খুব ভালো, ভালো মানে এর সাউণ্ড, রেসেপ্টিভিটি এগুলো ভালো। এই কথা বলে দেওয়ার পর মোবাইল বলতে যত বস্তু আছে, তার জাতি রয়েছে সেখান থেকে এই মোবাইলটা আলাদা হয়ে গেল। তারপর ক্রিয়া, কি রকম কাজ করে। এই কটি বিশেষণকে আচার্য বার বার ব্যবহার করেন।

আমরা ইন্দ্রিয় দিয়েই জানি আর বিচার করেই জানি, শেষ পর্যন্ত জানা যেটা হয় সেটার টেকনিক্যাল শব্দ হল উপমান, উপমান মানে তুলনা করা। আমরা যত কিছু জানি মূল জানাটা হয় উপমান দিয়ে, তুলনা করে করে একটা জিনিসকে জানা হয়। একটা শিশু সবে মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে। তার এখন বোধ বলে কিছু নেই, শুধু দুধ খায় আর ঘুমোয়। কিছু দিন পর তার একটা বোধ হয় যে, খিদে পেলে পেটে যে একটা জ্বালা অনুভব হয় মায়ের দুধ খেলে সেটা চলে যায়। ধীরে ধীরে মায়ের শরীরের গন্ধ, মায়ের কন্ঠস্বর, মায়ের রূপ শিশুর মনে বসতে শুরু করে। এরপর ওর বাবা বা অন্য কোন মহিলা বা পুরুষ ওর সামনে আসছে তখন ওর চোখ দিয়ে যে দৃশ্য ওর মনে যাচ্ছে তখন সে তুলনা করতে থাকে এটা কি সেই, এটা কি সেই, দেখছে মিলছে না। তখন মাকে দেখলে হাতটা এগিয়ে দেয়। যে কোন শিশু মায়ের কাছেই বেশি যায়, তার কারণই হল ও জানে এই আমার খাদ্যের উৎস। বাবাকেও ঘন ঘন কাছে আসতে দেখে। বাচ্চার কাছে যে বেশি যাবে ওর মনে তার ছাপটা বেশি পরে। এইভাবে বাবা আর মা এরপর দাদু, ঠাকুরমা, ধীরে ধীরে তুলনা করতে শুরু করে। শিশু যখন প্রশ্ন করতে শুরু করে তখন খুব সামান্য কয়েকটা, দুটো কি তিনটে জিনিস মাত্র জানে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তার মনে হাজারটা প্রশ্ন আসতে থাকে। তখন তাকে যেটাই বোঝান হোক, ও যতটুকু জানে সেটাকে আধার করেই ওকে বোঝান হয়। এই যে আধার করে বোঝান হয় এটাকে বলে উপমান।

আমাদের যত জ্ঞানরাশি আছে, কলা, বিজ্ঞান, যে শাখার জ্ঞানই হোক সবটাই শেষ পর্যন্ত চলে উপমানের উপরে। উপমান অনেকটা এগিয়ের যাওয়ার পর তারপর যে observations গুলো আসে, আর তার সাথে যুক্তিগুলো আসে, এই তিনটে জিনিসকে মিলিয়ে মিলিয়ে জ্ঞান চলে, কিন্তু উপমান হল এর মূল। যে জিনিসটাকে আমরা জানি না, সেটাকে আমার বর্তমান জ্ঞান দিয়েই তুলনা করে জানা হয়। বিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞানের এত বেশি উন্নতি হয়েছে আর এত দ্রুত হারে হয়েছে যে আর কোন শাখায় কখন এভাবে উন্নতি হতে ইতিহাসে দেখা যায়নি। এর মধ্যে অনেক মজার মজার ব্যাপার আছে, যার মধ্যে একটা মজার হল, যখনই ওনারা এ্যটমকে নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছেন তখন ওনারা বলছেন, এই রকম তো জগতে দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা তখন তাঁদের যে existing knowledge সেটাকে দিয়ে একটা mental image তৈরী করছেন। এরপর যেটা পেলেন, সেটাকে নিয়ে কিছু করছেন কিন্তু লোকেরা বুঝতে পারছে না, কত রকম আলোচনা, কনফারেন্স করছেন, সেখানে ব্যাখ্যা করছেন। বিজ্ঞানীদের কাছে তখন সব থেকে বড় সমস্যা ছিল, এই যে জিনিসটা চলে আসছে এটা কিন্তু এই সংসারে দেখা যায় না। দেখা না গেলে লোকেদের বোঝান যাবে না, কারণ উপমান ছাড়া কিছুই চলবে না। হাইজেনবার্গ অনেক পরিশ্রম করে, প্রচুর খাটাখাটনি করে অনেক কষ্টে একটা থিয়োরী নিয়ে এলেন (A x B is not = B x A)। গণিতের মৌলিক নিয়ম হল A x B is always = B x A। হাইজেনবার্গ এখন বিপদে পড়ে গেছেন, উনি জানেন যে থিয়োরী আমি লিখেছি এটা ঠিক। কারণ তিনি একটার পর একটা derived করে এগিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হল, একটা জায়গায় গিয়ে হয়ে যাচ্ছে A x B is not = B x A। এগুলো খুব জটিল ব্যাপার, আমরা এর কিছুই বুঝতে পারব না। প্রথমে অনেকের কাছে এই পেপার যেতে সবাই নাকচ করে দিল। হঠাৎ একজনের কাছে যেতেই তার মনে পড়ল মেট্রিক্সে নতুন কি একটা এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে অনেকের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করেছে। তারপর দেখা গেল গণিতে মেট্রিক্স বলে একটা শাখা আছে তাতে A x B প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে is not = B x A। এখন তো এগুলো ক্লাশ টেন ইলেভেনে পড়ানো হয়। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন দেখলেন গণিতে এই রকম আছে, সেটাও সবে নতুন এসেছিল, বেশি পুরনো ছিল না। তার মানে বিজ্ঞানীরাও এই জগতের জ্ঞানের বাইরে যেতে পারেন না। কিন্তু এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পর ওই

নতুনটাও জগতের জ্ঞানের মধ্যে চলে এলো। যার জন্য আমরা যদি ফিজিক্স বুঝতে যাই আমরা বুঝতে পারব না। কারণ আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সাথে এই নতুন জ্ঞানের এত গ্যাপ যে আমরা উপমানে যেতেই পারব না। কিন্তু যাঁরা খুব উচ্চমানের পদার্থ বিজ্ঞানী তাঁরা একটা বাক্য বললেই বুঝে নেবেন, কারণ তাঁর ওটার জন্য জমি তৈরী হয়ে গেছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস হয়। ক্ষেত্র তৈরী নেই বলে অনেক ফাঁক হয়ে গেছে। যাঁরা এই লাইনে অনেক দিন আছেন তাঁরা একটা শব্দ বললেই ধরে নেন এই শব্দ দিয়ে কি বোঝাতে চাইছেন।

উপমান ছাড়া আমাদের হবে না, existing knowledge যদি না থাকে তাহলে নতুন যে জ্ঞান আসছে এটাকে আমরা ধারণা করতে পারব না। এই যে বিভিন্ন জায়গায় শাস্ত্রের ক্লাশ হচ্ছে, এর দ্বারা existing knowledgeএর ভিতকে মজবুত করে দেওয়া হচ্ছে। নতুন যে জিনিস গুলো এখানে ঢুকছে সেগুলো ধীরে ধীরে ভেতরে বসতে থাকে। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে কি হয়, ব্রহ্মের না আছে কোন জাতি, না আছে কোন ক্রিয়া, কারণ *স্ব ক্রিয় অভাব* আর না আছে কোন গুণ, সেইজন্য ব্রহ্মকে কাউকে বোঝান যায় না। শিষ্য এসে গুরুকে প্রশ্ন করছেন *কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ*, মনকে কে প্রেরিত করেন? গুরু বলছেন, ওখানে যাঁর কথা বলা হচ্ছে আর সেই যে অবস্থা, দুটো এক। ওই জায়গায় মন যেতে পারে না, সেইজন্য ওর ব্যাপারে বলা যাবে না, আরও মুশকিল হল, যে বস্তুর কথা বলা হচ্ছে তাঁর না আছে জাতি, না আছে ক্রিয়া আর না আছে তাঁর গুণ। সেইজন্য যে তোমাকে উপমান পদ্ধতিতে বলব যে এটা এই রকম, সেটাও সম্ভব নয়। খুব প্রচলিত উপমা যদি নেওয়া হয়, একজন জীবনে কোন দিন সিংহ দেখেনি, এবার সে সিংহ শব্দটা শুনে জানতে চাইছে সিংহ জিনিসটা কি। তাকে তখন বলা হবে, বেড়াল দেখেছ? হ্যাঁ দেখেছি। ওরই বড় সাইজ, হুম্ করে বিশাল আওয়াজ করে, ঘাড়ে বড় বড় চুল। এইভাবে বর্ণনা দেওয়া হল। এবার সে চিড়িয়াখানায় গিয়েছে, সিংহ দেখতেই সে বুঝে গেল, আরে এটাই তো সিংহ। তাকে আর বলে দিতে হবে না যে এটাই সিংহ। সিংহের এই জ্ঞানটা তার উপমান পদ্ধতিতে এসেছে। আমাকে কিছু জিনিস বলে দেওয়া হয়েছে, তার সাথে কিছু মিল আছে কিছু মিল নেই। মিল কি রকম হয়? জাতি, ক্রিয়া ও গুণ এই তিনটে দিয়ে। ব্রহ্মের জাতি, ক্রিয়া ও গুণ কোনটাই নেই, আমরা ব্রহ্মের ধারণা করব কি দিয়ে! সেইজন্য আমি জানি না, *ন বিদ্ম ন বিজানীমো*। এইজন্য বোঝাতে পারব না যে এটা object নয়, শুধু object নয়, এটা যদি কোন পদার্থ বা বস্তু হত আমি বলতাম। মন দিয়ে বস্তুকে গ্রহণ করে বাণী দিয়ে বলতাম। দ্বিতীয় তাঁর যদি জাতি, ক্রিয়া ও গুণ থাকত তাহলেও বলতে পারতাম। কোন দিক থেকেই আমি তোমাকে বোঝাতে পারছি না। যে জিনিসটাকে নিয়ে এখানে আলোচনা চলছে, সেই জিনিসটাকে ধারণা করা কত কঠিন হতে পারে, এটা আজকে শুধু নয়, তখনকার দিনের আচার্য নিজের শিষ্যকে বলছেন, এই এই কারণে ব্রহ্মের ব্যাপারে তোমাকে কিছু বোঝান যাবে না।

সেই কথাই এখানে বলতে চাইছেন, যখন উপদেশ দেওয়া হয়, কোন জিনিসকে জানানো হয়, প্রতীতি করানো হয়, তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আচার্য শিষ্যকে এই যে বলছেন *ন বিদ্ম ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদ্*, আমি বাপু জানি না তোমাকে আমি কিভাবে বোঝাব, তার মানেই হয় একটা কিছু বস্তু আছে, কিন্তু আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আচার্য এটা বলছেন না যে, সেই রকম কিছু নেই, কিন্তু বলছেন আমি তোমাকে বোঝাতে পারছি না। তাই বলে জিনিসটা যে নেই তা নয়। অন্যান্য জিনিসকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ বা উপমান প্রমাণ দিয়ে জানা যায়, কিন্তু আত্মার কথা, ব্রহ্মের ব্যাপারে শাস্ত্র ছাড়া জানা যায় না, অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণ ছাড়া হয় না। শাস্ত্র প্রমাণ মানে, এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বিচার করে অর্থাৎ মন দিয়েও হয় না। এটাকে জানতে গেলে একমাত্র শাস্ত্র দিয়েই জানা যাবে। শাস্ত্র মানেই গুরু পরম্পরায় আসছে বলেই জানা যায়। সেইজন্য বলছেন *ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং*, আগের আগের ঋষিরা যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই রকমই বলে গেছেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা এই রকমই শুনেছি। এই কথা বলার সাথে সাথে শাস্ত্র পরম্পরাতে চলে গেলেন।

আমরা যে বলি ঠাকুর ভগবান, এটা আমাদের মুখের কথা। ঠাকুর ভগবান, এই কথায় বিশ্বাস হওয়া কি অতই সোজা! ঈশ্বর আছেন এই জিনিসটাকে বোঝা কি অত সহজ! যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে ঈশ্বর আছেন, সে কি আর জগতে কোন কিছুর সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখবে! তার মানে, আমাদের সবার মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে তিনি আছেন। এই বিশ্বাসের পেছনে রয়েছে আচার্যদের পরম্পরা। আমি যাঁকে শ্রদ্ধা করি তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি আরেকজনের কাছে শুনেছেন, এইভাবে পরম্পরায় চলে আসছে বলে এই বিশ্বাসটাও চলে আসছে, এটাকে বলে শাস্ত্র প্রমাণ। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে আত্মাকে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা এই কথা বলেছেন, এটাই প্রমাণ। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, মা ছেলেকে বলে দিয়েছে ও তোর দাদা, ছেলে বিশ্বাস করে নেয় সে আমার দাদা, তা সে যে জাতেরই হোক। কারণ ছেলে মাকে বিশ্বাস করে, মার কথাই তার কাছে প্রমাণ। ঠিক সেই রকম শাস্ত্র বলে দিয়েছে এটাই প্রমাণ, শাস্ত্র সেই উপলব্ধিবান ঋষিদের কথাই বলছে।

তাহলে কি এখানেই শেষ হয়ে যাবে? না, এখানে শেষ হবে না। একটা একটা কথা দিয়ে তাকে এগিয়ে দেবেন, আর শাস্ত্র কি বলছে সেটাও বলছেন। শাস্ত্র কি বলছে? পাছে তোমার এই ধারণা না হয়ে যায় যে ব্রহ্ম বলে কিছু নেই, তাই তখন বলছেন *অন্যদেব তদ্বিদিতাদ্*। বিদিত মানে যে জিনিসকে জানা যায়, যে কোন objectকে জানা যায়। তুমি না জানতে পার কিন্তু কেউ না কেউ জানেন, এখানে কেউ না জানুক অন্যত্র কেউ না কেউ জানে। বস্তু মানেই তাকে কেউ জানে। এই জানা জিনিসটাকে বলে বিদিতক্রিয়া, বিদিতক্রিয়া থেকে আসে বিদিত। যে কোন জিনিসকে যদি জানা যায়, বস্তু না হলে তো জানা যাবে না, বলছেন, জ্ঞাতব্য যে কোন বস্তু থেকে ব্রহ্ম আলাদা। যদি কোথাও কেউ জেনেছে তাহলেই সেটা জ্ঞাতব্যের মধ্যে এসে যাবে, অর্থাৎ এই বস্তুকে জানা যায়, আত্মা তার থেকে আলাদা। তাহলে কেউ যদি বলে ঈশ্বরকে জানা যায়, বুঝতে হবে তার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। এই কারণে আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলা হয় স্বসংবেদ্য, যে জানে সেই একমাত্র জানে। কারণ তিনি হলেন জ্ঞাতা, মন যখন একেবারে শান্ত হয়ে যায়, মনের ক্রিয়া সব বন্ধ হয়ে যায় তখন যিনি আছেন তিনি ভেসে ওঠেন। তখন দেখেন এটাই তো, ততক্ষণে ওটা আবার ঢাকা পড়ে যায়। আত্মার জ্ঞান বা ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বর জ্ঞান কখনই বস্তু রূপে হয় না, আমি রূপে হয়, কারণ ওটাই আমার স্বরূপ। ঠাকুর যখন মা কালীকে দেখছেন তখনও তিনি মা কালীর সাথে নিজেকে এক দেখছেন। এমনিতে ঠাকুর মা কালীকে কখন দিগম্বরী রূপে দেখছেন, ছোট মেয়ের মত দেখছেন সেখানেও তিনি বস্তু রূপে দেখছেন না, চৈতন্য রূপে দেখছেন। যিনি চৈতন্য তিনিই আসল জ্ঞাতা। আমরা যে ঈশ্বর দর্শন বলি, আমরা এগুলো ধারণা করতে পারি না বলে মুখের কথা হিসাবে বলতে থাকি। যে কোন জিনিস যদি কোথাও কারুর জানা হয়েছে তাহলে সেটা হয়ে যাবে বিদিত বস্তু, বিদিত বস্তু মানেই আত্মা তার থেকে আলাদা। যে বস্তুর নাম আছে, যার রূপ আছে, তাকে কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও, কখনও না কখন দেখেছে এবং জেনেছে। মূল কথা হল ব্রহ্ম বস্তু নন।

তার সাথে বলছেন, বস্তু যদি না হয় তাহলে *অবিদিত*। এখানে অবিদিতকে বলছেন অবিদ্যা রাশি। কোন বস্তু না হতে পারেন, কিন্তু ব্যষ্টি রূপে যে সম্পূর্ণ অজ্ঞান, মায়া, সংসারের যে ব্যষ্টি রূপ এটাই তাহলে ব্রহ্ম। না ব্রহ্ম তার থেকেও আলাদা। সেইজন্য বলছেন *অবিদিতাদধি*, অধি মানে উপরে, যিনি অধিষ্ঠান করেন। আচার্য এখানে খুব সহজ যুক্তি দিয়ে বলছেন, যে জিনিসটা যার থেকে উপরে থাকে তার মানেই সেই জিনিসটা আলাদা। যেমন এই গ্লাশ টেবিলের উপরে আছে, তার মানেই গ্লাশ টেবিল থেকে আলাদা। জলের উপর বরফ ভাসছে, তার মানে জল আর বরফ আলাদা। আমরা বলতে পারি দুটোই H_2O, হতে পারে কিন্তু বস্তু রূপে আলাদা। আমরা বলছি মায়াধীশ, মায়ার উপরে বসে আছেন, তার মানে তিনি মায়া নন। আচার্যের যুক্তি এত সরল অথচ এত সূক্ষ্ম স্তরে চলে যে এই জিনিস আচার্যের পক্ষেই সম্ভব। যেমনি বলে দিলেন *অবিদিতাদধি*, অবিদিতের উপরে, তার মানে অবিদিতা থেকে তিনি আলাদা। অন্য দিকে সমস্ত বস্তু থেকেও আলাদা। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অবিদ্যা, তার উপরে, তার থেকে আলাদা। তার মানে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। অন্য দিকে বলছেন শ্রোত্রেরও শ্রোত্র,

মানে আত্মা। একদিকে বলছেন ইন্দ্রিয়েরও জ্ঞাতা, মানে আত্মা। এটাকেই একই নিঃশ্বাসে বলে যাচ্ছেন অবিদ্যারাও উপরে, মানে ব্রহ্ম। তার মানে আত্মাও যা ব্রহ্মও তা। খুব সরল যুক্তি। কিন্তু চট করে ধরা যাবে না। শুরুতে বলছেন ইন্দ্রিয়েরও ইন্দ্রিয়, মনেরও মন, তার মানে ভেতরে চলে যাচ্ছেন। বলার পর বলছেন তোমাকে বোঝান যাবে না।

কেন বোঝান যাবে না? ওটা কোন বস্তু নয়, ঠিকই তো আত্মা তো কোন বস্তু নন। কিন্তু তারপরেই কি বলছেন? অবিদিত, অবিদিত মানে প্রকৃতি, যাঁর কথা বলা হচ্ছে তিনি প্রকৃতিরও উপরে, তার মানেই তো তিনি ব্রহ্ম। তার মানে যিনি বেদন করছেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের কার্য জানছেন, তিনিও যা পরমব্রহ্মও তাই, দুটো এক। আত্মাই ব্রহ্ম, এটাই উপনিষদের মূল বক্তব্য। কারণ শুদ্ধ চৈতন্যে কখন বিভাজন হয় না। বস্তুতে বিভাজন হয়, চৈতন্যে কখনই বিভাজন হতে পারে না। বিভাজন মানেই কোন জিনিসকে দিয়ে বিভাজন করা, দুটো আলাদা জিনিস। যিনি বিভাজন করছেন আর যেটাকে বিভাজন করা হচ্ছে দুটো আলাদা হবে। যেমন মাখন, মাখনকে টুকরো করতে ছুরি লাগবে, মাখন আর ছুরি দুটো আলাদা। ব্রহ্মকে যদি বিভাজন করতে হয় তাহলে ব্রহ্ম থেকে আলাদা কিছু নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া তো কিছু নেই বিভাজন করবে কি দিয়ে! সেইজন্য বলছেন চৈতন্যের বিভাজন হয় না। তাই আত্মাও যা ব্রহ্মও তাই।

এই যে আত্মার কথা বলা হচ্ছে, ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে, এখানে কখন কোন সাধন লাগে না, কোন ক্রিয়া হতে পারে না। কারণ এটাই চিৎজ্যোতি, চিৎ মানে চৈতন্য, তিনি চৈতন্যজ্যোতি, তিনি চৈতন্য স্বরূপ। বলছেন, এই সর্বাত্মা, যিনি সর্ববিশেষরহিত, এর মধ্যে কোন বিশেষ নেই, বিশেষ নেই মানে জাতি, ক্রিয়া ও গুণ নেই আর চৈতন্য স্বরূপ, এর যে বাক্যগুলো যেটা দিয়ে তাঁর ব্রহ্মত্ব নিরুপণ করা হয়, এই একই কথা আমাদের পূর্ব পূর্ব ঋষিরা বলে এসেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, পূর্বে পূর্বে যে ঋষিরা ছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন শব্দ দিয়ে যে ব্রহ্মের বর্ণনা করেছেন, সেই ব্রহ্মই আত্মা, সেই আত্মা সবারই ভেতরে আছেন, সেই আত্মা দিয়েই সমস্ত ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের কার্যকে জানা যায়, আত্মা না থাকলে জানা যাবে না। ইন্দ্রিয় কখনই জানতে পারে না, এই কথাটাই আমরা প্রথম থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করে আসছি। এই আত্মার জ্ঞান *ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং*, আচার্যের কাছেই শোনা যায়। আচার্য শঙ্কর এখানে নিজে থেকে যোগ করে বলছেন, কেউ যদি প্রখর যুক্তিবান হয়, প্রচুর তপস্যা করছে, জপ করছে, সমস্ত বেদ জানে, মেধা আছে, তাতেও আত্মাকে জানা যাবে না। যিনি পরম্পরায় আচার্যের মুখ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন একমাত্র তিনিই এই জ্ঞান পান, তাছাড়া এই জ্ঞান হবে না। একমাত্র গুরুমুখে শুনেই এই জ্ঞান হবে। গুরুর বৈশিষ্ট্য মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, *শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ*, যিনি বেদ জানেন আর ব্রহ্মনিষ্ঠ, এই ধরণের আচার্য যখন বলেন তখনই একমাত্র এই জিনিসটাকে জানা যায়। ঋষিরা যে কথাগুলো বলে গেছেন, ঋষিদের সেই পরম্পরায় শুনে আসছেন, সিদ্ধাচার্য যখন বলবেন তখনই একমাত্র জানা যায়। সেইজন্য বলছেন *ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে*। *ব্যাচচক্ষিরে*, ওই আচার্যরা এর ব্যাখ্যা করেছেন। ওইটাকে তুমি পরম্পরার আচার্যের কাছে শোন, ওটাকে মান, সেখান থেকে এবার নিজের জীবনকে তৈরী কর তাহলেই তুমি জানতে পারবে, এছাড়া আত্মার ব্যাপারে বা ব্রহ্মের ব্যাপারে জানার অন্য কোন পথ নেই।

এই যে তিনটে মন্ত্রের আমরা এত দীর্ঘ আলোচনা করলাম, সংক্ষেপে চারটে বাক্যে বক্তব্য হল; প্রথম বাক্য আমার যে জীবন এই জীবন কার দ্বারা চলছে? এটা হল প্রশ্ন, এর উত্তরে দ্বিতীয় বাক্যে বলছেন আত্মাকে দিয়ে চলে, তৃতীয় বাক্য আত্মাই ব্রহ্ম আর চতুর্থ বাক্য হল আত্মার ব্যাপারে যদি জানতে হয় তাহলে একমাত্র পরম্পরায় আচার্য বা গুরুর কাছ থেকে জানতে হবে। তার সাথে এটাও বলে দিচ্ছেন, যদিও সেই ভাবে কেনোপনিষদের মূল উদ্দেশ্য নয়, যিনি আত্মাকে জেনে যান তাঁর মুক্তি হয়ে যায়। কেনোপনিষদের মূল উদ্দেশ্য হল আমার জীবন কাকে দিয়ে চলে। কিন্তু যাঁকে দিয়ে চলে তাঁকে জানলে কি হয় সেই ফলটাও সাথে সাথে বলে দিচ্ছেন যে, যিনি আত্মাকে জেনে যান তাঁকে আর

জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খেতে হবে না। যদি কেউ বলে আমার আবার জন্ম হলে ক্ষতি কি! তাহলে ভাই উপনিষদের জ্ঞান তোমার জন্য নয়। এখান থেকে এবার উপনিষদ শুরু করবেন, আচার্যরা কি বলেছেন পরের মন্ত্র থেকে শুরু করছেন।

যদ্‌বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।১/৪।।

(বাগেন্দ্রিয় বা বাণী দ্বারা যাঁকে প্রকাশিত করা যায় না অথচ যাঁর দ্বারা বাণী প্রকাশিত হয় তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জানবে, যাঁকে (দেশকালবাঞ্ছিত বস্তু) লোকেরা সোপাধিক রূপে উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নন।)

পর পর এবার যে কটি মন্ত্র আসছে, অন্য দিক দিয়ে এই মন্ত্রগুলির গুরুত্ব আছে। শিষ্য গুরুর কাছে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, আমরা এই প্রশ্নকে সাইকোলজিক্যাল বা নিউওরোলজিক্যাল বা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন বলতে পারি। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গুরু ব্রহ্ম তত্ত্ব বললেন।

এই মন্ত্রের প্রথম অংশ আগে ছুঁয়ে গেছেন, যেখানে আমরা শ্রোত্র, চক্ষু নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এখানেও একই জিনিস এবার বাক্ দিয়ে আসছে। *যদ্‌বাচাহনভ্যুদিতং*, যাঁকে বাণী দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, *যেন বাগভ্যুদ্যতে*, কিন্তু যাঁর থেকে বাণীর জন্ম হয়, *তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি*, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জানবে, এই পর্যন্ত পরিষ্কার, কোন সংশয় নেই। কিন্তু পরের অংশে বলছেন, *নেদং যদিদমুপাসতে*, এখানে এসে একটা জোরালো ধাক্কা দিয়ে একটা দর্শন দিচ্ছেন। এই মন্ত্রটি দুটো অংশে ভেঙে যায়, প্রথম অংশটা হল আগের আগের মন্ত্রেরই ধারাবাহিক আর দ্বিতীয় অংশে একটা নতুন দর্শন শিষ্যকে দিচ্ছেন, যেটা পর পর কয়েকটা মন্ত্রে আসতে থাকবে। উপনিষদে যখনই কোন কথাকে বার বার বলবেন তখনই বুঝতে হবে যে জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর জটিল তাই বার বার বলছেন, তা নাহলে বলবেন না। *নেদং যদিদমুপাসতে* পর পর কয়েকটা মন্ত্রে আসবে। এর উপর আলোচনা করার আগে একটা বিষয়ের উপর আমাদের আলোকপাত করা দরকার। বিষয়টা সরাসরি এই মন্ত্রের সাথে হয়ত অতটা জড়িত নয়, কিন্তু এর পশ্চাৎপটটা বুঝে নিলে মন্ত্রের বক্তব্য ধারণা করা সহজ হয় যাবে।

আমরা সবাই কথা বলি, কথা বলার সময় শব্দের ব্যবহার করি, অথচ আমরা একবারও ভেবে দেখি না এই শব্দগুলো কোথা থেকে আসে, কিভাবে আসে। ছোটবেলায় বাবা-মার কাছে, পরে স্কুলে শিক্ষকদের কাছে আমরা অনেক ভালো ভালো শব্দ শিখেছি, সেইজন্য অনেক সময় আমরা ভালো শব্দ বলি, অনেক সময় কটূ শব্দ বলি, অনেক সময় সত্য কথা বলি আবার অনেক সময় মিথ্যা কথাও বলি। অনেক সময় নরম স্বরে কথা বলি, অনেক সময় চেঁচিয়ে কথা বলি। এই কথা বলার কত রকমের বৈচিত্র্য আছে। এর উৎস কোথায়? এর উৎস হল বাগেন্দ্রিয়। বাগেন্দ্রিয় কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত চলে জানা দরকার। আমরা জানি কন্ঠ থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত বাগেন্দ্রিয়ের কার্য চলে। তার সাথে নাসিকাও অনেক সময় জড়িয়ে যায়, যেমন অনেকে নাকিসুরে কথা বলে। মোটামুটি শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া যে অর্গান দিয়ে কাজ করে, নাক দিয়ে যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া হয় তেমনি মুখ দিয়েও নেওয়া যায়, বাগেন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এই অর্গানের মধ্যেই চলে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, পশু, পাখি, মাছ এদেরও একটা vocal sytem আছে, গরুও ডাকে, ছাগলও ডাকে আর ওদেরও vocal organ মানুষের মতই। অথচ আমরা জানি কুকুর, গরু, ছাগল কোন পশু পাখিই মানুষের মত কথা বলতে পারবে না। অথচ মানুষের vocal systemএর সাথে পশু পাখির vocal systemএ কোন তফাৎ নেই। এর একটাই কারণ, মানুষ তার জিহ্বাকে যেমন খুশি খেলাতে পারে কিন্তু পশু পাখিরা পারে না। আমাদের জিহ্বা পুরো আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেইজন্য বাগেন্দ্রিয়ের ব্যবহারের সময় মাঝে মাঝে বলে তোমার জিভ সামলে রাখ, হিন্দীতে বলে তেরা জিহ্বা খিঁচ লুঙ্গা। তোর জিভ টেনে নেব কথাটা আমরা একটু বাড়িয়ে বলছি, কারণ কথা বলাটা শুধু জিহ্বা দিয়ে হয় না। ধ্বণি আর শব্দের বড় তফাৎটা হয় জিহ্বার জন্য। আওয়াজটা ভেতর থেকে আসে আর জিহ্বাটা নাচে, পশুদেরও নাচে। পশুদের নাচে বলে

ওরা গলা দিয়ে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ বার করে। কিন্তু মানুষের মত ওরা জিহ্বাকে খেলাতে পারে না। সেতার বা সরোদ বাদকরা তারকে নিজের মত খেলাতে পারে, কথা বলার সময় বাতাস যেটা মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে জিভ ওটাকে এমন ভাবে নাচায় যার জন্য আওয়াজ হতে শুরু হয়ে যায়। যখন 'সা' বলছি তখন জিভ পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে, 'ট' বলছি জিভ সামনের দিকে চলে আসছে, এক একটা শব্দে জিভ আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করছে, জিভ কখন সামনে যাচ্ছে, কখন পেছনে যাচ্ছে, কখন দাঁতে লেগে থাকছে, আবার কখন জিভ থেমে থাকছে, যেমন 'প' বা 'ফ' বলছি জিভ থেমে যাচ্ছে, 'অ' বলতে গিয়ে জিভ পুরো silent থাকছে। বাতাস যেটা বেরোয় এই বাতাসকে জিভ পুরো খেলায়। আমরা যখন বাগেন্দ্রিয়কে নিয়ে কথা বলি তখন সেখানে যেহেতু জিহ্বা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই অনেক সময় বলি জিহ্বাতে সরস্বতীর অধিষ্ঠান। আর সরস্বতীর আরেকটা নাম বাগদেবী। তার মানে বাগেন্দ্রিয়ের যদি কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হন সাধারণ ভাবে বলি বাগদেবী, কিন্তু বেদান্তের দিক দিয়ে বাগেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন অগ্নি। তবে ইন্দ্রিয়, শব্দ, শব্দের অর্থ, তার জ্ঞান সব মিলিয়ে আমরা বলি বাগদেবী হলেন সরস্বতী।

বাক্ কোথা থেকে এসেছে এই নিয়ে অনেক রকম মত আছে। অনেকের মতে মানুষের মধ্যেই বাক্ বিবর্তিত হয়েছে, আর আমাদের যে দশটি ইন্দ্রিয় আছে তার মধ্যে বাক্ ইন্দ্রিয় সবার শেষে উন্নত হয়েছে। মানুষের যা আছে পশুদের সবারই তাই আছে, কিন্তু পশুর মধ্যে বাক্ (speech) নেই। শব্দ সবারই আছে কিন্তু পশুদের বাক্ speechটা নেই। মানুষের ক্ষেত্রে যখন ইন্দ্রিয় বলে, ইন্দ্রিয়তে শব্দ বলা হয় না, বলা হয় বাক্। শব্দ আর বাক্ দুটো আলাদা জিনিস, পশু মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে পারে কারণ ধ্বণি যন্ত্র তাদেরও আছে, কিন্তু বাক্ নেই। আমাদের এখানে যখন ইন্দ্রিয় বলা হয় তখন বলছেন *ন বাক্পাণি পাদং ন চ উপস্ত পায়ু*, ধ্বণি বলছেন না, বলছেন বাক্। এই বাক্ মানুষ আর পশুর মধ্যে তফাৎ করে দিচ্ছে। বলা হয় অনেক কিছুতেই মানুষ শ্রেষ্ঠ, মস্তিষ্কে পশুদের থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পশুদেরও মস্তিষ্ক আছে কিন্তু কম উন্নত। কোনটাতে পশুরা বেশি উন্নত, কোনটাতে মানুষ বেশি উন্নত। কিন্তু বাক্, এই ব্যাপারে একমাত্র মানুষই শ্রেষ্ঠ, আর কারুর নেই। বাকিরা শুধু শব্দ করতে পারে কিন্তু মানুষ স্পষ্ট বাক্ তৈরী করতে পারে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হল বাক্এ। বেদে বিভিন্ন জিনিসের যত অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেবতা আছেন কিন্তু তার মধ্যে একমাত্র বাক্ ইন্দ্রিয়, যার ইন্দ্রিয়ের নামও বাক্, তার কার্যও বাক্ আর তার দেবীর নামও বাক্, বাগদেবী। দেবী বাক্, ইন্দ্রিয় বাক্, এর কার্যটাও বাক্, খুবই অসাধারণ।

বাক্ আমাদের কাছে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের যে উন্নতি, এই উন্নতির মূলে হল বাক্। মা নিজের সন্তানকে প্রথম শিক্ষা দেয়, ছাগলও তার বাচ্চাকে শেখায়, জিম করবেটের বর্ণনা আছে কিভাবে ছাগল তার বাচ্চাকে শেখায়, গরুও বাছুরকে শেখায়, খুব প্রাথমিক ভাবে শেখায়। তাই দশ হাজার বছর আগে গরু যা ছিল আজও গরু তাই আছে। মানুষ তা নয়, বাক্কে মানুষ transmit করে। যদি দেখে এই বাক্টা হারিয়ে যাবে তখন সে লিখে রাখে। সেইজন্য লেখা জিনিসটা একেবারেই অসাধারণ ব্যাপার। মজার ব্যাপার হল, আমি কোন কিছু মুখে বলে দিই আর লিখে দিই, দুটোই কিন্তু বাক্। সেইজন্য বাক্ হল সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ, ইন্দ্রিয়টাও বাক্, যে কাজটা করছে সেটাও বাক্, তার দেবীর নামও বাক্, আর যখন লিখছে তখনও বাক্ আর বলছে যখন তখনও বাক্। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনও এই ইন্দ্রিয় পুরোদমে কাজ করে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো থেমে যায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় যদি সব থেকে বেশি কাজ করে তাহলে সেই ইন্দ্রিয় হল বাক্। সেইজন্য আমরা স্বপ্নেও কথা বলি, বাক্ এর কাজ শুধু জাগ্রত অবস্থাতেই চলে না, স্বপ্নেও চলে। বাক্ ইন্দ্রিয় এত গুরুত্বপূর্ণ যে, দেখা যায় যারা বোবা, কালা, যারা শুনতে পায় না, বলতে পারে না, তারাও আকার ইঙ্গিতে তার মনের কথা ব্যক্ত করে দেয়। আর যদি কোন কালা, বোবা ভালো ভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে, সাধারণ অবস্থায় কেউ তাকে আলাদা করে বুঝতেই পারবে না যে কালা বোবা। কারণ সেখানেও বাক্ ইন্দ্রিয় পুরোদমে কাজ করছে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় তার বিকল হয়ে গেছে কিন্তু বাক্ ইন্দ্রিয় বিকল হবে না।

হেলেন কেলার জন্ম থেকেই কালা, বোবা আর তার সাথে অন্ধ ছিল। ওর কাছে কোন ইনপুটই নেই। ওর বাবা-মা খুব উচ্চমানের মানুষ ছিলেন, তাঁরা তাঁদের মেয়েকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একজন স্পেশাল প্রশিক্ষককে নিযুক্ত করলেন, যার নাম Johanna Mansfield Sullivan। প্রথম ট্রেনিং শুরু হল ট্যাপ্ খুলে জলের তলায় ওর হাতটা নিয়ে লাগাচ্ছেন, তখন ওর হাতের উপর বানান করে ওয়াটার লিখছেন। এই ভাবে নানা পদ্ধতিতে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে শেষে তিনি গ্রাজুয়েট হলেন। পরে তিনি লেখালেখিও করেছেন, স্পীচ থেরাপি করে কথা বলার ক্ষমতা কিছুটা নিয়ে আসা হয়েছিল। যার চক্ষু ইন্দ্রিয় কাজ করছে না, শ্রোত্রেন্দ্রিয় কাজ করছে না, বাক্ ইন্দ্রিয় কাজ করছে না, সেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রাজুয়েট ডিগ্রী পাচ্ছে। তাহলে কি পড়ে বা কি লিখে সে ডিগ্রী পাচ্ছে? পরে তাঁকে ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াটাও শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পড়ছে ব্রেইলে, লিখছেও ব্রেইলে, কিন্তু কান আর বাক্ নেই।

তার মানে, মানুষের basic কিছু একটা আছে, যেটা এই ইন্দ্রিয়গুলি না থাকলেও কাজ করে। সেটা কি? আইডিয়া, আইডিয়াসেরও অনেক রূপ আছে। তার আইডিয়া রয়েছে, তার ইনফরমেশান রয়েছে, যেমন এই পেন একটা আইডিয়া, পেন আবার একটা ইনফরমেশান, পেন একটা শব্দ, পেন আবার একটা বস্তু। আইডিয়া বা শব্দ যে বলা হচ্ছে এটাকে অনেক সময় ইনফরমেশানও বলা হয়। আমরা যে কথা বলি মূলতঃ তখন ইনফরমেশান ভেতরে যায়। যার ভেতরে এই ইনফরমেশান যাচ্ছে তার মধ্যে যদি আইডিয়া থাকে তাহলে ইনফরমেশনটা ওই আইডিয়াটাকে জাগিয়ে দেবে। আইডিয়া যদি না থাকে তাহলে ওটা শব্দ মাত্র। হাওড়াতে আগুন লেগেছে, হাওড়াও জানা আছে আর আগুনও জানা আছে, আমি দিলাম ইনফরমেশান। একটা ঘটনা ঘটেছে, আমার ভেতরে ওই ঘটনার একটা আইডিয়া তৈরী হল, সেখান থেকে আমি ইনফরমেশান ছাড়লাম, শব্দের মাধ্যমে অন্যকে দিলাম, সেটা আপনার কাছে গেল, সেটাকে আপনি গ্রহণ করলেন, আপনার ভেতরে যে আইডিয়া রয়েছে সেটাকে চালু করে দিল, আপনি জেনে গেলেন, জ্ঞান হয়ে গেল। ইনফরমেশান, আইডিয়া আর জ্ঞান, এটাকেই বলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান। উপনিষদের কথা আমরা শুনছি কিন্তু বুঝতে পারছি না। কারণ আমাদের ভেতরে উপনিষদের আইডিয়া নেই। আচার্য ইনফরমেশান দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমরা নিতে পারছি না। যে কোন মানুষ, যত বড় আচার্যই হন না কেন আমাকে ইনফরমেশান দিতে পারেন কিন্তু আইডিয়া দিতে পারবেন না। তাই জ্ঞানও দিতে পারবেন না, কারণ আইডিয়া না থাকলে জ্ঞানটাও আসবে না। স্বামীজী তাই বলছেন, সমস্ত জ্ঞান তোমার মধ্যেই বিদ্যমান। জ্ঞান নিজেকে বার করতে হবে, জ্ঞান আমাদের কেউ দিতে পারবেন না। আইডিয়া যদি আগে থেকেই ভেতরে না থাকে যতই আমরা বড় বড় বক্তার বড় বড় ভাষণ শুনি না কেন, সব কথাই আমাদের মধ্যে ইনফরমেশান হয়ে যাবে, আর ইনফরমেশান হয়েই ধীরে ধীরে শরৎকালের মেঘের মত হারিয়ে যাবে। এক একটা শব্দ শিশির বিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা হয়ে থেকে যাবে বাকি সব উড়ে বেরিয়ে যাবে।

বাচ্চা বয়স থেকেই আমাদের মধ্যে অনেক রকম আইডিয়া তৈরী হয়ে আছে, এবার যখন একেবারে নতুন নতুন ইনফরমেশান যাবে, আমার বর্তমান আইডিয়া গুলো আর যে ইনফরমেশান গুলো যাচ্ছে, এই দুটোকে মিলিয়ে যদি আমরা প্রচুর পরিশ্রম করি, গরু ঘাস খেলে যেমন দুধ দেয় তেমনি তখন আমাদের মস্তিষ্কও দুধ দেওয়া শুরু করবে, দুম্ করে আমাদের মস্তিষ্কে একটা নতুন আইডিয়া তৈরী হয়ে যাবে। এবার সে একজন জ্ঞানী পুরুষ হয়ে যাবে। এই নতুন আইডিয়া তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এবার যখন নতুন ইনফরমেশান গুলো আসবে সেগুলো আবার আইডিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা যাঁদের বুদ্ধিমান বলছি, বুদ্ধিমানের অর্থটাই তাই, তাঁদের কাছে প্রচুর আইডিয়াস আছে, শুধু ইনফরমেশানই নয়। কয়েকটা বেসিক আইডিয়াসকে যদি কেউ ধরে নেয়, সবটাই সে ধরে নেবে, যেমন যেমন ইনফরমেশান ঢুকবে তেমন তেমন এক একটা আইডিয়া তৈরী করে নেবে। দুটো স্টেপে চলে, ইনফরমেশান আর আইডিয়া, ওই আইডিয়া যখন রূপ নিয়ে নেয় অর্থাৎ ভেতরে যখন অর্থটা স্পষ্ট করে দেয় সেটাই হয়ে যায় জ্ঞান। সে এখন ওই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আমরা প্রায়ই বলতে শুনি, কিছু লোক শুনে শেখে, কিছু লোক দেখে শেখে আর কিছু লোক হোঁচট খেয়ে শেখে। এই শেখা, শেখা মানে

নলেজ। নলেজের সামনে রয়েছে আইডিয়া, আইডিয়ার সামনে রয়েছে ইনফরমেশান। আমার যা কিছু শুনছি, দেখছি সবই ইনফরমেশান, হোঁচট খেলাম ইনফরমেশান, ওই ইনফরমেশান আইডিয়াতে রূপান্তরিত হবে কি হবে না এটা নির্ভর করে তার প্রস্তুতি কেমন। আর ওই আইডিয়া নলেজে রূপান্তরিত হবে কি হবে না সেটা নির্ভর করে তার মেধার উপরে। মা দেখছে ছেলে বদমাইশ, মা কান্নাকাটি করে, ছেলের সেবা করে, সবই করে। ছেলেও ঝামেলায় পড়ে গিয়ে দিব্যি খায় আর এই রকম করবে না। মা বিশ্বাস করে নেয়, ছেলে আবার ঝামেলায় জড়িয়ে যায়। মায়ের ক্ষেত্রে এটা আলাদা, মা পুত্রস্নেহে অন্ধ, ফলে জ্ঞান যদি হয়েও যায় যে ছেলে আবার ঝামেলায় পড়বে, আমার কথা শুনবে না, তাহলে তার কিছু করার নেই। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, আমরা যে জায়গাতে emotionally involved, এ আমাকে আজ মেরেছে আবারও মারবে। কিন্তু আমি নিজেকে বলছি আর মারবে না। তারপর আবার যখন মারে তখন বন্ধুরা বলল, দেখলে আবার তোমাকে মারল তো। তখন বলি আর ওর কাছে যাব না, কিন্তু কিছু দিন পর আবার যাব। ঠাকুর বলছেন, মেয়েদের যখন প্রসব বেদনা হয় তখন তারা বলে আর স্বামীর কাছে যাচ্ছি না। সন্তান হয়ে যাওয়ার পর আবার সে কাছে যাবে। বেদনাটা যতক্ষণ হচ্ছে ততক্ষণ ওই জ্ঞানটা থাকে, বেদনা চলে গেল আবার যথারীতি।

এই যে ইনফরমেশান, আইডিয়াস, নলেজ পুরো জিনিসটাকে আমরা আলোচনা করলাম, এই পুরো জিনিসটার জন্য একটা শব্দ আছে, আমরা সেটাকে বলি শব্দ। বেদেও আগেকার দিনে পুরোটাকে শব্দ বলা হত। আইডিয়া বলতেও শব্দ আর word বলতেও শব্দ। গ্রীক ভাষাতেও লোগোস মানে দুটোই হয়, আইডিয়াও হয় আর মুখ দিয়ে যে কথা বলা হয় সেটাও হয়। আমরা যে শব্দ বলি, এই শব্দকে তিনটে অর্থে নেওয়া যেতে পারে, শব্দ মানে আইডিয়া, শব্দ মানে spoken words আর শব্দ মানে আওয়াজ। যখন কেউ শব্দ বলছে তখন বলা মুশকিল সে কি শুধু আওয়াজ বলতে চাইছে, নাকি words বলছেন নাকি আইডিয়াস বলছেন। এই যে শব্দ, যার আওয়াজ আছে, বর্ণ আছে আর আইডিয়া আছে, এটাও বাক্ এরই রূপ। বাক্ এর ক্ষেত্রে বলা হল, বাক্ ইন্দ্রিয় আর তার যে সৃষ্টি বাক্, দুটো এক আর তার দেবী তিনিও বাক্। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের কার্য আর তার দেবী এক। বাক্ এরই আরেকটা নাম যেন শব্দ, সেখানেও শব্দ বলতে ধ্বণি আর শব্দ বলতে আমরা বর্ণের ব্যবহার করে কথা বলি, আর তার সাথে বিচার বা আইডিয়াটাও শব্দ। বাক্ এর যে প্রকাশ এটাকে বলা হয় শব্দ। সেটা আবার তিনটে স্তরে চলে, ধ্বণি, বাণী আর বিচার বা আইডিয়াস, আগেকার দিনে বেদে শব্দ বলতে এই তিনটেকেই বোঝাত। ইদানিং কালে ব্যবহার করা হয় না, কেউ ইচ্ছে করলে করতে পারে কিন্তু তখন তাকে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।

বাক্ বা শব্দ ঈশ্বরের সাথে এক। যখন ঈশ্বরের সাথে এক থাকে, তখন বাক্ও বলে না শব্দও বলে না, বলে স্ফোট্। হিন্দুদের একটা দর্শনই আছে যার নাম স্ফোটবাদ। স্ফোটবাদে বা আমাদের বেদেও বলে, যখন সৃষ্টি হয় তখন ভগবান সরাসরি তো সৃষ্টি করেন না, তিনি প্রকৃতির মাধ্যমে, শক্তির মাধ্যমে বা মায়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন, কিন্তু স্ফোটবাদ দিয়ে গেলে সেখানে বলবে তখন ঈশ্বরের মনে বিচার আসে। খুব নামকরা বিচার হল, আমি এক আমি বহু হব। এই বিচার যেই এসে গেল এবার স্ফোটেরও উৎপত্তি হয়ে গেল। যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনি এবার আকার ধারণ করে নিলেন, কারণ তিনি চিন্তাশক্তিতে এসে গেছেন বা বলা যেতে পারে ইচ্ছাশক্তিতে এসে গেলেন। ওই ইচ্ছাশক্তি যখন ক্রিয়াশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, এক যখন বহুতে আসবেন তখন যেটা বেরোয় সেটাকে বলে প্রণব (অ উ ম ওঁ), এর আরেকটা নাম নাদ। নাদ বা ওঁ বা স্ফোট যেটাই বলি না কেন, এটাই হল সৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রথম প্রকাশ। এর নামই শব্দব্রহ্ম, একে আমরা নাদ বলি, বাক্ বলি, প্রণব্ বলি, স্ফোট বলি, ওঁ বলি সবটাই এক। শুদ্ধ ওঁ হল storehouse of ideas। তার মানে ওঁ হল জগতে যত রকম শব্দ হতে পারে, সমস্ত শব্দের পুটলি। যত আইডিয়াস রয়েছে সব আইডিয়ারই একটা corresponding object থাকবেই। যেমন প্রত্যেকটি বস্তুর একটা নাম হয়, ঠিক তেমনি প্রত্যেক নামের একটা বস্তু হবে। উচ্চ

আধ্যাত্মিকতায় আইডিয়া আর অবজেক্ট বা বস্তু আর তার নাম আলাদা কিছু না। ঠাকুরও বার বার বলছেন নাম আর নামী অভেদ। সেইজন্য সমস্ত জগতের সৃষ্টি ওঁ থেকে, তাই ওঁ এত পবিত্র।

ওঁ এর প্রথম অক্ষর 'অ', সেইজন্য বেদে অনেক সময় বলে সমস্ত শব্দের জন্ম 'অ' থেকে, সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি 'অ' থেকে। ওঁ এর 'অ', 'উ' আর 'ম' যেন একটা ফরমুলা, যেটা যেমন যেমন সৃষ্টি এগোয় তেমন তেমন তার আকৃতি পাল্টাতে শুরু হয়, তার ব্যবহার বাড়তে শুরু হয়ে যায়। এই অ থেকেই শেষে 'ক' জন্মায়, 'চ' জন্মায়, 'ত' 'থ' 'প' আর বিভিন্ন ধরণের অন্য বর্ণ আছে তালব্য, মূর্ধণ্য, দন্তস্য, এর সব কিছু ওঁ এর মধ্যে বাঁধা হয়ে আছে। এটা আমরা স্ফোটবাদ থেকে বললাম। 'অ' 'উ' 'ম' ওঁ এগুলো কেউ যদি না মানতে চায়, তাহলে সবটাকে মিলিয়ে একটাই শব্দ হয় যার নাম বাক্, বাক্ যিনি দেবী, বাক্ যিনি শব্দ, বাক্ যিনি ইন্দ্রিয়, এটাই সৃষ্টি করে তালব্য, মূর্ধণ্য, দন্তস্য ইত্যাদি সহ সব স্বরব্যঞ্জন। গান করাটাও বাক্, সত্য কথা বলাটাও বাক্, মিথ্যা কথা বলাটাও বাক্। ওই বাক্, যেটা আমাদের ভেতরে, তারই এত রূপ, কর্মেন্দ্রিয় কিনা, কর্মেন্দ্রিয় তো কাজ করবেই, কত রকমের তার বৈচিত্র্য। বাক্ এর জন্ম তাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর থেকে। ইন্দ্রিয় রূপে ওখানে গিয়ে এক দেবতা, ব্যবহারে নামার পর তখন তার এত শাখা-প্রশাখা, তার এত রূপ।

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম বাক্ বলতে কি বোঝায়। এবার মন্ত্রের অর্থে কি বলছে দেখা যাক। বলছেন, বাণীর দ্বারা ব্রহ্ম প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাঁর জন্য বাণী প্রকাশিত হয় তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জানবে, সারা জগৎ যেটার পূজা করে সেটাকে তুমি ব্রহ্ম বলে মনে করো না। এর আগেও বলা হয়েছে, মন্ত্রের শেষ লাইনের শেষাংশ একটা আলাদা আলোচ্য বিষয় আর বাকিটা আলাদা আলোচ্য বিষয়। *যদ্‌বাচাহনভ্যুদিতং*, বাণী যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, এই বাণী বা বাক্ জিনিসটা কি জানার জন্য আমরা এত দীর্ঘ আলোচনা করলাম। এবার আচার্য কি বলছেন আমরা দেখব। এই বাণী ব্রহ্মকে প্রকাশিত করতে পারে না, বাণী জিনিসটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আচার্য এবার বাণীতে হাত দিচ্ছেন, অবশ্য আচার্য যেটাতেই হাত দেন সেটারই গুরুত্ব হয়ে যায়।

আচার্য বলছেন, বাক্ আটটি স্থানে আশ্রয় নিয়ে থাকে – জিহ্বামূল, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্ধা, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ আর তালু। হৃদয় থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে ওঠে। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় সেটা ওই ভাবেই সাজানো আছে। শুধু উচ্চারণের সময় হৃদয় থেকে যেটা আসে সেটা খুব গম্ভীর, আর নাক দিয়েও আওয়াজ করা যায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে হৃদয় থেকে আওয়াজ বেরোয় না, নাভিস্বর বলে ঠিকই, আসলে বলতে চাইছেন খুব গম্ভীর আওয়াজ। তবে যাঁরা প্রচুর জপ-ধ্যান করেন, জপ করতে করতে হৃদয় যাঁর খুলে যায়, তখন তিনি দেখেন হৃদয়ে ওই আওয়াজটা হচ্ছে, সেটাও বাক্, সেইজন্য হৃদয়কেও বাক্ এর সাথে জুড়ে দিয়েছেন। বাকি সাতটা হল ঠিক ঠিক বাণীর প্রকাশ, সেই দিক দিয়ে দেখলে বাক্ সাতটি জায়গায় অবস্থান করে, কিন্তু এখানে যাঁরা গভীর জপ করেন, যাঁদের অজপা জপ হয় আচার্য তাঁদেরটাকে ধরে হৃদয়কে নিয়ে বাক্ এর আটটি স্থানের কথা বলছেন। তার সাথে বলছেন অগ্নি দেবতা বাক্ এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অগ্নি বলাও যা বাক্ বলাও তাই, আমরা যখন বাগদেবী বলছি তখন অন্য অর্থে বলি। বলছেন, ভারতীয় ভাষার 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্ত বর্ণকে বাণী অভিব্যক্ত করেন। আমরা যেমন বলছি 'ক', 'ক' একটা বর্ণ, কিন্তু এর পেছনে যে শক্তি যেটাতে বর্ণ কাজ করে সেটাই বাণী। আচার্য এখানে বাক্ জিনিসটা কি ব্যাখ্যা করছেন। এখানে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, বাক্ বলতে আচার্য দুটো জিনিসকেই বলতে চাইছেন, যে ইন্দ্রিয়টা কাজ করছে সেটাও বাক্ আর তার কার্যটাও বাক্। এবার দুটোকে মিলিয়ে আচার্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, বাস করে আটটি স্থানে, তার দেবতা অগ্নি আর বর্ণ রূপে তার প্রকাশ।

আর বলছেন, *বর্ণাশ্চর্থঙ্কেতপরিচ্ছিন্না*, একটা জিনিস, একটা অর্থের দিকে আকার ইঙ্গিত করতে চাইছে, সেই অর্থ দিয়ে এই বাক্ পরিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। যেমন বাণী বর্ণ দিয়ে বেরোচ্ছে, কলম শব্দটা যেমনি বললাম, ক-ল-ম হয়ে গেল বর্ণ, বর্ণের খেলা বেরোচ্ছে ইন্দ্রিয় দিয়ে। কিন্তু কলম শব্দটা

পরিচ্ছিন্ন, ঢাকা দেওয়া আছে। কি দিয়ে ঢাকা দেওয়া? অর্থ সঙ্কেত দিয়ে, কিছু বলতে চাইছে। পুরোটাই বাক্, তার দেবতা অগ্নি, বসে আছে আটটি জায়গায়, সেখান থেকে বাণী রূপে বেরোচ্ছে, সেই বাণীতে যে শব্দ সেটা আবার পরিচ্ছিন্ন অর্থ দিয়ে। একটা জিনিসকে সে ইঙ্গিত করছে। যদি কেউ বলে 'টকলাকি', 'টকলাকি' কোন শব্দ হয় না, কিন্তু তারও একটা অর্থ জড়িয়ে আছে, অনর্থের মধ্যে অর্থ আছে, টকলাকির অর্থ হল ওর মাথাটি খারাপ, আবোলতাবোল বকে। কিছু শব্দ আছে যেটা আমরা জানি সেটাকে imply করে, আর যদি আবোলতাবল বলে, বাচ্চারা যেমন শব্দগুলোর আগে পিছে আরেকটা বর্ণ বসিয়ে এমন ভাবে বলতে থাকবে নিজের কয়েকজন বন্ধু ছাড়া কেউ বুঝতেই পারবে না কি বলছে। বাচ্চারা বললে আমরা বলব আবোলতাবল বলে, বড়রা বললে বলব মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানেও একটা অর্থ জড়িয়ে থাকে। অর্থ সঙ্কেত থাকবেই, এটা বাক্ এর বৈশিষ্ট্য। তার সাথে বলছেন, এটা ক্রমে প্রযুক্ত হয়। ক্রমে প্রযুক্ত হওয়াটা একটা টেকনিক্যাল টার্ম, ইদানিং আর এর ব্যবহার হয় না। আগেকার দিন যে শব্দগুলো ছিল তাতে মীমাংসকরা বলেন, যেমন একটা শব্দ হল গৌঃ, গ ঔকার আর বিসর্গ মিলিয়ে গৌঃ হয়। এখানে নিয়মটা পরিষ্কার, আগে গ আসবে পরে ঔ আসবে শেষে বিসর্গ আসবে, কিন্তু পুরো জিনিসটা এক। যখন একটা জিনিসকে আমি বলতে চাইছি, সেখানে একই বর্ণের মধ্যে নানা রকমের যে স্বরের খেলা হয়, তার নিয়মটা পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে আগে কোনটা হবে পরে কোনটা হবে। এটাই ক্রম, যাতে তার আইডিয়াস গুলো গোলমাল না হয়ে যায়। বাক্য রচনার ক্ষেত্রেও পরিষ্কার কতগুলি নিয়ম ঠিক করা আছে, সাধারণ ভাবে বাক্যে প্রথমে থাকবে বিষয়, তারপর থাকবে অবজেক্ট, তারপর থাকবে ক্রিয়া। যখন বাক্য নিয়ে কথা হবে তখন আমরা বলব সাবজেক্ট, অবজেক্ট আর ক্রিয়ার যার বিশেষ নিয়ম আছে। এখানে বলা হচ্ছে ক্রম বিশেষ, আগে ব্যঞ্জন আসবে, পরে স্বর আসবে, স্বরের মধ্যেও কোনটা আগে কোনটা পরে আসবে সেটাও পরিষ্কার ঠিক করা আছে।

এই যে বর্ণ আসছে, বর্ণের ক্রম আছে আর একটা জিনিসকে ইঙ্গিত করছে, এই পুরো জিনিসটা দিয়ে যে শব্দটা তৈরী হয়, সেই শব্দকে বলা হয় পদ বা অনেক সময় বলা হয় বাক্। বাক্ ইন্দ্রিয় আটটি জায়গায় বাস করে, তার অধিষ্ঠান দেবতা অগ্নি, বর্ণ দিয়ে বেরোয়, তার একটা অর্থ সঙ্কেত আছে অর্থাৎ একটা জিনিসকে সে ইঙ্গিত করছে আর তার ক্রম নির্দিষ্ট করা আছে, এই ক্রমেই তাকে আসতে হবে, সেখান থেকে যে শব্দ বের হয় তাকে পদ বলা হয় বা বাক্ বলা হয়। তাহলে এর অর্থ হল, এর দুটো প্রয়োগ আছে, একটা হল ইন্দ্রিয় আরেকটা হল যে জিনিসটা বেরোচ্ছে, শব্দ সেটাও বাক্।

আচার্য ঐতেরিয় আরণ্যক থেকে একটা মন্ত্র উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন *যদব্রহ্মবাচা শব্দেনানভ্যুদিতম্ স্পর্শান্তঃস্থোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি*। ব্রহ্মবাচা মানে ওঁ, ওঁ ব্রহ্মবাচক শব্দ স্পর্শ, অন্তঃস্থ আর উষ্ম এই তিনটে রূপে অভিব্যাক্তি পায়। 'ক' থেকে 'ম' সব ব্যঞ্জনবর্ণকে বলা স্পর্শ, য-র-ল-ব, এগুলোকে বলা হয় অন্তঃস্থ আর তিনটি স-শ-ষ এটাকে বলা হয় উষ্ম। আর স্বর হল অ থেকে ঔ পর্যন্ত। ব্রহ্মের বাচক ওঁ, তিনি একাই আছেন। তাঁর 'অ' থেকেই সমস্ত কিছু বের হচ্ছে। কিভাবে বেরোচ্ছে? স্পর্শ, অন্তঃস্থ আর উষ্ম, এই তিনটে প্রকারে। ওই একই জিনিস কিন্তু এত রকমের বিভাজন হয়ে যাচ্ছে। আছে অনাহত, যার আহত হয়নি, যার কোন খণ্ডিত কিছু নেই, কিন্তু এবার সে বহু হয়ে যায়। সেই এক ওঁ বহু হয়ে যায়। শুধু স্বরব্যঞ্জনেই থাকছে না, ব্যঞ্জনের মধ্যে আবার স্পর্শ, অন্তঃস্থ আর উষ্ম এই চারটে ভ্যারাইটি হয়ে গেল, সেখান থেকে এত রকমের ভাষা তৈরী হয়ে গেল। কোন কোন ভাষার উচ্চারণে একটু তারতম্য হয়, এনারা বলেন সংস্কৃতে উচ্চারণ এই রকমই হয়, উর্দুতে উচ্চারণ একটু পালটায় তাতে 'জ' শব্দে একটু বেশি জোর দিয়ে বলে, এই ধরণের কিছু কিছু উচ্চারণে তারতম্য হয়। তবে সংস্কৃতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, উচ্চারণ এভাবেই হবে। সেই এক ওঁ কিন্তু এত রকমে তাঁর অভিব্যক্তি।

এবার যে শব্দ হল এগুলো আবার তিনটে দিকে চলে যাচ্ছে, *মিতমিতং স্বরঃ*, মিত, অমিত আর স্বর। মিত হল যখন কোন well defined অক্ষরে গিয়ে শেষ হয়। এটাকে বলে ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে মিত বলা হয়। যখন well defined অক্ষরে গিয়ে শেষ হয় না তখন তাকে বলে অমিত,

যজুর্বেদকে বলা হয় অমিত। আর যদি গানও করা যায় তখন তাকে বলছেন স্বর, এটাই সামবেদ। এই যে তিনটি বেদ, ঋক্, যজু আর সাম, এই তিনটের নাম মিত, অমিত আর স্বরঃ। সেই এক ওঁ কিভাবে বিস্তার করছে, আটটি স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে, একজন দেবতা দিয়ে দিচ্ছেন, প্রথমে ভেঙে যাচ্ছে অ থেকে হ পর্যন্ত স্বর আর ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনের আবার তিনটে ভাগ, সেটা আবার তিনটে বেদে ছড়িয়ে যাচ্ছে, ঋক, যজু, সাম বলছেন না, বলছেন মিত, অমিত আর স্বর। আবার তার শেষ বিস্তার হয়ে যায় সত্য আর মিথ্যাতে। কিছু শব্দ সত্য, কিছু শব্দ মিথ্যা। যখন মিথ্যা কথা বলছে তখনও সেটা বাক্, যখন আবোলতাবোল কথা বলছে সেটাও বাক্, অর্থপূর্ণ কথা বলছে তখনও বাক্। যেহেতু এটা উপনিষদ, তাই বেদ কেন্দ্র করে এই আলোচনা করছেন। এটাই বলছেন, এই বাক্ ব্রহ্মকে অভিব্যক্ত করতে পারে না। জন্ম তার ওঁ থেকে। কোন ওঁ? যার এত ভাবে বিস্তার হয়ে যায়।

কেন বাক্ ব্রহ্মকে ধরতে পারে না? এর আগে যেখানে *ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি* আলোচনা করা হয়েছিল, সেখানে এর কারণ বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছিল। যিনি মৌলিক তাঁকে যৌগিক ধরতে পারে না। Simpleকে দিয়ে complexকে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু complexকে দিয়ে simpleকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এখানে আমরা যেমন বাক্‌কে ব্যাখ্যা করার জন্য ওঁ এ গেলাম, ওঁ থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে variety হচ্ছে। যদি variety থাকে সেখান থেকে আমরা simpleএ ফেরত যেতে পারব না। যে জিনিসটা যত simple হবে তাকে ব্যাখ্যা করা তত মুশকিল। Fundamental মানেই সেখানে কোন variety থাকবে না। Variety আছে মানেই এটা simple নয়, simple না হলে এটা fundamental নয়। যেমনি বাক বিভাজিত হয়ে গেল, যেখানে স্বর এসে গেল, মিত হয়ে গেল, অমিত হয়ে গেল, সত্য হয়ে গেল, মিথ্যা হয়ে গেল, অনেক কথা হয়ে গেল, এটা আর fundamental থাকল না, complex হয়ে গেছে। Complex হয়ে গেল মানে এটা ultimate truth নয়, ultimate truth সব সময় simple হবে। সেইজন্য শব্দব্রহ্ম হল ওঁ, ওঁ হল শেষ, ওঁ ঈশ্বরের সাথে এক। যখন silence তখন সেই differntiationটাও নেই, সেইজন্য silence হল name of God। সেইজন্য বাইবেলও বলছে In the beginning there was word, word was with God and word was God। এই জিনিসটাকে এনারা গ্রীক ফিলজফি লোগোসের ধারণা থেকে এনেছেন, খ্রীশ্চানরা wordsকে define করে Jesusকে দিয়ে। খ্রীশ্চানরা যেভাবে বলছে, পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে হিন্দুরাও সেই কথা বলে আসছেন, ব্রহ্ম ছিলেন, স্ফোটও যা ব্রহ্মও তাই। কিন্তু যখন স্ফোট দেখছি তখন ব্রহ্ম আর স্ফোট আলাদা, যখন স্ফোটটা মৌন হয় যাচ্ছে তখন কিন্তু ব্রহ্ম আর স্ফোট এক। বাক্ সেইজন্য কোন দিন ওঁ কে ধরতে পারবে না। ওঁ এর উচ্চারণ কোন দিন কেউ করতে পারবে না। কেন পারবে না? কারণ যেমনি উচ্চারণ করবে তখন আর ওটা ওঁ থাকবে না। সেইজন্য ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলছেন, ব্রহ্ম আজ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয়নি, কারণ ব্রহ্মের উচ্চারণ কোন দিন কেউ করতে পারবে না, ব্রহ্ম তো ছেড়ে দিন ওঁ এর উচ্চারণও কেউ কোন দিন করতে পারবে না। কারণ সমস্ত জগতে যত শব্দ হয়, শব্দ ছেড়ে দিন, শব্দের যে মা স্বরব্যঞ্জন, ওঁ তারও মা। যিনি ওঁ কে জেনে যান তিনি সমস্ত শব্দের রাজা হয়ে যান। যিনি সমস্ত শব্দকে জয় করে নেন, তিনি সমস্ত জগতকে জয় করে নেন। হরি ওঁ, ওঁ আমরা দিনরাত বলছি কিন্তু ওঁ উচ্চারণ করা যাবে না। তাহলে ওঁ লেখা হয় কেন? ওটা প্রতীক, সংস্কৃতে যে ওঁ লেখা হয় ওটা একটা প্রতীক, ওটা শব্দ নয়। আমরা উচ্চারণ করছি ওম্ কিন্তু ওর সঠিক উচ্চারণ আমরা জানি না। আমরা জপ করতে করতে যখন ধ্যানের গভীরে চলে যাব, তখন হৃদয় থেকে যখন ওঁ আওয়াজ বেরোবে একমাত্র তখনই আমরা জানতে পারবে সঠিক ওঁ উচ্চারণটা কি। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুখে ওম্ উচ্চারণ করেই চলতে হবে। কিন্তু ওঁ এর সঠিক উচ্চারণ কি একমাত্র তাঁরাই জানতে পারেন, যাঁরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে অনাহত ধ্বণি শুনতে পান।

বলছেন এই যে পদ রূপে পরিচ্ছিন্ন আর বাক্ ইন্দ্রিয় রূপে গুণ, এই যে বাণী আমরা বলি, এই বাণীটা কি? এর পরিধি হল বাক্, আর এই বাণীর বিশেষত্ব কি, পদ রূপে পরিচ্ছিন্ন। আসলে ওটাও বাক্, এটাও বাক্ ওটাও বাক্। সংশয় যাতে না হয় সেইজন্য আচার্য পদ আর বাণী আলাদা করে

দিলেন। মন্ত্রে বলছেন, *যদ্‌বাচাহনভ্যুদিতং*, বাণীর দ্বারা প্রকাশিত হয় না। বাণীটা কি, এটা বাক্ ইন্দ্রিয় থেকে বের হয়। এই বাণী ব্রহ্মকে কোন দিন প্রকাশিত করতে পারে না। ব্রহ্মকে প্রকাশিত করা দূরে থাক, ওঁ কেই প্রকাশিত করতে পারে না। ধ্যানের গভীরে যখন অনাহত ধ্বণি শুনতে পাবে তখন বুঝতে পারবে, ও তাই, ওঁ এই রকম। ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয় আর যোগী তাঁর কৃপায় ওই নাদ ভেদ করে পরমাত্মার সাক্ষাৎ করে। ওঁকারের ভেদন হবে, ওটাকে ছিড়ে বেরিয়ে যেতে হবে, তার মানে ওঁ এর এলাকা অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের এলাকাকে ছেড়ে যখন বেরিয়ে যাবে তখন আস্বাদ হয় ঈশ্বর কি। তিনিই রয়েছেন সেই নির্গুণ নিরাকার, যখন সৃষ্টি আছে তখন তিনি শব্দব্রহ্ম দিয়ে ঢাকা। ওই শব্দব্রহ্মকে ভেদ করতে হবে, শব্দব্রহ্মকে ভেদ করা অত্যন্ত দুরূহ, কদাচিৎ কোন কোন যোগী পারেন, বাকিরা ওই শব্দব্রহ্মের মধ্যেই ঢাকা থাকেন। শব্দব্রহ্ম থেকে যখন অনেক নীচে নামবে তখন কোথায় নামবে? নাদ থেকে নামলে ওঁ, ওঁ থেকে নামার পর এবার গায়ত্রীর শুদ্ধ উচ্চারণ, ওঁ আর গায়ত্রীতে এসে যাওয়ার পর সেখান থেকে শব্দে চলে এল। আবার শব্দ থেকে মৌনের দিকে যাওয়ার সময় গায়ত্রীর সাহায্যেই যেতে হবে, গায়ত্রীর সাহায্য নিয়ে ওঁকারে যাবে, ওঁকারের সাহায্য নিয়ে সেই নাদ অনাহত ধ্বণি, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে নাদে পরিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, সেই নাদে পৌঁছে যাবে। এবার ওখান থেকে তাকে বেরোতে দেবে না। এইজন্যই বেরোতে দেবে না, কারণ সে এখন সমস্ত জগতের মালিক হয়ে গেছে, সে যা চাইবে তাই হবে। বন্ধ্যাকে যদি বলে দেন তোমার সন্তান হবে, তার সন্তান হতে বাধ্য। অনাহতের সাথে যে এক হয়ে গেল, ওঁ এর সাথে যে এক হয়ে গেল সে এবার সমস্ত সৃষ্টির মালিক হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ওখান থেকে আর বেরোতে দেবে না। ঠাকুরকেই বেরিয়ে আসতে দিচ্ছেন না, তোতাপুরী নির্বিকল্পে নিয়ে যেতে চাইছেন কিন্তু মা কালী বার বার সামনে এসে যাচ্ছেন। ওটাই নাদ, একই জিনিস। তোতাপুরী তখন কাঁচের টুকরো দিয়ে কপালে আঘাত করে ওই আঘাতের উপর ধ্যান করতে বললেন, এবার মা কালী আসাতে ঠাকুর জ্ঞান অসি দিয়ে মা কালী রূপকে খণ্ডিত করে দিলেন। ঠাকুর বলছেন, তখন মনটা হু হু করে অখণ্ডে লয় হয়ে গেল। সেইজন্য বলছেন, বাক্ তাঁকে ধরতে পারে না।

বাক্ এর উপর ভাগবতেও খুব সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে অবশ্য অন্য ভাবে দেখানো হয়েছে। ভাগবতে বাক্ জিনিসটাকে চারটে ভাগে বলছেন, পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। যেখান থেকে শব্দগুলি বেরোচ্ছে অর্থাৎ মুখ দিয়ে কথা বলছি এটাকে বলে বৈখরী, যদি মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর মনে মনে কথা বলে তখন তাকে বলছেন মধ্যমা, আর এর উৎস যেটা তাকে বলছেন পশ্যন্তি, আর পরা হল ওঁকার, ওই জায়গায় পৌঁছে গেলে চেষ্টা না করেও একটা অনাহত ধ্বণি শুনতে পায়। যোগীরা যখন ওটাকেও পেরিয়ে যান তখন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরু বলে দেন জপ করার সময় ঠোঁট আর জিহ্বা যেন না নড়ে। অনেক দিন জপ করার পর দেখা যায়, ঠোঁট না নড়লেও জিহ্বার দু পাশটা একটু নড়তে থাকে, বলেন ওই সময় নার্ভ সেন্টারটা নড়াচড়া করছে, তার মানে মৌনতা এখনও আসেনি। ওটাও যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কণ্ঠ দেশে একটা নড়চড়া হচ্ছে। মনে মনে জপ হলে জপের গতি অনেক বেড়ে যায়। যে জিহ্বাটা নড়ছিল, সেটাও যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন জপের গতি আরও বেড়ে যায়। আর কণ্ঠের নড়াটাও বন্ধ হয়ে গেলে তখন জপের প্রচুর গতি হয়ে যায়। এরপর আরও গভীরে যখন যায় তখন দেখে একটা অখণ্ড শব্দ, যেমন অ আ ক খ যে খণ্ডিত শব্দের আলোচনা এর আগে করলাম, এগুলো কিছু নেই শুধু ওঁ এই জাতীয় একটা ধ্বণি বিরাজ করছে। ওই জায়গাতে গিয়ে সবাই আটকে যায়। ওই অখণ্ড শব্দকেও যখন ভেদ করে, অর্থাৎ মনটাকে যখন আরও সূক্ষ্ম করে তখন ওঁ ধ্বণিটাও শুনতে পায় না। জগৎ, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল শব্দের জগৎ। মনটাও শব্দ জগতের মধ্যেই পড়ে। শব্দ জগতকেও যখন পেরিয়ে যায় তখন মনটাও খসে পড়ে যায়। এটাকে ভাগবতে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারটে নামে বলছেন, একই জিনিস।

দেখা যায় মানুষ স্বপ্নেও কথা বলে, অচেতন অবস্থাতেও কথা বলে, যাদের কর্ণেন্দ্রিয় নেই, বাক্ ইন্দ্রিয় নেই তারাও বুঝতে পারে এই জিনিসটাকে দেখানো হচ্ছে, তার মানে শব্দের খেলা সেখানেও

চলছে। হেলেন কেলারের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান হল, অন্ধও যদি থাকে তাহলেও কিন্তু বাগেন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে। বস্তু আর শব্দের সম্পর্ক কখনই বন্ধ হয় না, বন্ধ হওয়ার কথাও নয়। এনার বলছেন, বাক্ খুব গভীরে যায়, উৎসে চলে যায়, সেই বাক্ সেও কিন্তু ব্রহ্মের কথা বলতে পারে না। পরের মন্ত্রে একটা আলোচনা আসবে, মন এটাকে ধরতে পারে না, তৈত্তেরিয় উপনিষদে বলছেন, সেখানে মন আর বাণী পৌঁছাতে পারে না। পরবর্তি আলোচনায় যাওয়ার আগে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আমাদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

যে কোন শব্দ যখন আমরা বলছি, তখন মন আগে ওর আইডিয়াটাকে গ্রহণ করে নেয়, এর আগে আমরা এই নিয়ে লম্বা আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম তিনটে জিনিস হয়, আইডিয়া, বস্তু ও শব্দ। বস্তুকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো গ্রহণ করে, নাদ আমাদের বাক্ ধারণ করে আর আইডিয়া আমাদের মন ধারণ করে। একটা বাড়ি বানাতে হবে, তার আগে বাড়ির একটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে, এটা হল আইডিয়া, তারপর ওটাকে শব্দে প্রকাশ করা হয় তারপর সেটাকে কার্যে পরিণত করা হয়, conceptualization, verbalization and actualization এই তিনটে স্তরে চলে। এনারা বলতে চাইছেন, conceptualization মন যে জায়গাটায় কাজ করে, সেখানে ব্রহ্ম আরও বৃহৎ হওয়ার জন্য conceptualisationই করা যায় না। এই আলোচনা গুলো এর আগেও করা হয়েছে, পরেও করা হবে। এটুকু বুঝে নিলেই হবে, মন ব্রহ্মকে ধারণ করতে পারে না। এর আগে আগে আমরা আলোচনা করেছি কেন করতে পারে না, একটু পরে আবার ব্যাখ্যা করা হবে কেন পারে না। ঠিক এই মন্ত্রটা শেষ হওয়ার পর আবার আসবে কেন করতে পারে না। এখন আপাততঃ আমরা মেনে নিচ্ছি। মন যেটাকে conceptualise করতে পারে না সেটাকে মন verbalise করতে পারবে না। Conceptualization হল must, conceptualization না হলে verbalise হবে না, verbalise না হলে কখনই actualize হবে না। সেইজন্য ব্রহ্মের ছবি কেউ কোন দিন করতে পারবে না, করে দিলে তো actualize হয়ে যাবে, সেইজন্য আগে তাকে শব্দে নিয়ে আসতে হবে। শব্দে আনার জন্য আগে তাকে ধারণা করতে হবে, মন তাঁকে ধারণা করতেই পারবে না। সেইজন্য বাণী কোন দিন ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারবে না। এটা গেল প্রথম যুক্তি, মনের দিক থেকে।

দ্বিতীয় যুক্তি, এর আগে বলা হয়েছিল, কিভাবে ওঁ থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, সেই অকার কিভাবে বিভিন্ন জিনিস হয়ে যায় যেমন স্বরব্যঞ্জন হয়ে যায়, সেখান থেকে স্পর্শ, অন্তঃস্থ, উষ্ম হয়ে যায়, আবার সেখান থেকে কিভাবে মিত, অমিত আর স্বর হয়ে যায়, সেখান থেকে কিভাবে আবার সত্য মিথ্যা হয়ে যায়। শুধু সত্য মিথ্যাই হয়ে যায় না, আরেকটা শ্রেনী, যেটা আচার্য বলছেন না, আচার্য বলছেন না মানে শাস্ত্রে এটা নেই, আমাদের ভাষায় বলতে পারি আখ্যায়িকা বা গল্প। গল্প জিনিসটা মিথ্যা কিন্তু ওটাকে মিথ্যা বলা হয় না। যে কোন সাহিত্যিক যিনি গল্প লেখেন, তিনি যত বড় সাহিত্যিকই হন না কেন, তিনি আসলে মিথ্যাই লিখছেন, এইজন্যই মিথ্যা যে জিনিসটা সেই রকমটি হয়নি। কোন সাহিত্যিককে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই যে আপনি কাহিনীটা লিখেছেন, সত্যিই কি এই রকম কোন ঘটনা হয়েছিল? তিনি বলবেন, না তো। তাহলে আপনি কি মিথ্যা কথা লেখেন? এর কি উত্তর দেবেন? আখ্যায়িকা, সাধারণ লোক এটা বুঝতে পারে না। যে কোন কাহিনী, যেমন ঠাকুর বলছেন সিংহের বাচ্চা ভেড়ার মধ্যে পড়েছিল। এবার যদি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হয় সত্যিই কি এই রকম কিছু ঘটেছিল? ঠাকুর কি বলবেন? এটা গল্প। গল্প মানে মিথ্যা। তাহলে ঠাকুর কি মিথ্যা কথা বলছেন? না, এটা একটা আলাদা শ্রেনী। যারা বলবে, আপনি বলুন এটা সত্যি না মিথ্যে, কেউই তাকে বোঝাতে পারবে না। আমাদের পুরো সাহিত্য, ব্যাস, বাল্মীকি থেকে শুরু করে এনারা কেউই মিথ্যা লিখছেন না আবার সত্যও লিখছেন না। সত্যে আধারিত যে হবে তাও না, কারণ সাহিত্যিক শুধু কল্পনা করে একটা জিনিসকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, ওটাকে মিথ্যা বলা যাবে না। এটা একটা আলাদা শ্রেনী, যেখানে শব্দগুলিকে নিয়ে একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আচার্য সেইজন্য বলছেন না, কারণ বেদ পরম্পরায় ওই জিনিসটা আসে না। আচার্য নিজের কোন কিছুই দেবেন না, বেদে যতটুকু

ঠিক ঠিক চলে, বেদে রয়েছে ঋতম অণৃতম, সত্য আর মিথ্যা, সেগুলো আসে ঋক্, সাম ও যজু তিনটে জায়গা থেকে। সেটা আবার আসে স্বরব্যঞ্জন থেকে, ব্যঞ্জনের আবার তিনটে রূপ। এখানে খুব সহজ একটা যুক্তি আসছে, এই যে বাক্ ব্রহ্মকে ধারণ করতে পারবে না, কেন ধারণা করতে পারবে না? কারণ সে হল স্বরব্যঞ্জন, মিত, অমিত ও স্বর, সে সত্য মিথ্যা, সেইজন্য ব্রহ্মকে ধারণা করতে পারবে না। ওঁ থেকে জন্ম হয়ে বাক্ স্বরব্যঞ্জন হয়েছে, স্বর না হয় আপাততঃ ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ব্যঞ্জনের এতগুলি ভ্যারাইটি, স্পর্শ, অন্তঃস্থ ও উষ্ম, আর সেখান থেকে হয়ে যাচ্ছে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ, যেটাকে বলছেন মিত, অমিত ও স্বর আর তার সাথে সত্য মিথ্যা। তাই না, আমি যদি নিজের মত আরও যোগ করতে পারি তাহলে আখ্যায়িকাও এসে যাবে, যেটা সত্যও না মিথ্যাও না। আচার্য বাক্ এর এভাবে ব্যাখ্যা করছেন। এই বাক্ ব্রহ্মকে ধারণা করতে পারে না। কেন ধারণা করতে পারে না? খুব সহজ যুক্তি, আচার্য যে এত লম্বা বাক্ এর একটা বর্ণনা দিলেন, ওঁ থেকে বাক্ এর জন্ম, তার এত রকমের manifestation, তার এত রকমের diversification, তার মানে শেষ পর্যন্ত বাক্ আমাদের কাছে আসছে তখন সে এক মহাজাল হয়ে গেছে, তার শাখা-প্রশাখার শেষ নেই। আচার্য সব সময় একটা মৌলিক যুক্তিকে নিয়ে আসবেন, anything complex is made of simple and cannot be the ultimate truth। আমরা যে এত লম্বা আলোচনা করলাম শুধু এটাই দেখাতে যে বাক্ জিনিসটা simple নয়। তার জন্ম simple থেকে, ওঁ থেকে বাক্ এর জন্ম, ওঁ relatively simple। কিন্তু সেখান থেকে যখন বেরোতে শুরু করে তখন বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দেয়। তাহলে কি ওঁ দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যাবে? জানা যাবে না, কারণ ওঁমেও তিনটে জিনিস লেগে আছে 'অ' 'উ' আর 'ম'। তাহলে যদি শুধু 'অ' বলা হয়? আসলে আমরা যত ভেতরের দিকে যাব তত তাঁর কাছে যেতে থাকব, কিন্তু নির্গুণ নিরাকারের কথা যেখানে আসছে সেখানে 'অ' ও থাকবে না। কিন্তু ওঁমকে যদি নেওয়া হয় তাহলে বলা যেতে পারে, ওঁ হল neareset equivalent to the God। ওঁমের থেকে বেশি আর কেউ তাঁর কাছে যেতে পারে না। গুরু নানক তাই বলছেন, এক ওঁমকার সৎনাম, ওঁমকার সেই ঈশ্বরের নাম। ঈশ্বরকে যে কোন নামেই ডাকা যায়, শিব, কালী, রাম, হরি, কৃষ্ণ, কিন্তু যুক্তির দিক থেকে ওঁ হল ঈশ্বরের সব থেকে কাছের। শব্দব্রহ্ম ও ব্রহ্মও এক নয়, কিন্তু খুব কাছের, আমরা যেমন শিব আর শক্তি বলি, শক্তি তো আর ব্রহ্ম নয়। ঠাকুর বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম আর শক্তি যদি অভেদ হয় তাহলে দুটো আলাদা শব্দ নেওয়া কেন? তখন ঠাকুর বলছেন, জল শান্ত থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল। তার মানে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। যেমনি আমরা এই জিনিস গুলো নিয়ে আসব আমাদের অনেক সংশয় এসে যাবে। সেইজন্য বেদান্ত বলে দেয়, আসলে কোথাও কোন পরিবর্তন হয় না। এসব যা কিছু আমরা দেখছি এটাকে বেদান্ত বলছে মায়া। কিন্তু যখন বলা হচ্ছে শিব আর শক্তি অভেদ, তখন এটাই বলতে চাইছেন যে ক্রিয়াশক্তি শিবের মধ্যেই আছে, ঠিক তেমনি ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মের মধ্যেই আছে, তাই দুটো আলাদা কিছু নয়। শব্দব্রহ্ম হল, শিব আর ক্রিয়াশক্তি এবার ক্রিয়া করতে শুরু করল। সৃষ্টির প্রথম প্রকাশটাই হয় শব্দব্রহ্ম দিয়ে। এগুলো সব বিভিন্ন দর্শনের দিক থেকে বলা হয়ে থাকে। সব দর্শনকে আমরা এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারি না। যখন শব্দব্রহ্ম নিয়ে আসা হবে তখন সেখানে আর শক্তি মত চলবে না, এগুলো এক একটা আলাদা আলাদা মত। কিন্তু শব্দ দিয়ে সৃষ্টি, ওঁমকার দিয়ে সৃষ্টির মত বেদেই আসে, উপনিষদেও আসে, সেইজন্য হিন্দুরা মোটামুটি সবাই এই মতকে মানে।

প্রথম যুক্তি দেখালেন মন ব্রহ্মকে ধারণা করতে পারে না, কেন পারে না, আমরা আগে আলোচনা করেছি, পরে আবার আলোচনায় আসবে। দ্বিতীয় হল, আচার্যের যুক্তি শুধু এখানেই নয়, তাঁর রচিত সমস্ত ভাষ্যে তিনি এই যুক্তিকে নিয়ে চলেছেন, সেই যুক্তি হল, কোন যৌগিক জিনিস কখনই মৌলিক হতে পারে না। যেমন শরবতে জল, লেবু আর চিনি আছে, তিনটে আলাদা আলাদা জিনিস দিয়ে একটা আলাদা জিনিস তৈরী হয়ে গেল, যাকে বলছি শরবৎ, ওটা কখন মৌলিক সত্য হতে পারে না। শুধু জল আরও মৌলিক, চিনি আরও মৌলিক। এবার জলকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তখন

বিজ্ঞানীরা বলে দিলেন জলকে শুধু জল বলেই জানা যাবে না, কারণ জল হল হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মিশ্রণ। এবার হাইড্রোজেন হল মৌলিক, বিজ্ঞানীরা তাই বলেন। ডাল্টন বলে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন ওনার Atomic Laws আছে, তিনি সেখানে বলছেন হাইড্রোজেন হল মৌলিক। তারপর বিজ্ঞানীরা আরও এগিয়ে গিয়ে দেখছেন, এ্যটম থেকেও অনেক কিছু বেরোচ্ছে, তারপর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নামে বিজ্ঞানের একটা নতুন শাখা বেরিয়ে এল। তখন দেখা গেল হাইড্রোজেনটাও মৌলিক নয়। কিন্তু জগৎ যখন চলে তখন হাইড্রোজেন মৌলিক। জগতের যে একটা individuality থাকে সেটা হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন এসে যাওয়া মানে জগতের যে আমরা individuality পাই সেখান থেকে সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, কিন্তু সেটাও মৌলিক নয়। রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান সবাই ওই অনুসন্ধান করে যাচ্ছে মূলটা কোথায়, যেখান থেকে বহু বেরিয়ে আসছে। বহুকেও বিজ্ঞানীরা মূল মনে করেন না। যেখানেই variation রয়েছে variety রয়েছে সেটা কিন্তু মূল নয়, মৌলিক নয়। কোথাও একটা মূল হতে হবে।

এই যে এত মানুষ, এর একটা শুরু খুঁজে বার করতে হবে। খুব সহজে বলে দেওয়া যায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন, একটা মূলে চলে যাওয়া গেল। কিন্তু আরও ভেতরে গেলে অনেক প্রশ্ন উঠে আসবে। উপনিষদ পুরো নিজেকে নিয়ে চলে, কারণ উপনিষদ মানেই, science of self realization আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান। নিজেকে নিয়ে বলতে গিয়ে আমার ইন্দ্রিয় যেগুলো রয়েছে এগুলো ব্রহ্ম নয়। কেন নয়? তখন বাক্ নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন এরও এত বিভিন্নতা।

এরপর বলছেন, বাণীর পেছনে একটা চৈতন্য শক্তি থাকাতে বাণী বিভিন্ন বিচারগুলিকে বহন করে চলতে পারে। তার মানে এটাই হয়, এই যে বিভিন্নতা রয়েছে, এই বিভিন্নতা কাজ করত না যদি তার পেছনে একটা মৌলিক সত্য কাজ না করত। একটা মৌলিক শক্তি তার পেছনে কাজ করছে, এই শক্তি যদি কাজ না করত তাহলে বাণীর পক্ষে তার কোন কাজ করা সম্ভব হত না। এই মৌলিক শক্তিকে বলছেন আত্মজ্যোতি। ঐ যে আত্মজ্যোতি, আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম, বাণীরও যিনি সার, যিনি পুরো জিনিসটাকে ধারণ করে আছেন। এই জিনিসগুলো আগে আগে আমরা অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম, তাই যেখানে যেখানে যতটুকু দরকার তার ততটুকুই আলোচনা করা হচ্ছে।

যে কোন জিনিসের যেটা মূল বা স্বরূপ, যেটা মৌলিক, ওটাই ব্রহ্ম। ওটাকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জানবে, যাঁর আরেকটা নাম ভূমা। ভূমার অর্থ বৃহৎ। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলছেন, *যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্*। ব্রহ্ম শব্দ এসেছে বৃ ধাতু থেকে, বৃ মানে বড়। যেটার যা বড় সেটাই ব্রহ্ম, যদি তারও বড় হয়, সেটা ব্রহ্ম, যদি তারও বড় হয় সেটাই ব্রহ্ম। এইভাবে শেষে এমন জায়গায় বড়কে নিয়ে যেতে হবে যেখানে তার থেকে বড় আর কিছু হয় না, অনন্ত, সেটাকে বলছেন ব্রহ্ম। তার একটা নাম ভূমা, ভূমা মানে বড়। তিনি বৃহৎ কেন? কারণ তিনি সব কিছুতে ছেয়ে আছেন অথচ তিনি সব কিছুর আত্মা, ভেতরে আত্মা আছেন বলে জিনিসগুলো চলছে। আত্মা আর ব্রহ্ম এক। কারণ যে কোন জিনিস, যেমন বাক্ ইন্দ্রিয় কাজ করছে, এই যে বিভিন্নতা, এই বিভিন্নতাতে যিনি ঐক্য সাধন করছেন, যে একত্রিকরণের জন্য জিনিসটা চলছে, এটাই তার স্বরূপ, তার আত্মা। তাহলে আত্মা কি? যেটা আমার স্বরূপ, বাস্তবে যেটা আমি। এই বাণীর এত বৈচিত্র্য কিন্তু তার স্বরূপ আত্মা। এই আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম মানেই বৃহৎ। কত বড়? যত বড় আমরা কল্পনা করতে পারি তার থেকেও বড়। ভাগবতে কাহিনী রূপে এটাই দেখাচ্ছেন, যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাঁধছেন, কিন্তু যত দড়িই তিনি নিয়ে আসছেন দড়ি কয়েক আঙুল কম পরে যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ ওই কয়েক আঙুল বড় সব সময় থেকে যাবেন।

যিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তাঁরও যিনি আত্মা, সেই আত্মাই বৃহৎ। সেই একই জিনিস ব্যপ্ত হয়ে আছে। আমি আছি, আমার দেহ আছে, দেহেতে আছে আমার মন, মন আরও সূক্ষ্ম, এই মনের আরও ভেতরে রয়েছেন আত্মা, আরও সূক্ষ্ম। মানুষের মন এমন, যেটা ক্ষুদ্র সেটাকে মন বৃহৎ দেখে আর যেটা আসলে বড় সেটাকে ক্ষুদ্র দেখে। আত্মা সর্বব্যাপী, অথচ আমরা মনে করি আমার ভেতরে ক্ষুদ্র রূপে আছে। আর

মন হল, জগৎ যতটুকু ততটুকু জড়িয়ে মন, কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের বুদ্ধির ভেতরে যেটা কাজ করছে সেটাই মন আর এই সব কিছু এই দেহের ভেতরে। অথচ ঠিক ঠিক যদি দেখা হয় তখন দেখা যাবে আত্মাই অনন্ত আর মন হল বৃহৎ, অর্থাৎ এই জগতে সব থেকে বড়। আর তার ভেতরে শরীর একটা ছোট্ট জিনিস। অথচ আমরা পুরো জিনিসটাকে উল্টো দেখি। ছোটটা বড় দেখাচ্ছে, বড়টা ছোট দেখাচ্ছে, এটাই মায়া। উল্টো ভাবে দেখাতে এই কারণেই দোষের নেই, ভেতরে যেটা দেখা হয় সেটাকে বলছেন আত্মা আর ওই আত্মাই বৃহৎ। আসলেই বৃহৎ, সেইজন্য তাঁর নাম ব্রহ্ম।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, ঐটাকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জানো। কোনটা কে? এই যে বাক্‌এর যে এত ভ্যারাইটি রয়েছে, এই বিচিত্রতার পেছনে যে এর স্বরূপ, সেটাকে তুমি ব্রহ্ম বলে জান। সেই ব্রহ্মের কি বিশেষত্ব? ব্রহ্মের উপর যখন বিভিন্ন উপাধি এসে যায় তখন দেখা যায় তিনি বাণীরও বাণী, চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, তার সাথে মনে হয় তিনি নিয়ন্তা, শাসনকর্তা, আর মনে হয় বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। এগুলো হল ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করা, যেমন যেমন উপাধি দেওয়া হবে, যেভাবে দেখতে চাইবে, জিনিসটা সেইভাবে দেখাবে। তিনি নিরাকার বলে আমরা তাঁর উপর একটা উপাধি লাগিয়ে দিচ্ছি। তেমনি যখন বলছি তিনি আমাদের কর্মফল দেন, তখনও একটা উপাধি চাপিয়ে দেওয়া হল। আসলে তিনি হলেন সর্বব্যাপী, নির্বিকার, নির্বিশেষ। ব্যবহার কালে আমরা তাঁর নামে অনেক কিছু বলছি, এই যে বলছেন, চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, তিনি নিয়ন্তা, হৃদয়ে বসে তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি বিজ্ঞানময়, কত কি বলছি। অথচ তিনি অব্যবহার্য, তাঁকে কখনই ব্যবহার নামানো যায় না, লৌকিক জগতে তাঁকে কখনই নামানো যায় না। আমরা যেমন সব সময় বলি, ঠাকুর আছেন, তিনি দেখছেন, তিনিই দেখবেন, এগুলো বলে আমরা তাঁকে ব্যবহারে নামিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমরা ঠাকুরকে নিয়ে আলোচনা করছি না, আলোচনা চলছে সত্য কি। উপনিষদের ঋষি বলছেন সত্য হল ব্রহ্ম, যিনি চক্ষুরও চক্ষু, কানেরও কান। প্রকৃতপক্ষে তিনি অব্যবহার্য, কিন্তু তিনি এমন ভাবে প্রতীত হন যে যেন তিনি ব্যবহারে আছেন।

সমস্ত উপাধিকে সরিয়ে দেওয়ার পর যে নির্বিশেষ আত্মা থাকেন, ওটাই ব্রহ্ম। বেদান্তে এনারা একটা খুব প্রচলিত উপমা সব সময় ব্যবহার করেন, একটা স্ফটিকের সামনে যদি অনেক রকম রঙের ফুল রাখা হয় তখন স্ফটিকটাও নানা রকম রঙের দেখাবে, একটা ফুল সরিয়ে দিলে একটা রঙ চলে গেল, আরেকটা ফুল সরিয়ে দিলে স্ফটিকের আরেকটা রঙ চলে গেল। সমস্ত ফুল সরিয়ে দেওয়ার পর যে স্ফটিককে দেখাবে সেটাই তার আসল স্বরূপ, এটাই নির্গুণ নির্বিশেষ। বিশেষ মানে, একটা গুণ বা উপাধি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। বলছেন, ওই উপাধিরহিত, নির্বিশেষকে তুমি ব্রহ্ম বলে জানবে। আমরা যখন উপনিষদাদি বুঝতে যাই তখন আমাদের একটা সমস্যা হয়, বিশেষ করে আমরা যারা ভক্ত ছোটবেলা থেকে শিব, কালী, দূর্গা, কৃষ্ণ, রামকে নিয়ে বড় হয়েছি আর আমরা সব ব্যাপারেই বলি ঠাকুরই সব করছেন, ঠাকুর এটা করিয়ে নিলেন। উপনিষদে ঠিক এই প্রশ্নটাই উত্থাপিত হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে কে চালায়, কানকে কে চালায়, চোখকে কে চালায়, আমাদের কাছে সহজ উত্তর ঠাকুর চালান। উপনিষদ বলছেন, না, এগুলো সব আত্মাই চালান। আত্মা কে? উপাধিরহিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম, উপাধি চাপিয়ে দেওয়ার পর এই ব্রহ্মকেই নানান ভাবে দেখায়। সমস্ত উপাধি সরিয়ে দিলে ভেতরে যিনি আছেন, যেটা প্রকৃত স্বরূপ, সেটাই আত্মা, সেটাই ব্রহ্ম। আসলে ওই ব্রহ্মই সব কিছু চালাচ্ছেন, কিন্তু নির্বিশেষ রূপে দেখতে হয়।

ভক্ত বলতে পারে, আমি এত জটিল কিছু জানতে চাই না, ঠাকুর সবারই ভেতরে আছেন, ভেতরে বাইরে সবটাই তিনি। ঠিকই তো বলছে, জিনিসটা তো তাই হল, সেই ঠাকুর তখন হয়ে গেলেন কৃপাময়, দয়াময়, তিনি ভক্তদের উপর কৃপা বর্ষণ করেন, তিনি হয়ে গেলেন আরও মৌলিক। এই যে নিয়ম, complex is less true than the simple, এই নিয়ম ঠাকুরের ক্ষেত্রেও লাগবে, যারা ঈশ্বর মানে তাদের ক্ষেত্রেও লাগবে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, বৈষ্ণবদের একটা সম্প্রদায় আছে সহজিয়া,

তিনি সহজ, simple। যে জিনিসটা যত simple সেই জিনিসটা তত fundamental। যে জিনিসটা যত fundamental সেই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করা তত কঠিন, ব্যখ্যা করার সময় সহজ জিনিসের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কারণ জটিল জিনিসের ব্যাখ্যা করার জন্য সহজ জিনিসের সাহায্য নেওয়া হয়, সেই সহজকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সৌন্দর্য জিনিসটাকে যদি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবে না। কারণ সৌন্দর্যটা হল মৌলিক। যেটাই মৌলিক সেটাই হয় সহজ। সহজ জিনিসকে intuitively বোঝা যায়। আচার্য ঘুরিয়ে বলছেন, দেখ বাক্‌এর যে এত বিরাট diversification, এর পেছনে যেটা simple রয়েছে যেটা এর স্বরূপ, সেটাই আত্মা। ওই স্বরূপের সমস্ত উপাধিকে যখন সরিয়ে দেবে তখন দেখবে সেই আত্মা নির্বিশেষ, ওটাকেই ব্রহ্ম রূপে জানো, ওটাই সব কিছু।

তার সাথে বলছেন, *নেদং যদিদমুপাসতে*। যদিও বলে দেওয়া হয়েছে তাও জোর দেওয়ার জন্য আরেকবার বলে দিচ্ছেন, তুমি সত্য রূপে যাঁর উপাসনা করছে তিনি কিন্তু ব্রহ্ম নন। যদি ওই জিনিসটা ওই বস্তুর স্বরূপ না হয় তাহলে সেই জিনিসটা আত্মা নয়। এবার আমরা আগের আলোচনায় ফিরে গিয়ে এই জিনিসটাকে সহজে বোঝার চেষ্টা করছি, আগে বলা হল বাক্ এর দেবতা অগ্নি। অগ্নি কি বাক্ এর স্বরূপ? সাধারণ লোক তাই মনে করবে, অগ্নি বাণীর স্বরূপ। তারা অগ্নিকেই ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করছে। উপনিষদের ঋষি বলছেন, না, কারণ অগ্নি বাক্ এর স্বরূপ নয়। কারণ যেটা স্বরূপ, সেটাই বিরাট, যেটাই স্বরাট সেটাই বিরাট, যেটাই প্রভু সেটাই বিভু। অগ্নি চরম সত্য নয়, ভেতরের স্বরূপ যেটা সেটাকে যদি বাইরেও ব্যপ্ত হয়ে আছে তাহলে ঠিক আছে। আমরা ঠাকুরের উপাসনা করছি, খুব ভালো। কিন্তু তাহলে আমাদের মানতে হবে ঠাকুর আমার স্বরূপ আর তার সাথে ঠাকুর হলেন সর্বব্যাপী শেষ সত্য, সবারই ভেতর সেই ঠাকুর বিরাজমান। যদি ঠাকুরকে আমরা এই ভাবে নিই তাহলে ঠাকুর আর ব্রহ্ম এক। কিন্তু যদি মনে করি ঠাকুর উপরে কোথাও বসে জগৎ চালাচ্ছেন, তাহলে কিন্তু এই মন্ত্রের যে প্রশ্ন এটা মিলল না। প্রশ্ন ছিল ইন্দ্রিগুলিকে কে চালাচ্ছে আর তার উত্তর হল ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাচ্ছে সহজ, যে জায়গায়তে সব কিছু এক হয়ে যাচ্ছে, যেটা তার আত্মা, এই আত্মাই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। এর বাইরে তুমি যদি অন্য কোন কিছুকে আত্মা রূপে, ব্রহ্ম বলে, ইষ্ট রূপে উপাসনা করতে থাক সেটা ব্রহ্ম নয়, সেটা আত্মা নয়, সেটা সর্বনিয়ন্তা নয়। কালী মানুক, শিব মানুক যাঁকেই মানুক, যদি মনে করে তিনি আছেন, তিনি দেখছেন, তিনি আমাদের বাইরে থেকে যন্ত্রের মত চালাচ্ছেন, তাহলে তিনি ব্রহ্ম বা আত্মা হবেন না। এবার যদি ঘুরিয়ে বলে, তিনি আমার হৃদয়ে বসে চালাচ্ছেন, তাহলে তিনি ব্রহ্ম। তিনি কি সর্বব্যাপী? হ্যাঁ। তোমার সামনের লোকের ভেতরেও কি তিনি আছেন? হ্যাঁ। তাহলে তুমি তার সাথে মারামারি কর কেন? তোমার জ্ঞান তাহলে অপূর্ণ।

এর প্রথম দিক হল, যেটাকে আমি ultimate truth বলে জানছি, জানতে চাইছি, তার বৈশিষ্ট্য হল, তাকে মৌলিক হতে হবে, সেটাই চরম সত্য রূপে হতে হবে, সেটা যেন তোমার স্বরূপ হয় আর সর্বব্যাপী হয়। ওটাই হল একমাত্র সত্য, যেটা দিয়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। এর বাইরে আমরা যাঁরই উপাসনা, পূজা অর্চনা ব্রহ্ম রূপে, আত্মা রূপে, ঈশ্বর রূপে করে থাকি না কেন, আমাদের ধারণাটা ভুল, সেটা ব্রহ্ম নয়, আত্মা নয়। কিন্তু সেটাকে আমরা কালী রূপে দেখি, শিব রূপে দেখি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তাকে নির্বিশেষ হতে হবে। যদি নির্বিশেষ না হয়, বিশেষ যদি হয় তাহলে যখন যুক্তির মধ্যে দিয়ে এগোবে তখন অনেক সমস্যা এসে যাবে।

এখানে আলোচ্য বিষয় হল কানকে, চোখকে কে বস্তুর দিকে পাঠায়, ইন্দ্রিয়গুলোকে কাজে কে প্রেরিত করছে। এর উপর পুরো বিস্তারে আমরা আলোচনা করা হয়ে গেছে। তখন এভাবে বলা হয়েছিল এর কয়েকটা সম্ভাব্য সহজ উত্তর হতে পারে, একটা উত্তর হতে পারে ইন্দ্রিয়গুলো নিজের মত চলে, দ্বিতীয় উত্তর হতে পারে ইন্দ্রিয়গুলোকে মন চালায়, তৃতীয় ইন্দ্রিগুলিকে কোন দেবতা চালায়। একটা সহজ সাধারণ ধারণা হল, যেমন বাক্ এর দেবতা অগ্নি, তাই অগ্নি দেবতাই বাক্ কে চালায়। ভক্তরা বলবে অগ্নি চালায়, নিওরো বিজ্ঞানীরা বলবে মন চালাচ্ছে, সাধারণ মানুষ মনে করে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের

মত চলছে। এবার একজন সত্যিকারে মেধাবী ছাত্র এসে গুরুকে প্রশ্ন করেছে, চোখ, কান, নাক এদের কে চালায়। গুরু তখন শিষ্যকে খুব সংক্ষেপে একটা একটা করে বলছেন, এই যে চক্ষু ইন্দ্রিয় এর পেছনে তার যিনি দ্রষ্টা, যিনি কাজ করছেন, যিনি চোখেরও চোখ, কানেরও কান, মনেরও মন এটাই আসলে এদের চালায়। যিনি চালাচ্ছেন তাঁর কি গুণ? তার উত্তর দ্বিতীয় মন্ত্রে বললেন। শিষ্য এত কথার কি বুঝল না বুঝল, কতটা বুঝল জানা নেই, তাই গুরু আবার বলছেন, সেই যে ব্রহ্ম তাঁকে বাক্ প্রকাশিত করতে পারে না, ব্রহ্ম থেকেই এর উৎপত্তি। যেখান থেকে এর উৎপত্তি সেটাই আসল। তুমি যদি মনে কর এর বাইরে কেউ ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাচ্ছে, এটা তাহলে তোমার ভুল ধারণা। কেন ভুল ধারণা, এটাই আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করে এলাম।

আবার আমরা মূল প্রশ্নে আসছি। ইন্দ্রিয়কে কে চালাচ্ছেন? আমি বলব ঠাকুর চালাচ্ছেন। খুব ভালো, কোন অসুবিধা নেই। এনারা যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন যদি ঠাকুর মৌলিক সত্য হন তাহলে ঠাকুরই চালাচ্ছেন বলাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু ঠাকুরকে যদি উপাধিযুক্ত রূপে নিয়ে থাকি তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর এই কারণেই সঠিক হবে না, যাঁরই একটা উপাধি লাগানো হয় তাহলে তাঁর দুটি উপাধি হয়ে যাবে, সোপাধিক মানেই যাঁর দুটি উপাধি হবে তাঁর তিনটি উপাধি হবে। এবার তিনি যৌগিক হয়ে গেলেন, যৌগিক হয়ে যাওয়ার পর তিনি আর মৌলিক সত্য থাকলেন না। যেমন আমরা বলছি ঈশ্বর কৃপাময়, আমার প্রতি অবিচার হয়েছে, আমি এখন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর আমার উপর অবিচার হয়েছে তুমি কৃপাময় তুমি আমাকে ন্যায্য বিচার দাও। ঈশ্বরের কাছে কেন গেলাম? কারণ তিনি ন্যায় দেন, তিনি ন্যায়পরায়ণ ভগবান। এবার একজন খুন করে এসে ঈশ্বরকে বলছে, হে ঠাকুর! তুমি কৃপাময় আমাকে বাঁচাও। ঈশ্বর এবার কি করবেন? তিনি কি ন্যায়পরায়ণ থাকবেন নাকি খুনিকে কৃপা করবেন? আমরা বলব, একটু শাস্তি দেবে একটু ছাড়বেন। যাকে খুন করা হয়েছে তার বাড়ির লোকেরা এসে ঈশ্বরকে বলবে, হে ঈশ্বর তুমি যে ন্যায়পরায়ণ আমি দেখতে চাই, ও যেন ছাড়া না পায়, ওর যেন কঠোর থেকে কঠোরতম দণ্ড হয়। এদিকে খুনি বলছে, হে ঠাকুর তুমি কৃপাময় আমাকে রক্ষা কর। এবার কি হবে? ঈশ্বর complex হয়ে গেলেন।

আচার্য এটাই যুক্তিতে ব্যবহার করছেন, যে কোন জিনিস যদি complex হয় ওটা কখনই মৌলিক সত্য হতে পারে না। মৌলিক সত্য কে হবে? যিনি সব কিছুকে তার নিজের নিজের কাজে চালাচ্ছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে যিনি চালাচ্ছেন তিনি কে? তিনিই সেই, যিনি ওই বস্তুর স্বরূপ, স্বরূপ মানেই আত্মা, যিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর উপর থেকে যত উপাধি আমরা সরাব তত আমরা তাঁর কাছে যাব। আচার্য তাই বলছেন, যিনি ব্রহ্ম তাঁর একটি নাম সচ্চিদানন্দ। বলেই আচার্য বলছেন, যিনি সৎ তিনিই চিৎ তিনিই আনন্দ। রামানুজাচার্য বলছেন, তা কখন নয়, যিনি ঈশ্বর সৎ, চিৎ, আনন্দ এগুলো তাঁর গুণ। এবার এখানেও সমস্যা এসে গেল, যিনি আনন্দময় তিনি তো নিরানন্দও থাকতে পারেন। এর জবাবে বিশিষ্টাদ্বৈবাদীরা খুব ভালো ভালো উত্তর দেবেন, আমরা সাধারণ মানুষ এসব বুঝতেও পারব না। কিন্তু আমরা এতটুকু বুঝতে পারি, যেমনি ঈশ্বরের মধ্যে গুণ নিয়ে আসা হল, এবার কিন্তু complexity আসতে শুরু হয়ে যাবে। আচার্য বার বার বলছেন, মৌলিক সত্য সেটাই যেটা সবাইকে চালাবে সেখানে কোন complexity থাকতে পারে না। যে কোন জিনিসের যদি দুই থাকে, ওই দুই কোথাও না কোথাও গিয়ে যোগ হবে, সেখান থেকে তিন হবে। সেইজন্য আচার্য দেখাচ্ছেন, যে কোন জিনিসকে যদি নেওয়া হয় প্রত্যেকটি জিনিসের পেছনে বহু লেগে আছে, ওই বহুর পেছনে যে এক, সেই এক যেটা সেটাকে ধর। যেমনি উপাধি সহিত নেওয়া হবে, তখন এই যে প্রশ্ন *কেনেষিতং পততি মনঃ*, এর উত্তর হতে পারে না।

এখানে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হচ্ছে না যে, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম সত্য নাকি সগুণ সাকার ব্রহ্ম সত্য, এখানে প্রশ্ন হল ইন্দ্রিয়গুলিকে কে চালায়। মেলায় আজকাল নাগরদোলায় দেখা যায় কোনটা খুব স্পীডে ঘুরছে, কোনটা আরেকটার উল্টোদিকে ঘুরছে, বাচ্চাদের চাপতে প্রথমে ভয় লাগবে। কিন্তু

একবার চাপার পর খুব মজা পায়। কারুর যদি মনে প্রশ্ন আসে এই যে এত গুলো দোলনা বিভিন্ন ভাবে ঘুরছে এর পেছনে কি কোন শক্তি আছে যে এই সব কটা শক্তির জননী? তখন সে ধীরে ধীরে অনুসন্ধান করতে করতে দেখল একটা সিঙ্গল মোটর, ওই একটা মোটর ঘুরছে বলছে সব কটা দোলনা ঘুরছে। ওই মোটরের রহস্য জেনে গেলে সব কটার রহস্য জানা হয়ে যাবে। এখানেও তাই, এতগুলো ইন্দ্রিয় এত রকম ভাবে চলছে, কে চালাচ্ছে? খুব সহজ উত্তর মন চালাচ্ছে। আরেকটু গভীরে গেল, তিনিই চালাচ্ছেন। কিন্তু উপনিষদ বলছেন, যিনি স্বরূপ তিনিই চালান। তাঁর স্বভাব কি? তিনি নির্বিশেষ, তিনি বৃহৎ, যাঁকে ব্রহ্ম বলছেন।

বাচ্চা বয়স থেকে আমরা সবাই ঈশ্বর, ঠাকুরকে নিয়ে কিছু বোকা বোকা বিশ্বাসকে লালন পালন করে আসছি ফলে উপনিষদের এই চরম সত্যকে নেওয়ার দম আমাদের মধ্যে নেই। ছোটবেলায় মেয়েরা পুতুল খেলে, পুতুলকে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, পুতুলের বিয়ে দেয়। পুতুল নিয়েই যদি ওরা সারা জীবন থাকে তাহলে পুতুল হয়েই থাকবে, বড় হয়ে বিয়ের পরেও পুতুল নিয়েই থাকবে। আমাদেরও ঠিক একই সমস্যা। আমরা সবাই grown up, কিন্তু বাচ্চা বয়সে ঠাকুরমা, ঠাকুর্দারা আমাদের যে পুতুল রূপী ভগবান, পুতুল রূপী নারায়ণ ধরিয়ে দিয়েছেন, ওই পুতুলকে আমরা আর ছাড়তে পারছি না। যতক্ষণ ওই পুতুলকে না ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হবে ততক্ষণ আমরা শাস্ত্র ধারণা করতে পারব না। বেদান্ত কখনই আপত্তি করবে না যদি তোমরা মনসাদেবী, শীতলামাঈয়ের পূজা কর। কিন্তু যদি প্রশ্ন কর ইন্দ্রিয়গুলিকে কে চালাচ্ছেন তখন বলবেন *তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি*। তাহলে কোনটা ঠিক? *নেদং যদিদমুপাসতে*, মনসাদেবী যিনি সাপের দেবী, শীতলামাঈ যিনি বসন্ত রোগ নিরাময় করেন তিনি কি সেই? না, তিনি নন। যুক্তিটা কি? এতক্ষণ আমরা এটাই আলোচনা করে আসছি। তত্ত্বের দিক থেকে যখন দেখা হবে, ইন্দ্রিয়গুলিকে কে চালান? শীতলাদেবী চালান। কোন অসুবিধা নেই। তাহলে সেই শীতলাদেবীকে কে হতে হবে? আপনি বলছেন শীতলাদেবী বসন্ত রোগের দেবী। তাহলে তিনি কি আমার স্বরূপ? এখানেই যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কি চালান? যদি তিনি আমার স্বরূপ হন তাহলে হ্যাঁ তিনিই চালান, যদি স্বরূপ না হন, তিনি যদি কৃপাময়, করুণাময় এই ধরণের উপাধি আসে তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ চালান না। উপনিষদ কখনই করুণা, কৃপা এই জিনিসগুলোকে আনবে না। সেইজন্য উপনিষদ সাধারণ লোকেদের জন্য নয়।

কঠোপনিষদে আত্মার কথা বলতে গিয়ে বলছেন *নিত্যোনিত্যানাং চেতনাশ্চেতনানাম্ একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্*। অনিত্যের মধ্যে যিনি নিত্য, সেই একই সিদ্ধান্ত, যেখানে বৈচিত্র রয়েছে সেটাই অনিত্য, সেই অনিত্যের মধ্যে যেটা নিত্য সেটাই সব কিছুর স্বরূপ। *চেতনাশ্চেতনানাম্*, মন, বুদ্ধি যাদের চেতন বলে বোধ হয় তারও যিনি চেতয়িতা, তিনি সেই আত্মা। যিনি বহু রূপে দেখাচ্ছেন আর যিনি সমস্ত কামনার পুর্তি করেন। উপনিষদই বলছেন, তিনি সব কামনার পুর্তি করেন, পূরণ করেন। তাহলে ঠাকুর যদি আমার আত্মা হন তিনি তো আমার কামনা পূরণ করবেনই। আমাদের জীবনে কোন না কোন কামনা তো পুর্ত হয়েছে। খেলে আমার পেট ভরে, তৃপ্তি পাই। ওই পুর্তিটা কে দেন? সাধারণ বায়োলজিতে বলব, আমি হাত দিয়ে খাই, মুখ দিয়ে পেটে যায়, আমার পেট ভরে, আমি তৃপ্তি পাই। এনারা বলবেন, ওই তৃপ্তিটা আত্মার হয়। কারণ পেটের বোধ করার ক্ষমতা নেই। পেট সঙ্কেত পাঠায় মস্তিষ্কে, মন জেনে গেল আমি তৃপ্ত। মন অবশ্যই তৃপ্ত হত যদি মন স্বাধীন হত, কিন্তু মন স্বাধীন নয়, মন মৌলিক নয় সেইজন মন সন্তুষ্টি পেতে পারে না। সন্তুষ্টি আসে আত্মা থেকে, জীবনে সন্তুষ্টি কে দেন? ঠাকুর দেন। ঠাকুর কে? আমার স্বরূপ। সেখান থেকে তিনি যদি করুণার সাগর হন তাতে কিছু অসুবিধা নেই। কেউ যদি সোপাধিক রূপে ঠাকুরকে দেখতে চায় তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু যদি প্রশ্ন করে মনকে কে চালান? যদি ভেতরে যেতে চায়, তখন হবে নিরুপাধিক ব্রহ্ম।

কিন্তু আমি তার চিন্তাই করতে পারব না, কারণ মন তাকে চিন্তা করতে পারে না, তাই বাক্ তাঁকে প্রকাশিত করতে পারে না, সেই ব্রহ্মকে নিয়ে আমি কি করব! আমার এমন ব্রহ্ম চাই যাঁর আমি

চিন্তা করতে পারব, তাঁর কাছে আমি প্রার্থনা করতে পারব আর তাঁর কথা আমি অপরকে বলতে পারব। তাই সোপাধিক ব্রহ্মকেও দরকার। ঠাকুর আর ব্রহ্মের কোন সমস্যা নেই। সগুণ ঈশ্বর আর নির্গুণ ঈশ্বরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু একজন সোপাধিক আরেকজন নিরুপাধিক। উপনিষদ অবশ্য কক্ষণ কোন মতে যুক্তির বিরোধিতা করার সুযোগ দেবে না। সেইজন্য যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেবেন নিরুপাধিক ব্রহ্মই সত্য। পরে আবার কোন প্রসঙ্গ এলে বলবেন যিনি নিরুপাধিক তিনিই সোপাধিক, কিন্তু এই জায়গায় তা হচ্ছে না। এখানে নিরুপাধিক মানে নিরুপাধিকই, যিনি তোমার স্বরূপ তিনি বৃহৎ, তিনিই ভূমা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা।

মুণ্ডকোপনিষদেও ঋষি প্রথমেই প্রশ্ন করছেন, *কস্মিন নো ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি*, কোনটাকে জানলে সবটা জানা যায়। এখানেও খুব সহজ উত্তর, মূলকে জানলে সবটাই জানা হয়ে যাবে। স্বামীজী একই সিদ্ধান্তকে আধার করে বলছেন ফিজিক্স যেদিন জেনে যাবে, যে শক্তি দিয়ে বাকি সব শক্তি বেরিয়েছে, সেদিন ফিজিক্স শেষ, কেমেস্ট্রি যেদিন জেনে যে element থেকে সব element বেরোচ্ছে, সেদিন কেমেস্ট্রি শেষ, তারপর আর কিছু জানার অবশিষ্ট থাকে না। এই প্রশ্ন আমাদের ঋষিরা অনেক আগেই তুলেছেন, মূলটা কি। ফিজিক্সে জানা যাবে কোন এনার্জি দিয়ে সব এনার্জি চলছে, কেমেস্ট্রি বলবে কোন element দিয়ে সব element চলছে। বায়োলজি বলবে কোন জিন দিয়ে সব জিন বেরোচ্ছে। কিন্তু ধর্ম আরেক ধাপ পেছনে যাচ্ছে। কোন জিনিসটাকে জানলে ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি সবটাই জানা হয়ে যাবে। উত্তরটা খুব সংক্ষেপে হল যেটা compound নয়। কিন্তু এই সহজ উত্তরকে বুঝতে গেলে আমাদের এই জন্ম কেন আরও কত যে জন্ম লেগে যেতে পারে জানা নেই। কারণ উপনিষদ আর ফিজিক্সে একটা বড় তফাৎ আছে, এখানেও একটা মজার ব্যাপার আছে। Murray Gell-Mann একজন খুব নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন, ১৯৬৯ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি নোবেল প্রাইজও পান। মজার হল ফিজিক্সের কাহিনী যেভাবে যায় বেদান্তের কাহিনীও ঠিক সেভাবেই যায়। ফিজিক্স আর কেমেস্ট্রির যে জায়গাটা সীমারেখা, যেখানে এ্যাটমস্ রয়েছে, বিজ্ঞানীরা দেখছেন সেখানে আশি নব্বুইটা element আছে, আর সবটাই এলেমেলো, কোন sense বার করতে পারছেন না। তখন ম্যণ্ডোলিন নামে একজন বিজ্ঞানী, অনেক বুদ্ধি লাগিয়ে একটা জিনিস দাঁড় করালেন, তাকে বলছেন Periodic Table। এই পিরিয়ডিক টেবিল পুরো ফিজিক্স আর কেমেস্ট্রিকে পাল্টে দিল। ক্লাশ নাইন টেনে যে পিরিয়ডিক টেবিল পড়ানো হয় সেখানে তার তাৎপর্য অত বোঝা যায় না। প্রথমেও কেউ এর অর্থটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু জিনিসটা খুব কাজের।

ম্যাণ্ডোলিন এই পিরিয়ডিক টেবিল করার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর লাগল এর উপযোগিতাকে বুঝতে। যত রকমের এ্যাটমস্ রয়েছে সব কটাকে তিনি গুছিয়ে দিয়েছেন আর তাই না, পিরিয়ডিক টেবিল দেখলেই একটা এ্যাটম কোন জায়গাতে আছে তার পুরো প্রপার্টি বলে দেওয়া যায়। যার জন্য কারুর যদি পিরিয়ডিক টেবিল না বোঝা থাকে সে কেমেস্ট্রি বুঝতে পারবে না, লোহা এভাবে কেন আচরণ করে, হিলিয়াম গ্যাস কেন এভাবে আচরণ করে, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম কেন এভাবে আচরণ করে সব ওই একটা টেবিলে দেওয়া আছে। অথচ যিনি এটা করলেন তখন তিনিও এর এত উপযোগিতা বোঝেননি, কারণ ফিজিক্স কেমেস্ট্রি তখনও এতটা উন্নত হয়নি। এরপর ১৯০০ সালের কাছাকাছি এসে রাদারফোর্ড যখন এ্যাটমকে ভাঙলেন, তখন একটার পর একটা বেরোতে থাকল, এ্যাটমের ভেতরে ইলেক্ট্রন আছে, প্রোটন আছে। হতে হতে ১৯১৫ আসতে আসতে এ্যাটমের ভেতর থেকে ষাট সত্তর খানা জিনিস বেরিয়ে এল। কোন বিজ্ঞানী মাথা, মুখ, চোখ খুঁজে পাচ্ছে না। একটার সাথে আরেকটা রিলেশানশিপ কি সেটা বার করতে পারছেন না। যেমন এই জগতে আমরা রিলেশানশিপ কিছু খুঁজে পাই না। একটা বাচ্চা যদি বলে গাছ আর আমার মধ্যে প্রাণ আছে, গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মরে যায়, আমি কেন চলতে পারি, আমি আর পাখি কি করে এক হলাম, পাখি উড়ে যেতে পারে আমি তো পারি না? সত্যিই এর থেকে কোন অর্থ বার করতে পারি না। ঠিক সেই রকম বায়োলজিত বিভিন্ন

প্রজাতির উৎস যতক্ষণ আসেনি, কেউ কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পরে ডারউইন ও আরেকজন বিজ্ঞানী পুরো জিনিসটাকে সাজিয়ে একটা প্যাটার্নে নিয়ে এলেন, সবটাই একটা প্যাটার্নে চলছে।

এখন এই Murray Gell-Mann একটা ডায়াগ্রাম বানালেন, ডায়াগ্রাম বানিয়ে উনি বললেন যত সাব-এ্যটমিক পার্টিক্যাল আছে সব কটাকে এভাবে গুছিয়ে দেওয়া যায়। এরপর উনি তাঁর একজন বন্ধুর সাথে এর উপর কথা বলছিলেন তখন বন্ধু তাঁকে দেখালেন আপনার এতে এই গ্যাপ রয়ে গেছে। একটা গ্যাপ ছিল ঠিকই, এগুলো একটু হায়ার ফিজিক্সে চলে। ওই সময় তাঁরা একটা হোটেলে খাচ্ছিলেন, সেখানেই একটা ন্যাপকিন বার করে উনি দেখালেন, এটাকে আমি যদি নিতে যাই তাহলে বেরোবে প্রোটনের ভেতরে এমন জিনিস আছে যার চার্জ অবাস্তব হয়ে যাবে। বন্ধু তখন আরও দু চারটে কথা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। উনি ওটার নাম দিলেন কোয়ার্ক (Quark), এই নামটা তিনি আবার একটা উপন্যাস থেকে নিয়েছিলেন, সেটাও আবার খুব মজার কাহিনী। এখন সমস্যা হল, তিনি বললেন এই কোয়ার্ক জিনিসটাকে কোন দিন experiment দিয়ে জানা যাবে না। অন্য দিকে থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্সের ওটা হল প্রাণ। আজকের দিন কোয়ার্ক ছাড়া ফিজিক্স কল্পনাই করা যায় না। ইলেক্ট্রন প্রোটন সব কটার মা হল কোয়ার্ক। বলছেন কোয়ার্ককে জানাই যাবে না। তখন পদার্থ বিজ্ঞানী বললেন, যে জিনিসটাকে আমি জানতেই পারব না, তার অস্তিত্বের কোন দাম নেই। ওনারা বললেন, আমরা এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও ওর অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ করে ছাড়ব। তারপর ওনারা নানা রকম experiment করে করে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ পেয়ে গেলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ নয়। কোয়ার্কের আশ্চর্যের জিনিস হল, ওর যে স্বভাব, ওর যে গুণ, ওর যে প্রপার্টি তার মানেই হয় এই জিনিসটাকে কোন দিন জানা যাবে না, ওর সংজ্ঞাই এটা, এই জিনিসটাকে কোন দিন জানা যাবে না। কোন পদার্থ বিজ্ঞানী যদি বলে তুমি বলছ ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, কোন ভাবে জানা যাবে না, যত সব ফালতু কথা। তাহলে বিজ্ঞানীকেও একই ভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে, তোমার যেটা মৌলিক কোয়ার্ক, এটাকে কি কোন দিন দেখা যাবে? কোন দিন যাবে না। অথচ আজকের দিনে কোয়ার্ক ছাড়া ফিজিক্স অচল। বিজ্ঞানীরা এও বলছেন যে কোয়ার্কের প্রমাণ তাঁরা পরোক্ষ ভাবে পেয়েছেন। কোয়ার্ক মূলতঃ তিন রকমের হয়, সেটার আবার variety দু রকমের হয়। এই ভাবে করে করে ওনারা দেখছেন যত রকমের এ্যটমিক পার্টিকেলস্ আছে সব কটাকে ওটা দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। এই যে গেল-মান একটা থিয়োরী নিয়ে এলেন, বিজ্ঞানীরা বলছেন যদি এর verify না হয় তাহলে এর কোন দাম নেই।

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে ঠিক তাই হয়। এনারা দুটো জিনিস নিয়ে আসছেন, এই যে variety আছে এটাকে আমরা কোন common platformএ ফেলে দিতে পারি কিনা। Common platformএ যখন ফেলতে যাচ্ছেন তখন এনারা বলছেন simple, ফেলা যাবে। একটা মূল আছে যেখান থেকে সব কিছু বের হচ্ছে। ওই মূলের পরিভাষা কি? এটাই তার পরিভাষা যে সেখানে কোন complexity নেই। কদাচিৎ একটা জিনিসকে যদি আমরা ধরে নিই যে এটাই আমার শেষ কথা, তখন হবে যে, এটা যদি শেষ কথা হয় তবে এর কি কখন কোন পরিস্থিতিতে কোন পরিবর্তন আছে? যদি হয় তাহলে ওটা কিন্তু মূল নয়। এটাই মৌলিক, এছাড়া আর কিছু নয়। এরপর প্রথম থেকে আমরা যে আলোচনা করে যাচ্ছি যে ইন্দ্রিয়গুলি কখনই মৌলিক হতে পারে না। এইভাবে আমরা বাক্ ইন্দ্রিয়ে এলাম, সেখান দেখান হল বাক্ ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কেন করতে পারে না? কারণ বাক্ এর একটা উৎপত্তি আছে, আমরা জানি কিভাবে তার জন্ম হয়। দ্বিতীয় বাক্ এর বিস্তার আছে, যে জিনিসরই বিস্তার আছে সেটা কখনই মৌলিক হতে পারে না। ওই জিনিসটার বিস্তার যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে ঠিক আছে সেটা না হয় মানলাম মৌলিক, কিন্তু বাক্ নিজেরই দুটো বিস্তার আছে, সত্য আর মিথ্যা, বাক্ এর বিস্তার স্বরব্যঞ্জন, তার মানেই বাণীর variety আছে। তাই বাণী মূল হতে পারে না। তাহলে বাণীর জন্ম কোথা থেকে? এর উপর আগে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। আমাদের শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে এর আলোচনা করেন। ভাগবতাদি গ্রন্থে বলছেন পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। বৈখরী মানে আমরা সব সময় যত কথা বলছি, আর যেমন যেমন ভেতরে নিঃশব্দের

দিকে যায় সেখান পরা হল শেষ, যেখান থেকে সব কিছুর উৎপত্তি। এটাই ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে, প্রণব নাদে লয় হয়, সেই নাদ ভেদ করে যোগী তাঁর কৃপায় পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন।

এই সিরিজের প্রথম মন্ত্র *যদ্বাচানভ্যুদিতং* আমরা আলোচনা করলাম, বাক্ দিয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ঠাকুর বলছেন ব্রহ্ম কোন দিন উচ্ছিষ্ট হবে না, কারণ তাঁকে মন বাণী দিয়ে ধরা যাবে না। আমরা বেশির ভাগ সময় মনে করি, একটা পাথর আকাশে ছুড়লে পাথরটা নীচে পড়ে যাবে, এ্যারোপ্লেনও একটা সময় পড়ে যাবে, পাখিও একটা সময় পড়ে যাবে, ঠিক তেমনি মন আর বাণী অত উঁচুতে যেতে পারে না। এখানে ব্যাখ্যাটা তা নয়। ব্যাখ্যা হল, যৌগিককে দিয়ে কখনই মৌলিককে ব্যাখ্যা করা যায় না আর যৌগিককে দিয়ে কখনই মৌলিককে ধরা যায় না। একটা জিনিসের নিজস্ব যে প্রপার্টি, যেটা তার আত্মা, বাণী কখনই আত্মার উপর কাজ করতে পারবে না। আগুন যেমন কোন দিন নিজেকে জ্বালাতে পারবে না, আর জল যেমন নিজেকে কোন দিন ভেজাতে পারবে না, তেমনি বাণীর আত্মা ব্রহ্ম, সেইজন্য বাণী কোন দিন ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

মৌলিক মানেই সেখান থেকে বাকি সব কিছু বেরিয়ে আসছে। ওই একটাকে যে ধরে নেবে বাকি সব কিছুকে সে জেনে যাবে। গয়নার দোকানে কত রকম ডিজাইনের গয়না কিন্তু তার মূল হল সোনা। সোনাকে জেনে গেলে সমস্ত গয়না বেরিয়ে আসবে। যত গয়না বার করে নেওয়া হবে তারপরেও অনেক গয়না বাকি থেকে যাবে, ইতি করা যাবে না। ঠাকুর বলছেন, মা এখনও আমাকে নতুন নতুন অনুভূতির মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। একজনের অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে যেতে পারে, ঠাকুর অবতার, ঠাকুর অদ্বৈত জ্ঞানী, মা কালীর দর্শন করেছেন, মা কালীকে সব কিছু দেখছেন, কিন্তু তাও শেষে বলছেন মা এখনও আমাকে নতুন নতুন অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় উক্তি করছেন, একটা পাখি আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তার শেষ নেই। ব্রহ্ম যেমন অনন্ত, আপেক্ষিক দৃষ্টিতে তাঁর সৃষ্টিও অনন্ত, আর সৃষ্টি যেহেতু অনন্ত তাই তার অনুভূতিও অনন্ত হবে। যিনি বলছেন আমি জেনে গেলাম, বুঝতে হবে সে ভুল বলছে। কেন ভুল বলছেন? কারণটা খুব সহজ, ঈশ্বর যেমন অনন্ত তাঁর সৃষ্টিটাও অনন্ত, কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে। ব্রহ্মকে আমরা যেভাবে অনন্ত বলি, ঈশ্বরকে যেমন অনন্ত বলি, সৃষ্টি সেই দিক থেকে অনন্ত নয় কিন্তু ইতি করা যায় না।

কেউ যখন বলছে আমি সমস্তকে জেনে গেছি, তখন সে বলতে চাইছে আমি ওই তত্ত্বকে জেনে গেছি যেটা দিয়ে সমস্ত কিছু হচ্ছে, কিন্তু ওই সমস্তকে জানা যাবে না। যেমন সোনাকে কেউ জেনে যেতে পারে, সোনাকে কিভাবে বিভিন্ন আকার দেওয়া যেতে পারে সেটাকে জেনে যেতে পারে কিন্তু তাই বলে সমস্ত ডিজাইনের খবর কেউ কোন দিন জানতে পারবে না। নতুন নতুন ডিজাইন আসতেই থাকবে। একজন কুম্ভকার যত বড় ওস্তাদই হোক, যতই তার হাজার বছরের বংশ পরম্পরা কুম্ভ কার্যের বিদ্যা জানা থাকুক, কিন্তু মাটি থেকে কত রকমের জিনিস তৈরী হতে পারে সবটাই সে বলে দিতে পারবে না। মৃত্তিকাকে সে জানতে পারে, কিন্তু কত রকমের আকৃতি হতে পারে কেউ জানতে পারবে না, অবতারও জানতে পারবেন না। মুণ্ডকোপনিষদে এই প্রশ্নই করা হয়েছে, *কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি*, কোনটাকে জানলে সবটাকে জানা যায়। সমস্তকে কখনই জানা যাবে না, সমস্ত যেখান থেকে সৃষ্টি সেই তত্ত্বকে জানা, সেই তত্ত্ব মানে মৌলিককে জানা। মৌলিককে আমরা কি করে বুঝব? যার কোন বিকার নেই। যার কোন বিকার নেই, এই একটা জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমস্ত গীতা, সমস্ত উপনিষদ, সমস্ত বেদ লেগে দিচ্ছে। জগৎ মানেই বিকার, আমি আপনি সব সময়ই আলাদা। কিন্তু সেই অবিকারী থেকে বিকার এলো কি করে, প্রশ্ন করলে মুখ থুবড়ে পড়বে। কারণ এর কোন ব্যাখ্যা নেই। যিনি অবিকারী, যিনি নির্গুণ নিরাকার সেখান থেকে বিকার আসবে কি করে, অথচ সেখান থেকে এই বিকার যুক্ত জগৎ বেরিয়ে আসছে। আমাদের যত ধর্মগ্রন্থ আছে সব শুধু এর মধ্যেই ঘুরপাক করছে।

অবিকারী থেকে বিকার কিভাবে এলো, এর খুব সহজ উত্তর ঠাকুরের ইচ্ছায় আসে। কিন্তু এভাবে শাস্ত্র চলে না, দর্শন চলে না, তাকে রীতিমত ব্যাখ্যা করে দেখাতে হয় কিভাবে আসে। অবিকারী কাকে বলে, কেন বলে, বিকার জিনিসটা কি আর অবিকারীর সাথে বিকারের সম্পর্কটা কি, এটাকে ব্যাখ্যা করতেই সমস্ত শাস্ত্র চলে যায়। এই বিকারের মধ্যে একটা প্যাটার্ন খুঁজে নেওয়ার জন্য, এই বিকারের মধ্যে নিজের জীবনের একটা ধারা খুঁজে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে।

গেল-মান যিনি কোয়ার্কের কথা বললেন, সেটাকে ওনারা practical করে আনলেন, যখন দেখছেন yes, it is like this, এই জায়গাতে বিজ্ঞান আর ধর্মের একটা মিল আছে আবার অমিলও আছে। মিল হল, যেমনি বলা হল মৌলিক মানে এই আমি এটাকে বুঝতে পারি কিনা, এটাকে আমি জীবনে কাজে লাগাতে পারব কিনা। যদি জীবনে লাগাতে পারছি না, তার মানে practical হল না, যদি practical না হয় তাহলে এই কথার কোন দাম নেই। কিন্তু বিজ্ঞান আর ধর্মের তফাৎ হল, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে হয় না, ধর্মের ক্ষেত্রে নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে হয়। মিল কোথায়? আপনার যত যা থিয়োরী হোক, ওটাকে practical হতে হবে আর জীবনে এটা সরাসরি কাজে লাগানো যাবে। আরেকটা অমিল হল, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বস্তুর উপর দিয়ে ওটার experiment হয়ে যায়, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে নিজের উপর দিয়ে হয়। ধর্ম মানে আমিও করেছি তুমিও আমার মত খাটো তোমারও হবে। ঠাকুর যেমন নরেনকে বলছেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তোকেও দেখাতে পারি। বিজ্ঞান যখন একটা থিয়োরী দেয় তখন বলে এটা experiment করে দেখা যাবে কিনা, verified হবে কিনা। হ্যাঁ হবে। এর মধ্যে আমরা চরিত্র ও জীবনের কোন ভূমিকা আছে কিনা? বিজ্ঞান বলবে, না। ধর্ম বলছে এটা verifiable, আর এই verificationটা হবে তোমার জীবনে। উপনিষদ বোঝা তাই খুব কঠিন, কারণ যতক্ষণ নিজের জীবনে প্রয়োগ না করতে পারছে ততক্ষণ ওর কোন দাম নেই, একটা থিয়োরী হয়ে থেকে যাবে মাত্র। পরের মন্ত্রে বলছেন –

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।১/৫।।

(অন্তঃকরণের দ্বারা লোকে যাঁকে চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু অন্তঃকরণ যাঁর দ্বারা উদ্ভাসিত হয় বলে ব্রহ্মবিদরা বলে থাকেন তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জান; কিন্তু এই যাঁকে লোকে আত্মভিন্ন রূপে উপাসনা করে থাকে, তাঁকে নয়।)

আগের মন্ত্রে বাক্‌কে নিয়ে বললেন, এই মন্ত্রে মনকে নিয়ে বলছেন। *যন্মনসা ন মনুতে*, মন দিয়ে যেটাকে মনন করা যায় না, মন দিয়ে যেটাকে জানা যায় না। যদি কেউ বলে আমি ঈশ্বরকে জানি, বুঝতে হবে তার কথায় কিছু গোলমাল আছে। কিছু ভক্ত প্রায়ই মহারাজদের এসে বলতে থাকে, আজ ঠাকুরের দর্শন হয়েছে, কাল শ্রীমার দর্শন হয়েছে, মহারাজরাও প্রথমেই বলে দেন, দয়া করে আপনি আগে একটু ডাক্তার দেখান। *যন্মনসা ন মনুতে*, আমার মন যদি ঠাকুরকে দেখে তাহলে গোলমাল আছে, কারণ উপনিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি বলছি। ঠাকুরের তাহলে কি করে দর্শন হত? ঠাকুরের মন দিয়ে দর্শন হত না। লীলাপ্রসঙ্গে যেখানে ঠাকুরের দর্শনাদির বর্ণনা চলছে সেখানে পড়লে বুঝতে পারা যায় ঠাকুরের মন দিয়ে দর্শন হত না। এর আগে মন নিয়ে যখন আমাদের আলোচনা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল, মন যে জিনিসটাকে জানে সেটাকে মন বিষয়ীকরণ করে নেয়। যেমন এই পেনকে মন জানছে, মন এই পেনকে তখন objectification করে নিচ্ছে, তবেই মন পেনকে জানতে পারবে, তা নাহলে জানতে পারবে না।

ঠাকুর বলছেন, এক সের ঘটিতে কি তিন সের দুধ ধরে? ধরবে না। তার মানে, যে বস্তুকে আমি জানব, মন যেন সেই বস্তুকে ধরতে পারে। আমার হাত এতটুকু, এই হাত দিয়ে বিশাল একটা পাথরকে আমি কোন দিন ধরতে পারব না। ঠাকুরও মন দিয়ে ধরেননি, একমাত্র শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ আত্মাকে জানতে পারেন, তাছাড়া জানা হয় না। মন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা মানেই গোলমাল আছে,

এটাকে আমরা বলি হ্যালুসিলেশান, ভূত দেখার মত। যাঁদেরই ঈশ্বর দর্শন হয় সেখানে কয়েকটা লক্ষণ আছে, প্রথম হল মন দিয়ে দর্শন করেন না, দ্বিতীয় ও খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল তাঁর জীবন সম্পূর্ণ রূপে পাল্টে যায়। জীবন পাল্টে যাওয়া মানে, ঠাকুর যেমন দেখছেন মা কালী সব হয়েছেন, তাঁর চাহনিতেই জগৎ চলছে, এই ভাবটা এসে যায়। যার জন্য কোন রচনা দেখলে বোঝা যায় এটা কোন কবির রচনা নাকি কোন ঋষির রচনা।

এখানে বলছেন *যন্মনসা ন মনুতে*, মন যেটাকে মনন করতে পারে না। শুধু তাই না, আরও গুরুত্ব হল, যেটার জন্য মন মনন করতে পারে। যাঁর জন্য মনের মনন শক্তি কাজ করে, *তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি*, ওটাকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জানবে। *নেদং যদিদমুপাসতে*, তুমি যার উপাসনা করছ, তুমি যেটাকে ব্রহ্ম বলে মনে করছ সেটা ব্রহ্ম নয়। যদি আমি মনে করি ঠাকুর আমার সাথে সাথে আছেন, ঠাকুরই আমাকে চালাচ্ছেন, তিনিই সব করছেন, তাহলে কিছু একটা গোলমাল আছে। হয় আমি না বুঝে মুখের কথা বলছি, আর তা নাহলে, আমার মাথায় গোলমাল আছে। কিন্তু কেউ যদি বলেন, ঠাকুরের ব্যাপারে মুখে কিছু বলা যাবে না, তিনি আমার মনেরও আত্মা, সেটাই ব্রহ্ম আর যেটাকে আমি দেবতা বলে মনে করছি, ইনিই মনকে চালিত করছেন, মনের দেবতা চন্দ্রমা, চন্দ্রমাই মনকে চালান, তাহলে কিন্তু হবে না। এখানে মন বলতে, মনের চারটি রূপ, মন যে চারটে ভাগে কাজ করে মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর অহঙ্কার সব কটাকে নিয়েই বলা হচ্ছে। চিত্তের কাজ হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা, চিত্তে গিয়ে সব তথ্য জমা হয়, মনের কাজ হল এই তথ্যগুলিকে বাছাই করা, এটাকেই বলছেন সঙ্কল্প-বিকল্প করা, যেগুলো কাজে লাগবে না সেগুলোকে ফেলে দেয়, বুদ্ধির কাজ নিশ্চয় করা আর অহঙ্কারের কাজ identification করা, সব শেষে যে আনন্দের বৃত্তি, ওর পরিভাষা হল অহঙ্কার।

এখানে শুধু মন বলে দিয়ে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে এক করেই বলা হচ্ছে, আলাদা করে বলছেন না। মনের মনন করা আর সঙ্কল্প-বিকল্প করা দুটো একটু আলাদা। যোগের দৃষ্টিতে মনকে বলে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা, সঙ্কল্প-বিকল্প মানে এটা করব কি করব না, এই জিনিসটা কি হতে পারে, এটা না ওটা। আর মনন হল বারংবার একটা জিনিসকে ধরার চেষ্টা। যেমন বলা হল, আজকে শিবরাত্রি তোমরা শিবমন্ত্র জপ কর তার সাথে শিবের ধ্যান কর। এখন সে ওঁ নমঃ শিবায় জপ করছে, কিন্তু সেখান থেকে মন মাঝে মাঝেই ছিটকে যাচ্ছে, বা অন্য কোন মন্ত্র এসে ঢুকে যাচ্ছে। তখন বলছেন, শুধু শিবের চিন্তন কর। এই যে মনন করা হচ্ছে, মনন করে বলেই তার নাম মন।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ে মনের বিস্তার। এবার গোলমাল শুরু হয়ে যাবে, একটাই মন, এবার তার বিস্তার হয়ে গেল, মন রূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে তার বিস্তার। ফিজিক্স বা বায়োলজির দৃষ্টিতে দেখলে তখন আমরা বলব, চোখের নার্ভস মস্তিষ্কে যাচ্ছে, আমরা বলব কানের নার্ভ গুলো বুদ্ধিতে যাচ্ছে। প্রথমের দিকে আলোচনার করার সময় বলা হয়েছিল অনুভূতি গুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে যায়, জানা জিনিসটা উল্টো পদ্ধতিতে আসে। আত্মজ্যোতি মনকে আলোকিত করে। প্রথম মন্ত্রে বলছেন *কেনেষিতং পততি*, তখন আমরা বলেছিলাম এই *পততি* শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, *পততি*, মন দৌড়াচ্ছে। আত্মা দৌড়াচ্ছে না। সাধারণ বিজ্ঞানের ভাষায় ইন্দ্রিয়গুলো মনকে খবর দেয়, আমাদের বড় বড় উচ্চমানের ঋষিরা কি এই সাধারণ জিনিসটাকে বুঝতেন না বা জানতেন না! তাহলে কেন এইভাবে বলছেন, *কেনেষিতং পততি?*

এর আগে আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মনে তথ্যগুলো যাচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু জিনিসটাকে জানার ব্যাপারটা outward হয়, inward হয় না। কর্মেন্দ্রিয়গুলো যেমন বাইরের দিকে কাজ করে, জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলো যেমন ভেতরের দিকে নিয়ে আসে, ঠিক তেমনি জানাটাও বাইরের processএ হয়। রাজার দ্বারপালরা এসে রাজাকে খবর দিল, হুজুর এই রকম হয়েছে। রাজা তখন আদেশ দিল করে দাও। এবার দ্বারপাল আদেশ পালন করার জন্য চলল, সে তখন ভেতর থেকে বাইরে যায়। ঠিক সেই রকম জানা জিনিসটা ভেতর থেকে বাইরে হয়। এই যে *পততি*, এই যে যাওয়া, পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে এটা uniform। তার মানে মন একসাথে পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে ছড়িয়ে আছে।

এখানেই গোলমাল হয়ে গেল, কারণ search for the fundamental মানেই হয় no multiplicity permitted, কিন্তু মনের multiplicity এসে গেছে, পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে সে ছড়িয়ে গেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আমাদের কামনা মনে আসে, মনে সঙ্কল্প ওঠে আমি এমনটি করব, তাছাড়া মনের অনেক সংশয় হয়, করব কি করব না, একটা জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা যেটাই হোক সেটা মনেই হয়, তার মানেই মন জটিল, জটিল মৌলিক হবে না।

প্রথম জটিলতা হল ইন্দ্রিয়গুলিতে মন ছড়িয়ে আছে, দ্বিতীয় জটিলতা মনের সঙ্কল্প-বিকল্প থেকে শুরু কর সংশয়, ভালোবাসা, ঘৃণা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা ইত্যাই এত রকম তারতম্য হয়। সেইজন্য মন কখনই মৌলিক হতে পারে না। ঈশ্বরকে মন দিয়ে তাই কখনই জানা যাবে না। কারণ complexকে দিয়ে fundamentalকে কখনই জানা যায় না। এটা যে শুধু বেদান্তের কথা তা নয়, পাশ্চাত্য দর্শনেরই কথা। আমাদের যা কিছু জ্ঞান তিনটে স্তরে হয়, প্রথম হয় বস্তু, দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় আর তৃতীয় মন বা বুদ্ধি। যে কোন বস্তুর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা গুণ থাকে। এই পাঁচটা গুণ যদি কোন বস্তুতে না থাকে তাহলে আমি সেই বস্তুকে জানতে পারব না। যার জন্য বিজ্ঞান ইলেক্ট্রন প্রোটন এগুলো কোন দিন দেখতে পারবে না। কারণ এদের ওই গুণগুলো নেই। ফলে তারা পরোক্ষ ভাবে ওই জিনিসগুলোকে জানে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না, অনুমান প্রমাণ দিয়ে জানে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে এলে বা পদার্থ যখন হয়ে যাবে তখন তার এই পাঁচটা গুণ থাকতে হবে। পাঁচটাই যদি না থাকে ওর মধ্যে dormant থাকবে, কিন্তু আছে। যেমন আগুন একেবারে গরম আর অন্য দিকে আলো বা পিওর আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। অন্য জিনিস নাও থাকতে পারে কিন্তু সবটাই আছে কিন্তু তার প্রভাবটা কম। পদার্থ এই কারণেই মৌলিক নয়, কারণ তার মধ্যে এই পাঁচটা গুণ রয়েছে। পদার্থের পেছনে রয়েছে ইন্দ্রিয়, যে ওটাকে গিয়ে ধরে। ইন্দ্রিয়েরও আবার বিভিন্ন অবস্থা আছে, যেমন বাচ্চা বয়সে চোখের খুব তেজ থাকে, বয়স হয়ে গেলে চশমা লাগে। আবার ঘুম থেকে ওঠার পর ভালো করে দেখতে পারে না। একই ইন্দ্রিয় ঘুম থেকে ওঠার পর এক রকম, ঘুমোতে যাচ্ছে তখন আরেক রকম, বিভিন্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির আচরণ বিভিন্ন রকম হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় একটা ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যায়। অন্ধ হয়ে গেলে চোখে আর দেখতে পারবে না। তার মানে, সেই একই ইন্দ্রিয় কিন্তু তার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, তাই ইন্দ্রিয়গুলিও মৌলিক নয়। মূলতঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটো জিনিসের দরকার, বস্তু আর ইন্দ্রিয়। বস্তু এই কারণে মৌলিক নয় তার পাঁচটা গুণ আছে, আর ইন্দ্রিয়ও এই কারণে মৌলিক নয় একই ইন্দ্রিয় কিন্তু তার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। বস্তু আর ইন্দ্রিয়ের পর তৃতীয় হল মন।

মনের ক্ষেত্রে এই জায়গায় নিয়ে আসছেন *কামসংকল্পশ্রদ্ধাদি*, কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য, অধৈর্য, লজ্জা, বুদ্ধি ও ভয় এই সমস্তই মন (মনোধর্ম)। মন এই মুহূর্তে বলছে এখন আমার ইচ্ছে করছে না, তার মানে আগে ইচ্ছে করছিল আবার ক্ষণে রুষ্টম্ ক্ষণে তুষ্টম্, কখন মন খুশি থাকে আবার কখন অখুশি থাকে। তার মানে, মনের অবস্থা পাল্টাচ্ছে। তাই সেই একই যুক্তিতে মনও মৌলিক নয়। আবার বলছেন, যে তার থেকে শ্রেষ্ঠ সে তাকে জানতে পারবে না। যেমন বস্তু ইন্দ্রিয়কে কোন দিন জানতে পারবে না, কিন্তু ইন্দ্রিয় বস্তুকে জানতে পারবে। তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি, চোখ কখনই মনকে জানতে পারবে না, মন কিন্তু চোখের কার্যকে জানে। কারণ যে যত সূক্ষ্ম তাকে ধরা তত কঠিন। তাই বলছেন, আত্মা চৈতন্যজ্যোতি, মন কোন দিন তার মনন করতে পারবে না। আত্মার তুলনায় মন অনেক জটিল। মন হল জড়, আত্মা হলেন চৈতন্যজ্যোতি, আর স্বভাবে মন অনেক বেশি জটিল। আত্মাই সব কিছুকে প্রকাশ করেন, সেইজন্য যাবতীয় যা কিছু আছে আত্মা তার প্রত্যগাত্মা, প্রত্যগ্ মানে আন্তরিক, অন্তরস্থ আত্মা। বলছেন, মন যেখানেই প্রবেশ করুক, মন আত্মাতে কোন দিন প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু মনই নয়, কোন জিনিসই তার আত্মায় প্রবেশ করতে পারে না, কারণ আত্মাই ওই জিনিসের সার। যার যেটা সার সে সেখানে গিয়ে কাজ করতে পারে না, আমরা উপমা দিলাম, অগ্নি নিজেকে কোন দিন জ্বালাতে পারবে না, জল নিজেকে কোন দিন ভেজাতে পারবে না।

মন যখন কাজ করে তখন বৃত্তি রূপে কাজ করে। আচার্য এই জিনিসটাকে এখানে যোগশাস্ত্র মতে নিয়ে যাচ্ছেন। যখনই কোন বস্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্বেলিত করে, সেখান থেকে অনুভূতিগুলি মনে যায়, মন তখন একটা প্রতিক্রিয়া পাঠায়। যেমন পুকুরে একটা পাথর ছুড়লে পুকুরের জলে তরঙ্গ ওঠে, মনেও সেই রকম তরঙ্গ ওঠে। মনের ওই ঢেউ ওঠাকে বলে জ্ঞান, মন যে প্রতিক্রিয়া ছাড়ছে এটাই জ্ঞান। এই জ্ঞানকে বলা হয় বৃত্তিজ্ঞান। ঢেউ আর জল এক নয়, জল আর ঢেউ পুরো আলাদা। ঢেউ তো বাস্তবিক কিছু নয়, একটা disturbance হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি মনে যে বৃত্তি ওঠে ওটা বাস্তবিক কিছু নয়, ওটা বৃত্তি। যে কোন জ্ঞান হওয়া মানেই ওটা বৃত্তিজ্ঞান। যখন কেউ বলছে, ঠাকুর আমাকে দিয়ে এটা করালেন, যদি সে সত্যিই উপলব্ধি করে থাকে ঠাকুরই তাকে দিয়ে করাচ্ছেন, তাহলে ওটা বৃত্তিজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, মনে একটা ঢেউ উঠেছে। কিন্তু ঠাকুর সবারই আত্মা, সেইজন্য তিনি কখনই বৃত্তিজ্ঞান হবেন না। ঠাকুর হলেন স্বরূপ, স্বরূপের জ্ঞান হয় না, স্বরূপের বোধ হয়। ঠাকুর বলছেন বোধে বোধ হয়। স্বজ্ঞাত ভাবে বোধ করে যে একটা আছে। বৃত্তিজ্ঞানে বাইরে থেকে একটা উত্তেজনা এলো, সেটাতে মন যে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে, এই প্রতিক্রিয়া ছাড়াটাই বৃত্তিজ্ঞান। এই বৃত্তিতে মন যে কাজ করছে, ভেতরে চৈতন্যজ্যোতি আত্মা আছেন বলেই মন কাজ করে। যে চৈতন্যজ্যোতির জন্য মন বৃত্তিগুলো তৈরী করছে, ওটাই ব্রহ্ম। এর বাইরে তুমি যদি মনে কর মনের অন্য কোন দেবতা আছে, তাহলে কিন্তু তুমি ভুল ধারণা করবে। একজন ভালোবেসে কাউকে বলতে পারে তুমি আমার মনের রাজা। সে হয়ত বিশ্বাসও করতে পারে, তোমার ভালোবাসায় আমার মন চলে, তোমার রাগে আমার মন অবশ হয়ে যায়। আমার মন জুড়ে শুধু তুমিই আছ, তুমিই আমার মনের আত্মা হয়ে গেলে। কিন্তু এখানে বলছেন, *তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে*।

গীতায় সেইজন্য ভগবান বলছেন *মচ্চিত্ত মৎপরঃ*, যার চিত্ত শুধু আমিময় মানে কৃষ্ণময় হয়ে গেছে আর আমাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, মানে আমাকে আত্মা রূপে জানে। যে ঈশ্বরকে আত্মা রূপে জানে না, ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠ রূপে মনে করে না, সে তো একেবারেই অধম। আর যে মচ্চিত্ত নয়, যার চিত্ত ঈশ্বরময় নয়, সে সাধুপুরুষ নয়। এখানে দুটো জিনিস, *মচ্চিত্ত* আর *মৎপরঃ*, একজন কামী পুরুষের চিত্ত সব সময় একটা মেয়েতে পড়ে থাকে কিন্তু সেও জানে মেয়েটি আমার আরাধ্য শিবের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। মেয়েটির জন্য সে হয়ত ৩৬৪ দিনই দিয়ে দেবে কিন্তু শিবরাত্রির একটা দিন কিছুক্ষণ শিব ঠাকুরের কথা চিন্তা করবে। কিন্তু সে যদি মেয়েটিকে বলে, তোমার জন্য আমি শিব ঠাকুরকেও ছেড়ে দিচ্ছি, সে এবার অধম হয়ে গেল। যে বলছে আমি তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমার হিন্দু ধর্মকেও ছাড়তে রাজী, লোকটি গোল্লায় গেছে। আগেকার দিনে কোন ব্রাহ্মণকে মুসলমানরা ধর্মান্তরিত করতে এলে বলে দিত, তুমি আমাকে কেটে ফেল, আমি আমার ধর্ম ছাড়তে পারব না, কারণ আমার ঈশ্বর তোমার থেকে অনেক উপরে, আমার প্রাণ, আমার জীবনের থেকেও তিনি উপরে। এইভাবে শত শত ব্রাহ্মণ তাঁদের অমূল্য জীবন দিয়ে দিতেন। ঔরঙ্গজেবের সময় একটা শহরে একজনকে জোর করে ধর্মান্তরিত করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা দেখে শহরের যত ব্যবসায়ীরা ছিল সবাই সেই শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। যার ফলে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যই বন্ধ হয়ে গেল। মুসলমানদের তখন টনক নড়ল, সেই থেকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তার বদলে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ইত্যাদি নানা রকম অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করল যাতে গরীব লোকেরা নিজে থেকেই মুসলমান ধর্মে আসে। ব্রাহ্মণরা কোন দিনই ধর্মান্তরিত হতেন না, আদিবাসী, নিম্নবর্ণদের করা হত, কারণ ওদের কাছে ঈশ্বর পরম নন, ব্রাহ্মণদের কাছে পরম। একটা মেয়ের জন্য বা অর্থের লোভে বা যে কোন জিনিসের জন্য যে ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে পারে, বুঝতে হবে সে গোল্লায় গেছে।

জ্ঞানী কে, সাধু কে? যাঁর চিত্ত আর যাঁর আত্মা দুটোই ঈশ্বর, যিনি মনে করেন ঈশ্বরই অন্তরতম, আর তাঁর মনটাও ঈশ্বরে ডুবে আছে। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না। ঠাকুরের চিত্ত পুরোপুরি ঈশ্বরে ডুবে আছে। ঈশ্বরে মন সব সময় ডুবে থাকাকে অনেকে মনে করে মনের ভুল, পাগলামি ইত্যাদি। ঠাকুরকেও তখন সবাই পাগল ভাবতে শুরু করেছে। ভাবল বিয়ে

দিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। মথুরবাবুও ভাবলেন নারীসঙ্গ করলে ঠিক হয়ে যাবে। বেশ্যা বাড়ি নিয়ে গেছেন, ঠাকুরে সেখানে তাদের দেখে মা মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ঠাকুর জানেন তাঁর ইষ্টদেবী মা কালী জগজ্জননী, তাঁর আত্মা, তার সাথে তাঁর চিত্তটাও মা কালীতে ডুবে আছে। অন্যরা মনে করছে, শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্ত মা কালীতে ডুবে আছে কিন্তু মা কালী পরঃ, শ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে। তাই চিত্তকে একটা পরঃ অর্থাৎ একটা মেয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হোক, তাহলে নিজে থেকেই চিত্তটা মা কালী থেকে সরে শ্রেষ্ঠের দিকে চলে আসবে। কিন্তু ঠাকুরের কাছে মা কালীই শ্রেষ্ঠ, ফলে চিত্তেও কোন চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না। একজন সাধারণ মানুষের কাছে চিত্ত আর শ্রেষ্ঠত্ব দুটো আলাদা। সেইজন্য তার ধর্ম জীবন চলে। সাধু যিনি তাঁর কাছে ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ, চিত্ত কখন ঈশ্বরের দিকে যায় কখন সংসারের দিকে যায়। কিন্তু সত্যিকারের সাধুর চিত্ত ঈশ্বরে ডুবে আছে আর তাঁর কাছে ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ।

মন দিয়ে আমরা যে জিনিসটাকেই জানছি, সেটা কিন্তু আত্মা নয়, সেটা ব্রহ্ম নয়। আবার একই কথা পুনরাবৃত্তি করে বলছেন, *নেদং যদিদমুপাসতে*, এটাকে আমরা আগের মন্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, সেই দেবতা ইন্দ্রিয়ের দেখাশোনা করতে পারেন কিন্তু কেউ যদি তাঁর উপাসনা করে তাকে জানতে হবে যে সেটা ব্রহ্ম নয়। যে শিষ্য গিয়ে গুরুকে প্রশ্ন করছে সেই শিষ্যও একটা সমাজ থেকে এসেছে। ইদানিং কালেও বিজ্ঞানের সমাজ থেকে এসে ব্রহ্মচারীদের মনে পাঁচটা প্রশ্ন ওঠে, এটা তো বিজ্ঞানের সাথে মিলছে না। ঠিক তেমনি তখনকার শিষ্যরা সবাই বৈদিক সমাজ থেকেই আসত, বৈদিক সমাজে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের আলাদা আলাদা দেবতা আছে। সেইজন্য গুরুও বলে দিচ্ছেন তুমি যাঁর উপাসনা করছ বা তুমি যাঁরই উপাসনা কর সেটা কিন্তু ব্রহ্ম নয়। কারণ মন দিয়ে যারই চিন্তন করা হবে সে কখনই ব্রহ্ম হতে পারে না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, নাদ ভেদ করে যোগীরা তাঁর কৃপায় পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। নাদ ভেদ করা মানে মনের আর কোন এলাকা থাকল না। শিষ্যের জিজ্ঞাস্য হল কে এই জিনিস গুলোকে চালান, উত্তর হল ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আত্মা, আত্মা মানে যিনি সব কিছুর সার, যে জায়গাতে গিয়ে সব কিছু জুড়ে যাচ্ছে, সমস্ত complexity যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আমি আর আমার আত্মা যখন বলছি তখনও কিন্তু আমার এই অহঙ্কারটা থাকছে, পূর্ণজ্ঞান এখনও হয়নি। কিন্তু তিনি যখন বাস্তবিক দেখবেন বাকি সব কিছুর আত্মা ঠাকুর, এবার কিন্তু তিনি জ্ঞানের দিকে এগোচ্ছেন। যখন দেখবেন ঠাকুরই সব কিছু হয়েছেন, যাঁরা জ্ঞানমার্গি বা ঠাকুরের কথাতেই যদি যাওয়া হয়, সেখানে বলছেন, একটা খুব ক্ষীণ আবরণ থেকে যায়। কিসের আবরণ? ওই আমিত্বের অহঙ্কার, কিন্তু খুবই ক্ষীণ। ঠাকুর বলছেন, ওই আমিত্বটা পোড়ো দড়ির মত, আকারটুকুই আছে কিন্তু ওটা দিয়ে বাঁধার কাজ করা যাবে না। ভক্তিমার্গে এটাকেই শেষ, সর্বোচ্চ অবস্থা বলছেন, ভক্ত বলেই দিচ্ছেন আমি চিনি হতে চাই না, চিনি আস্বাদ করতে চাই। কিন্তু উপনিষদ বা গীতা এটাকে কখনই শেষ কথা মানবেন না। ওনারা তখন বলবেন, ওই যে আমিত্ব বা ক্ষীণ আবরণ সেটাও যেন ফেটে যায়। ফেটে গেলে কি থাকবে? যা আছে তাই আছে, মুখে বলা যাবে না। জলের একটা বড় সাইজের বুদ্ বুদ্, ওর আবরণ এত ক্ষীণ আর এত স্বচ্ছ যে হাতে নিলে মনে হবে যেন জলের একটা গোলা নিয়েছি। ফেটে যাওয়ার পর যে অবস্থা হবে ওটাই জ্ঞানের অবস্থা।

তাহলে জানা ব্যাপারটা কি করে হয়? এটাই আমরা প্রথম থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে আসছি, আসলে মানুষের জানার ব্যাপারটা কখনই মন দিয়ে হয় না, যে কোন জানার পদ্ধতিটা আত্মা দিয়েই হয়। আত্মাই একমাত্র যাঁর চেতনা আছে। ওই যে আমিত্বের আবরণ, যেটা আবৃত করে রেখেছে, ওটা ফেটে যাওয়ার পর সেই শুদ্ধ আত্মাই থাকেন, তিনিই একমাত্র সব কিছুর জ্ঞাতা। আমিত্ব যখন নাশ হয়ে গেল তখন কি আর থাকবে? এটাই কঠোপনিষদে বলছেন, *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশিয়ে দিলে কি হবে, সেই শুদ্ধ জলই থাকবে। একটা পাত্রে গঙ্গাজল ভরে সেই পাত্রকে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিলাম, দুটো জলে আপাত ভাবে কোন পার্থক্য বোঝা যাবে না। কিন্তু একটা

তফাৎ আছে, পাত্রের বাইরের আবরণটা আছে। পাত্রকে যদি ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না। গঙ্গাজল গঙ্গাজলে মিশে এক হয়ে যাবে। কিন্তু পাত্রের ওই আবরণটা, আমিত্বটা আর থাকবে না। সেইজন্য আমি জ্ঞানী, আমি জেনেছি এই বোধট তার আর থাকবে না। কারণ আমি জ্ঞানী, আমি জেনেছি এই আমিত্বের জন্য অহঙ্কারটা চাই। ঠাকুর বলছেন আমি তাঁর দাস। আমি তাঁর ভক্ত, আমি তাঁর সন্তান এই বোধগুলো যতক্ষণ থাকবে একটা অহঙ্কারের আবরণ ততক্ষণ থাকছে। কিন্তু ওই অহঙ্কারের আবরণ এমনই ক্ষীণ যে এই অহঙ্কার দিয়ে আর সংসার কার্য হবে না। কিন্তু ভক্তিমার্গে এটা মানতে চাইবে না, তাদের কাছে এটাই উচ্চতম আর শেষ অবস্থা, এরপর যা হয় ওটা তোমার মনের ভুল। ভক্তিমার্গে আমি আর ইষ্ট যেন এক হয়ে গেছি, এটাই উচ্চতম অবস্থা, একটা যেন জুড়ে থাকছে। কিন্তু বেদান্ত বলবে যেন টেন কিছু থাকবে না, ওটা এক, একই থাকে, জ্ঞানও একই হয় সেইজন্য ধ্যাতা, ধ্যেয় আর ধ্যান এক, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক। ভক্ত আর ভগবান কি কখন এক হয়? এক হওয়ারই কথা, যদি না হয় তাহলে জ্ঞানে কিছু ঘাটতি আছে। কিন্তু ভক্ত তখনও একটা ভাব নিয়ে থাকতে চায়, আমি তাঁর দাস। এরপর কোন মতে, কদাপি আর কারুর দাস সে হবে না। স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে এক জায়গায় বলছেন, যাঁদের এই অবস্থা হয়ে যায় তাঁরা সগুণ সাকার ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যান। আর এই সৃষ্টি যখন শেষ হয়ে যাবে, ঈশ্বরের স্বরূপ যখন লয় হয়ে যাবে, তাঁরাও তখন লয় হয়ে যাবেন, ঈশ্বরের অঙ্গ হয়ে যান। আমি যখন ধ্যান করছি, মনন করছি তখন মনের কার্য চলছে, কিন্তু ভক্তির অবস্থায় যখনে চলে যায় তখন ওই মনকে আর মন বলা চলে না। কিন্তু জ্ঞানের অবস্থায় ওই আমিত্বের আবরণটাও চলে যেতে হবে, তা নাহলে জ্ঞান হবে না। ভক্তরা এখানে অনেক যুক্তিতর্ক নিয়ে আসেন, তাঁরা দেখান আমি ঈশ্বরের দাস এটাই একত্ব। উপনিষদের মতে এটা হবে না, কারণ সেখানেও দুই থেকে যাচ্ছে, আমি তুমির ভেদটা থেকে যাচ্ছে। ভক্তদের কাছে এগুলো খুব ভাবের বিষয় হয়ে যায়, তাই জ্ঞানীরা তাঁদের সাথে কোন তর্ক করতে যান না। ঠাকুরকে আমরা দুটো ভাবেই থাকতে দেখছি, দুটো ভাবের মধ্যে বাচ খেলে করছেন, এই দ্বৈত ভাবে থাকছেন আবার এই অদ্বৈত ভাবে চলে যাচ্ছেন। পরের মন্ত্রগুলিতেও একই যুক্তি দিয়ে পুনরুল্লেখ করছেন –

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।১/৬।।

(চক্ষুর দ্বারা যাঁকে কেউ দেখে না, যাঁর সহায়ে লোকে নয়নবৃত্তি সমূহকে উদ্ভাসিত করে, তুমি তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান; কিন্তু এই যাঁকে আত্মভিন্ন রূপে উপাসনা করা হয়, তাঁকে নয়।)

যে চোখ দিয়ে আমরা দেখার কাজ করি, এই চোখের অন্তঃকরণ বৃত্তি আছে। মানে মন চোখের ভেতর দিয়ে কাজ করে সেইজন্য মন সমস্ত জগতকে দেখতে পায়। চোখ সব কিছুকে দেখতে পারে কিন্তু ঈশ্বরকে দেখতে পারে না। এর আগের আগের মন্ত্রে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, সেই একই যুক্তি দিয়ে দেখান হচ্ছে যে, চক্ষুও একটা যৌগিক পদার্থ আর ইন্দ্রিয়ের যে দোষগুলো রয়েছে, যেটা আগে আমরা আলোচনা করলাম, কখন ভালো, কখন মন্দ, কখন সতেজ, কখন নিস্তেজ, এই পার্থক্য গুলোই বলে দিচ্ছে এটা যৌগিক, যৌগিক হওয়ার জন্য চোখ ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। ঈশ্বরই তার হয়ে কাজ করছেন, ঈশ্বরই তার হয়ে দেখেন। যিনি থাকাতে এই চোখ কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে, তিনিই ব্রহ্ম। চোখের দেবতা সূর্য, সূর্যকে তুমি ব্রহ্ম মনে করো না। পরের মন্ত্রেও বলছেন –

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।১/৭।।

(শ্রবণের দ্বারা যাঁকে কেউ শুনতে পারে না, যাঁর দ্বারা শ্রবণ বিষয়ীকৃত হয় (স্ববিষয় প্রকাশে সমর্থ হয়), তুমি তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান; কিন্তু এই যাঁকে আত্মভিন্ন রূপে উপাসনা করে, তাঁকে নয়)

শ্রোত্র হল আকাশের কার্য। আকাশের প্রপার্টি শব্দ, আর শব্দের ইন্দ্রিয় শ্রোত্র এবং এই শ্রোত্রের দেবতা হলেন দিক্। তাহলে তিনটে এসে যাচ্ছে, জন্ম আকাশ থেকে, কার্য হয় এই ইন্দ্রিয় দিয়ে, তার প্রপার্টি শব্দ, দিক্ দেবতা তাকে ধরে আছেন। শ্রোত্রের এই যে বিস্তার যদিও সংক্ষেপে দেখানো হচ্ছে, বাণীর ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখলাম তার কিভাবে বিস্তার রয়েছে, তার জন্ম কিভাবে হচ্ছে, সেইজন্য তার ওঠা নামা আছে, উঁচু নীচু রয়েছে, তার অন্ত রয়েছে, সে ইন্দ্রিয় তো নয়ই। তাহলে ইন্দ্রিয়ের দেবতা? না, ইন্দ্রিয়েরও দেবতা নয়। কারণ ইন্দ্রিয়ের দেবতা সীমিত। *নেদং যদিদমুপাসতে*, তুমি যাকে মনে করছে, মানে শ্রোত্র ইন্দ্রিয় যেটা কাজ করে, তার দেবতা দিক্, তিনি ব্রহ্ম নন। যেটা দিয়ে শ্রোত্রকে দেখা হয়। তুমি যদি মনে কর দিক্ দেবতাকে দিয়ে দেখা হয়, না তা হবে না। আমরা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান দেবতা রূপে যাদের মনে করছি তাঁরাও দেশ কালের সীমায় আবদ্ধ। এই অধ্যায়ের তিন নম্বর মন্ত্রে বলা হয়েছিল *অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি*, সেখানে আচার্য বলছেন যিনি সমস্ত পদার্থের বাইরে আর প্রকৃতিরও উপরে, সেটাই আত্মা, সেটাই ব্রহ্ম। ইন্দ্রিয়ের যে দেবতারা রয়েছেন এনারা কখনই আত্মা হতে পারেন না। কারণ দেবতারা দেশ কালে আবদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত দেবতারা কেউ চোখের দেবতা, কেউ কানের দেবতা, কেউ বাণীর দেবতা, কেউ মনের দেবতা, তার মানেই variations এসে যাচ্ছে। যেখানে এতগুলো দেবতা এসে যাচ্ছেন, তার মানে তাঁরা কখনই আত্মা হতে পারেন না। আবার দেখা যাবে দেবতাদেরও আত্মা আছেন। এক ভক্ত একবার এক মহারাজকে এসে প্রশ্ন করছে, ঠাকুর কেন কালীর সাধনা করলেন, কালী তো একজন আদিবাসীদের দেবী। ঠিকই বলছে, কালী আদিবাসীদের দেবী। কিন্তু ঠাকুর যে কালীর সাধনা করছিলেন তিনি কি আদিবাসীদের দেবী রূপে সাধনা করছিলেন? নাকি সমস্ত সৃষ্টির আধার রূপে সাধনা করছিলেন? সেইজন্য নাম দিয়ে কিছু হয় না, নাম একটা শব্দ মাত্র। কালী একটা নাম, একটা শব্দ, দেখতে হবে তাঁকে কি রূপে সাধনা করা হচ্ছে। যাঁরা শিবের ভক্ত তাঁরা শিবকে কি রূপে উপাসনা করছেন? যিনি নন্দী ভৃঙ্গীকে সাথে নিয়ে ষাঁড়ের পিঠে ঘুরে বেড়ান আর ডমরু বাজান, মাঝে মাঝে ভাঙ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন, এই রূপে উপাসনা করছেন? তাহলে সে ভুল পথে চলছে। শিব হলেন যিনি মৌলিক, যেখান থেকে সমস্ত সৃষ্টি। শিব তত্ত্বে বলছেন, শিবের ডমরু থেকে শব্দ, সেই শব্দ থেকে শব্দব্রহ্ম, সেই শব্দব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি। বেদেও তাই বলছে শব্দব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি। যাঁরা শিবের ভক্ত তাঁরা বলেন শব্দ মানে ধ্বণি, ধ্বণি কোথা থেকে আসে? শিব যখন ডমরু বাজান। তাহলে সৃষ্টি কোথা থেকে? শিব থেকে নাকি ব্রহ্মা থেকে নাকি বিষ্ণু থেকে? কোথাও থেকে নয়, ভক্ত যেখান থেকে দেখতে চাইছে। শিব যখন ডমরু আওয়াজ দেন তখন দুটো জিনিস হয়, সেখান থেকে শব্দব্রহ্মের সৃষ্টি, শব্দব্রহ্ম থেকে স্বরব্যঞ্জন বর্ণের সৃষ্টি, ঐ ওঁ ডমরু থেকেই সৃষ্টি। বেদেই বলছে শব্দব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি। ওই শব্দব্রহ্ম আসছে শিবের ডমরু থেকে, শিবই তাহলে সৃষ্টি কর্তা। ওই রূপে যদি শিবকে দেখা হয় তাতে কোন দোষ হবে না। কিন্তু শিবকে যদি দেখা হয় শিব ছাই ভস্ম মেখে ষাঁড়ের পিঠে ঘুরে বেড়ান, ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু তিনি ব্রহ্ম হবেন না। কিন্তু যে শিবের ডমরু থেকে সৃষ্টি হয় তিনিই ব্রহ্ম, কারণ তিনি তখন সমস্ত কিছুর অন্তর্যামী হয়ে গেলেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলোর মধ্যে একটা করে আধ্যাত্মিক সত্যকে ঢুকিয়ে আমাদের সামনে রাখছেন। ঋষিরা কঠিন তত্ত্বগুলোকে কাহিনীর মাধ্যমে সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করছেন। পরের মন্ত্রে বলছেন –

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।১/৮।।

(ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা কেউ যাঁকে আঘ্রাণ করতে পারে না, যাঁর দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়, তুমি তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান; কিন্তু লোকে যাঁকে আত্মভিন্ন রূপে উপাসনা করে, তাঁকে নয়।)

এখানে প্রাণ বলতে মূলতঃ ঘ্রাণ বলছেন। এই জিনিসটা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। ঘ্রাণ নাক দিয়ে চলে। যেখানেই পৃথিবী তত্ত্ব রয়েছে সেখানেই গন্ধ থাকবে, সেই গন্ধকে আঘ্রাণ করে। বলছেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে আত্মজ্যোতির দ্বারা কাজ করতে পারে সেটাকেই তুমি আত্মা বলে জানবে। যেটার

উপাসনা করছ সেটা আত্মা বা ব্রহ্ম নয়। এই যে পাঁচটি মন্ত্রের আলোচনা করা হল এর মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয়কে আনা হয়নি, কিন্তু ধরে নেওয়া হয়েছে। শরীরের যত রকমের ক্রিয়া আছে তার মধ্যে চোখ, কান, নাক তিনটে ইন্দ্রিয়কে নিয়েছেন। আসলে মনকে নিয়ে নিলে সবটাই হয়ে যায়। *যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে*, আচার্য এখানে প্রাণ বলতে ঘ্রাণকে নিচ্ছেন। যদি প্রাণকে ধরে এর ব্যাখ্যা করা হয় তখন হবে, প্রাণ মানে চলা। ওনার যুক্তি হল প্রাণ দিয়ে সব চলে, আমরা যে বলি মন প্রাণ দিয়ে কর, মন বলে দিলে সব কটা ইন্দ্রিয় এসে যায় আর প্রাণ বলে দিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শক্তি এসে যায়। মন আর প্রাণ একসঙ্গে নেওয়া যায় বা ইন্দ্রিয়গুলিকে আলাদা করেও নেওয়া যেতে পারে। আমাদের শরীরে যা কিছু চলছে তাতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও মনের কাজ চলছে। যদি তুমি মনে কর ইন্দ্রিয়গুলি শেষ কথা, তুমি ভুল মনে করছ। যদি তুমি মনে কর ইন্দ্রিয়ের পেছনে যে মন সেই মন শেষ কথা, ভুল মনে করবে। যদি মনে কর ইন্দ্রিয়গুলির পেছনে যে দেবতারা কাজ করে তাঁরা শেষ কথা, তাতেও তুমি ভুল করছ। কিন্তু সমস্ত কিছুর পেছনে তাদের যে আত্মা, সেটাই মূল। আত্মাটা কি? *অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি*, সমস্ত পদার্থ থেকে আলাদা আর প্রকৃতিরও উপরে। আচার্য তখন যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন এটাই আত্মা হতে পারেন, আত্মাই ব্রহ্ম।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে; মন্যে বিদিতম্।।২/১।।

(যদি তুমি মনে কর "আমি ব্রহ্মকে উত্তম রূপে জেনেছুই", তবে তুমি ওই ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ক্ষুদ্র রূপ আছে, সেটাই মাত্র তুমি জেনেছ; সুতরাং এখনও ব্রহ্ম তোমার কাছে বিচার্য। (গুরুর এই কথা শোনার পর শিষ্য যথোচিত বিচার করে বললেন) — "আমার মনে হয়, ব্রহ্ম আমার নিকট জ্ঞাত হয়েছেন।)

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এক ভক্ত বসে আছেন, ঠাকুর কিছু কথা বলছেন। ভক্তটি বলছে, মশাই! ওসব জানা আছে। ঠাকুর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, শুধু জানলে কি হবে, ধারণা করা চাই। কথামৃতেই আরেকটা ঘটনা আছে, ঠাকুর বলছেন আর আরেকজন তর্ক করছেন। পাশ থেকে একজন তার গা টিপে বলছে, মেন নাও না। ঠাকুর তার উপর খুব রেগে গেছেন, তুমি তো মহা ছ্যাঁচড়া, না বুঝে কি করে বলবে যে বুঝে গেছি!

ধর্মের জ্ঞান তিনটে ধাপে চলে, প্রথমটা চলে বিশ্বাসে। ঠাকুর যেমন বলছেন, মা ছেলেকে ছুতোরের ছেলেকে দেখিয়ে বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়। সেও মেনে নিয়েছে ও আমার দাদা। সারা বিশ্বে যত ধর্ম আছে সব বিশ্বাসের উপরেই চলে। নরেন যখন কারুর ব্যাপারে বলছেন, ওটাতো অন্ধ বিশ্বাস। ঠাকুরও তখন বলছেন, চোখওয়ালা বিশ্বাস আর অন্ধ বিশ্বাস আলাদা নাকি, বিশ্বাস বিশ্বাস। মা, ঠাকুরমার কাছে আমরা ধর্মের দুটো কথা, কিছু কাহিনী ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, এখনও আমরা তাই মেনে নিয়ে চলছি। অনেকে এসে প্রশ্ন করে রাম বালীকে যেভাবে লুকিয়ে বধ করেছিলেন, তিনি খুব অন্যায় কাজ করেছিলেন, এই রকম লোককে আমরা কেন ভগবান বলে মানব? আজ সে বালীকে বধ করা নিয়ে প্রশ্ন করছে, আগামীকাল এসে আবার প্রশ্ন করে সীতাকে কেন রাম জঙ্গলে পাঠিয়েছিলেন। পরশুদিন এসে প্রশ্ন করবে সীতার অগ্নি পরীক্ষা কেন হল। যাই বলা হোক না কেন, পুরো জিনিসটা এক সঙ্গেই তো নিতে হবে। এক সঙ্গে নিতে গিয়ে ইতিহাস পুরাণের প্রেক্ষাপটকে আনতে হবে, দেখতে হবে ইতিহাস পুরাণে ধর্মকে কিভাবে দেখা হয়, সেখান থেকে এসে যাবে রামায়ণ মহাভারতে ধর্ম আর অধর্মের লড়াই হয় না, ধর্ম ও অধর্মের লড়াই তো আছেই কিন্তু তার সাথে ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াই থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের এখানে ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াই।

এখানে এই প্রসঙ্গটা এইজন্যই বলা হল যে, বেশির ভাগ মানুষ মেনে নেয়েছে যে শ্রীরামচন্দ্র বালীকে মেরে ঠিকই করেছিলেন। কিছু লোক বলবে, রামচন্দ্র মোটেই ঠিক কাজ করেননি, তিনি লুকিয়ে মেরেছেন, তাঁকে আমরা ভগবান বলতে মানতে পারি না। রাম সীতাকে বনে পাঠিয়ে, অগ্নিপরীক্ষা করে নারী নির্যাতনের নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। কারণ ওই বিশ্বাসের উপরে চলেছে কিনা। প্রথম একটা ধাক্কা মারলে বিশ্বাস কোথায় ছিটকে বেরিয়ে যাবে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় ধাপে চলে জ্ঞান, বিশ্বাসের পরেই আসে জ্ঞান। আগেকার দিনে বড় বড় যে জাহাজ ছিল, যেগুলো বিদেশে যেত, ওইসব জাহাজের নিজের কামরায় বসে আছে আর কখন যে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে টেরই পাওয়া যেত না। অনেকক্ষণ পর কামরার জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছে বন্দর কখন ছেড়ে এসেছে, দেখাই যাচ্ছে না, দেখছে সমুদ্রে চলে এসেছে। বিখ্যাত গানে বলছে পাখি তুই ঠিক বসে থাক, গানে ওটাই বলছেন, জাহাজটা কখন ছেড়ে দিয়েছে পাখিটা বুঝতেই পারেনি। যখন টের পেল তখন দেখছে চারিদিকে শুধু জল আর জল, কোন কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না। মানুষও বুঝতে পারে না, কখন যে একজন তার বিশ্বাস থেকে সরে জ্ঞানের দিকে চলে এসেছে সে নিজেও বুঝতে পারে না। যখন এই জ্ঞানের দিকে সরে আসে এবার তার ওই বিশ্বাস গুলি আর বিশ্বাস রূপে থাকে না, তখন দেখছে আরে তাই তো এই

এই কারণে হয়, তাহলে এতদিন ঠিকই বিশ্বাস করে এসেছি। এইভাবে হতে হতে, সে যে পথেরই পথিক হোক, ভক্তিপথ হোক জ্ঞান পথ হোক, ওই জ্ঞানে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে কাশীতে গিয়ে একদিন দেখছে, কাশীর গঙ্গার ঘাটে একজন পাদরী দাঁড়িয়ে হিন্দুদের নামে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে, একেবারে ঝড় বইয়ে দিয়েছে গালাগাল দিয়ে। লোকগুলো খুব নিষ্ঠার সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে যাচ্ছে। সেই ফরাসী পর্যটক লিখছে, এটা কি রকম একবার কল্পনা করে দেখুন রোমের ভ্যাটিকানের বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ক্যাথলিক ধর্মের নিন্দা করছে, ওই রকমই হবে কাশীতে বসে হিন্দুদের নিন্দা করা। আমরা কি করব ওই লোককে একবার কল্পনা করে দেখুন। পর্যটক লিখছেন, মাঝে মাঝে হঠাৎ একজন হাত তুলে বলছে, এই যে কথাটা বললেন এটা ঠিক পরিষ্কার হল না, এটাকে একটু পরিষ্কার করে দিন তো। ভদ্রলোক বলছেন, পাদরী শেষে কাঁদছে আর বলছে ভারতবর্ষে এসে আমরা ধর্ম প্রচারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, এদেরকে আমরা কিছু করতে পারব না। যাদের নিজেদের ধর্মে এমন বিশ্বাস, এমন জ্ঞান যে নিন্দা করলে রাগেও না। নিন্দা করলে কে রাগবে? প্রথমত তার দুর্বলতা থাকতে হবে। দুর্বলতা কি রকম হবে? হয় তার সিস্টেম দুর্বল আর তা নাহলে সে জানে না। বলছেন, সিস্টেমটাও দুর্বল না, জ্ঞানেও দুর্বলতা নেই। বিদ্রুপ করে যে বলবে, তোমার কথা শুনব না, তাও করছে না, বসে বসে শুনে যাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে, এই জায়গাটা পরিষ্কার হল না।

স্বামীজী পরে ফরাসী পর্যটকের এই বই থেকে পুরো একটা পাতা কপি করে চিঠির সাথে একজনকে পাঠিয়েছিলেন। পরে লুই বার্ক যখন স্বামীজীর উপর প্রচুর রিসার্চ করতে শুরু করলেন তখন কিভাবে কিভাবে আমেরিকারই রামকৃষ্ণ মঠের কোন একটা শাখায় পুরনো একটা বাক্স খুলে ফরাসী পর্যটকের লেখা এই বইটা পাওয়া গেল। তখন ওই বইটা একেবারেই আউট অফ প্রিন্ট হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাসের সাথে জ্ঞান, অর্থাৎ যখন সে জেনে গেল এরপর তাকে যতই ধাক্কা মারা হোক আর যাই করা হোক না কেন, তাকে আর ওখান থেকে নাড়িয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু এটাও অনেক নিকৃষ্ট, যারা পারে না তাদের জন্য খুবই ভালো। ঠাকুর বলছেন, শুনে এক রকম, বই পড়ে এক রকম, বিচার করে আরেক রকম আর তিনি যদি কৃপা করে দেখিয়ে দেন সেটা আরেক রকম। আমাদের ভাষায় বিশ্বাস দিয়ে যখন জানছি তখন এক রকম, আলোচনা করে, পড়াশোনা করে যে ধারণা হচ্ছে সেটা আরেক রকম, তখন আর তাকে নাড়াতে পারবে না। কিন্তু তিনি যখন নিজে কৃপা করে তাকে দেখিয়ে দেবেন, তখন দেখবে জিনিসটা পুরো অন্য রকম, তখন তার গলা কেটে দিলেও তার কিছু আসবে যাবে না। তাকে গ্যালিলিওর মত ওটাও বলতে হবে না যে, যদিও আমাকে বলতে হয়েছে কিন্তু আসলে পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। যেমন ভগবান যীশুর হল, তিনি ক্রুশিফাই হয়ে গেলেন। এই হল তিনটে ধাপ, বিশ্বাস, জ্ঞান আর অনুভূতি, অনুভূতিকে অনেক সময় বিজ্ঞান বলা হয়।

কেনোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে গুরু শিষ্যকে একটা জ্ঞান দিলেন। এতদিন ধরে শিষ্যের যে দেবতা-সম্বন্ধি একটা ধারণা ছিল, ওই জ্ঞানে সেটা চলে গেল। কেনোপনিষদ কোন নভেল নয়, এখানে মন্ত্রগুলি অনেক কিছুকে স্কুইজ্ করে দিচ্ছে, এমনকি টাইম স্প্যান যেন স্কুইজ হয়ে যাচ্ছে, আলোচনাগুলো স্কুইজ হয়ে যাচ্ছে। একটু আমাদের নিজের মত এখানে টাইম যোগ করে নিতে হবে। আমরা মেনে চলছি প্রথম অধ্যায়ে যেটা বলেছিলেন সেটা সেখানেই যে শেষ তা নয়, এই ধরণের আরও অনেক কথা গুরু হয়তো বলেছিলেন। পুরো জিনিসটা যেন খুব সংক্ষেপে আমাদের কাছে এসেছে। এটা যদি একটা সেশনেই হয়ে যেত তাহলে ঠাকুর আর নরেনকেও ছাড়িয়ে যাবে, সেইজন্য সেই রকম হবার কথা নয়। এর অর্থটা হল, গুরু মোটামুটি এইভাবে শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দেওয়ার পর শিষ্য এবার মোটামুটি বুঝে গেছে।

গুরুর এবার চিন্তা হয়েছে। শিষ্য যদি মনে করে আমি সব বুঝে গেছি, তাহলে না বুঝে ওর মনে হবে বুঝে গেলাম। অন্য দিকে বিশ্বাসের ধাপ থেকে সে এবার জ্ঞানের অবস্থায় হয়ত এসে গেছে

কিন্তু অনুভূতির স্তরে তো যায়নি। অনুভূতির স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত একটা ভয় থাকে। ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানীও ভয়তরাসে, এই জ্ঞানী কিন্তু বিজ্ঞানী নয়, এই জ্ঞানী হলেন যিনি এখনও জ্ঞানের উপর আধারিত। এখানে জ্ঞান মানে, শুনে, বিচার করে, মনন করে আরও ভালো ও দৃঢ় ভাবে ধারণা করে নিয়েছে আর পাকা বিশ্বাস হয়ে গেছে যে জিনিসটা এই রকম। বিজ্ঞানী যিনি তিনি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন। যিনি সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন তাঁকেও জ্ঞানী বলা হয়। সেইজন্য বিষয় বস্তুটা দেখে বুঝতে হয় জ্ঞানী বলতে কোনটাকে বলতে চাইছেন।

জ্ঞানীর ক্ষেত্রে একটা ভয় থাকে, হয়ত কোন প্রলোভনে বা অন্য কোন কারণে পতন হয়ে যেতে পারে। যেমন আমরা বিশ্বামিত্রের ক্ষেত্রে দেখি। তপস্যাদি করে জ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু এক অপ্সরা দেখে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। কিন্তু যখন শেষে অনুভূতি পেয়ে গেলেন তখন আর কখন তাঁর গোলমাল হয়নি। এখানে গুরু দেখছেন শিষ্যকে আমি এতো শিক্ষা দিচ্ছি, শিষ্য এখন মনে করবে আমি সব বুঝে নিয়েছি, কিন্তু ও তো এখনও ভালো করে বোঝেনি। এইবার গুরু তাকে নাড়া দিয়ে ভালো করে দেখছেন। মাটিতে কোন থাম্বা যদি পুততে হয় তখন প্রথমে ঠুকে ঠুকে মাটির ভেতরে ঢোকায়, একটু ঢোকার পর আবার নাড়িয়ে দেখে। যদি নড়ে যায় তখন আবার জোরে জোরে ঠুকতে থাকে আর সাথে সাথে ইট-পাটকেল দিতে থাকে যাতে ভিতটা নড়ে না যায়। গুরু সেইজন্য কিছু কিছু unsettling প্রশ্ন করছেন। আইনস্টাইন ফিজিক্সের নামকরা সব ইক্যুয়েশান দিয়েছেন। একটা ট্রেন পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে দৌড়াচ্ছে, ওই ছুটন্ত ট্রেন থেকে যদি একটা বল সামনের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তখন বলটাও পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে যাবে। তাহলে বলের গতি কত হবে? ট্রেনের পঞ্চাশ কিমি গতি আর বলটাকে পঞ্চাশ কিমি গতিতে ছোঁড়া হয়েছে, বলের তাই একশ কিমি গতি হবে। এবার কোন জিনিস আলোর গতিতে যাচ্ছে, সেখান থেকে যদি সামনের দিকে কিছু ছুঁড়ে দেওয়া হয়, সেটাও যদি আলোর যত গতি সেই গতিতে ছোঁড়া হয়েছে। তাহলে যেটাকে ছোঁড়া হল তার গতি কত হবে? আগের নিয়ম অনুযায়ী আলোর গতির দ্বিগুণ হওয়ার কথা। আইনস্টাইন বলছেন, তা হবে না, ওটা আলোর গতিতেই যাবে। আমি যে ট্রেনে বসে আছি সেই ট্রেনের পাশ দিয়ে যদি উল্টো দিকে কোন ট্রেন যায় তখন সব সময় মনে হবে পাশের ট্রেনটা অনেক বেশি গতিতে বেরিয়ে গেল। আবার পাশাপাশি যদি দুটো ট্রেন চলতে থাকে তখন মনে হবে দুটো ট্রেনই আস্তে চলছে। এটাকে বলে relative speed। এখন ওদিক থেকে একটা আলো আসছে সেটাও আলোর গতিতে আসছে আর এদিক থেকেও একটা আলো যাচ্ছে তারও আলোর গতি, ট্রেনে পঞ্চাশ আর পঞ্চাশ একশ হয়ে যায়, তাহলে আলোর ক্ষেত্রে এক আলোর গতি আর এক আলোর গতি মিলে দ্বিগুণ আলোর গতিবেগ হয়ে যাবে। আইনস্টাইন বলছেন, আলোর গতি একই থাকবে।

গণিতের বিজ্ঞান ওখান থেকেই চলে। সেখানে দেখাচ্ছেন আলোর গতি যখন চলে তখন সময় কিভাবে মন্থর হয়ে যায়। গতির দিকে জিনিসটা shrink করে যায়। পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখছেন সত্যিকারের এই রকমই হয়। ফলে যেটার দ্বিগুণ আলোর গতি হওয়ার ছিল, ওর যে টাইম আর ডাইলেশান আর distanceএর যে shortening ওগুলো সব কটা মিলে ওটাকে compensate করে দেয়। প্রথম যখন থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি পড়ানো হয় তখন কনফিউস্ করে দেবে, প্রথমে বলে দেবে এই জগতে আলোর গতিকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না, ফিজিক্সের এটাই মূল সিদ্ধান্ত। তাই যদি হয় ওদিকে থেকে একটা লাইট বীম আসছে আর এদিকে থেকে একটা লাইট বীম যাচ্ছে, ওটাতে যে বসে আছে সে এটাকে কত স্পীডে দেখবে? ক্লাশিকাল ফিজিক্স বা নিউটোরিয়ান ফিজিক্স সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে আলো গতির দ্বিগুণে দেখবে। তুমি তো আগেই বললে, আলোর গতির থেকে বেশি এই জগতে কেউ যেতে পারে না। তাহলে দ্বিগুণ আলোর গতি কি করে হবে। এই যে পঞ্চাশ কিমি গতিতে আসছে আর ওদিকে থেকে পঞ্চাশের গতিতে আসছে, পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশ হল, তাহলে ওয়ান লাইট স্পীড আর এটা ওয়ান লাইট স্পীড হল এবার এটা যাবেটা কোথায়? এখানে নিউটনের প্রতিভা, তিনি দেখাচ্ছেন কিভাবে টাইম ওখানে স্ট্রেচ করে যায় আর অন্য দিকে লেংথটা কন্ট্রাক্ট করে। পুরো গাণিতিক

নিয়মে দেখাচ্ছেন, মনে হবে দ্বিগুণ আলোর গতি হবে কিন্তু আসলে এক আলোর গতিই থাকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম, কোন জিনিস আলোর গতির উপরে যাবে না। আপেক্ষিক গতিও কখনই আলোর গতির উপরে যাবে না। বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রথমের দিকে যখন পড়ানো হয় তখন তাকে ভালো করে এগুলো বলে কনফিউস করে দেওয়া হয়। এরপর তাকে ভালো করে নাড়িয়ে নাড়িয়ে বোঝান হয়। এখানেও গুরুর মনে হয়েছে, এতক্ষণ শিষ্যকে আমি যে শিক্ষা দিলাম, *যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে*, এগুলো যে বললাম শিষ্য এবার মনে করবে আমি আত্মতত্ত্বটা জেনে গেছি। ওইটাকে কাউন্টার করার জন্য বলছেন *যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি*।

মন্ত্রের প্রথম লাইনের অর্থটা হল, যদি তুমি মনে কর আত্মাকে তুমি ভালো করে জেনে গেছ তাহলে এটা নিশ্চয় যে তুমি আত্মা বা ব্রহ্মকে বোঝনি। তুমি যাঁকে ব্রহ্ম বলে বুঝেছ ওটা ভুল ব্রহ্ম। কোরাণে খুব নামকরা কথা আছে, আল্লাই একমাত্র গড্, আর যারা আল্লাকে উপাসনা করে না তার সব false Godsকে উপাসনা করছে। কিন্তু ইসলামে এই কথার প্রেক্ষাপট আলাদা, সেখান থেকে তারা আল্লাকে অন্য নামে ডাকছে এবং যার আল্লাকে মানছে না তাদের গলা কেটে দিচ্ছে। এখানে বলছেন যদি তুমি মনে কর তুমি বুঝে গেছ তাহলে তুমি বুঝবে যে তুমি ভুল বুঝেছ।

গুরু এখানে স্নেহ করেই শিষ্যকে বলছেন, শিষ্যকে ছোট করা উদ্দেশ্য নয়। উপনিষদের গুরু যখন উপযুক্ত শিষ্য পেতেন তখন তিনি পুরো জ্ঞান ওর মধ্যে ঢেলে দিতে চাইতেন। লীলাপ্রসঙ্গে খুব ভালো করে পড়লে দেখা যাবে ঠাকুর তাঁর সন্ন্যাসীদের জ্ঞান ঢেলে দিচ্ছেন আর নরেনকে কোন মতেই ছাড়তে চাইতেন না। গীতাতেও আচার্য শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনকে নিয়ে বলছেন, ভালো শিষ্য পেলে বিদ্যার প্রসার হয়, সেইজন্য অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাটা ঢেলে দিয়েছেন। ঠাকুর আবার ত্যাগী শিষ্যদের বলতেন, তোরা রবিবার বাদে অন্য দিনে আসিস। কারণ রবিবারে গৃহী ভক্তরা আসতেন বলে ঠাকুর সব গুহ্য কথা খুলে বলতে পারতেন না, তখন ভক্তদের মত করে বলতে হত। ঠাকুর আবার অন্যান্যদের কোন রকমে পাশ কাটিয়ে দিতেন, বেশি কথা বলতে চাইতেন না। উপযুক্ত শিষ্য যদি তার জানার আগ্রহ থাকে, গুরু কোন মতেই তাকে ছোট করবেন না। গুরুর আবার চিন্তা হয় শিষ্য যেন কোন কথা ভুল না বুঝে নেয়, সেটাকে দেখার জন্য শিষ্যের যেখানে নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে আছে ওই জায়গাটাতে একটা নাড়া দিচ্ছেন। ওই নাড়া দিতে গিয়ে বলছেন, *যদি মন্যসে সুবেদেতি*, যদি মনে কর তুমি ভালো ভাবে আত্মাকে বুঝে নিয়েছ, এখানে তাকে ছোট করা হচ্ছে না।

আচার্য এখানে নিজেই একটা আপত্তি শিষ্যের মাধ্যমে তুলছেন, *নন্বিষ্টৈব সু বেদাহম ইতি নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ*, আমি ভালোভাবেই জানি এটাই তো ইষ্ট। এটাই তো সবাই চায়, একটা জিনিসকে জানতে গিয়ে যদি বলি এটা আমি বুঝেছি, এতো ভালো কথা, এটাকে নিয়ে আপত্তি কেন হবে? *নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ*, নিশ্চিত জ্ঞান হবে, এটাই তো আমি চাই। অথচ মন্ত্রে বলছেন *যদি মন্যসে সুবেদেতি*, যদি তুমি মনে কর তুমি ভালোভাবে বুঝে গেছ তাহলে বুঝতে হবে তোমার গোলমাল আছে। আচার্য তখন বলছেন, নিশ্চিত জ্ঞান যেটা এটা অবশ্যই ইষ্ট, আমরা সত্যি এটাই চাই। কিন্তু যখন ব্রহ্মের ব্যাপারে বলা হয় তখন বলা হয় *ন হি সু বেদাহমিতি*, 'আমি ওই জিনিসটাকে ভালোভাবে জানি' এটা কিন্তু ইষ্ট নয়। এই জিনিসটারই প্রতিফলন ঠাকুরের একটা গল্পের মধ্যে দেওয়া আছে, দুই ছেলে আশ্রমে গুরুর কাছে অধ্যয়ন করার পর বাড়িতে ফিরে এসেছে। বাবা তখন বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, আত্মার ব্যাপারে তুমি কি জানলে বল। সে তখন আত্মার ব্যাপারে বলতে গিয়ে অনেক কথা বলে গেল। এরপর ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করতেই সে চুপ মেরে গেল। বাবা তখন ছোট ছেলেকে বলছে, বাবা তুমিই আত্মার ব্যাপারে ঠিক বুঝেছ। তার মানে যে আত্মার ব্যাপারে এত কথা বলে গেল সে বস্তুর বর্ণনা কেমন সেটা জানে কিন্তু বস্তুটাকে জানে না। বলছেন, ঈশ্বরের ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান যেটা হবে সেটা অবশ্যই ইষ্ট, কিন্তু যদি বলে আমি ভালো ভাবে সেটাকে জানি, তাহলেই সেখানে কিছু গোলমাল আছে।

একটা জিনিসকে কখন ভালো ভাবে জানা যায়? যেমন এই পেনকে জানতে চাইছি, পেনটা আমার জ্ঞানের বিষয়, পেনটাকে আমি ভালো ভাবে জানি। কিন্তু ব্রহ্ম তো কখনই কারুর বিষয় হতে পারেন না। প্রথম অধ্যায়ে গুরু একটা একটা করে এটাই শিষ্যকে বুঝিয়ে এসেছেন, আত্মা কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, মনেরও বিষয় নয়। কিন্তু একটা জিনিসকে যদি আমরা ভালো ভাবে জানতে চাই তাহলে ওটাকে মনের বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হতে হবে। যখন আমি খুব প্রত্যয়ের সাথে বলছি আমি এটা ভালো ভাবে জানি তার মানে ওই জিনিসটা আমার মনের বিষয় হয়ে গেছে। যখন কেউ আমাকে বলছে, আমি কিন্তু আপনাকে ভালো করে জানি, তার মানে আমি তার মনের বিষয় হয়ে গেছি। সন্তান যা করবে মা সবই জানে, কারণ সন্তান মায়ের জ্ঞানের বিষয়। সন্তান এটা বুঝতে পারে না, যার জন্য সে মাকে বিষয় করতে পারে না। উন্নত মনের অধিকারী ব্যক্তি অনুন্নত মনের ব্যক্তিদের সহজেই ধরে ফেলে। ব্রহ্ম হলেন শ্রেষ্ঠ, মন তাঁর থেকে ছোট, মন ব্রহ্মকে কি করে ধরবে! ধরতে পারে না, তাই ব্রহ্মের ব্যাপারে মন বলতে পারবে না। যার জন্য ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলছেন, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হননি। হওয়ার কথা নয়, কারণ উচ্ছিষ্ট হওয়ার আগে মন দিয়ে ব্রহ্মকে ধরতে হবে। মন ধরে নেওয়া মানে, এক সের ঘটিতে পাঁচ সের দুধ ধরাতে চাইছে, যা কখনই হয় না। তাই বলছেন, যদিও নিশ্চিত ভাবা জানা ইষ্ট, কিন্তু কেউ যদি মনে করে এটা আমি ভালো ভাবে জেনে গেছি, তখন বুঝতে হবে যে সে বলতে চাইছে এই জিনিসটা তার মনের বিষয় হয়ে গেছে। কিন্তু যখন মনের বিষয় হয়ে গেছে বলছে তাহলে তো পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। যে জিনিসট মনের বিষয় হতে পারে না, সেই জিনিসটাকে বলছে আমার মনের বিষয় হয়ে গেছে।

অগ্নি যখন কোন কিছুকে জ্বালায় তখন সেই জ্বালানোটা অগ্নির বিষয়, তার আত্মা নয়। যেমন কয়লা আগুনে দিলে কয়লাটা অগ্নির বিষয় হয়ে গেল, অগ্নি কয়লাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তাই বলে কয়লা কখনই অগ্নির আত্মা হবে না। মন যেটাকেই ধরে নেয় সেটা কখনই আত্মা হতে পারে না। বিপরীত ভাবে আত্মা যেটা সেটাকে কখনই বিষয় করা যাবে না। যার জন্য অগ্নি অগ্নিকে জ্বালাতে পারে না। আগে এর উপর অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, আত্মা বা ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর সার। আত্মা কখনই বিষয় হবে না, এটা বেদান্তের একটা মৌলিক সিদ্ধান্ত। আত্মা কখনই object হয় না, আত্মা কখনই subject হয় না। এই অর্থেই subject হয় না, কারণ আমার যে অর্থে জ্ঞাতা মনে করি আত্মা সেই অর্থে জ্ঞাতা হন না। আত্মা হলেন eternal subject, জ্ঞাতা বলতে হয় যেখানে জ্ঞান আর যে বস্তুর জ্ঞান হচ্ছে এই দুটো আলাদা থাকবে। কিন্তু আত্মার বাইরে তো কিছু নেই, সেইজন্য আত্মা কোন কিছুকে জানেন না, তাই আত্মা জ্ঞাতা নন। আত্মাতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সব এক হয়ে যায়। অনেকেই আত্মাকে কর্তা ও জ্ঞাতা বলে উল্লেখ করেন, কিন্তু আমরা যে অর্থে কর্তা বা জ্ঞাতা মনে করি সেই অর্থে আত্মা জ্ঞাতা বা কর্তা হন না, যে অর্থে আমরা বলি আমি এই জিনিসটাকে জানি বা জানলাম। কিন্তু আত্মা সবটাই সব সময় জানেন, কিন্তু আমরা যে অর্থে কর্তা অর্থাৎ প্রথমা, কর্ম অর্থাৎ দ্বিতীয় আর ক্রিয়া এই তিনটে জিনিস বা কারকের যত বিভক্তি আছে, এগুলোর কোনটাই আত্মার জানার ক্ষেত্রে যুক্ত হয় না। আত্মা কোন পরিস্থিতিতে objectতো হবেনই না, এমনকি তিনি subjectও নন। আমি এই জিনিসটাকে জানি যখন বলা হয় তখন তাতে বিষয়, জ্ঞান আর জ্ঞাতা এই তিনটে জিনিস থাকবে। কিন্তু আত্মার বাইরে কোন কিছু নেই যেটাকে তিনি জানবেন। মূল কথা হল আত্মা subject objectএর পারে। আত্মা object নন, এই জিনিসটাকে বোঝাবার জন্য বলা হয় তিনি জ্ঞাতা, তিনি কর্তা। কিন্তু আমরা বাংলা বা ইংরাজীতে যে অর্থে জ্ঞাতা বা কর্তা বলি সেই অর্থে আত্মা জ্ঞাতা বা কর্তা নন।

আচার্য দেখাচ্ছেন, আগের আগের মন্ত্রগুলিতে ঠিক এই জিনিসগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, যিনি ব্রহ্ম তিনি সব কিছুর আত্মা, সেইজন্য তিনি কখন জ্ঞানের বিষয় হবেন না। তুমি যদি মনে কর জিনিসটাকে তুমি ভালো ভাবে জেনেছ, ভালো ভাবে বুঝেছ, তোমার বোঝাতে কিছু গোলমাল আছে কারণ এটা মূল সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়ে যাচ্ছে, আগুন যেভাবে আগুনকে জ্বালাতে পারে না, ঠিক

তেমনি কোন জিনিস নিজের আত্মাকে জানতে পারে না। আর যেহেতু ব্রহ্ম সব কিছুর আত্মা তাই ব্রহ্মকে জানা যাবে না। কিন্তু নিশ্চিত জ্ঞান অভিষ্ট, তবে এই নিশ্চিত জ্ঞান অন্য পদ্ধতিতে আসে।

প্রথম অধ্যায়ে শিষ্যকে নানা ভাবে বোঝানর চেষ্টা করা হয়েছিল, এই জ্ঞান বিদিতের আলাদা, অবিদিতের উপরে, *ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং*। এটা সম্প্রদায় বিদ্যা, শুধু আমিই যে এর অনুভব করেছি তা না। ঠাকুরের কথাগুলো একটাও শাস্ত্র বিরোধী নয়। ঠাকুর বিভিন্ন শাস্ত্রের কথা খুব মন দিয়ে শুনতেন। যদি বিভিন্ন শাস্ত্রে এই কথাগুলো আগে বলা না হয়ে থাকত, তখন এটা মনের ভুলও হতে পারে বলে মনে করা হত। আচার্যও নিজের যুক্তি দিয়ে, নিজের অনুভূতি দিয়ে, সম্প্রদায় বিদ্যা দিয়ে দেখাচ্ছেন, এই যে এখানে বলা হল ব্রহ্ম সব কিছুর আত্মা আর আত্মা কোন পরিস্থিতিতে ওই জিনিসটার বিষয় হবেন না। সেইজন্য বলছেন আমার এই আলোচনা শুনে তুমি যদি মনে করে থাক তুমি এটা ভালো ভাবে জেনে গেছ, তাহলে তোমার ভুল আছে। এখানে যে আপত্তি তোলা হয়েছে, এই জগতে একটা জিনিসকে ভালো ভাবে জানাটাই অভিষ্ট। অভিষ্ট ঠিকই, কিন্তু যে অর্থে তুমি মনে করছ আমি এটাকে জেনেছি, বুঝেছি সেই অর্থে এই জানাটা ভুল। এই বলার পর মন্ত্রের মূল আলোচনা শুরু করছেন।

আচার্য এখানে নিজের মত দিচ্ছেন, *কদাচিদ্ যথাশ্রুতং দুর্বিজ্ঞেয়মপি ক্ষীণদোষঃ সুমেধাঃ কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে*, কখন সখন দেখা যায় খুব বুদ্ধিমান পুরুষ একটা দুর্বিজ্ঞেয় বিষয়কে বুঝে নিতে পারে। প্রথমে বলছেন বুদ্ধিমান পুরুষ, দ্বিতীয় বলছেন যাদের দোষ ক্ষীণ হয়ে গেছে। যদিও এখানে আচার্য বেদ উপনিষদের অর্থেই বলছেন, কিন্তু এটাকে যে কোন বিষয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। *ক্ষীণদোষঃ*, মন রূপী দোষ যার ক্ষয় হয়ে গেছে আর তার সাথে সে বুদ্ধিমান। তার মানে যার মনে কোন পাপ নেই, কোন দোষ নেই, তাহলেই যে সে বিষয়টা বুঝে নিতে পারবে তা হবে না। *সুমেধাঃ*, বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, দ্বিতীয়ত খুব তুখোড় বুদ্ধিও যদি থাকে তাহলে যে সে বিষয়টা বুঝে যাবে তা হবে না। যে কোন দুর্বিজ্ঞেয় বস্তুকে বোঝার জন্য দুটো শর্ত দরকার, এক বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হতে আর দুই হল সব দোষ ক্ষয় হয়ে গিয়ে থাকতে হবে। উপনিষদ খুব দুর্বিজ্ঞেয়, এমনকি ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, অঙ্ক এগুলো বোঝাও খুব কঠিন।

রিচার্ড ফাইনম্যান ক্যালিফোর্ণিয়ার Institute of Technologyতে প্রফেসর ছিলেন, নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। ফাইনম্যান নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অনেক আগেই, সাতাশ-আটাশ বয়সেই তিনি প্রফেসর হয়ে গিয়েছিলেন। ইউনিভার্সিটির লোকেরা তাঁকে ছাত্র মনে করত অথচ তিনি প্রফেসর। হঠাৎ কোন কারণে ফাইনম্যানের মনে হল তার কিছু টাকার দরকার। তিনি অন্য একটা ইউনিভার্সিটিতে দরখাস্ত করলেন। দরখাস্ত পাঠাবার পর অন্য ইউনিভার্সিটি থেকে জানিয়ে দিল আমরা আপনাকে বারশ ডলার দেব, তখন উনি এখানে হাজার ডলার পাচ্ছিলেন। ফাইনম্যান নিজের ডিনকে জানিয়ে দিলেন, ওরা বারশ ডলার দিচ্ছে। ডিন জানিয়ে দিলেন, আমাদের ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠছে না, আমাদের এখানে যে আসে সে জীবনের মতই আসে, আমরা তোমাকে পনেরশ ডলার দেব, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পার না। তিনি আবার ওদেরকে জানালেন, ওরা বলল, তোমাকে আমাদের চাই, আমরা তোমাকে আঠারশ ডলার দেব। উনি আবার নিজের ডিনের কাছে গিয়ে বলতেই বলে দিল, তোমাকে দু হাজার ডলার দেব, তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না।

ফাইনম্যান তখন একটা গল্প বলছেন, একটা গাধার দুদিকে যদি ঘাসের স্তুপ রেখে দেওয়া হয়, যখন গাধাটা সামনের ঘাসের গাদার দিকে যায় তখন ও মনে করে অন্য গাদায় বেশি ঘাস রয়েছে। তখন এটাকে ছেড়ে ওটাকে খেতে যায়। আর ঐদিকে যখন যায় তখন মনে করে এইদিকের গাদাটায় বেশি ঘাস রাখা আছে, তখন আবার ওখান থেকে ফিরে অন্য গাদার দিকে যায়। শেষ পর্যন্ত গাধা না খেয়েই মরে যায়। ফাইনম্যান বলছে আমার আরও বাজে অবস্থা, এখানে ঘাস দুটো সমান নয়, সত্যিকারের বাড়ছে। উনি যখন এদিকে আসছেন তখন এদিকে বেড়ে যাচ্ছে। তখন ফাইনম্যান খুব সুন্দর কথা বলছেন। ওনার স্ত্রী যক্ষ্মা রোগে মারা গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স খুব কম। স্ত্রীর আগে থেকে যক্ষ্মা রোগ ছিল, কিন্তু তিনি মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন, বাড়ি থেকে বিয়েতে খুব আপত্তি

করেছিল। সেই থেকে ফাইনম্যানের বাড়ির প্রতি মন ভেঙে গিয়েছিল। বিয়ের এক বছর কি দু বছরের মধ্যেই স্ত্রী মারা যান। ফাইনম্যান এখন জীবনে একা হয়ে গেছেন। তারপর থেকে বাড়ির সাথে আর কোন দিনই তাঁর সম্পর্ক হয়নি। ফাইনম্যানের এখন তিরিশ বছর, তিনি ভাবছেন, আমি যদি এই দু হাজার ডলার নিই তাহলে কি হবে? তিনি বলছেন, প্রথমেই তো আমার একটা প্রেমিকা জুটে যাবে, তার জন্য আমাকে একটা বাড়ি ভাড়া করতে হবে, আর সারাটা দিন বসে বসে আমি দুশ্চিন্তা করতে থাকব, আমি তো এখন বাড়িতে নেই, অন্য কারুর সাথে ঘুরছে কিনা। শেষে দেখা যাবে ফিজিক্স নিয়ে চিন্তা ভাবনা ছেড়ে আমি প্রেমিকার চিন্তাই করতে থাকব, ফিজিক্সটা তো আমার বন্ধই হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডিনকে বলে দিলেন, আমার কোন পয়সা লাগবে না, হাজার ডলার যেমন দিচ্ছিলেন ওই হাজার ডলারেই আমি থাকব। এটাকে বলে ক্ষীণদোষ, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছেন। মনে যদি দোষ থাকে তার দ্বারা কোন দিন দুর্বিজ্ঞেয় জিনিস জানা হবে না। কঠোপনিষদে বলছেন, *নাবারিতো দুশ্চরিতাৎ*, প্রথমেই বলছেন, তোমার চরিত্র যদি ঠিক না থাকে, কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে যদি না গিয়ে থাকে, তার দ্বারা দুর্বিজ্ঞেয়কে জানা কোন দিন হবে না। তার সাথে বলছেন সূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রচণ্ড সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকতে হবে। এই দুটোর একটা না থাকা মানে, তার দ্বারা হবে না। আচার্য বলছেন, এই দুটো শর্ত, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর ক্ষীণদোষ, এই দুটো যদি থাকে তখন দেখা যায় কদাচিৎ সে দুর্বিজ্ঞেয় জিনিসকে বুঝে ফেলে।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় খুব বুদ্ধিমান, ক্ষীণদোষ ব্যক্তি দুর্বিজ্ঞেয় জিনিস বোঝার চেষ্টা করেও বুঝতে পারল না। তার মানে, ক্ষীণদোষ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকলে সে দুর্বিজ্ঞেয় জিনিসকে বুঝতেও পারে আবার নাও বুঝতে পারে, এটা আরও মারাত্মক ব্যাপার। গুরু তখন দেখতে চাইছেন আমি যে শিষ্যকে এতগুলো কথা বললাম শিষ্য এগুলো বুঝেছি কি বোঝেনি। এটাকে জোর দেওয়ার জন্য তখন আচার্য ছান্দোগ্য উপনিষদের একটা গল্প বলছেন। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র আর অসুরদের রাজা বিরোচন মনে করল আমরা যদি আত্মতত্ত্বটা জেনে যাই তাহলে আমরা অমর হয়ে যাব। ওরা দুজনেই ব্রহ্মার কাছে গেলেন, আমরা আত্মজ্ঞান জানতে চাইছি। ব্রহ্মা তাদের বললেন, আত্মতত্ত্ব জানতে হলে এখানে থেকে আগে এক বছর তপস্যা কর তারপর তোমাদের উত্তর দেব। দুজনে মিলে এক বছর ব্রহ্মার ওখানে থেকে তপস্যাদি করল। ব্রহ্মার কাছে গেছে। ব্রহ্মা দুজনকে বলে দিলেন, তোমার চোখের ভেতরে যে পুরুষকে দেখা যায় সেটাই আত্মা। দুজনে খুব খুশি হয়ে ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে এই মনে করে চলে গেল যে, আমরা আত্মাকে পেয়ে গেছি। অসুরদের রাজা বিরোচন গিয়ে সব অসুরদের বলল, ভাই! আমার চোখের ভেতরে যিনি অর্থাৎ আমিই হলাম শুদ্ধ আত্মা। সেইজন্য সবাই জেনে নাও, এই আমিটাকেই ভালো করে সেবা করতে হবে। সেই থেকে অসুররা নিজের দেহকেই আত্মা মনে করে, খাওয়া-দাওয়া, ভোগে সবাই লিপ্ত হয়ে গেল। অন্য দিকে ইন্দ্রও তাই মনে করে চলে গেল, কিন্তু পরে তার মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছে, ঠিক মিলছে না, কারণ আত্মার কথা যেমনটি শোনা হয়েছে তাতে আত্মার কোন ধরণের চাঞ্চল্য হওয়ার কথা নয়, শরীরটা সব সময় পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। ইন্দ্র আবার ব্রহ্মার কাছে গেছে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, দেহটা তো আত্মা হতে পারে না, আপনি আমাকে আত্মার ব্যাপারে একটু বলুন। ব্রহ্মা বললেন, এক বছর থেকে তপস্যা কর। ইন্দ্র আবার এক বছর তপস্যা করেছে। এক বছর পর ব্রহ্মা যে উত্তর দিলেন, একই উত্তর কিন্তু অন্য ভাবে বলছেন যে, জলে যে প্রতিবিম্ব দেখ, একই কথা বলছেন। তখন ইন্দ্রের পর পর মনে হল, ও তাই দেহ আত্মা নয়, তাহলে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনে হল মনই আত্মা, এইভাবে এক বছরের তপস্যা করে ফেরত যাচ্ছে, আবার সন্দেহ আবার এক বছরের তপস্যা এই করে অনেক দিন পর ইন্দ্র জানল ভেতরে চৈতন্যজ্যোতি যিনি তিনিই শুদ্ধ আত্মা। দুজনই তপস্যা করল, দুজনই রাজা, দুজনই বুদ্ধিমান আর দুজনেই প্রজাপতির সন্তান, একই শিক্ষা প্রজাপতি দুজনকেই দিয়েছেন, কিন্তু একজন দেহকেই আত্মা মনে করে থেকে গেল, অন্যজন আরও তপস্যা করে ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সেইজন্য যারাই নিজের দেহকে, মনকে আত্মা বলে জানে, যারাই নিজের দেহের বেশি খাতির যত্ন করে, এরা সবাই অসুর।

আচার্য তাঁর ভাষ্যে এখানে এই গল্পটা উল্লেখ করে বলছেন, একই উপদেশ দুজনকে বলা হল কিন্তু দুজন এক ভাবে নিল না। ইন্দ্রকেও চার বার গুরুর কাছে যেতে হয়েছিল জিনিসটাকে স্পষ্ট করার জন্য।

গুরুর কাছে যারা শ্রবণ করে তারা তিন প্রকারের, প্রথম হল যারা ঠিক ঠিক বুঝে নেয়, দ্বিতীয় যারা ঠিক ভাবে বোঝে না আর তৃতীয়রা বিপরীত বোঝে। এরপর চতুর্থ প্রকার আছে যারা কিছুই বোঝে না। বোঝা বা না বোঝার যে কথা এখানে বলছেন এটা আত্মার ব্যাপার নিয়ে বলছেন না, সব কিছুকে নিয়েই বলছেন। যে কোন বিষয় বোঝাতে গেলে এই চার রকম হয়। গুরু যদি সব শিষ্যদের ভালো ভাবেই বোঝান সেখানেও শিষ্যদের মধ্যে এই চার রকম শিষ্য থাকবে। প্রথম শিষ্য ভালো ভাবে বুঝে নেবে, দ্বিতীয়রা ঠিক ভাবে বুঝতে পারবে না, এই ধরণের শিষ্যদের বারে বারে বুঝিয়ে বলতে হয়। তৃতীয় হল যারা বিপরীত বুঝে নেয় আর চতুর্থ হল এরা কিছুই বোঝে না। স্বাভাবিক ভাবেই এখন গুরুর দায়ীত্ব সব শিষ্যরা যেন ভালো ভাবে বুঝে নিতে পারে। আচার্য তখন বলছেন, একটা সাধারণ বিষয়কে বোঝাতে গিয়ে যদি এই অবস্থা হয় সেখানে আত্মতত্ত্ব হলে কি হবে ভাবাই যায় না।

আচার্য এখানে বলছেন *সদ্বাদি অসদ্বাদি*, সাংখ্য, পূর্বমীমাংসক, ন্যায়, বৈশাষিকদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এনারাও আত্মতত্ত্বটাকে ভুল বোঝেন। আচার্যের সব ভাষ্যেই দেখা যাবে তিনি বিভিন্ন দর্শনকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে দেখাচ্ছেন আত্মার ব্যাপারে তাঁদের ধারণাটা ভুল। আচার্য এখানেও এটাই বলতে চাইছেন, অন্যান্য দর্শনের পণ্ডিতরাও উপনিষদের অর্থ বুঝতে ভুল করেন। যেমন আত্মাতে নৈয়ায়িকরা কিছু কিছু ধর্ম চাপিয়ে দেন, এনারা ধর্ম অধর্ম এগুলো আত্মাতে দেন। কিন্তু বেদান্ত ওটাকে আত্মার ধর্ম বলে নেন না, এগুলো বুদ্ধির ব্যাপার রূপে নেন। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা আত্মাকে নিয়ে বলছেন, সেখানে আচার্য ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছেন, এগুলো মত, কিন্তু ওই জায়গাতে আত্মাকে বুদ্ধি বলে নিতে হয়। আমাদের উপনিষদাদি অনেক প্রাচীন, প্রায় পাঁচ ছয় হাজারের পুরনো, কোথায় পরম্পরাটা হারিয়ে গেল আমরা জানি না, দ্বিতীয়তঃ আজকের দিনে যেমন একটা ইউনিফর্ম টেক্সট বুক আছে সেই ভাবে ওনাদের যে ইউনিফর্ম টেক্সট বুক ছিল তা না। আর যার হাতে যখন ক্ষমতা থাকে তখন সে তার মত ইতিহাস তৈরী করে নেয়, কিন্তু যে কোন দেশে যদি একটা ইউনিফাইড পলিসি হয় আর তাতে গোলমাল যদি হয় তখন সবারই গোলমাল হবে। আমাদের ভারতবর্ষে দর্শন নিয়ে এটা একটা সমস্যা ছিল, পকেটস ছিল। পকেটের পরে পরম্পরা হতে শুরু হয়ে গেল। দিল্লীতে দিল্লী বিশ্বাবিদ্যালয়ের একটা পরম্পরা আছে আবার জেএনইউর একটা নিজস্ব পরম্পরা আছে। এনাদেরও ঐটা ছিল, ন্যায় দর্শনের একটা সেট অফ স্কুলস্, বৈশাষিকের একটা সেট অফ স্কুলস্, পূর্বমীমাংসকদের একটা সেট অফ স্কুলস্, ওনারা ওই পরম্পরাতেই বড় হয়েছেন, ওনাদেরও নিজস্ব যুক্তিতর্ক আছে। আচার্য যখন সামনে এলেন তখন তিনি লাইন করে সব কটা দর্শনকে তর্কে হারিয়ে হারিয়ে এমন করে দিলেন যে আর ওরা মূল স্রোতে থাকতে পারল না। শুধু ন্যায় থেকে গেল তার লজিকের জন্য কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে সেভাবে থাকতে পারল না। অন্য দিকে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, আধ্যাত্মিকতায় স্বচ্ছ, কিন্তু সাধারণ মানুষ নিতে পারল না, সাধারণের জন্য দ্বৈতবাদ, রামানুজ, মাধ্বাচার্যের দর্শন। তখন কোন ইউনিফাইড সিস্টমে না থাকাতে বিভিন্ন পকেটস্ বিভিন্ন ভাবে চলত। বিভিন্ন ভাবে চলার জন্য, বিভিন্ন স্কুল আত্মাকে নিজেদের মত দেখত আর উপনিষদে যে কথাগুলো আছে সেগুলোকে কোট করে নিজের মত করে দেখাত যে তারাই ঠিক বলছে। আচার্য তখন পুরো উপনিষদ এনে দেখাচ্ছেন, আমি মানছি আপনার কথাই ঠিক তাহলে উপনিষদে এই জায়গায় যে এই কথা বলছে এর ব্যাখ্যা করে দেখান এটা আপনার কথার কোথায় দাঁড়াচ্ছে? এরা আচার্যের কোন উত্তর দিতে পারল না, এরপর ধীরে ধীরে এদের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে গেল।

এখানে আচার্য এটাই বলছেন, যাঁরা এত বড় বড় পণ্ডিত তাঁরাই আত্মার ব্যাপার নিয়ে ভুলভাল বলছেন সেখানে সাধারণ লোক আর কি বুঝবে। সাধারণ শিষ্যদের তো ভুল বোঝারই কথা। তারপর ঠাকুর আসার পর পুরো ছবিটা আরও পাল্টে গেছে। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি গুলো যখন আমাদের

শাস্ত্রের সাথে মেলানো হচ্ছে তখন তো নৈয়ায়িকরা আর কোন দামই পাচ্ছে না। আচার্য শঙ্কর যেটাকে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ঠাকুর সেটাকেই নিজের অনুভূতি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

এখানে বলছেন, যদি তোমার মনে হয় তুমি সত্যিই ব্রহ্মকে ভালো ভাবে বুঝেছ তাহলে বুঝবে ব্রহ্মের অল্প রূপকে তুমি জেনেছ, ব্রহ্মকে জেনেছ ঠিকই কিন্তু ব্রহ্মের অল্প রূপকে জেনেছ। *দহরমেবাপি নূনম্*, দহর মানে হয় ছোট বা ক্ষীণ। দহর শব্দ যদিও এখন আর অত প্রচলিত নয় কিন্তু সামবেদে খুব প্রচলিত শব্দ ছিল, এমনকি ছান্দোগ্য উপনিষদেও দহর শব্দ আসে, সেখান দহর শব্দের অর্থ হয় হৃদয়গুহা, হৃদয়ের ছোট্ট যে স্থান, ছোট স্থান তাই দহর বলছেন। আর এখানে দহর বলতে ছোট বলছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্য বিদ্যা খুব নামকরা অধ্যায়, শাণ্ডিল্য বিদ্যাকে দহরবিদ্যাও বলা হয়। দহরবিদ্যা হল, ধ্যান ধারণা করে হৃদয়ের ভেতরে যখন ধ্যান কেন্দ্রিত করে তখন সেই হৃদয়গুহায় আত্মজ্যোতির সাক্ষাৎ করে, এটাকে বলে দহরবিদ্যা। ছান্দোগ্য উপনিষদেরই ছোটভাই কেনোপনিষদে, দুটোই সামবেদের।

তখন পূর্বপক্ষ আচার্যের ব্যাখ্যার আপত্তি করে আচার্যকে প্রশ্ন করছে, ব্রহ্মের কি ছোট রূপ বড় রূপ বলে কিছু আছে নাকি? আচার্য তার উত্তরে বলছেন, অবশ্যই আছে, না থাকার তো কিছু নেই। যখন নাম রূপের উপাধি লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন ব্রহ্মের অনেক রূপ হয়ে যায় কিন্তু বাস্তবে সেটা নেই। আর তাঁর যে বাস্তব স্বরূপ, কঠোপনিষদে যেমন বলছেন *অশব্দমস্পর্শম* বা *অণোরনিয়াম মহতো মহীয়ান্* বা *আসীতো দূরং শয়ানো যাতি সর্বত্রঃ*, এই জিনিসগুলো যে বলছেন এগুলো তাঁর স্বরূপ, মানে তিনি অনন্ত, কিন্তু তুমি যেমনি নাম আর রূপের উপাধি দিয়ে দেবে তখন ব্রহ্মের অনেক রূপ হয়ে যায়। আমরা সবাই ব্রহ্মের সেই এক একটি রূপ। আচার্য বলছেন, যখন নাম রূপের উপাধি এসে যায় তখন এটা ব্রহ্মের ছোট রূপ আর যখন নাম রূপের উপাধি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন ওটাই ব্রহ্মের স্বরূপ। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর মানবলীলা করেন, দেবলীলা করেন, জগৎলীলা করেন। যিনি ঈশ্বর তিনি অনেক রকম লীলা করেন। খ্রীশ্চান পাদরী হিন্দুদের গালাগালি দিয়ে বলছে, 'যে সাপকে আমাদের ভগবান স্বর্গ থেকে বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন সেই সাপ হিন্দুদের ভগবান। ওদের গীতাতেই ভগবান বলছেন *সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ*, এই হল হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র, এর কথা কি তোমার শুনবে'! এবার ওই পাদরীকে যদি প্রশ্ন করা হয় ওই যে সাপকে স্বর্গ থেকে ভগবান বাইরে ফেলে দিলেন ওই সাপকে কে সৃষ্টি করেছিল? ভগবানরই সৃষ্টি তো? আর ভগবানরই যদি সৃষ্টি হয় তাহলে মানুষ কি মানুষের বাচ্চাকেই জন্ম দেবে নাকি ভেড়ার বাচ্চা জন্ম দেবে। ভগবানেরই যদি সৃষ্টি হয়, সন্তান হয় তাহলে ভগবানেরই তো রূপ হবে। তাহলে সাপটা কোত্থেকে এসেছে, সাপটা কি ভগবানের থেকে আলাদা কিছু? ঐ জিনিসকে মেলাবার জন্য তখন এরা স্যাটার্নকে নিয়ে আসে। স্যাটার্নকে যখন নিয়ে আসে তখন দেখা যায় স্যাটার্নের শক্তি ভগবানের থেকেও বেশি হয়ে যাচ্ছে। খ্রীশ্চানদের থিয়োলজিতে এত গোলমাল যে ওরা নিজেরাও মেলাতে পারে না। হিন্দুদের এই সমস্যা নেই, হিন্দুরা জানে যা কিছু আছে সেই ঈশ্বরেরই নির্গুণ রূপ, সগুণ রূপ। সৃষ্টিটা তাঁরই লীলা। তিনি জগৎ রূপে লীলা করেন, তিনিই দেবতা রূপে লীলা করেন, তিনিই মানুষ রূপে লীলা করেন, তিনিই আবার পশুপাখি রূপে লীলা করেন। পশুপাখি রূপে লীলা করবেন তাই তাঁকে কূর্মাবতার বানিয়ে দিচ্ছে, তার জন্য তাঁকে মৎস্যাবতার, নৃসিংহ অবতার বানিয়ে দিচ্ছে। কেন? কারণ এই জগতে কোন কিছু নেই যেটা ঈশ্বরের বাইরে, আর সব ঈশ্বরেরই লীলা। আচার্যও এখানে বলছেন, ব্রহ্মের অনেক রূপ হয়, কিন্তু সেটা তাঁর স্বরূপ নয়, যখন তাঁর উপর নাম আর রূপের উপাধি লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন তিনি ছোট বড় হন।

নাম আর রূপ এটাই উপাধি। আমরা মনে করি উপাধি দিয়ে কাউকে বড় করা হয়, আসলে উপাধি ছোট করে দেয়। উপাধি মানে যেটা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হল। যারা সাধারণ তাদের উপাধি দিলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা বড় হয়ে যাবে, মুকুটের মত কিনা। কিন্তু বড় জিনিসের উপর দিলে ওটা ছোট হয়ে যাবে। একজন লোক বোম্বে থেকে সমুদ্রের উপর দিয়ে লণ্ডন যাবে। সমুদ্রের উপর দিয়ে

যেতে হলে তাকে হয় জাহাজে করে যেতে হবে, নৌকা নিয়ে যেতে পারে। আর সে যদি বিরাট যোগী পুরুষ হয় আর যোগশক্তিতে সে যদি নিজে জলের সাথে একাত্ম হয়ে জল হয়ে যায় তখন সে জলের শরীরের সাথে এক হয়ে গেল। সমস্ত জলের সাথে এক হয়ে গেল, এখন সে তৎক্ষণাৎ অন্য পারে চলে গেল, সেখানে গিয়ে সে আবার নিজের শরীর ধারণ করে নিল। এইভাবে এপার থেকে ওপারে যেতে তার কতক্ষণ লাগবে? মাইক্রো সেকেণ্ড লাগবে। এই জিনিসটাকে কল্পনা করে একটা রূপকথা বা কল্প কাহিনী লেখা যায়। জলের যে এই জিনিসটা বলা হল, সত্যিকারের তার যদি যোগশক্তি থাকে তাহলে শুধু জল নয়, নিজেকে সে বায়ু বানিয়ে নিতে পারে, নিজেকে মন বানিয়ে নিতে পারে।

নিজেকে জল বানিয়ে নিলে সে বোম্বে থেকে লণ্ডন যেতে পারবে কিনা বলা হলে, তাত্ত্বিক ভাবে মনে হবে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে সে পারবে। এইজন্যই পারবে, যখন আমরা সমুদ্র ভাবছি, জল ভাবছি তখন আমরা জলকণা ভাবছি। জলকণা আর জল দুটো আলাদা জিনিস। ওই জলের উপর যখন একটা নাম আর উপাধি এসে যায় তখন হয়ে যায় জলকণা বা জলের বিন্দু। অনেক জলবিন্দু হয়ে গেলে তখন আরেকটা উপাধি ও নাম হয়ে পুকুর বা নদী হয়ে গেল। পুকুর, নদী এগুলো নাম রূপের উপাধি। কিন্তু কেউ যদি জলের সাথে এক হয়ে যায় তখন কি হবে? তখন সে জল জিনিসটাই হয়ে যাবে। ওই জায়গাতে গিয়ে সে যদি চায় আবার নিজের শরীরটা পাল্টে নিতে পারে। কিন্তু সে অন্য ভাবে যদি পার হতে চায় সে আর পেরোতে পারবে না, তখন তাকে ওই পদ্ধতিতে, ওই গতিতেই পার হতে হবে। যোগীরা যে এখান থেকে ওখানে মুহূর্তে চলে যান, তার এটাই কারণ, তাঁরা ওই ধাতু তত্ত্বের সাথে এক হয়ে যান। এক যখন হয়ে গেল তখন এখানেও যা ওপারেও তাই। সমুদ্রের জল বোম্বেতে যা আমেরিকাতেও তাই, কিন্তু জলের একটা ফোঁটাকে নিলে তখন আলাদা, তাহলে যেতে ওরও একই সময় লাগবে। জল আর জলের ফোঁটা আলাদা। যদি আমরা আকার হিসাবে নেই তখন এক গ্লাশ জল আলাদা, এক চামচ জল আলাদা, সবই আলাদা আলাদা হবে। তখন ওর প্রপার্টি আর আকার অনুযায়ী চলবে। কিন্তু যদি সে জল তত্ত্ব হয়ে যায় তখন সে জলের সাথে এক হয়ে গেল, যেখানেই যা জল আছে সব জলের সাথে এক হয়ে গেল। সে যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে যেতে চাইবে সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে যাবে, তা সে বোম্বেতেই হোক, আমেরিকায় হোক বা মহাসমুদ্রের মাঝখানেই হোক।

এখানে দুটো জিনিস, একটা জল তত্ত্ব রূপে আরেকটা হল জলবিন্দু রূপে। আমাদের মন এমন ভাবে তৈরী যে, যখনই আমরা জল ভাবি, জল বলতে আমরা এক গ্লাশ জল, এক জাগ জল এভাবেই ভাবি। তত্ত্ব রূপে জল আমাদের মন কল্পনা করতে পারে না। একটা জল যখন দেখছি তখন সেখানে জল ফোঁটা রূপে আছে আবার জল তত্ত্ব রূপেও আছে। একটা পুকুর রূপে যে দেখছি সেখানেও জল তত্ত্ব রূপে আছে আবার পুকুরে জলরাশী রূপেও আছে। জল আর জলরাশি দুটো আলাদা জিনিস, সাধারণ অবস্থায় আমরা এর পার্থক্য করি না। পতঞ্জলি যোগসূত্র অনুসারে যখন ধ্যান করে তখন ঠিক এভাবেই ধ্যান করে। যখন পদ্মফুলের ধ্যান করতে বলা হয় তখন বলা হয় প্রথমে পদ্মফুলটার ধ্যান কর। তারপর বলা হবে, এই পদ্মফুলটার ধ্যান না করে পদ্মফুলের ধ্যান কর। এই পদ্মফুলটা হল specific আর দ্বিতীয় ধাপে যে পদ্মফুলের ধ্যান করতে বলা হচ্ছে ওটা হল generic, generic হল সব কটার মা। পদ্মফুলের একটা generic আছে যেটা ঈশ্বরের মনে আছে। যে কোন জিনিসের একটা specific হয় আরেকটা generic হয়। যেমন মানুষ, মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর চিন্তা করলেন মানুষ হোক, ওটা একটা generic, একটা স্টাণ্ডার্ড ছাঁচ। ওই ছাঁচে তৈরী করতে গিয়ে যেটা ডানদিক বামদিক হয়, সেটা হয়ে গেলে defect, এই defectকে আমরা বর্তমান কালে style বলি। যার যেটা defect হয়ে যায় ওটাই তার style হয়ে যায়। সেখান থেকে যখন হয়ে যায় তখন লাল পদ্ম, নীল পদ্ম, সাদা পদ্ম, বড় পদ্ম, ছোট পদ্ম, তাজা পদ্ম, শুকনো পদ্ম এত কিছু হয়ে যায়। মন যখন specific পদ্ম থেকে generic পদ্মে বসে যায় তখন তাকে বলে নির্বিতর্ক সমাধি। পদ্মফুল পঞ্চ তত্ত্ব দিয়ে নির্মিত, এবার বলছেন, ওই পঞ্চ তত্ত্বের উপর ধ্যান কর। পঞ্চ তত্ত্বের উপর ধ্যানে যে সমাধি হয় তাকে বলছেন সবিচার সমাধি। পরের ধাপে বলছেন, ওই যে পঞ্চ তত্ত্ব ওটা ফুলের মধ্যে আবদ্ধ, এবার শুধু যে পঞ্চ

তত্ত্ব ওর উপর ধ্যান কর, এখানে যে সমাধি হবে সেই সমাধিকে বলছেন নির্বিচার সমাধি। এই ভাবে যোগে কয়েক রকম সমাধির কথা বলা হয়েছে, বিতর্ক, নির্বিচার, সবিচার, নির্বিচার, সানন্দা আর সাস্মিতা।

যখন আমি জল দেখছি, জলাশয়, নদী, সমুদ্র দেখছি তখন সমুদ্র পার করতে হলে আমাকে প্রত্যেকটি জলের ফোঁটাকে পেরিয়ে পেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যে generic জল রয়েছে তার সাথে যদি এক হয়ে যাওয়া যায়, তখন সে সমস্ত জলের আত্মা হয়ে যাবে, তখন সে সমস্ত জলেই ব্যপ্ত হয়ে গেল। তার মানে জলে পা দেওয়ার সঙ্গেই সে জল হয়ে গেল। সে যদি পুকুরে পা দেয় এবারে সারা পুকুরের সাথে এক হয়ে যাবে। যে জায়গাতে সে দাঁড়াতে চাইবে সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে যাবে, কিন্তু রূপটা তার অন্য হয়ে যাবে। যে কোন জিনিসের specific যখন আসছে তখন তার নাম রূপ এসে যাচ্ছে। তখন আমরা পুকুরের জল, নদীর জল, ডোবার জল বলছি। Generic হল সব কিছুর মা, যেখান থেকে সব কিছু বেরিয়ে এসেছে। তেমনি বাতাসেরও generic বাতাস আছে। কেউ যদি বাতাসের সাথে মিশে যায়, তাহলে বাতাসের যে শরীরটা রয়েছে সেটার সাথে সে এক হয়ে গেল। কিন্তু তার মধ্যে যদি ব্রেক থাকে সে তাহলে ব্রেকটা ফেলতে পারবে না। যেমন জলের ওপারে মাটি রয়েছে, মাটিকে সে কিন্তু পেরোতে পারবে না, যতটুকু জল ততটুকুই যাবে। মাছ বা জলজ প্রানী যেমন সাঁতরে যাবে, সে সাঁতরে যাবে না, পুরো জলের সাথে এক হয়ে যাবে। এই যে generic রূপে সমস্তটাতে ছড়িয়ে থাকা, আর specific রূপে ওটা জলের ফোঁটা, গ্লাশের জল, পুকুরের জল, নর্দমার জল সব কটা জলই তখন আলাদা হয়ে যাবে।

ব্রহ্ম ঠিক তাই, তাঁর আসল রূপটা সর্বব্যাপী। আর তাঁর নাম রূপের উপাধি যদি দিয়ে দেওয়া হয়, তখন যতগুলো উপাধি দেওয়া হবে ততগুলো তাঁর রূপ হয়ে যাবে। এখন যদি কেউ generic রূপে ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যেতে পারে তাহলে কি হবে? তখন সে বলবে *অহং ব্রহ্মাস্মি*। তখন সে কি হবে? যত উপাধি আছে সব উপাধির সাথে এক হয়ে যাবে। ব্রহ্মাও একটা উপাধি, সেইজন্য ব্রহ্মার সাথেও এক হয়ে যাবে, সৃষ্টিকর্তা হয়ে যাবে। শিব যিনি সংহারকর্তা, শিবও একটা উপাধি, চাইলে শিবের সাথেও এক হয়ে যাবে, যার সঙ্গে চাইবে এক হয়ে যেতে পারবে। এটাই কেনোপনিষদে বলছে, আচার্য তাঁর ভাষ্যে জিনিসটাকে আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। এইসব কারণে বলে কেনোপনিষদ সব থেকে কঠিন। অথচ কেনোপনিষদ যা বলছে, একই কথা ঈশোপনিষদ বা কঠোপনিষদও বলছে। আচার্য সেইজন্য বলছেন শুদ্ধ ব্রহ্মের অনেক রূপ। কত রূপ? যত নাম ও রূপ আছে। কিন্তু যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সাথে এক, সে সমস্ত নাম ও রূপের সাথে এক। সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস দেওয়ার সময় কিছু মন্ত্র দেওয়া হয়, তার মধ্যে একটা মন্ত্র আছে *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*। এর মূল অর্থ সৃষ্টি আমার থেকেই বেরিয়েছে। বাঘ, সিংহ, সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গী, সাধু, বদমাইশ সব আমার থেকে এসেছে। সবাই আমার থেকে এসেছে তাই *অভয়ং সর্ব ভূতেভ্যঃ*। যিনি সন্ন্যাসী তিনি সবাইকে অভয় দেবেন। ওখানে বলছেন না যে তুমি মনে করবে, সন্ন্যাসের সাধনাই হল আত্মজ্ঞানের সাধনা আর তার ব্যবহারিক হল সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার থেকেই বেরিয়েছে।

Generic ব্রহ্মই সংস্কৃতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম আর specific ব্রহ্ম হয়ে যাবে সোপাধিক ব্রহ্ম। সোপাধিক ব্রহ্ম কোন দিন নির্বিশেষ ব্রহ্মকে জানতে পারবে না, যেমন এক ফোঁটা জল কোন দিন সমুদ্রকে জানতে পারবে না। উপনিষদ এটাই বলছেন, ব্রহ্মকে কে জানতে পারবে? একমাত্র ব্রহ্মই জানতে পারবে। যেহেতু ব্রহ্মকে ব্রহ্মই জানতে পারবে সেইজন্য তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হয়ে যায়। তাই নিজেকে যতক্ষণ উপাধি যুক্ত মনে করব ততক্ষণ ব্রহ্মকে কোন দিন জানা যাবে না। আমি সাধক, আমি সন্ন্যাসী এই বোধও যত দিন থাকবে কোন দিন ঈশ্বরকে জানতে পারবে না। সেইজন্য বলে নিজে শিব হতে হয় তবেই শিবকে জানতে পারবে। উপনিষদ এই ট্রেনিংটাই দেয় তুমি নিজেকে যে উপাধি রূপে জান, এই উপাধিকে কিভাবে ত্যাগ করতে হবে। উপাধি ত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত কোন

দিন জানতে পারবে না। যদি জানতে চান তাহলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তু হয়ে যাবেন। এই আলোচনাটাই এখন চলতে থাকবে। যোগসূত্রে ঠিক এই জিনিসটাকেই বলছেন, যখন ধ্যান করা হয় তখন এভাবেই ধ্যান করতে হয় specific – generic। সবিকল্প নির্বিকল্পও তাই, specific – generic। ঈশ্বরকে যখন দেশ-কাল-কারণের মধ্যে দিয়ে দেখা হয় তখন সোপাধিক ব্রহ্ম, ব্রহ্মের উপর উপাধি এসে গেছে। উপাধিকে যখন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন নির্বিশেষ ব্রহ্ম। তখন আর তাঁকে জানা যাবে না, তখন বোধে বোধ করা ছাড়া আর কিছু হয় না। ঠাকুর এটাকে খুব সহজ করে বলছেন, ঈশ্বর অনেক রূপে লীলা করেন, জগতলীলা, দেবলীলা, মানবলীলা। আমরা সেইজন্য বলি কূর্মাবতার, নৃসিংহ অবতার, মৎস্যাবতার ইত্যাদি। এই আইডিয়াকেই বৌদ্ধরা জাতক কথাতে নিয়ে গেছেন, সেখানে তিনি কখন বানর হয়েছেন, কখন হাতি, কখন পাখি হয়েছেন। আমরা শুধু গল্পই শুনে এসেছি, গল্পের কাহিনীর মধ্যেই থেকে গেছি, তত্ত্বগুলো তাই জানি না। তিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম, শুদ্ধ ব্রহ্ম হওয়ার জন্য তিনি যেখানে খুশি যেভাবে খুশি নিজেকে প্রকাশিত করে দিতে পারেন। জল তত্ত্ব, specific generic যা কিছু বলা হল সব একই তত্ত্ব। উপনিষদে কথাগুলোকে সরাসরি রেখে দিচ্ছেন আর কথামৃতে ঠাকুর ওই একই কথা উপমা ছলে, গল্পচ্ছলে রাখছেন। উপনিষদ পড়ার সময় সবারই মনে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না কিন্তু কথামৃত পড়ার সময় আমরা মনে করি সব বুঝে ফেলেছি।

আসল যিনি ব্রহ্ম তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, তিনি শব্দ নন যে তাঁকে গ্রহণ করবে, তিনি রস নন যে তাঁকে গ্রহণ করবে। সেইজন্য ব্রহ্মের যত রূপ হতে পারে সেটাকে নিষেধ করা হচ্ছে, তাঁর কোন রূপ নেই। তখন আবার পূর্বপক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হয়েছে, যে ধর্ম দিয়ে কোন বস্তুকে নিরুপণ করা হয় সেটাই তার রূপ। অগ্নির ধর্ম যেমন পুড়িয়ে দেওয়া তাই অগ্নির রূপ পোড়ান, দাহিকা শক্তি। জলের ধর্ম সিক্ত করা, তাই জলের রূপ ভেজানো। সেইজন্য কোন জিনিসকে তার বিশেষণ দিয়ে নিরুপণ করা হয়। একজন লোক খুব রাগী, রাগী লোকটা আসছে বললেই আমরা বুঝে নেব কে আসছে। দিনরাত আমরা বাড়িতে, সমাজে এইভাবেই ব্যবহার করি। ব্রহ্ম তিনি ব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন, পৃথিবী হয়েছেন, সূর্য চন্দ্র হয়েছেন, এগুলো ঠিক তাঁর রূপ নয়। ঠিকই বলছেন, কিন্তু উপনিষদেই বলছেন *বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম*, *বিজ্ঞানঘন এব*, *সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম*, *প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম*, এই যে কথাগুলো বলা হয়েছে, এটা দিয়ে তো বলাই যেতে পারে। এখানে যুক্তিটা খুব সূক্ষ্ম যুক্তি। যে জায়গাতে উনি আপত্তি করছেন ঠিক তার আগে একটা প্রশ্ন উঠছে।

আচার্য বলছেন, কোন জিনিস দিয়ে, কোন ভাবে তাঁর কোন রূপের কথা বলা যায় না। তখন আচার্যের কথাতে আপত্তি করে বলছেন, কেন বলা যাবে না, উপনিষদেই তো বলছে *প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম*, আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের যে ছোট রূপ পৃথিবী, দেবতা, মানুষ এগুলোকে না হয় আমরা নাকচ করে দিলাম, কিন্তু আপনার উপনিষদেই তো এই কথাগুলো বলছেন, সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম বলছে, তা হলে না করা যাবে কেন? আচার্য তখন বলছেন, আপাত ভাবে যুক্তিটা ঠিকই, এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু ছোট্ট একটা তফাৎ রয়েছে। ব্রহ্মকে যখন এভাবে বলা হয়, যারা শুনছে তাদের মন, বুদ্ধির যে প্রপার্টিস সেটাকে আঘাত করে এই জিনিসগুলো বলা হয়েছে। মানুষের মধ্যে আনন্দ খুব বড় একটা প্রপার্টি, প্রজ্ঞাও খুব বড় একটা গুণ, ওই জন্যই ব্রহ্মকে এভাবে বলা হয়, আসলে জিনিসটা তা নয়। ব্রহ্মের আসল রূপ হল যেটা আগে বলা হয়েছে, বিদিতের পারে আর অবিদিতের উপরে, এটাই একমাত্র যেটা বলা যেতে পারে। তার মানে নেতি নেতিই হল ঠিক ঠিক। শাব্দিক অর্থে যদি বুঝতে হয় তাহলে এর অর্থ হল, আত্মা বা ব্রহ্মের উপরে কোন বিশেষণ যদি লাগানো হয়, তাহলে এটা ভুল। একমাত্র নেতি নেতি দিয়েই ব্রহ্মকে বলা যায়। জিনিসটা খুবই সহজ কিন্তু খুব জটিল। বেদান্তের যত দর্শন আছে, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত ইত্যাদি সব এই পয়েন্ট থেকেই আলাদা হতে শুরু হয়ে যায়।

ঈশ্বরকে আমরা বলছি তিনি দয়াময় আবার অন্য দিকে বলছি তিনি ব্রহ্মের সাথে এক। দয়াময়, এই গুণটা লাগিয়ে দিলাম এটাই তাঁর স্বরূপ হয়ে গেল। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে আমরা দয়াময় বলতে পারি কিন্তু

ব্রহ্মের ক্ষেত্রে আসবে না। আচ্ছা তা না হয় মানলাম, কিছু না হোক শুধু শুদ্ধ চৈতন্য তাঁকে বলা যাবে তো? লোকেদের বোঝাবার জন্য শুদ্ধ চৈতন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ মানুষ বুদ্ধির সাথে নিজেকে একাত্ম মনে করে, মানুষ আনন্দের সাথে নিজেকে একাত্ম করে, সেইজন্য এভাবে বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মের কোন বিশেষণ নেই, সেইজন্য কোন পরিস্থিতিতে কোন বিশেষণ দিয়ে বলা যাবে না। যদি বলতে হয় তাহলে শুধু এটা বলা যাবে, যে কোন জিনিস যেটা বিদিত তিনি তার বাইরে আর অবিদিত, প্রকৃতি যেটা তারও উপরে। এছাড়া আর কোন ভাবে ব্রহ্মের ব্যাপারে বলা যাবে না।

ফাস্ট ফুড খেতে খেতে যেমন হজম শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, ধর্মের অতি সহজিকরণ করে করে আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম জিনিস গুলোকে হজম করার শক্তি সবারই শেষ হয়ে গেছে। এই যে কথাগুলো আমরা এতক্ষণ বললাম, আচার্য এটাকেই দুটো বা তিনটে বাক্যে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন, আর উনি ধরেই নিচ্ছেন যে এতেই সবার স্পষ্ট হয়ে যাবে। অথচ আমরা কিছু ধারণ করতে পারছি না। এটাই এখানে বলছেন, তুমি যদি মনে কর তুমি সব বুঝে গেছ, তাহলে তুমি কি রকম বুঝেছ? *দভ্রমেবাপি*, ব্রহ্মের ছোট্ট রূপ বুঝেছ, আসলে তুমি কিছুই বোঝনি। ব্রহ্মের ছোট রূপ বড় রূপ কিছু হয় নাকি? হ্যাঁ হয়, উপাধি লাগিয়ে দিলে ছোট বড় হয়। আবার ব্রহ্মের কখন কোন রূপ হয় না। তখন বলছেন ব্রহ্মের কোন রূপ হয় না আপনি কি বলছেন, উপনিষদেই তো বলছে, ব্রহ্ম আনন্দঘন, প্রজ্ঞানন্দ। উপনিষদে ঠিকই বলছে, এটা হল লোকেরা highest যে জায়গাটা হতে পারে সেটাকে তুলনামত্মক ভাবে আনা হয়েছে, ইতি দিয়ে ব্রহ্মকে কখন জানা যায় না, নেতি দিয়েই জানা হয়। আর ঠিক ঠিক যদি হয় তাহলে *অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং* এই ভাবেই বলা হয় আর এখানে যেটা বলছেন বিদিতের পারে আর অবিদিতের উপরে, ব্রহ্মের ব্যাপারে যদি কিছু বলা যেতে পারে এটাই ঠিক ঠিক বলা।

এখানে যেভাবে আচার্য বলে যাচ্ছেন তাতে ব্রহ্ম আর আত্মা ক্রমাগত inter change terms, কারণ আত্মার জ্ঞান সবারই আছে। কেউ নেই যে আত্মাকে জানে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে জানে, আধ্যাত্মিক ভাবে মানে নিজের রূপে জানে, আমি দেহ দেহটাই আমার আত্মা এই রূপে জানে। খুব হলে আমি মন, আমি বুদ্ধি এই রূপে জানে। এই যে আধ্যাত্মিক ভাব, এটা ব্রহ্ম ঠিকই কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্রহ্মের ছোট রূপ। আর আধিদৈবিক রূপে যদি দেখ, অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে যদি ব্রহ্ম দেখ, সেটাও ব্রহ্মের ছোট রূপ। গুরু শিষ্যকে সাবধান করছেন, তুমি যেটাই জানছ এটা কিন্তু ব্রহ্মের ছোট রূপ, এটা ব্রহ্মের ঠিক রূপ নয়। কেন বলছেন? উপনিষদ শুরু হয়েছিল এই প্রশ্ন দিয়ে *কেনেষিতং পততি মনঃ*, মনকে কে প্রেরিত করে? সেখান থেকে শুরু হয়েছে। সেখান থেকে ঘুরিয়ে ব্রহ্মের নিয়ে এসে ফেলেছেন। শিষ্য বলছে এবার আমি বুঝে গেছি। তখন গুরু সাবধান করে দিচ্ছেন, তুমি কিছুই বোঝনি, তুমি যেটা বুঝেছ সেটা ব্রহ্মের ছোট রূপ বুঝেছ। কারণ আত্মা সমস্ত উপাধির বাইরে, সেইজন্য তুমি যখনই দেহ, মন, বুদ্ধি এই উপাধি দিয়ে দিচ্ছ বা আধিদৈবিক রূপেও যদি দেখে থাক, যেমন আমরা ঠাকুরকে দেখে থাকি, সেটাও কিন্তু অল্পত্ব। কারণ ঠাকুরকে আমরা সেই ভাব রূপে দেখি না। আমরা দেখছি ঠাকুর আছেন, তিনি ভগবান, তিনি আমাদের দেখবেন, কৃপা করবেন। আর আমরা মনের জগতে একটা সুখের সংসার বানিয়ে রেখেছি, সেখানে একটা ধাক্কা লাগলে বলি ঠাকুর আমার একি করলেন। এটাও ব্রহ্মের ছোট রূপ, আসল রূপ নয়। বলছেন, যেখানে সমস্ত বিশেষণ চলে যায়, যা কিছু উপাধি চাপান ছিল সব সরে যায়, যখন এক, অদ্বিতীয়, অন্য কিছু আর থাকে না। তার সাথে বলছেন শান্ত, কোন ধরণের চাঞ্চল্য নেই। চাঞ্চল্য নেই মানে, দুই বলে কিছু নেই, সৃষ্টি নেই। আর *ভূমাসংজ্ঞক*, ভূমা মানেই বৃহৎ, এটাই ব্রহ্ম। মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলছেন, *শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্*।

এরপর আচার্য নিজের তরফ থেকে বর্ণনা দিয়ে বলছেন। গুরুর কাছ থেকে এরূপ কথা শোনার পর শিষ্য একান্তে চলে গেল আর গুরুর কথা শুনে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করল। চিন্তন করতে করতে মনকে সে একাগ্র করল, এই যে এতক্ষণ গুরুর কাছে যে কথাগুলো সে শুনেছিল সেই কথার যে অর্থ তার উপর বিচার করতে শুরু করল। মনে মনেই সে যুক্তিতর্ক করে বিচার করতে থাকল, এইভাবে

করতে করতে শিষ্যের জ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর আবার সে এসে গুরুকে বলছে, আমার মনে হয় এখন আমি ব্রহ্মতত্ত্বকে বুঝে গেছি। এখানে আচার্য বলছেন না যে শিষ্য কত দিন একান্তে ছিল। ভাষ্যে আচার্য যে ভাবে বলছেন তাতে মনে হয় যেন, ক্লাশের যেমন ইন্টারভাল হয় শিষ্যও ওই ইন্টারভাল পিরিয়ডে চিন্তা ভাবনা করে এসে বলছে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝে গেলাম। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, এখানে আট থেকে দশ বছরের সময় লেগে থাকতে পারে আবার এক বেলা সময় লেগে থাকতে পারে। আচার্য নির্দিষ্ট করে কিছু বলছেন না, বলছেন শিষ্য গুরুর সব কথা শুনল, এবার সে একান্তে গিয়ে মনকে একাগ্র করে গুরুর কথার তাৎপর্যের উপর মনন করতে শুরু করল। তারপর সে দেখল যে এবার বুঝলাম জিনিসটা সত্যিই কি। এখানে মূলতঃ আত্মজ্ঞান কি পদ্ধতিতে হয় সেটারই খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করছেন। শিষ্য গুরুর কাছে এসেছে, শিষ্য প্রশ্ন করেছে, গুরু শুনলেন, শোনার পর উত্তর দিলেন, শিষ্যের একটু সংশয় তৈরী করে দিলেন, এবার শিষ্য একান্তে গিয়ে চিন্তন-মনন শুরু করল। চিন্তা ভাবনা করার পর বিচার করল, বিচার করে আবার গভীর ভাবে ভাবল, তখন ওর জ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান আসার পর শিষ্য গুরুর কাছে আবার ফিরে এসে বলছে -

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।।২/২।।

([শিষ্য]- আমি এরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তম রূপে জেনেছি; অর্থাৎ 'জানি না' তাও মনে করি না এবং 'জানি' তাও মনে করি না। 'জানি না যে তাও নয় এবং জানি যে তাও নয়' – আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।

অহং ন মন্যে সুবেদেতি, আমি মনে করি না যে আমি ভালোভাবেই এটাকে জানি। আমরা আগেও বলেছিলাম, কেনোপনিষদে যদিও গুরু-শিষ্যের সংলাপের মাধ্যমে এগিয়েছে কিন্তু ধারাবাহিকতা পাওয়া যাবে না। কঠোপনিষদ যেমন একটা আখ্যায়িকা, ওখানে একটা ধারাবাহিকতা আছে। নচিকেতা যমরাজের বাড়ি গেলেন, তিন দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে যমরাজের জন্য অপেক্ষা করলেন, তারপর যমরাজ আসার পর তাঁর বাড়ির লোকেরা জল নিয়ে নচিকেতাকে অভিবাদন করতে বলছেন, একটা ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু কেনোপনিষদে সেই ধারাবাহিকতাটা নেই। এখানে অনেক কিছু জিনিস উহ্য থেকে যাচ্ছে, সেইজন্য আরও সমস্যা হয়ে যায়। শিষ্য তাই কত দিন ধ্যান ধারণা করল আমাদের জানা নেই। কিন্তু তারপরেই শিষ্য এসে বলছে, *নাহং মন্যে সুবেদেতি*, আমি মনে করি না যে জিনিসটাকে আমি ভালোভাবে জেনেছি। তুমি যদি ভালোভাবে নাই জানলে তুমি তুমি কি বলতে এসেছ? প্রশ্ন করা হল, কি হে তুমি কে জেনে গেছ? হ্যাঁ জেনেছি, আমি যে ভালোভাবে জানি না এটা জেনে গেছি। এটা কি ধরণের উত্তর! তাহলে তো তুমি বোঝনি। তখন শিষ্য বলছি, *নো ন বেদেতি বেদ চ*, না না আমি এটা বলছি না যে আমি বুঝিনি। এটাকে বলে পরস্পর বিরোধী পদ্ধতি, এখানে আবার দুটো পরস্পর বিরোধী আসছে। *সুবেদেতি* এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, বিশেষ ভাবে ভালোভাবে জানি। *সুবেদেতি*, ভালো ভাবে জানা, এর অর্থ হল আমরা যখন একটা জিনিসকে জানি, যেমন এই পেন, আমরা ভালো ভাবে জানি এটা পেন, এর কি কাজ। কিন্তু যখন ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের ব্যাপারে বলছি আমি ভালো ভাবে জানি তখন ঈশ্বর বা ব্রহ্ম একটা বস্তু হয়ে গেলেন। শিষ্যকে যখন এই ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হল শিষ্য তখন জিনিসটাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেছে। চিন্তা ভাবনা করে শিষ্য একটা জায়গায় পৌঁছাল, ঈশ্বরকে, ব্রহ্মকে সুষ্ঠু ভাবে জানা যায় না। এটা বলা যাবে না যে আমি ভালো ভাবে জিনিসটাকে জানি। তাহলে কি আমি জানি না? না, তা নয় *নো ন বেদেতি বেদ চ*, আমি জানি। কিন্তু *সুবেদেতি* নয়। তার মানে ব্রহ্মকে আমি জানি, বস্তু ভাবে জানি না। একটা বস্তুকে বা একটা বিষয়কে যেভাবে ভালো করে জানা হয় সেভাবে আমি জানি না।

গুরু এবার শিষ্যকে আরও বেশি করে নাড়া দিচ্ছেন। তুমি তো পরস্পর বিরোধী কথা বলছ, এই তুমি বলছ জানি না, আবার বলছ এটাও নয় যে আমি জানি না। কারণ আমি জানি আর আমার

সংশয় আছে, এই দুটো জিনিস একসাথে হয় না। তুমি প্রথমে বলছ আমি ভালো ভাবে জানি তা না, কিন্তু জানি না তাও নয়, এটাই পরস্পর বিরোধী কথা হয়ে গেল। কোন জিনিসকে যখন ঠিক ঠিক জানা হয় তখন কোন সংশয় থাকে না, আর বিপরীত জ্ঞান থাকে না। যে কোন ব্যাপারে যদি দেখা যায় বিপরীত জানে, তাহলে কিছু একটা গোলমাল আছে। জার্মান ফিলজফিতে কান্টের খুব নাম, তাছাড়া পাশ্চাত্য দর্শনে তিনি বিরাট shape দিয়েছিলেন। শুধু চিন্তা ভাবনা করেই তিনি সব কিছুকে এত দূর নিয়ে গেছেন যে কল্পনাই করা যায় না, তার সাথে বিজ্ঞানকে যে তিনি এতদূর প্রভাবিতক করেছিলেন ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আজকে হিন্দুরা আমরা বড় বড় কথা বলি কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বিজ্ঞানকে একটুও প্রভাবিত করেনি। কান্ট খুব দামী একটা কথা বলেছিলেন, মানুষের বুদ্ধি এমন ভাবে তৈরী যে সে বিপরীত জিনিসকে নিয়ে চলে দুটোকেই প্রমাণিত করে দিতে পারে। এটাই মানুষের একটা বিরাট বড় শক্তি আবার বিরাট দুর্বলতা। যার জন্য দেখা যায়, বৈজ্ঞানিকরা যখন কোন থিয়োরীকে নিয়ে আসেন তখন একজন বৈজ্ঞানিক এক রকম সিদ্ধান্ত দিয়ে প্রমাণিত করে দিল, অন্য বৈজ্ঞানিক ওই যুক্তি দিয়েই তাকে অন্য রকম প্রমাণিত করে দিল। তারপর কালের সাথে চলতে চলতে সেটা অন্য একটা জিনিসে দাঁড়িয়ে যায়। এর খুব মজার দৃষ্টান্ত হল, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন আর জগৎকেও প্রচুর চিন্তা-ভাবনার রসদ দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। উনি একবার ঠিক করলেন একটা দর্শনের বই লিখবেন যাতে তিনি এমন একটা পদ্ধতি দাঁড় করাবেন, যে পদ্ধতি পুরোপুরি যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে, তাতে যুক্তি ছাড়া কিছু থাকবে না আর যেটাকে কেউ কোন দিন কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত উনি লিখলেন। যখন লিখছিলেন ঠিক সেই সময় আমেরিকাতে একজন গণিতজ্ঞ স্বাধীন ভাবে কাজ করছিলেন। সেই সময় তিনি প্রমাণিত করে দিলেন, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই মেথড কখনই বাস্তবে সম্ভব হতে পারে না। ওনার একটা খুব জটিল গাণিতিক থিয়োরী আছে যার নামই হল Gödel's incompleteness theorems। উনি তাতে দেখাচ্ছেন আপনি যদি কোন প্রণালীর মধ্যে নিজেকে বেঁধে নেন আর সেই প্রণালীর মধ্যে থেকে আপনি যদি কোন কিছুকে প্রমাণিত করে দিতে পারেন তাহলে সেটা সব সময় incomplete হবে। কারণ কোন জিনিসকে প্রমাণিত করার জন্য আপনাকে ঐ জিনিসের বাইরে থেকে আসতে হবে। কিন্তু বাইরে থেকে আসা মানেই হবে জিনিসটার নিয়মকে ভেঙে দেওয়া। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর নতুন থিয়োরিতে এক দুই করে কয়েকটি খুব সাধারণ পরিভাষা নিয়ে এলেন, তার মানে তিনি একটা প্রণালী তৈরী করে দিলেন। Gödel গাণিতিক নিয়মে প্রমাণিত করে দিলেন, যদি এই রকম হয় তাহলে ঐ নিয়মের মধ্যে থেকে তাকে কখনই প্রমাণিত করা যাবে না, তার মানে জিনিসটা কখনই complete হবে না। Complete কিনা বোঝার জন্য আপনাকে ঐ সিস্টেমের বাইরে আসতে হবে। যেমনি বাইরে এসে গেলেন তাহলে প্রথমে তিনি যে সিদ্ধান্ত গুলি দিয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্তের আর কোন দাম থাকল না। সেই থেকে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এত নামকরা Mathematical Philosophy চিরদিনের মত ওখানেই শেষ হয়ে গেল। এটাই বলা হচ্ছে, মানুষের মন বিপরীত জিনিসকে নিয়ে চলতে পারে, আর বিভিন্ন লোক ওই বিপরীত জিনিসকে প্রমাণিত করে দিতে পারেন। এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। একই লোককে আমরা ভালোও দেখি আবার মন্দও দেখি। আচার্য এখানে এটাই বলছেন, সংশয়যুক্ত জ্ঞান কখনই জ্ঞান নয়। আর বিপরীত জ্ঞান নিয়ে যদি চলা হয়, রাতের অন্ধকারে যাচ্ছি আর দেখছি দড়ির মত কি একটা পড়ে আছে, আমি জানি ওটা দড়ি, তবে ওটা দড়ি না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে, এটাও কোন জ্ঞান নয়। সংশয় সব সময় বিপর্যয়, বিনাশের কারণ, ওই জ্ঞান কোন জ্ঞানই নয়।

গুরুর কাছে এই কথা শোনার পর এবার কিন্তু শিষ্য বিচলিত হল না। যদিও মন্ত্রে এই কথাগুলো নেই, এই জিনিসগুলো আচার্য নিজের তরফে যোগ করছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি। এক হল আচার্যের উপদেশ, দুই উপপত্তি = বিচার, জ্ঞান আর তৃতীয় বলছেন অনুভব। এই তিনটেকে আমরা এভাবেও বলতে পারি, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য তিনটে ধাপ লাগে, প্রথম ধাপে শ্রুতি, অর্থাৎ এর আগের আগের আচার্যরা যেন এই কথা বলে থাকেন, দ্বিতীয় ধাপে যুক্তি, বিচার

করে দেখা যে এই জিনিসটাই ঠিক আর শেষ ধাপে ওটাকে নিজের অনুভব করা। শিষ্য এই শিক্ষাটা গ্রহণ করেছে, প্রথমে সে একান্তে চলে গিয়েছিল, আচার্যের বাক্যকে মনন করেছে, সেটাকে বিচার করেছে এবং বিচার করে ব্রহ্মবিদ্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই তিনটের মধ্যে একটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে। যদি আচার্যের কাছ থেকে উপদেশ না শুনে থাকে, দ্বিতীয় যদি নিজে থেকে বিচার না করে থাকে আর নিজের যদি অনুভূতি না হয়ে থাকে সমস্যা হয়ে যাবে। আমাদের যে এত দীর্ঘ আলোচনা করা হচ্ছে, এইজন্যই করা হচ্ছে যাতে বিচার শক্তিটা বাড়ে। ক্লাশে আচার্যের কথা আমরা প্রতিনিয়ত শুনে যাচ্ছি, গীতার শ্লোক, শাস্ত্রের কোন কথা থেকে থেকে আমাদের মনে ভেসে উঠছে, তার মানে আচার্যের কথা আমি জেনে গেছি। কিন্তু দ্বিতীয় যেটা হওয়ার, ওটাকে বিচার করে নিজের মত আপন করে নেওয়া সেটা হচ্ছে না। এখানে শিষ্য যা যা করছে, গুরুর কাছ থেকে শুনল, শুনে একান্তে চলে গেল, বিচার করেছে, মনন করেছে, এই জিনিসগুলো সবাইকেই করতে হবে। এগুলো যদি না করা হয় তাহলে উপনিষদের কথা তার ভেতরে যাবে না, ভেতরে না যাওয়া মানে উপনিষদ তার কাছে শব্দ মাত্র হয়েই থেকে যাবে। উপনিষদের একটি কথা একবার যদি কারুর ভেতরে ঢুকে যায়, এটা নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যায় যে সমস্ত শাস্ত্রের সমস্ত কথা তার মধ্যে ঢুকে গেল। এবার তাকে ওই জ্ঞানকে নিজের অনুভবে নিয়ে আসতে হবে। যখন বিচার করতে শুরু করবে, বিচার করে করে যত গভীরে যাওয়া যাবে তখন সব কিছু পরিষ্কার হতে শুরু করবে।

আচার্যও আবার নিজের তরফ থেকে যোগ করে বলছেন, শিষ্য এবার গর্জন করে বলছে। আমরা বাংলায় গর্জন যে অর্থে বলি সেই অর্থে শিষ্য কখনই গুরুর সামনে গর্জন করে কোন কথা বলবে না, গর্জন মানে খুব আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলছে। উপনিষদে এক জায়গায় ঋষি *শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রা আয়েধামানি দিব্যানি*, বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষকে আহ্বাণ করে বলতে চাইছেন, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন, তোরা কে কোথায় আছিস আয়। যাদের জ্ঞান হয়ে যায় তারা যে গর্জন করেন না সেটাও বলা যাবে না, আবার গর্জন করেন সেটাও বলা যাবে না, ত্রৈলঙ্গস্বামী কথাই বলতেন না। এখান গর্জন বলতে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলছে। শিষ্য বলছে, আমাদের এখানে যে ব্রহ্মচারীরা আছে তারা তত্ত্বতঃ ব্রহ্মকে যে ভাবে জানার কথা সে ভাবে যে সে জানে সেটা সে জানে। তার মানে ব্রহ্মকে বস্তু রূপে জানে না, নিজের আত্মা রূপে জেনে গেছে। তার সাথে সাথে এই যে আত্মা, এই আত্মাকে দেহাত্মা, মন আত্মা, বুদ্ধি আত্মা এই রূপে জানছে না। বিদিতের পারে অবিদিতের উপরে, এইভাবেই জিনিসটাকে জেনেছে।

এটাকেই এবার ব্যাখ্যা করে বলছেন *যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ*, *নঃ* মানে আমাদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে সেই জিনিসটাকে জানে। কি রকম জানে? আগে যেভাবে বলা হয়েছিল, বিদিতের পারে আর অবিদিতের উপরে, সেইভাবে জানে। এটাকে যারা অনুমান আর অনুভব এই দুটোকে মিলিয়ে আচার্যের বাক্যের নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেছে, সেখান থেকে যখন পৌঁছে যায় বিদিতের পারে আর অবিদিতের উপরে, সেটাই জ্ঞান। এখানে বলছেন, সাধারণ মনের লোকেরা যাতে ভুলে না মনে করে আমরা বুঝে যাচ্ছি, সেটাকে এখানে আটকানো হচ্ছে। *নো ন বেদেতি বেদ চ*, যে এই জিনিসটাকে ঠিক ঠিক জানে যেভাবে বলা হল, আমি জিনিসটাকে জানি কিন্তু ওই ভাবে জানি না যেভাবে জিনিসটাকে জানা হয়। এই কথা বলার পর শিষ্য বলছে, *যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ*, আমাদের ব্রহ্মচারীদের মধ্যে যারা যারা আছে, যারা এই ভাবে জিনিসটাকে জেনেছে একমাত্র তারাই জেনেছে আর আমিও জেনেছি। কি জেনেছি? ব্রহ্মকে বা আত্মাকে বস্তু রূপে জানা হয় না, দ্বিতীয়তঃ এটাও আমি জেনেছি বিদিত অর্থাৎ যে কোন বস্তুর তিনি পারে আর সমস্ত বস্তুর সমষ্টি যেটাকে অবিদিত বলা হয়, প্রকৃতিও বলা হয়, ব্রহ্ম তারও উপরে। আমি এভাবে জেনেছি।

কিন্তু যে মনে করে আমি জানি, প্রকৃতপক্ষে সে জানে না। কারণ জানি বলতে ওখানে বোধ হয়ে যায়, এই জানাটা পদার্থ জ্ঞান। আর যে বলছে আমি জানি না, এই জায়গাটায় মন্দ বুদ্ধির যারা, পরে

আবার বলবেন যে সাধারণ লোকেরা তো জানেই না, তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। মূলতঃ তিনটে শ্রেনী হয়, প্রথম হল যারা সাধারণ মানুষ, যাদের বুদ্ধি জড়, তারা ব্রহ্মের ব্যাপারে কিছু জানেই না, এখানে এদের কথা একেবারেই বলা হচ্ছে না। দ্বিতীয় হল যারা অল্প একটু জানে, তারা মন বুদ্ধি রূপে আত্মাকে জানে। আর তৃতীয় হল যাঁরা ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁরা জানেন ব্রহ্ম সব কিছুর পারে। কিন্তু তাঁকে জানি না এটা বলা যাবে না কারণ আমি জানি, কিন্তু মন বুদ্ধি রূপে যে জানা সেইভাবে জানি না। এই তিনটে শ্রেনী – অজ্ঞানী, অল্প জ্ঞানী আর জ্ঞানী। এই তিনটে শ্রেনীতে বিভক্ত করে বলছেন, যাঁরা জানেন যে আমি জানি না, তাঁরাই জানেন। যারা মনে করে আমি জানি, তারা জানে না, তারা জানে এই বোধটা বস্তু জ্ঞানকে নিয়ে। যে কোন মানুষ আত্মা বা ব্রহ্মকে মনে করে আমি জানি, তারাও জোর দিয়ে বলে, আমি নিজেকে জানব না! তার মানে তুমি কাকে জান? তুমি মনকে জান, আত্মাকে জান না। যে জানে সে জানে যে তাঁকে জানা যায় না, কিন্তু তার সাথে এটা জানে যে তিনি যে নেই তা নয়, দ্বিতীয় তাঁকে আমি বোধে বোধ করি।

এখানে এই আলোচনাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্তরে চলছে। দেখাচ্ছেন, মন আর বুদ্ধিকে যদি চেতনার শেষ কথা বলে মনে করা হয়, এটা যে একেবারেই ভুল তা নয়, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সত্য নয়। যাঁরাই একটু চিন্তনশীল তাঁরা যদি মনে করেন মন আর বুদ্ধি যেখানে চিন্তন হচ্ছে, যেখানে পুরো জিনিসটাকে গ্রহণ করা হচ্ছে এটাই চেতনার শেষ অবস্থা, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নয়। কিন্তু বেদান্ত বিভিন্ন ভাবে, অনুভূতি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, শাস্ত্রের কথা দিয়ে দেখাচ্ছেন জিনিসটা কিন্তু তা নয়। একটা জিনিস এনারা যেটা বার বার ব্যবহার করছেন, যেখানেই বহুত্ব সেটা মৌলিক হতে পারে না। এই কথা আচার্য শঙ্কর যে নতুন কিছু বলছেন তা না, ফিজিক্সেও এটা খুব পুরনো সমস্যা। ফিজিক্স যখন বলল নিউক্লিয়াসকে ভাঙা হোক, যেমনি নিউক্লিয়াসকে ভাঙতে গেছে তারপর দেখা গেল ওর থেকে অনেক গুলো পার্টিকেলস বেরোতে শুরু করল। তখন বিজ্ঞানীরা বললেন, এটা হতে পারে না। কারণ মৌলিক পার্টিকেলস এতগুলো কখনই হতে পারে না, একটা হতে পারে, দুটো বা তিনটে হতে পারে, এর বেশি হতে পারে না। আজ থেকে বার'শ বছর আগে আচার্য শঙ্কর লজিকের একটা মূল বানাচ্ছিলেন সেই একই লজিক আজ ফিজিক্সও ব্যবহার করছে, কিন্তু এতে ফিজিক্স বা আচার্যের কোন সম্পর্ক নেই, এটা আমার আপনার খুব সাধারণ জ্ঞান। আমরা যখন বলছি মৌলিক, মৌলিক মানে মূল, তার মানে একশ খানা জিনিস কখনই মূল হতে পারে না।

আমাদের যত ধর্ম শাস্ত্র আছে তাতে খুব বেশি হলে ওনারা তিনটে মৌলিক জিনিসকে নেন। খুব স্থূল রূপে দেখলে তিনটে হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ। কিন্তু এটা কোন ফিলজফি নয়। যখন নীচে যাবে তখন সব থেকে বেশি হলে দুই হয়ে যাবে, শিব আর শক্তি। সাংখ্যের দিক থেকে দেখলেও দুই হয়ে যাবে, পুরুষ আর প্রকৃতি। যদি আরও নীচে যাওয়া তখন মৌলিক একটি মাত্র হয়ে যায়, এই এক হল ঈশ্বর। যখন বলছেন নারায়ণ, বিষ্ণুই আছে, তখন একটিই আছে। খুব স্থূল ধারণা হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ, এটা খুব স্থূল প্রচলিত ধারণা, এটাকে নেওয়াও যায় না। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে নেওয়া হয় দুই, পুরুষ-প্রকৃত, শিব-শক্তি। আরও যখন মূলে যায় তখন এক, এক হয়ে গেলে তখন তাকে বলে একেশ্বরবাদ। একেশ্বরবাদে আল্লাই আছেন, গডই আছেন God alone exists, বৈষ্ণবরা বলে বিষ্ণুই আছেন। তাহলে মূল হয়ে গেল এক। শুধু অদ্বৈত বেদান্ত বলে মূল একও নয় দুইও নয়, কি আছে বলা যাবে না, এক আর দুইয়ের পারে। বৌদ্ধরা এটাকেই শূন্য বলে, শূন্য বলছে বটে কিন্তু শূন্যটাও একের মতই হয়। একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত বলে আছে, ওই যা আছে তাকে এক বলা যাবে না। কেন এক বলা যাবে না? কারণ দুই নেই, দুই নেই বলে এক বলা যাবে না। কারণ ওই এক আছে বলার জন্য আরেকজনকে থাকতে হবে। এগুলো শুনলে কিছুই বোঝা যায় না, যেদিন যে বুঝবে সে নিজে থেকেই বুঝবে। অদ্বৈতের ধারণা করা খুব কঠিন, একদিনে হয় না। যেদিন হবে সেদিন নিজে থেকেই হয়।

বলরাম মন্দিরে ঠাকুর একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছেন, আকাশে এক সূর্য আর নীচে দশটি জলপূর্ণ পাত্র, তাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে। তাহলে কটি সূর্য? একজন ভক্ত বললেন, আকাশে সত্য সূর্য আর নীচে দশটি প্রতিবিম্বিত সূর্য, মোট এগারোটি সূর্য। এবার একটি একটি করে পাত্রকে ভাঙতে শুরু করল, শেষ একটি পাত্র থেকে গেল। এখন কটি সূর্য? দুটি, একটা উপরে আরেকটা নীচে। ঠাকুর গিরিশ ঘোষের দিকে তাকিয়ে বলছেন, শেষ পাত্রটিকেও ভেঙে দেওয়া হল, এবার কটি সূর্য থাকল? গিরিশ বলছেন, একটি সূর্য। ঠাকুর বলছেন, না, আর মুখে বলা যাবে না। একের বোধ, দুইয়ের বোধ হওয়ার জন্য মনকে আসতে হবে। মন যখন নেই তখন এক, দুই বলাই যাবে না। তাহলে খ্রীশ্চানদের গড আর বেদান্তের ব্রহ্ম কি এক? কারণ ব্রহ্ম তিনিই শুধু আছেন, আর নারায়ণও তিনিই শুধু আছেন, দুটো কি এক? না, দুটো এক নয়। কারণ যিনি এক, তাঁকে ধ্যানের দ্বারা জানা যাবে, যেমন ঠাকুর মা কালীকে জেনেছেন। মা কালীকে জানছেন মানে, এককে জানছেন। এক যিনি তাঁকে জানা যায় কিন্তু ব্রহ্মকে জানা যায় না। ব্রহ্ম আর ঈশ্বরে এটাই তফাৎ।

ঈশ্বরকে জানা যায় ব্রহ্মকে জানা যায় না, এই জায়গায় এসে একটা জটিলতার উদ্ভব হয়। তাহলে ঈশ্বরকে কি ব্রহ্মের ছোট রূপ বলা যায়? বলা যায় না, কারণ যিনি ব্রহ্ম তিনিই ঈশ্বর, ঈশ্বরকে মন দিয়ে জানা যায়। ঠাকুর আবার বলছেন, তিনি ঈশ্বর লীলা করেন, সেদিক থেকে ব্রহ্মের ছোট রূপও বলা যায়। কিন্তু সমস্যা হল, যে মুখ দিয়ে, মন দিয়ে ছোট ব্রহ্ম বলছি, সেই মুখ দিয়ে, সেই মন দিয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই শেষ কথা। যতক্ষণ মনের এলাকায় আছে, মনের এলাকা মানেই মায়ার এলাকা, তখন তিনি শ্রেষ্ঠরও শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য তাঁকে ছোট ব্রহ্ম বলা যাবে না। ব্রহ্ম জিনিসটা তখনই আসে যখন মন বুদ্ধির পারে চলে যাবে। মন বুদ্ধির পারে চলে গেলে তখন তো আর ছোট বড় কিছুই থাকল না। মনের এলাকায় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দেবতা, মানুষ এদের ব্রহ্মের ছোট রূপ বলা যাবে কিন্তু ঈশ্বরকে ছোট রূপ বলা যাবে না। কারণ তিনিই পরম, তিনিই সব কিছু হয়ে আছেন। ঈশ্বরকে জানা যায়, যখন জানা যায় তখন আমি বোধটা থাকে। ঠাকুর যেমন বলছেন, আমি মা কালীর দর্শন পেলাম, মা কালীকে জানলাম, ঠাকুর একবারও কিন্তু বলছেন না যে আমি ব্রহ্মকে জানলাম। ঠাকুর বারবার বলছেন, বোধে বোধ হয়, ব্রহ্মের অনুভূতি বলছেন, কিন্তু আমি ব্রহ্মকে জানলাম এই কথা কখনই বলছেন না। তার মানে ঈশ্বরকে যখন জানছেন, ঈশ্বর শব্দ ওই এক যখন আনছেন তখন কিন্তু এক থাকেন না, সব সময় দুই হয়। কারণ ঈশ্বরকে জানা মানেই, ঈশ্বর আছেন এবং তাঁকে একজন জানছে। সেইজন্য বেদান্তে counting সব সময় দুই থেকে শুরু হয়, অদ্বৈত বেদান্তে শূন্য বলে কিছু নেই, এক বলেও কিছু নেই, তাই সব সময় counting দুই থেকে শুরু হয়।

ঈশ্বরকে আমরা ভালো ভাবে না জানলেও আমাদের এই বোধটা আছে যে আমি ঈশ্বরকে জেনেছি। রামপ্রসাদের গানে, কমলাকান্তের গানে, মীরাবাঈয়ের ভজনে, সুরদাসের ভজনে ঈশ্বরের ভালোবাসার কথাই বলছেন। কিন্তু যেমনি আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে নামবে তখন এই ধরণের অভিব্যক্তি আসবে না। একটা সাধারণ অভিব্যক্তি আসে কিন্তু সেটা অন্য রকম, যেমন উপনিষদে বলছেন, *বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*, তিনি বলছেন আমি সেই পুরুষকে জেনেছি, যিনি সূর্য্যের মত দীপ্ত, সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকারের পারে। কিন্তু সেখানেও ঠিক ঠিক অদ্বৈত বেদান্তের অনুভূতির কথা বলছেন না। কিন্তু কেনোপনিষদে পুরোপুরি অদ্বৈত বেদান্তের কথা চলছে, সেইজন্য বলছেন ঈশ্বরের ইতি করা যায় না, কিন্তু জ্ঞান হয়, কারণ মন দিয়ে তাঁকে জানা যায়। যার মন যেমন তাঁকে সে সেই ভাবে দেখে। কিন্তু আত্মার যে জ্ঞান এটা পুরোপুরি বোধে বোধ হয়। তবে একটা জিনিস মন দিয়ে জানা যায়, আরেকটা জিনিসকে মন দিয়ে জানা যায় না, অথচ দুটোরই reality এক। আমরা এখানে মাইক্রোফোনকে দেখতে পাচ্ছি, সবাই সবাইকে দেখছি, এগুলোও ব্রহ্মেরই রূপ, তবে ছোট রূপ। ঈশ্বরকে কেউ জানছে, সেটাও ব্রহ্মেরই রূপ, কিন্তু ওটাই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ রূপ। ওর থেকে উপরে আর কিছু হয় না, তার সমতুল্য, সমকক্ষ আর কিছু হয় না। ওই জায়গাতে ছোট বড় বিচার চলে না, কিন্তু সেটাও ব্রহ্মের যে অনুভূতি তার থেকে আলাদা। কারণ মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যে ঈশ্বরের অনুভব করেন,

তিনি সেই স্মৃতিটা বহন করেন। যেমন ঠাকুর, তিন দিন নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় পড়ে আছেন, তারপর ওখান থেকে যখন নেমে আসছেন তখন তিনি মা মা করছেন। এটাই কেনোপনিষদের যুক্তি। তোমার বুদ্ধি দিয়ে যদি এই বোধ হয় আমি জেনেছি, তাহলে কিন্তু তুমি ব্রহ্মকে জাননি। কোন কারণে তোমার যদি অনুভূতি হয়ে থাকে, যদি তোমার জ্ঞান হয়ে থাকে, তাহলে তোমার হয়েছে। এত সহজে কিন্তু ছাড়বেন না, আরও যুক্তি চলবে।

আচার্য এখানে দুটো যুক্তি ব্যবহার করছেন, প্রথম যুক্তি হল তোমাকে মূলে যেতে হবে, যেখানে দুই সেটা কখনই মূল হতে পারে না। দ্বিতীয় যুক্তি হল, মন, ইন্দ্রিয় এদের সবাইর multiplicity আছে, সেইজন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে যে জিনিসকে জানা যায় সেটা কখনই মূল হতে পারে না। মনটাই যদি মূল না হয় তাহলে মূল যেটাকে ধরছে সেটা কি করে মূল হবে! মূল থেকে complexএর সৃষ্টি হয়, যেটা complex সেটা দিয়ে কখনই মূল সৃষ্টি হতে পারে না। এর আগের অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি, মন নিজেই complex, মন যেটাকে ধরছে সেটাকে আরও বেশি complex হতে হবে। তাহলে মন যদি বলে আমি মন দিয়ে এটা বুঝেছি, তাহলে তোমার তো পুরোটাই গোলমাল হয়ে গেল। তার মানে, চৈতন্য মনের নয়, শুধু তাই নয় মন ওই চৈতন্যকে কোন দিন ধরতেও পারে না, কারণ complex জিনিস কখনই মূলকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। Complex তার নিজের থেকে আরও বেশি যে complex তাকে গিয়ে ধরে। যেমন এক কিলো বাটখারা দিয়ে চল্লিশ কেজি চাল মাপা যাবে কিন্তু চল্লিশ কিলোর বাটখারা দিয়ে এক কিলো চাল কখনই মাপা যাবে না। বড় দিয়ে ছোটকে কখনই মাপা যায় না, ছোট দিয়েই মাপা যায়। মন নিজেই complex, তাহলে মন কাকে ধরবে? মনের থেকে আরও যে বেশি complex। তাহলে প্রথমেই এটা উড়ে যায় যে মন আত্মা নয়। দ্বিতীয় মন দিয়ে যদি আত্মাকে ধরা হয়, তাহলে তোমার ওই আত্মা কিন্তু গোলমেলে। এই দুটো যুক্তি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ভাবে চলতে থাকে। আচার্যের চেষ্টা হল এই ধারণাটা যেন আমাদের মনে গেঁথে যায়। এতক্ষণ যাবৎ আমরা যে কঠিন কঠিন মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করে এসেছি শুধু এই জিনিসটাকে ধারণা করার জন্য যে, যেখানেই দুই অর্থাৎ যেখানেই multiplicity থাকবে ওটা মূল হবে না। যেটা মূল কোন পরিস্থিতিতে সেটা দুই হবে না। মন সবার উপরে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মন নিজেই complex, আর complex জিনিস কখনই সহজকে ধরতে পারবে না, complex জিনিস সব সময় আরও complex জিনিসকে ধরতে পারবে। আচার্যও তাই বার বার বলছেন, বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত দুর্বোধ্য, যদি তথ্য জানতে চায় তাহলে দুটো কথা দিয়েই বলে দেওয়া যাবে। বলে দিলেই হল যে, ইন্দ্রিয় দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না, মন দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না, তথ্য জানা হয়ে গেল। কিন্তু যদি বুঝতে চায় complexity ঠিক কোথায়, তাহলে কিন্তু মনকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম করতে হবে।

মন ইন্দ্রিয়ের এদের কারুরই চেতনা নেই, আসল চেতনা আত্মার। আত্মার ওই চেতনা যখন মন ধরে নেয়, তখন মনকেই চৈতন্য বলে মনে হয়। আমার আমিত্ব মন দিয়ে চলে, তার মানে যদি আমি ঈশ্বরকেও জানতে চাই তাহলে আমাকে মন দিয়েই জানতে হবে। কারণ মন হল শেষ কথা, মনকে প্রশ্ন করা যাবে না। মনকে যদি প্রশ্ন করে দেওয়া হয় তাহলে আমার আমিত্বটাই উড়ে যাবে, তাহলে আমার ঈশ্বর জ্ঞান, সব রকম জ্ঞানই মিথ্যা হয়ে যাবে। মনকে কেউই প্রশ্ন করে না, পাশ্চাত্য দর্শনও করে না, হিন্দুরাও করে না, অদ্বৈত বেদান্ত কোন মতেই করে না, কারণ মন শেষ কথা। শুদ্ধ মন মানে, বেদান্তের দৃষ্টিতে যে মনে একটিও চিন্তার তরঙ্গ নেই। মনে একটি যদি চিন্তা থাকে সেটাই অশুদ্ধ মন। আমরা বলি ঠাকুরের বাবার মন অত্যন্ত শুদ্ধ পবিত্র ছিল, কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে সেটাও অশুদ্ধ মন। সত্ত্বগুণ যখন বাঁধে তখন জ্ঞান দিয়েই বাঁধে। জ্ঞানী কে? অজ্ঞানকে বুঝে নিয়ে যে সরিয়ে রেখেছেন। আমি জ্ঞানী, আমি এক পবিত্র আত্মা, এই আমিত্ব ভাব এটাই অশুদ্ধ ভাব। বেদান্তের দৃষ্টিতে পাপ যতটা খারাপ, পূণ্যটাও ততটাই খারাপ, তবে পাপটা আরও বেশি খারাপ কারণ ওটা তমোগুণের লক্ষণ, পূণ্য সত্ত্বগুণের লক্ষণ, কিন্তু বাঁধছে দুজনই। সেইজন্য চিত্তবৃত্তি, মনে যদি একটাও বৃত্তি থাকে সেই মন অশুদ্ধ মন।

এই যে বলছেন, একটা বৃত্তি থাকা মানেই মনটা অশুদ্ধ, তাহলে ঈশ্বরকে যখন জানছেন তখন কি হয়? তখন ওই এক ঈশ্বরের বোধ বা এক ঈশ্বর বৃত্তি ছাড়া আর কিছু থাকে না। ওই একটা বৃত্তি ছাড়া আর কিছু থাকে না, সেইজন্য ওটাকে বৃত্তি বলা যায় না। বৃত্তির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে পাঁচ রকমের বৃত্তি, প্রমাদ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, তাতে কিছু বৃত্তি হয় বাইরে থেকে আসতে হবে তা নাহলে ভেতর থেকে আসতে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের যে জ্ঞান এই জ্ঞান বাইরে থেকেও আসে না, ভেতর থেকেও আসে না। ওই পাঁচটি বৃত্তির বাইরে যে বৃত্তি হয় সেটা বৃত্তি নয়। তাই ঈশ্বরের যে জ্ঞান হয় সেটা বৃত্তি জ্ঞান নয়, তাই ওটা অশুদ্ধ মন নয়, শুদ্ধ মন। কিন্তু যখন অদ্বৈতে যায়, তোতাপুরী কপালে কাঁচ দিয়ে আঘাত করে যেটা ঠাকুরকে করলেন, তখন আমার ঈশ্বরের জ্ঞান হচ্ছে, আমি ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ, এই ভাবটাও চলে যাচ্ছে। তখন কি থাকছে কেউ জানে না। কিন্তু ওখান থেকে যখন নেমে আসবেন তখন ওই অবস্থার একটা আস্বাদ থেকে যায়, সেইজন্য মন তখন আছে কি নেই বলা অসম্ভব। এনারা এর উপমা দেন, মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় চলে যায়, নিদ্রা থেকে বেরিয়ে আসার পর একটা বোধ থেকে যায়, আমি জোর ঘুমিয়ে ছিলাম। গভীর নিদ্রায় মন কাজ করছে না, কিন্তু যখন গভীর নিদ্রা থেকে ফেরত আসছে তখন ওই স্মৃতিটা থাকছে। কেউ বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন তার হুঁশ আসে তখন সে বলে, আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে জানে না কতক্ষণ বেহুঁশ ছিল। তার মন কাজ করছে না, কিন্তু স্মৃতিটা তাকে জানিয়ে দিচ্ছে। অদ্বৈতের ওই অবস্থায় একই জিনিস হয়।

তাহলে কি অদ্বৈতের ওই বোধ ঘুমের মত? না, ঘুমের মতন নয়, কারণ মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় যায় বা বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন ফেরত আসে তখন সে যেমনটি ছিল তেমনটিই ফেরত আসে। কিন্তু মুর্খ যদি সমাধিতে যায় সে জ্ঞানী হয়ে সেই অবস্থা থেকে ফেরত আসে, এটাই একমাত্র তফাৎ। ঈশ্বর জ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞানে কি কোন তফাৎ আছে? খুব উচ্চস্তরে কোন তফাৎ নেই। সেইজন্য ঠাকুর বারবার বলছেন জ্ঞান আর ভক্তি এক। ঈশ্বর জ্ঞানে একটু আমিত্ব থেকে যায়, কিন্তু ওই আমিত্ব সত্ত্বগুণের আমিত্ব নয়, এই আমিত্ব ঈশ্বরের আমিত্ব। ঈশ্বর জ্ঞান শুদ্ধ মনেরই লক্ষণ, কিন্তু সমাধির অবস্থায় এই শুদ্ধ মনেরও লয় হয়ে যায়। এই দুটো জিনিসকে জেনে নিলে জীবনে অধ্যাত্ম তত্ত্বকে বোঝার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না, দুই কোন ভাবেই মৌলিক নয়, আর যৌগিককে দিয়ে মৌলিককে কখনই জানা যাবে না। ঠাকুর বারবার বলছেন, সরল না হলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। সরল মানে non-complex, ঈশ্বর হলেন সব থেকে সরল, সরলকে জানতে হলে আগে সরল হতে হবে।

আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত নিয়ে অনেক বড় বড় সন্ন্যাসীরাও ভুল ধারণা নিয়ে চলেন। শঙ্করাচার্য এত বড় অদ্বৈতী অথচ তিনি ভারতের চার প্রান্তে নিজের চারটে মঠ স্থাপন করে চারজন অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। আচার্য একজন অদ্বৈতবাদী, অদ্বৈত মানেই কোন রূপ থাকবে না, নাম থাকবে না, তাহলে কেন তিনি চারটে মঠে শক্তির স্থাপনা করলেন? দ্বিতীয়তঃ আচার্যের অদ্বৈত মত নিয়ে অনেককে বলতে দেখা যায়, এই যে তোমরা অদ্বৈত অদ্বৈত বলে যাচ্ছ, খাওয়ার সময় কি তোমাদের অদ্বৈত ভাব থাকে? যাঁরা আচার্যের ভাষ্যাদি খুব ভালো করে অধ্যয়ন করেন অদ্বৈতের বক্তব্যকে ভালো করে বিচার করেছেন তাঁরা বুঝতে পারেন, এনাদের এই ধারণার সবটাই ভুলভাল। অদ্বৈত কখনই একবারও বলছে না যে কেউ দেবী-দেবতা মানবে না, আর খাওয়া-দাওয়ার সাথে অদ্বৈতের কোন সম্পর্কই নেই। উপনিষদই একমাত্র অদ্বৈতের কথা বলেন, আর উপনিষদের একমাত্র আর একটাই উদ্দেশ্য, তা হল, তুমি কে এই বিচার কর, আগে তুমি কে এটাকে বোঝ। প্রথমে তোমার শরীরের বাইরে যা যা বস্তুর সাথে, বাড়ি গাড়ি সম্পত্তি যা কিছু আছে এগুলোর সাথে তোমার identificationকে কমাও। দ্বিতীয়, তোমার শরীরের প্রতি যে আসক্তি হয়ে আছে এটাকেও কমাও। এরপর ধীরে ধীরে আরও যখন উচ্চ অবস্থায় আসবে তখন মন থেকেও তোমাকে আলাদা করে নিতে হবে। শেষে তুমি চৈতন্যজ্যোতির সাথে এক হয়ে যাবে, এই চৈতন্যজ্যোতিই আছে, এর উপরে আর কিছু নেই।

যারা বলছে আমি জানি এগুলো মায়া, বন্ধন ছাড়া কিছু নয় কিন্তু তাও আমি ছাড়তে পারছি না, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আচার্য শঙ্কর এদেরকেও জ্ঞানী বলছেন। যাঁরা বলছেন, জন্মজন্মান্তরের আমার এমন এমন কর্ম রয়েছে যে আমি এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না, তাঁরা তো জ্ঞানী হয়ে গেলেন। এরপর সংস্কারগুলো তাকে অনেক নাচাবে, কিন্তু শেষে সে সব কিছু থেকে ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। উপনিষদ একবারও বলছে না যে তুমি কার উপাসনা করবে। হিন্দুদের পুরাণাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট করে বলে দেয়, তুমি এই দেবতা, সেই দেবতার উপাসনা করবে। শিবপুরাণে বলবে শিব ছাড়া আর কিছু নেই, শিবের পূজা করলে তোমার সব হয়ে যাবে। ভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকেই পূজা করতে হবে। রামায়ণ এমন ভাবে চলে যে শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া আর কেই নেই যে যাঁর পূজা করা যেতে পারে। কিন্তু তার মধ্যেও থেকে থেকে ওনারাও বলেন বিষ্ণু শ্রেষ্ঠতম আর ব্রহ্মা বা শিব এনারা যে তাঁর থেকে নীচে ঠিক এই দৃষ্টিতে বলেন না, বলবেন শিব ব্রহ্মাও ওখান থেকেই বেরিয়েছেন। এভাবে বললেও ওই ভাবটা যায় না, তোমাকে এটাই করতে হবে। যেমন বৈষ্ণবরা বলে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নেই, শাক্তরাও ওটাই বলে কালী ছাড়া গতি নেই। এই ভাব আসলে ইসলামের ভাব, হিন্দু ভাব নয়। উপনিষদ কিন্তু বলছে না যে ব্রহ্ম ছাড়া তোমার গতি নেই। এনাদের খুব সহজ বক্তব্য, তোমার দুঃখ-কষ্ট আছে কিনা? হ্যাঁ আছে। তার কারণ তুমি নিজেকে এই এই মনে করছ, এবার তুমি এখান থেকে বেরিয়ে এসো। তুমি নিজেকে যা মনে করে বসে আছ বাস্তবে তুমি তা নও। তোমার বাস্তবকে জেনে গেলে স্বাভাবিক ভাবে নীচের জিনিসগুলো খসে পড়ে যাবে। স্বামীজীর বই পড়ে, দুটো উপনিষদের ক্লাশ করে *অহং ব্রহ্মাস্মি*, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, এই কথাগুলো সবাই জানে, কিন্তু সাধনা হল ওই সত্যের উপর অবস্থান করা। সমস্যা হল টিয়া পাখিকে বেড়াল ধরলে তার রাম রাম বুলির বদলে ট্যাঁ ট্যাঁ বেরোয়। ট্যাঁ ট্যাঁ বন্ধ করার দুটি পথ, বাস্তবে দেখতে হবে আমি সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম, শুদ্ধ আত্মা। দ্বিতীয় বিচার করে করে নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে চলে গেল যেখানে তার আর কোন সংশয় নেই। তখন বেড়ালে ধরলেও তার আর ট্যাঁ ট্যাঁ বেরোবে না। পতনের সম্ভবনা তখনও থাকে, কিন্তু মনের জগতে যারা বাস করছে তাদের ক্ষেত্রে এটাই সর্বোচ্চ। যাই হোক পরের মন্ত্রে বলছেন –

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।।২২/৩।।

(শ্রুতি বলছেন – ব্রহ্ম যাঁর নিকট অবিদিত (বলে নিশ্চিত) তাঁর কাছেই তিনি বিদিত; যাঁর কাছে বিদিত (বলে নিশ্চিত) তিনি জানেন না। যাঁরা সম্যক্ জ্ঞানবান তাঁরা ব্রহ্মকে জ্ঞাত বলে মনে করেন না; আর যাঁরা সম্যক্ জ্ঞানবান নন তাঁরাই মনে করেন যে ব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েছেন।)

এতক্ষণ গুরু আর শিষ্যের সংবাদ চলছিল, ওখান থেকে এখন সরে এসেছেন। আলোচনার সমাপ্তি টানছেন এই বলে যে, *যস্যামতং তস্য মতং*, যে ব্রহ্মকে জানে আসলে সে ব্রহ্মকে জানে না। কেন জানে না? কারণ যেমনি বলছে আমি জানছি, তার মানে আমি বুদ্ধির এলাকায় টেনে নিয়ে এসেছি। এরই এতক্ষণ ব্যাখ্যা করা হল। বুদ্ধির এলাকায় যেটাই জানা হয় সেটা কোন ভাবেই আত্মা হতে পারবে না। আর যে বলছে আমি জানি না, সেই জানে। *মতং* মানে ভালো ভাবে ধরে নেওয়া আর *বিজ্ঞাত* মানে জানা। আচার্য এখানে বলতে চাইছেন, সাধারণ ভাবে তিন ধরণের লোক হয়, প্রথম হল যাদের মধ্যে আত্মার ব্যাপারে কোন আগ্রহই হয় না, উপনিষদ এদের কথা বলছেন না। এই যে বলছেন, যে বলছে আমি জানি আসলে সে জানে না, আর যে বলছে আমি জানি না, সেই জানে। তার মানে ফুটপাথের যে কাঙালী ভিখারী সেও তো বলবে যে আত্মার ব্যাপারে আমি জানি না, তাহলে সে জানে? না, এদেরকে এখানে বিবেচনার মধ্যেই আনা হচ্ছে না।

দ্বিতীয় হল, কিছু কিছু দার্শনিক আছেন তাঁরা আত্মাকে বুদ্ধির সাথে যোগ করেন। এনাদের মধ্যে খুব নামকরা হলেন নৈয়ায়িক আর বৈশাষিক। ন্যায়, বৈশাষিক ভারতবর্ষের খুব নামকরা দর্শন। তাঁরা বলেন আত্মার সাথে মন বুদ্ধির যখন সংযোগ হয় তখন চৈতন্যের জন্ম হয়। তার মানে, আত্মা নিজে

চৈতন্য নয় কিন্তু আত্মার বুদ্ধির সাথে সংযোগ হওয়ার পর আত্মার চৈতন্য হয়। এগুলো খুব সূক্ষ্ম যুক্তি, ন্যায় পড়লে মনে হবে ওরাই ঠিক বলছেন। আবার বেদান্ত পড়ার সময় মনে হবে বেদান্তই ঠিক বলছে। তারের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে, এটাকে এমনিতে জানার কোন পথ নেই। কিন্তু যেমনি টিউব লাইটের গ্যাসের মাঝখান দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে টিউব লাইট জ্বলে উঠছে। তখন তো ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না, কিন্তু ওনাদের যুক্তি কিছুটা এই ধরণের। আত্মার নিজস্ব কোন চৈতন্য নেই, যখনই আত্মার বুদ্ধির সাথে সংযোগ হয় তখনই চৈতন্যের জন্ম হয়। সেইজন্য ওনারা বুদ্ধিকেই আত্মা মনে করেন, কারণ বুদ্ধি ছাড়া চৈতন্যকে জানার কোন পথ নেই। আচার্য এই জায়গায় উপনিষদের সাহায্যে এই মতকে খণ্ডন করছেন। আচার্য বলছেন, যাদের মনে হয় আমি এটাকে ভালো ভাবে জানি, কারণ বুদ্ধিকে আমরা ভালো ভাবে জানি, এটা কিন্তু জানা নয়, তারা আত্মাকে জানে না। যদি কেউ বলে আমি জানি না, এই জানি না বলতে দুই রকম হয়। একটা হয় একেবারে মূঢ় অজ্ঞানী, এদের কথা এখানে আনাই হচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা বলেন, আমি জানি কিন্তু যে অর্থে জানা সেই অর্থে নয়। এনারাই ঠিক ঠিক ব্রহ্মকে জানেন।

বিশেষণ আর বিশেষ্য এক, শক্তি আর শক্তিমান এক, আগুন আর তার দাহিকা শক্তি এক। যেমনি আত্মার উপর কোন বিশেষণ লাগান হল, আত্মা কিন্তু সেটাই হয়ে যাবে। তাহলে আত্মাকে যে নির্বিশেষ বলছে, কোন বৈশিষ্ট্য নেই, আত্মা খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছেন। আত্মা অনন্ত, এটাও আত্মার উপর একটা বিশেষণ চেপে গেল। আমাদের শাস্ত্রে আত্মার ব্যাপারে যা যা কথা বলা হয় তাতে আত্মা খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা সব সময় সবিশেষ দেখি। ঈশ্বরকে আমরা দেখি তিনি কৃপাময়, করুণাময়, তিনি ন্যায়পরায়ণ, তিনি দয়াবান, যত খুশি গুণ দেওয়া হোক কোন দোষ নেই। পরে অনেক সমস্যা আসবে, এর সাথে ওকে মেলানো যাবে না ঠিকই, সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু আত্মার উপর করা যাবে না। সেইজন্য আত্মার উপর নেতি নেতি করে চলতে হয়। আত্মার উপর কোন বিশেষণ এসে গেলে আত্মা খণ্ডিত হয়ে যাবেন, উপনিষদ বলতে চাইছেন আত্মা খণ্ডিত নয়। তাহলে আত্মা কি? তুমি বুঝে নাও। কোন বিশেষণ দেওয়া যাবে না, খুব কাছাকাছা যেটা দেওয়া যাতে পারে তা হল নেতি নেতি করে, বাকিটা তোমাকে নিজেই বুঝে নিতে হবে।

আগে যেমন বলা হয়েছিল, বিদিত থেকে আলাদা আর অবিদিতের উপরে। সেটাই আবার বলছেন, ব্রহ্মের ব্যাপারে যাঁরা ঠিক ঠিক জানেন না, তাঁদের সমস্যা হল ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি এগুলোর উপর তাঁরা আত্মভাব করে নেন। যাদের এই রকম আত্মভাব তারাই অজ্ঞানী। এখানে তাদেরই কথা বলা হচ্ছে, তারা আত্মাকে জানে না। আত্মাকে কারা জানে না? যাদেরই এই বোধ আছে আমি জানি। আমাদের এই বোধটা আছে যে আমি জানি। আমরা অনেক সময় অপরকে বলি, তুমি আমাকে জানো না! যে এই কথা বলছে তাহলে নিশ্চয় সে নিজেকে জানে। সে নিজেকে কিভাবে জানে? আমি অমুক লোক, আমার এই উপাধি, আমার এই এই ক্ষমতা, আমি তোমার এই এই ক্ষতি করতে পারি। তার মানে সে আত্মাকে জানে না। তখন সে বলল, না না আমি খুব শান্ত নম্র, আমি সবাইকে শ্রদ্ধা করি। তার মানে সে নিজের আমিত্বকে জানে, আমি শান্ত, নম্র, শ্রদ্ধাবান। তাহলে তার আত্মজ্ঞানে গোলমাল আছে। কারণ সে তার মনের যে গুণগুলো আছে তার সাথে আত্মভাব করছে। তার যে আমিত্ব তার একাত্ম মনের কয়েকটি গুণের সাথে, গুণ আর বস্তু এক হয়, দুটো আলাদা কিছু নয়। আমি শ্রদ্ধাবান, এর উপর যখন জোর দিচ্ছে তখন কিন্তু সে নিজেকে জেনে গেল। নিজেকে যখন জেনে গেল, তার মানে তার আত্মজ্ঞান হয়নি।

এতক্ষণ আচার্য-শিষ্যের সংবাদ চলছিল। উপনিষদের মূল ভাবটাই হল শিষ্য গুরুর কাছে গিয়ে বসে, এরপর দুজনের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে পুরো উপনিষদ চলতে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আখ্যায়িকার মাধ্যমেও নিয়ে যাওয়া হয়, যেমন কঠোপনিষদের বক্তব্য আখ্যায়িকার মাধ্যমে রাখা হয়েছে। একটা কোন সংবাদ বা আখ্যায়িকাতে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গা থেকে উপনিষদ তার নিজের

বক্তব্যকে পেশ করতে শুরু করেন। কথোপকথনে কোথাও পরিষ্কার বলে দেওয়া হয় এই আচার্য, আবার পরিষ্কার না হলেও বোঝা যায় যে আচার্য বলছেন, যেমন ঈশাবাস্যোপনিষদে বলে দিচ্ছেন এই রকমটি করা উচিৎ, তার মানেই আচার্য বা গুরু শিষ্যকে এই কথাগুলো বলছেন। তিন নম্বর মন্ত্র থেকে উপনিষদ নিজেই তার বক্তব্য রাখছেন, ওটারই পুনরাবৃত্তি চলছে চার নম্বর মন্ত্রে –

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।।২/৪।।

(যখন বুদ্ধি-বৃত্তিসমূহের আত্মরূপে ব্রহ্ম বিদিত হন, তখনই প্রকৃত জ্ঞান হল, কেন না উক্ত জ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়। কেবল আত্মার শরণ নিলেই অমৃতত্ব লাভের যোগ্যতা হয় (অন্য রূপে হয় না); এই জন্যই আত্মবিদ্যার ফলে মুক্তিলাভ ঘটে।)

যখন বুদ্ধি বৃত্তি সমূহে আত্মরূপে ব্রহ্ম বিদিত হন তখনই প্রকৃত জ্ঞান হয়। প্রকৃত জ্ঞান কখন হয়? যখন বুদ্ধি বৃত্তি সমূহ, তার মানে একটা বুদ্ধি বৃত্তি নয়, সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তির কথা বলছেন, এই সমূহে যখন ব্রহ্মকে জানা হয় অর্থাৎ যত বুদ্ধি বৃত্তি হচ্ছে তার পেছনে সেই ব্রহ্ম, সেটাকেই বলে প্রকৃত জ্ঞান।

চৈতন্যকে যদি বুঝতে হয় তাহলে বেদান্ত বাদে আমরা তিনটে মত নিতে পারি। প্রথমটা খুবই সাধারণ যে ধারণা সবাই করে থাকে, বুদ্ধির কার্যটাই চেতনা, বিজ্ঞানও যাকে চেতনা রূপে দেখে, সাধারণ মানুষও বুদ্ধিকেই চৈতন্য রূপে দেখে। আমাদের মস্তিষ্কে যে কোশিকা গুলো রয়েছে, তাদের যে কাজ, সেখানে যেসব ক্রিয়াকলাপ হয়ে যে বুদ্ধি বৃত্তি তৈরী হয় এই বুদ্ধি বৃত্তিকেই চেতনা রূপে সবাই গ্রহণ করে থাকে। দ্বিতীয় ধারণাটা খুবই মজার, হিন্দুদের ছয়টি দর্শন, ন্যায়, বৈষাশিক, যোগ, সাংখ্য, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা, এই ছয়টি দর্শন চৈতন্যকে বিভিন্ন ভাবে দেখেন। চৈতন্যের ব্যাপারে ন্যয় ও বৈশাষিকদের একটা অদ্ভূত ধারণা আছে, আগেও এর উপর আলোচনা হয়েছে, তাঁদের মতে আত্মা নির্বিকার, আত্মা যখন বুদ্ধির সাথে যুক্ত হয় তখনই চৈতন্যের জন্ম হয়। তার মানে, আত্মার মধ্যে চেতনা নেই, মনের মধ্যেও চেতনা নেই কিন্তু আত্মা ও মনের যখন সংযোগ হয় তখনই চৈতন্যের জন্ম হয়। যেমন টিউব লাইট, ইলেক্ট্রিসিটিতে আলো নেই আর টিউব লাইটেও আলো নেই, কিন্তু যখন ইলেক্ট্রিসিট টিউবের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন আলোর জন্ম হয়, চৈতন্যও এই রকম।

ন্যায় ও বৈশাষিকদের চৈতন্যের এই ধারণা সাংখ্য দর্শন থেকে আসতে পারে। সাংখ্য দর্শনে দুটো সত্তাকে নেওয়া হয়, পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ মানে চৈতন্য, অর্থাৎ আত্মা আর প্রকৃতি হল জড় সমূহ। অদ্বৈত বেদান্তে এক বলে কিছু হয় না, তিনি নির্বিকার, নির্বিশেষ, তাঁকে জানার কোন পথ নেই। সাংখ্যের পুরুষ অনেকটা এই রকম। তিনি নির্বিকার, নির্বিশেষ, তাঁকে জানার কোন পথ নেই, তাঁকে জানারও কেউ নেই। কিন্তু সেখান থেকেই তাঁদের একটা বিচিত্র ধারণার জন্ম হয়, পুরুষ যতই নির্বিকার হন কিন্তু যখনই প্রকৃতির কাছে আসেন, প্রকৃতি এমনিতে জড় সেই প্রকৃতিই তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখনই একটা বিচিত্র জিনিস হয়ে যায়, পুরুষের আলো প্রকৃতি নিয়ে নেয় আর প্রকৃতির সাথে পুরুষ নিজেকে জুড়ে নিয়ে নিজে জড়ের মত আচরণ করে, কিন্তু জুড়ে নেওয়ার কথা নয়। এরপর সৃষ্টি চলতে শুরু করে। তার মানে প্রত্যেক আত্মা বা পুরুষ প্রকৃতির সাথে জুড়ে আছে আর প্রকৃতির লীলা খেলা দেখছে। সাংখ্যের এই মতবাদ থেকে প্রভাবিত হয়েই ন্যায় বৈশাষিকরা বলছে আত্মা যখন বুদ্ধির সাথে যুক্ত হয় তখনই চৈতন্যের জন্ম হয়। ন্যায় বৈশিষিকরা প্রকৃতি না বলে মন বা বুদ্ধি বলছে। এদের বক্তব্য হল বিভিন্ন পদার্থের মত মনও একটা পদার্থ, মন আর আত্মা যখন জুড়ে যায় তখনই চৈতন্যের জন্ম হয়। তাঁদের কাছে চেতনা মানেই মন আর আত্মার সংযোগ। চৈতন্যের ব্যাপারে এটাই দ্বিতীয় মত।

তৃতীয় হল বৌদ্ধদের মত, এর নাম ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে বলে, একটা চেতনার ধারা যেন চলছে, যেমন গঙ্গা ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। গঙ্গা যে বয়ে যাচ্ছে তাতে আমরা কি করে বলব যে এটা গঙ্গা? কারণ ক্রমাগত তার মধ্য দিয়ে জল বয়ে চলেছে, আর যে কোন জায়গাতেই দাঁড়াই না কেন ওখানেও জল ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে, অথচ পুরো জিনিসটার একটাই প্রতীতি

হচ্ছে, সেই এক গঙ্গা নদী কিন্তু তার জল সব সময় পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। চেতনাও ঠিক এই রকমই হয়, একটা চেতনা আরেকটা চেতনাকে জন্ম দেয়, সেই চেতনা আরেকটা চেতনাকে জন্ম দেয়, চেতনার একটা স্রোত যেন বয়ে চলেছে, সিঙ্গল বলে কিছু নেই। এই যে চেতনার স্রোত এটাই চৈতন্য। বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন পুরোপুরি এই সিদ্ধান্তের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

বেদান্তের মতে চৈতন্যের ব্যাপারে এই তিনটে সিদ্ধান্তই ভুল। বেদান্ত প্রথম থেকে যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছে যে ইন্দ্রিয় যে জিনিসটাকে বোধ করছে এটা কখনই চৈতন্য হতে পারে না। এর আগেও বলা হয়েছিল যে, যে জায়গাতে একটা চেতনা এসে যাচ্ছে, আমি এই জিনিসটাকে জানি, সেটাও চৈতন্য হতে পারে না। এগুলো আমরা আগে আগে আলোচনা করে এসেছি। এবার উপনিষদ এটাকে আরও ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন, কারণ এর পেছনে যুক্তিতর্ক যা ছিল সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে। একটা খুব মূল যুক্তিতে বলা হয়েছিল, যেটা মৌলিক, যার কোন পরিবর্তন নেই অথচ আছে, যেটাকে আধার করে সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে সেটাই আত্মা।

এই মন্ত্রে এবার ওই মূল যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। প্রতিনিয়ত আমাদের যত রকমের বোধ হচ্ছে, বস্তুর বোধ, ব্যক্তির বোধ, সুখ-দুঃখের বোধ আর একই সাথে অনেক রকমের বোধ হচ্ছে, বলছেন *প্রতিবোধবিদিতং বিদিতং*, যত রকমের আমাদের বোধ হচ্ছে, যে জিনিসেরই জ্ঞান হচ্ছে, যেটার ব্যাপারে আমাদের চেতনা হচ্ছে, যেটারই ব্যাপারে আমি জানছি, প্রত্যেকটি বোধ যার উপর দাঁড়িয়ে হচ্ছে সেটাই ব্রহ্ম। ভারতের বিবেকানন্দ গ্রন্থের একটি লেকচারে স্বামীজী এক জায়গায় সমস্ত সিদ্ধান্ত গুলিকে এনে বলছেন, বৌদ্ধরা বলে stream of consciousness, কিন্তু বেদান্ত এক ধাপ এগিয়ে যায়। এই কথা বলে তিনি বলছেন, stream of consciousnessএ যে পরিবর্তন হয়, ওই পরিবর্তনের একটা আধার থাকতে হবে, আধার না থাকলে পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তন কোন কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে হয়। যুক্তিটা এখানে খুবই সরল। আসলে যাঁরা এই জিনিসগুলো লিখে গেছেন তাঁদের বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম যে যখন যেটা পড়ব মনে হবে এটাই ঠিক বলছে। তাঁরা আমাদের বোকা বানাচ্ছেন তা নয়, তাঁরা ওটাকে বিশ্বাস করেন বলেই বলছেন। পরিবর্তন কোন কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই হবে, constant যদি না থাকে, তাহলে পরিবর্তনের যে পরিবর্তন হচ্ছে এই বোধটা কোথা থেকে আসবে? তাহলে বৌদ্ধরা কি ভুল বলছেন? ওনাদেরও এর বিরুদ্ধে যুক্তি আছে, অত সহজে ছেড়ে দেন না। অথচ এই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদকেই আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে একেবারে তুলোধুনো করে রেখেছেন। ওখানে তিনি উপনিষদ থেকে কিছু নিয়ে আসছেন না, শুধু অকাট্য যুক্তি দিয়ে চলে গেছেন। যখন বলছে একটা জিনিসের পরিবর্তন হল, এটাকে তখন কেউ দেখছে বলেই বলছে, কাউকে আধার করেই পরিবর্তনটা হচ্ছে। থিয়োরী অফ রিলেটেভিটিতে ঠিক এই জিনিসটাই নিয়ে আসছেন। পরিবর্তন যখন বলছি তখন আমরা একটাকে standard মনে করে অপরটাকে মনে করছি পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু তখন এটা আমরা খেয়াল করছি না যে, এর তুলনায় এটারও পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন একটা প্ল্যাটফরম আর ট্রেন, প্ল্যাটফরম মনে করছে ট্রেন মুভ করছে, ট্রেন মনে করছে প্ল্যাটফরম মুভ করছে। দুটো ট্রেন মুখোমুখি থাকলে, একটা ট্রেন ছাড়লে অপর ট্রেনের যাত্রীরা মনে করে তাদের ট্রেনটা ছাড়ল।

সেখান থেকে চিন্তা ও পরীক্ষা নিরিক্ষা করে করে আইনস্টাইন দেখলেন আলোর গতি সব সময় সমান থাকে। আলোর গতি যদি সমান থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটা জিনিস যদি তার পাশ দিয়ে খুব বেগে চলে যায় তখন দেখা যাবে যে এই জিনিসটার গতি, আলোর যে গতি ততটাই হতে হবে, কিন্তু তা হয় না। আইনস্টাইন এটাকে চিন্তা করে করে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন যেটা লোকেদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। আজকে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত ছাড়া পদার্থ বিজ্ঞান কল্পনাই করা যায় না। এই ধরণের কিছু ব্যাপার এই জায়গাতে আসছে। পরিবর্তন যখন বলা হচ্ছে তখন এটা ধরেই নিতে হবে একটা কিছু স্থির আছে। আমরা সবাই জানি পৃথিবী গোল, এই গোলাকার পৃথিবীর কেন্দ্রটা কোথায়? কোথাও নেই, আমি আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ওটাই কেন্দ্র। যদি গ্লোবের দিক দিয়ে দেখা

হয়, আসলে গ্লোব ফিক্সড হয়ে থাকে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে পুরো পৃথিবীটা স্লোপ করছে, আর আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে স্লোপ করছে। আকাশের দিকে যদি তাকাই তখন দেখা যাবে আমাকে কেন্দ্র করে আকশ স্লোপ হয়ে আছে। যে আমার দশ কিলোমিটার দূরে আছে সে বলবে, তোমাকে নয় আমাকে কেন্দ্র করে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্লোপড্ হয়ে আছে। যখন আমি চলছি তখন আমাকে কেন্দ্র করে ওই স্লোপটা চলতে শুরু করেছে। পৃথিবীর স্লোপও আমাকে কেন্দ্র করে চলছে আর আকাশের স্লোপও আমাকে কেন্দ্র করে চলছে। সেখান থেকে মানুষ মনে করে আমিই হলাম এই সৃষ্টির কেন্দ্র। আমি চলছি, এই পুরো জিনিসটাকে যদি পিকচারে নেওয়া হয়, আমার চেতনা লাগাতার ভাবে যে একটা stream যাচ্ছে, এই stream of consciousnessটাই সত্য এর নীচে আর কিছু নেই।

আগের আগের মন্ত্রে ওনারা যেসব যুক্তি নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা হল। এবার বলছেন, তোমার যে প্রত্যেকটি বোধ, আর এই বোধ ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে, আমরা এই মাইক্রোফোন দেখছি, কথা শুনছি, একে তাকে দেখছি, এই যে ক্রমাগত বোধ হয়ে চলেছে, এই প্রত্যেকটি বোধের যে আধার সেটাই আত্মা। মানুষ যখন এই জিনিসটাকেই উপলব্ধি করে নেয়, আসল আত্মাটা কি জেনে নেয় তখন যে জেনে যায় যে ওই যে বোধ হচ্ছে ওটা আত্মা নয়। তার মানে আত্মা আর মনের যে সংযোগ, যেখানে বোধের জন্ম, সেটাও আত্মা নয়। বোধগুলো যে পর পর পাল্টাচ্ছে সেটাও আত্মা নয়, বরঞ্চ প্রত্যেকটি বোধের যে আধার, এই আধারটাই আত্মা। এই জিনিসটার বোধ হয়ে গেলে মানুষ অমর হয়ে যায়, তাছাড়া মানুষ অমর হয় না।

এখানে একটা জিনিসকে বোঝার আছে, এই জগতে যা কিছুর পরিবর্তন হয়, বস্তুর পরিবর্তন হোক, চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হোক, কথাবার্তার পরিবর্তন হোক, সব কিছুর পরিবর্তনের যিনি আধার তিনিই আত্মা। ওই আত্মাকে জানা, আত্মার সাথে নিজেকে এক করে দেওয়া অর্থাৎ আমিই সেই, এই বোধ যখন হয়ে যায় তখনই মানুষ অমর হয়, তখনই মানুষের মুক্তি হয়, এছাড়া অমর বা মুক্তি হওয়া যায় না। ভক্তিমার্গের সাধকরা এই জায়গায় এসে জিনিসটাকে পাল্টে দেন। তাঁরা বলেন, আমি অত কিছু জানি না, আমি জানি আমি আছি আর আমার ইষ্ট আছেন। ভক্তিমার্গের সাধকরা এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে সাধনা করতে করতে এমন জায়গায় চলে যান যেখানে তাঁর অন্য কিছুর বোধ থাকে না, যত রকমের বোধ আছে সব বোধ থেমে যায়। ভক্তিমার্গের সাধক বলেন, সব বোধ থেমে গিয়ে যা থাকে, সেটা যাই হোক না কেন, সেটাই ইষ্ট। ভক্ত মুক্তির বদলে ঈশ্বরের ভালোবাসা চায়, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায়। কিন্তু তিনি যদি চান তাহলে তিনি তাঁর ভক্তকে মুক্তিও দিয়ে দেন। কারণ এই যে প্রতীতি বলা হচ্ছে, তিনিই ঈশ্বর রূপে প্রতীত হন, তিনিই আবার কৃপা করেন, করুণা করেন, কারণ তিনি চৈতন্যময় কিনা। ভক্তিমার্গের পথিকরা তাই বলেন তিনি চাইলে মুক্তিও দিয়ে দেন।

আমরা যেভাবে ইষ্টের ধারণা নিয়ে চলছি, উপনিষদের কাছে এই ধারণা জানা নেই। গীতা ও মহাভারতে ইষ্টের ধারণা ধীরে ধীরে আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল আর পুরাণাদিতে তো রীতিমত জ্ঞান আর ভক্তিকে সমন্বয় করা হয়েছে। যাঁরা ভক্ত তাঁরা যখন সব কিছু ত্যাগ করেন, ত্যাগের আবার দুটি পথ। ইষ্টের প্রতি ভক্তের এমন ভালোবাসা যে বাকি সব কিছু পড়ে থেকে যায়। দ্বিতীয় বিচার করে করে, এর মধ্যে আমি আমার ইষ্টকে দেখছি না, আমি ঈশ্বরকে একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই দেখছি, তখনও বাকি সব কিছু খসে যায়। তখন তিনি চাইলে ব্রহ্মজ্ঞানটাও দিয়ে দেন। ঠাকুর দুটো ত্যাগের কথাই বলছেন, তিনি চাইলে মুক্তি দিতেও পারেন। কিন্তু আবার পার্বতীর মুখে বলছেন, পার্বতী তাঁর পিতাকে বলছেন, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও তাহলে সাধুসঙ্গ কর। যেমন তেমন সাধু না, একেবারে কাঠখোট্টা উপনিষদের সন্ন্যাসী সাধু। আগেকার দিনে হরিদ্বারের দিকে উপনিষদের সাধু যাঁরা ছিলেন তাঁর বুঝতেন না ইষ্ট জিনিসটা কি। ওনারা ইষ্টের ধারণা মানা তো দূরের কথা, শুনবেনই না, কারণ উপনিষদের মত এক রকম। কিন্তু পরের দিকে গীতা জ্ঞান আর ভক্তি সমন্বয় করে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে। পরের দিকের ঋষিরা ও অবতার পুরুষরা জ্ঞান আর ভক্তিকে সমান ভাবে নিয়ে চলেছেন।

আত্মনা বিন্দতে বীর্যং, আত্মা দিয়ে সে শক্তি পায় আর *বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্,* আত্মজ্ঞানের বিদ্যা দিয়ে মানুষ অমৃতত্ত্ব লাভ করে। তার মানে বলতে চাইছেন আত্মা আর আত্মজ্ঞান এই দুটোই প্রধান। যখন তুমি জানতে পারবে সমস্ত রকমের বোধ প্রতীতি যা হচ্ছে, যোগশাস্ত্রে যাকে বৃত্তি বলছেন, যত রকমের বৃত্তিজ্ঞান হতে পারে তার যে আধার, এটাই আত্মা। যোগশাস্ত্রেও ঠিক এই কথাই বলছেন, তাঁরা বলছেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেলে কি হবে? *তদাদ্রষ্টু স্বরূপেবস্থানম্,* তখন যিনি দ্রষ্টা তিনি স্বরূপে অবস্থান করবেন। স্বরূপটা কি? যোগশাস্ত্র ওখানে পরিষ্কার করে বলছেন না, যদিও শেষের দিকে বলবেন। স্বরূপ এটাই, *প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে,* ঐ স্বরূপ, যেখানে বৃত্তি নিরোধ হয়ে যায়। এখানে নিরোধ করার কথা বলছেন, সমস্ত রকমের বোধ্য প্রতীতি, যেখানে তোমার বোধ হচ্ছে তার যে প্রতীতি, সেটাকে যখন ধরতে পারবে জিনিসটা কি, আর সেটার সাথে নিজেকে যখন এক মনে করবে তখন তোমার অমৃতত্ব লাভ হয়ে যাবে। খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ইন্দ্রিয় দিয়ে মনে আমাদের যত রকমের inputs যাচ্ছে বা মনের ভেতর দিয়ে যা কিছু বোধ হচ্ছে, যেখানে মনের প্রতীতি হচ্ছে, জিনিসটাকে আমি জানতে পারছি বা বুঝতে পারছি, এই সমস্ত প্রতীতির যে আধার সেটাই আত্মা। এই জিনিসটাকে যদি কেউ জেনে নেয়, বুঝে নেয়, অবস্থিত হয়ে যায়, একমাত্র তারই মুক্তি হয়, তার বাইরে আর কারুর হয় না। পরের মন্ত্রেই বলবেন, এই জ্ঞান না হলে কোন দিন মুক্তি হবে না।

সমস্ত প্রতীতি যাঁর বিষয়। আমাদের সমস্যা হল যখন কোন প্রতীতি হয়, যেমন এই গ্লাশ দেখছি, গ্লাশের জ্ঞান হল, আমি মনে করছি আমি জানলাম, এই জ্ঞান আমার হল। ন্যায় বৈশাষিকদের মতে এই বোধ হওয়াটা হল আত্মা ও মনের সংযোগ। তাদের মতে প্রতীতি মানে আত্মা আর মনের সংযোগ, বৌদ্ধদের মতে এটা হল ক্ষণিক বিজ্ঞান। ঋষিরা বলবেন, এটা তা নয়, এই যে প্রতীতি হচ্ছে এটাও একটা বিষয়। কার বিষয়? আত্মার বিষয়। কিন্তু আমাদের কাছে প্রতীতি মানে শেষ কথা। এই যে গ্লাশকে আমি জানলাম, আমরা মনে করছি, গ্লাশটা বিষয় আর আমি বিষয়ী, আমার বুদ্ধিটা বিষয়ী যে গ্লাশকে বিষয় করে নিয়েছে। উপনিষদ বলছেন, তা নয়। তোমার যে প্রতীতি হচ্ছে, এই যে তোমার বোধ হচ্ছে আমি গ্লাশকে দেখছি, ওই বোধেরও যিনি বিষয়ী তিনিই আত্মা। আমি জানছি, এই যে তোমার বোধ হয়ে গেল আমি জানলাম, এটাও কিন্তু বিষয়, এই বিষয়ের বিষয়ী হলেন আত্মা। আগে যার জন্য বলছেন *যস্যামতং তস্য মতং,* যদি কেউ বলে আমার জ্ঞান হল, যখনই বলছি আমার জ্ঞান, তখন এটা প্রতীতি হল, প্রতীতি মানেই ওটা বিষয়। এই জিনিসটাকে ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। যে বলছে আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, আমি ঈশ্বরকে জানি, এটাও কিন্তু প্রতীতি। তার মানেই তোমার ঈশ্বর জ্ঞান হয়নি। কারণ ওটা বিষয় হয়ে গেছে। এই বিষয়ই যখন একেবারে সূক্ষ্মতম স্তরে চলে গেছে, শুধু জ্ঞানের আভাসটুকু আছে, তখনও ওটা প্রতীতি হচ্ছে। ওই প্রতীতি যাঁর হয় তিনিই আত্মা। ঠাকুর কথামৃতে পদে পদে এক কথাই বলছেন, ওইখানে মূক হয়ে যায়। মূক হয়ে যাওয়া মানে, ওখানে আর কোন প্রতীতি হবে না। সম্পূর্ণ প্রতীতির যিনি সাক্ষী, যিনি চিৎ শক্তির স্বরূপ মাত্র, সেখানে কোন বোধ বলে কিছু থাকে না। ওই আত্মা যদিও তিনি চৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু ওই যে প্রতীতি গুলো হয় সেটা দিয়ে লক্ষিত হয়, আমাদের মনে হয় যেন সেটা সেই। বলছেন ওই অন্তরাত্মাকে জানার অন্য কোন পথ নেই, একটাই পথ। সমস্ত যে প্রতীতি হচ্ছে, সেটাও যার বিষয়। কিন্তু যদি আমার বোধ হয় আমি বোধ করছি, আমি দেখতে পাচ্ছি, জানবে ওটাও অন্তরাত্মা নয়। যে জায়গাটা একেবারে চিৎ শক্তি স্বরূপ মাত্র থেকে যাচ্ছে, যেখানে গিয়ে সমস্ত চিন্তা থেমে যাচ্ছে। সমস্ত প্রতীতির যিনি আধার সেটাই নিজের অন্তরাত্মা, যিনি অন্তরাত্মা তিনিই ঈশ্বর। যিনি ব্রহ্ম তিনিই সমস্ত প্রতীতি, তার অন্তঃ সাক্ষী স্বরূপ, এটাই ব্রহ্মজ্ঞান।

এরই ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে দেখতে পাই। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ছাগ বলি হবে, ঠাকুর বলছেন, যে ছাগের বলি হবে সেই ছাগ, যেটা দিয়ে বলি হবে সেই খড়্গ, যেটার উপর রেখে বলি হবে সেটা, যে বলি দেবে সে, সবই ব্রহ্ম। যত ক্রিয়া হচ্ছে, তার প্রতীতির যে সাক্ষী, সেটাই তিনি। এটা কোন কল্পনা দিয়ে হয় না, সাক্ষাৎ অনুভব হয়, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয় তিনি এটাকে বাস্তব দেখেন। কথামৃতে ঠাকুরে বলছেন, মা ওকে তুই কেন এক কলা দিলি। বলার পরেই বলছেন, ও

বুঝেছি, তাতেই তোর কাজ হবে। এখানেও তাই, *প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে*, যা কিছু শক্তি সব ব্রহ্ম থেকেই আসে। সেই শক্তির প্রতীতি কোথা থেকে আসছে? সেই আত্মা, সেই ব্রহ্ম থেকে আসছে। সেই ব্রহ্মকে ঠাকুর কালী রূপে দেখছেন। এরপরে যে শক্তি আসছে সেই শক্তি মা কালীই দিয়েছেন, এখানে কোন তফাত নেই। মাকে যখন ঠাকুর বলছেন, মা তুই ওকে এক কলা কেন দিলি, তখন ঠাকুর একই কথা বলছেন, *প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে*। মা কালীর সাথে ঠাকুরের যত কথাবার্তা আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় কথা, ভাবসমাধিতে কথা, অর্ধবাহ্যদশায় কথা, কেনোপনিষদে যে যে কথার বর্ণনা আছে, পুরোপুরি এক। তাহলে ঠাকুর মা কালী না বলে ব্রহ্ম কেন বলছেন না? কারণ ঠাকুর তখন মনের যে অবস্থায় আছেন, তখন মনের যে আবরণ, সেই আবরণে তিনি ব্রহ্মকে কালী দেখছেন। সমস্ত প্রতীতির আধার সেই ব্রহ্ম, সমস্ত শক্তির আধার সেই ব্রহ্ম, সমস্ত ক্রিয়ার আধার সেই ব্রহ্ম। যখন ছাগ বলি হচ্ছে সেখানেও সবটাকেই ঠাকুর ব্রহ্ম দেখছেন আর যা কিছু হচ্ছে সবই ব্রহ্ম দেখছেন। সেটাকেই ঠাকুর মা কালী বলছেন। লাটু মহারাজ ও রাজা মহারাজের জ্ঞান যাই হোক কিন্তু দুজনের শক্তির তফাত আছে। শক্তি এই তফাত কোথা থেকে আসছে? কেনোপষিদ দিয়ে দেখলে ব্রহ্ম থেকে আসছে। আর যদি শক্তির আরাধনা করে, তাহলে মা কালী থেকে আসছে। রামের উপাসক বলবে শ্রীরামচন্দ্র থেকে ওই শক্তি আসছে। তফাতটা কেন হয়?

এই জায়গাতে এসে ব্রহ্ম আর জগৎ এই দুটোর মধ্যে যে কিভাবে সম্পর্ক হয়ে, কেন হয়, এটাকে আজ পর্যন্ত কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেননি, আচার্য শঙ্করও পারেননি। এটাই একটা সব থেকে বড় রহস্য। ওনারা তাই এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে যান না, শুধু statement of fact বলে মেনে নিয়েছেন। শক্তির তারতম্য কেন হয় ঠিক ঠিক বলা যায় না। তোমার এই শক্তি আছে, তোমারও শক্তি বেশি হবে যদি তুমি নিজেকে আরও বেশি ভেতরে নিয়ে যাও। এই জায়গাতে এসে অনেক ধরণের জটিলতা সৃষ্টি হয়। লাটু মহারাজ ব্রহ্মজ্ঞানী, স্বামীজীও ব্রহ্মজ্ঞানী, লাটু মহারাজ যদি চাইতেন আমিও স্বামীজীর মত বক্তা হব, তাহলে কি তিনি হতে পারতেন? খুব বিতর্কিত ব্যাপার। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু অন্য দিকে বিষয়ের জ্ঞান বিষয়ের মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়। ঠাকুর বলছেন, অবতারও শক্তির আণ্ডারে। ঠাকুর এগুলোকে নিচ্ছেন as a statement of fact, কেশব এই রকম, লাটু অন্য রকম, আবার স্বামীজী আরেক রকম, এই তফাতটা কেন? ঠাকুর মা কালীকে এটাই জিজ্ঞেস করছেন। তারপরেই ঠাকুর বলছেন, ও বুঝেছি তাতেই তোর কাজ হবে। আমরা এটা বলতে চাইছি না যে কেন কম বেশি। বলছেন, মা দিয়েছেন, তাই বলে আমরা যেন না ভাবি যে মা কালী উপরে কোথাও বসে আছেন তিনি ওখান থেকে খুশি মত শক্তি সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছেন। বাচ্চা স্কুলে যাওয়ার সময় মা যেমন স্কুল ব্যাগে টিফিন বাক্সে এটা সেটা খাবার ভরে পাঠায়, সেই ভাবে মা কালী সবার ভেতরে শক্তি ভরে পাঠাচ্ছেন। এভাবে কখনই হয় না, শক্তি যা আসছে সেই ব্রহ্ম থেকেই আসছে, মা কালী থেকেই আসছে।

ঠাকুর বলছেন, সব মায়ের ইচ্ছা, এর এটাই অর্থ যত প্রতীতি হচ্ছে সব প্রতীতির আধার মা, সেই ব্রহ্ম। কেউ যদি বলে, ওর কেন এই রকম হচ্ছে, আমার কেন অন্য রকম হচ্ছে, এখানে এই নিয়ে আলোচনা চলছে না। এই আলোচনা করতে গেলে কর্মবাদ, কর্মবাদের সাথে জন্মান্তর বাদ এসে যাবে। জন্মান্তর বাদে আমাদের কর্মগুলো আর সাংসারিক জ্ঞান পরের জন্মে আসবে না, প্রবৃত্তি ও সংস্কার গুলো চলতে থাকে। কঠোপনিষদও একই কথা বলছেন, *যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থানুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*।। যেমনটি তার কর্ম, যেমনটি তার জ্ঞান সেই অনুসারেই বিভিন্ন যোনিতে বা স্থানুতে তার জন্ম হয়। কর্ম আর জ্ঞান সংস্কার তৈরী করে, তার মানে কেউ যদি ভালো মানুষ হয়, পরের জন্মে সে ভালো মানুষ হয়েই জন্ম নেবে। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে জন্মাবে কেউ বলতে পারে না। পরের মন্ত্রে এটাই বলবেন, তোমার এই জন্মটাই গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্মেই যা কিছু করার করতে হবে, না হলে তুমি ফেঁসে যাবে। কঠোপনিষদের বক্তব্যও তাই। শাস্ত্র জানার পর তুমি যদি সেই ভাবে না চল তাহলে কিন্তু তুমি ফেঁসে যাবে। কারণ পরে কোন শরীরে গিয়ে, কোন পরিস্থিতিতে ফেঁসে

যাবে কোন ঠিক নেই। কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ এগুলো শাস্ত্র দিয়েই জানা যায়, অন্য ভাবে যুক্তি দিয়ে জানার কোন পথ নেই। মানুষে মানুষে তফাত কেন হয়, মা একে কিছু শক্তি দিয়েছেন, তাকে অন্য রকম শক্তি দিয়েছেন, কেন এভাবে দেন এটা জানার আমাদের কোন পথ নেই। তফাতের স্রোত কোথায় সেটা জানা আছে। কেনোপনিষদের মতে এটা ব্রহ্ম থেকে হয়। আর ভক্তের মতে তাঁর ইষ্ট থেকে হয়। কিন্তু কেন হয় কারুর জানা নেই। এই কেনর উত্তর দেওয়ার জন্য বলা হয়, দৈববশাৎ হয়ে গেছে বা তাঁর ইচ্ছাতে হয়েছে। তৃতীয় আরেকটা উত্তর হল তার নিজস্ব কর্ম। কর্মের উপর বিভিন্ন মতবাদ আছে। শুধু এটুকুই বলে দেওয়া হয়, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন এসব মাথা থেকে নামাও, এর উত্তর খুঁজতে যেও না। তুমি এখন এই পজিশানে আছে, এখান থেকে এবার এগিয়ে যাও। কেন জানতে চেও না, কোথা থেকে হয় সেটাকে জানো আর সেটাকে পাওয়ার চেষ্টা কর। লাটু মহারাজ স্বামীজীর মত বক্তৃতা দিতে পারবেন কিনা, এর উত্তর তুমি খুঁজতে যেও না। স্বামীজী ভাষণ দেওয়ার যে শক্তি পাচ্ছেন, কোথা থেকে পাচ্ছেন? কেনোপনিষদের মতে সেই ব্রহ্ম থেকে। সেই ব্রহ্মকে তুমি জানো, জানলে তুমি ধন্য হয়ে যাবে, বাকি সব কিছুর উত্তরও পেয়ে যাবে।

আমরা মনে করি আমাদের যা কিছু বোধ সব ইন্দ্রিয় মন দিয়েই হয়, কিন্তু তা হয় না, এটাই কেনোপনিষদ আগের আগের মন্ত্রগুলিতে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্মের ধারণা সবারই আছে, কিন্তু সীমিত রূপে। কেনোপনিষদের আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল। ইন্দ্রিয় মন দিয়ে যে ব্রহ্মের অবধারণা হয় সেটা ভুল। কিন্তু কি করে বুঝব ভুল? যখনই ব্রহ্মকে কোন রূপে দেখছে, তাতে সে যে ব্রহ্মকে ভুল জানছে এর একমাত্র প্রমাণ হল, যে বলছে আমি জানি। যেমনি বলছে আল্লাই ঈশ্বর বা কৃষ্ণই ঈশ্বর, কৃষ্ণই একমাত্র আছেন, তখনই সে গোলমাল করে ফেলছে। কারণ যখনই তার এই বোধটা এসে যাচ্ছে যে আমি জেনেছি, সে কিন্তু ভুল জেনেছে, ব্রহ্মকে সে জানেনি। এটা হল সব থেকে বড় প্রমাণ। আমি বলছি, আমি জানি ঠাকুর ব্রহ্ম। তার মানে আমি ব্রহ্মকে জানি না। তাহলে কি ঠাকুর ব্রহ্ম নন? ঠাকুর ব্রহ্ম ঠিকই, কিন্তু তুমি যদি মনে কর তুমি ভালো ভাবে জেনে গেছ তাহলে ভুল জেনেছ। কারণ তোমার এই জানাটা মন বুদ্ধি দিয়ে আসছে। এটাই এনাদের প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় একটা জিনিস খুব নিভৃতে চলছে, সেটাকে পরে আরও টেনে নিয়ে যাবেন।

কেনোপনিষদের মতে ব্রহ্ম কি? এর খুব সহজ একটা যুক্তি আছে, এই যুক্তিকে ধরে নিলে কেনোপনিষদ কি বলতে চাইছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। যত উপনিষদ আছে তার মধ্যে কেনোপনিষদ প্রচণ্ড যুক্তি দিয়ে চলে, সেইজন্য যত উপনিষদ আছে তার মধ্যে কেনোপনিষদ অত্যন্ত কঠিন। কারণ একটা দুর্বোধ্য জিনিসকে যুক্তি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে কোন assumption নেই, কিন্তু একটা সত্যকে দিয়ে দিচ্ছেন। দেওয়ার আগে যুক্তি দিয়ে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তারপরে দিচ্ছেন। এখানে যার সাথে কথা হচ্ছে তাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করবে, তোমার জগতটা কি? এখানে যে এত কিছু আছে, এই এত কিছু তোমার জগৎ নয়। তোমার জগৎ হল তুমি যেটাকে গ্রহণ করছ। গ্রহণ করার পর যেটাকে তুমি ভেতরে ধরে আছ, সেটাই তোমার জগৎ। আমাদের বোধের মধ্যে যা কিছু আছে ওটাই আমাদের জগৎ, তার বাইরে আমাদের কাছে জগৎ বলে কিছু নেই। ধরুণ, আমি উপনিষদের ক্লাশ শুনতে যাই। এই যে আমি উপনিষদ শুনতে যাই, এই জিনিসটা আমার কোথায় আছে? আমার মনেই আছে। শেষ পর্যন্ত আমার জগৎ হল আমার মনের জগৎ। এই মনের জগতটা কোথা থেকে তৈরী হয়? ইন্দ্রিয় দিয়ে আসে। একটা বস্তু বাইরে আছে সেটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভেতরে আসছে। ইন্দ্রিয় দিয়ে ভেতরে কিভাবে আসছে? একটা বোধ হয়ে আসছে। তার মানে, আমার আপনার যে জগৎ এটা একটা বোধ। যেটা আমরা গ্রহণ করে আছি আর যেটা গ্রহণ করছি, এছাড়া আমাদের তো কোন জগৎ নেই। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানে কি হবে সেটা আমার জগৎ নয়। কারণ ওটা আমি এখনও গ্রহণ করিনি। আমি যে দেশে যাইনি, যে দেশের কোন ছবি দেখিনি, যে দেশের কথা শুধু শুনেছি সেটা আমার জগৎ নয়। যে লোককে আমি চিনি না, যার কথা শুনিনি, সে আমার জগৎ নয়। তার মানে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি যা সংগ্রহ করেছি, করছি আর তার যে বিন্যাস ও সংযোজন, এটাই আমাদের সবার জগৎ। এই জগতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ

factor হল বোধ। তারপরে আসছে ultimate truth, ultimate truth কি? বোধ, এছাড়া আর কোন কিছু নেই। এটাকেই ফরাসী দার্শনিক Rene Descartes খুব জনপ্রিয় উক্তি দিয়ে বলেছিলেন, I think, therefore I am, আমার যে অস্তিত্ব, কেন এই অস্তিত্ব, কারণ আমি চিন্তা করতে পারছি। আমি যদি আমাকে নিয়ে চিন্তা না করতে পারি তাহলে তো আমার অস্তিত্বই নেই। অস্তিত্ব মানে সত্তা, সত্তার বোধ কোথা থেকে আসে? আমার অস্তিত্ব এই বোধ থেকে, আমি চিন্তা করতে পারছি এটা আমার অস্তিত্বের চিহ্ন। তাহলে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা কি? বোধ।

এবার কেনোপনিষদ পুরো যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন, যে ইন্দ্রিয় এত কিছু বোধ করছে, সেই ইন্দ্রিয় কিন্তু মৌলিক নয়, তাই ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধ হতে পারে না। ইন্দ্রিয় দিয়ে যদি বোধ হত তাহলে যা কিছু ইন্দ্রিয় দেখেছে কিন্তু বোধ আসেনি সেটাও ভেতরে থেকে যেত, যেমন ক্যামেরাতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই তখন মনে হতে পারে মনই বোধ করে। কেনোপনিষদ আবার যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন মনও কিন্তু ultimate বোধ নয়। মন স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে না, যেমন মানুষ খারাপ কাজ করতে চায় না তবুও খারাপ কাজ করে, মন কখন ভালো থাকে কখন খারাপ থাকে। তার মানে মন বোধের উৎস হতে পারে না। কারণ যে উৎস সে যেটা বলে সেটাই করে। এইভাবে যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন মনও ultimate বোধ নয়। তখন বলছে, আমি বুঝেছি দেবতা। এই জায়গাতে সাবধান করছেন, তুমি দেবতাকে বোধ করে নিচ্ছ, তাই দেবতা ব্রহ্ম নয়। যে জিনিসটাকে বোধ করা যাচ্ছে, যে জিনিসটার অস্তিত্ব কাল ছিল না আজ আছে সেটা কিন্তু মৌলিক নয়। তাহলে ultimateটা কি? যেটাই মৌলিক, যেটাই ultimate source সেটাই ব্রহ্ম, সেটাই আত্মা। যুক্তিটা খুবই সরল, এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই। আমরা নিজেরা জটিল তাই সরল জিনিসকে ধরতে পারি না।

আমি আছি আর জগৎ আছে, জগতে আমি হলাম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, শুধু কেনোপনিষদেই নয়, যে কোন উপনিষদে মানুষ বা যে কোন জীব হল প্রধান। জীবের বাইরে এনারা কোন কিছু বলবেন না। মানুষ মাত্রই তার নিজের কাছে সে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এবার কেউ একজন জানতে চাইছে আমি কে, আমার সত্তা কি? উপনিষদ সেখানে বলছেন, তোমার কি বোধ আছে যে তুমি আছ? তোমার যে একটা সত্তা আছে এর বোধ কি আছে? হ্যাঁ আছে। তোমার যে জগৎ যেখানে তোমার বাবা-মা আছেন, তোমার স্ত্রী বা স্বামী আছে, তোমার সন্তানরা আছে, তাদের প্রতি ভালোবাসা আছে, তোমার পছন্দ অপছন্দের বোধ আছে? হ্যাঁ আছে। এরা সবাই কোথায় আছে? বাড়িতে আছে, কর্মস্থলে আছে। কিন্তু তুমি এটা কেন দেখছ না যে, তোমার যে জগৎ সেটা তো তোমার ভেতরে বসে আছে, তার সাথে বাইরের কোন সম্পর্ক নেই। তার মানে এই যে বোধ, আমি আছি, আমার প্রিয়জন, অপ্রিয়জনরা আছে, আমার বাড়ি আছে এটাই মূল। তাহলে গুরুত্ব কোনটার? সত্তার গুরুত্ব সব থেকে বেশি ঠিকই, কিন্তু ওই সত্তাটা আসছে কোথা থেকে। বোধ থেকে। তাহলে গুরুত্বটা কিসের? বোধ। তাহলে মৌলিক কি? বোধ।

এবার এই বোধকে নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এই বোধটা আসে কোথা থেকে, আর কি পদ্ধতিতে আসে? বলবে, বস্তু আছে বলে বোধ হচ্ছে। বস্তু থাকুক, বস্তুর সাথে কোন ব্যাপার নেই। কারণ বোধ তো ভেতর থেকে হচ্ছে, বস্তুটা তো বাইরে। এই বোধটা কিভাবে আসছে? এই ফোনটা বাইরে আছে, ফোনের বোধটা আমার ভেতরে হচ্ছে। এই বোধ কে সৃষ্টি করছে? সহজ উত্তর ইন্দ্রিয় করছে। আগে আগে যুক্তি দিয়ে বলে দেওয়া হয়ে গেছে যে ইন্দ্রিয়গুলি বোধ সৃষ্টি করতে পারে না। ইন্দ্রিয়ই যদি বোধের জন্ম দাতা হত তাহলে চোখ কানকে জানতে পারত, কান চোখকে জানতে পারত, কিন্তু এক ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়কে জানতে পারে না। এই কারণে ইন্দ্রিয়গুলো সীমিত। তাহলে মন জানছে। কিন্তু মন যদি শেষ কথা হত তাহলে মন এখন ভালো থাকছে, একটু পরে খারাপ থাকছে, এই জিনিস কখনই হত না। আর এই খারাপ কাজে, এই ভালো কাজের দিকে মন যেত না। মন যে কাজ করব বলে ঠিক করে নেয় কিন্তু দেখা যায় মন সেই কাজ করতে পারছে না। তাই মনও সীমিত, মন শেষ কথা হতে পারে না। তাহলে মালিক আরও গভীরে।

তখন শিষ্য বুঝে নিয়ে বলছে, এবার আমি বুঝেছি, এই ইন্দ্রিয়গুলিকে যে দেবতারা চালান, মনকে যে দেবতা চালান তিনিই শেষ কথা। তখন দেখাচ্ছেন যে দেবতারাও শেষ কথা হতে পারেন না। কারণ দেবতাদের তুমি তোমার মন দিয়ে জানছ। মন নিজেই সীমিত, সীমিত জিনিস দিয়ে যেটাকে জানা হবে সেটাকে অবশ্যই তার থেকে সীমিত হতে হবে। এখানে যিনি শেষ কথা তাঁর কথা বলা হচ্ছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি আসবেন, তাঁকে কি কোন সিপাহী ধরে নিয়ে আসবে? কখনই সম্ভব নয়। তার মানে মনের পেছনে যে মৌলিক সত্তা, যেটাই মৌলিক সত্তা, যেটার জন্য বোধ হচ্ছে সেটাই শেষ কথা, তিনিই বোধ স্বরূপ। সেই শেষ কথাকে আত্মা বলা হয়, ব্রহ্ম বলা হয়, যে কেউ তাঁকে যা খুশি বলতে পারে। এখানে মূল উদ্দেশ্য, সেই চৈতন্যকে জানা। আসলটা কে, যেখান থেকে সব হচ্ছে, এটাকে জানাই মূল উদ্দেশ্য। কেউ বলতে পারে, জেনে গেলে আমার লাভ কি? এই যে জন্ম-মৃত্যুর চক্র, এই চক্র থেকে তুমি বেরিয়ে যাবে। অন্যান্য জায়গায় বলবেন, শোক মোহের পারে চলে যাবে। ঠাকুর আবার এক জায়গায় বলছেন, সবাই তার বশে এসে যায় এমনকি তার স্ত্রী পর্যন্ত তার বশে চলে আসে। কারণ যিনি চৈতন্যের সাথে এক হয়ে গেলেন তিনি তো সব কিছুর মালিক হয়ে গেলেন, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, আর এটা বাস্তবিক তাই হয়। যার গায়ে বেশি জোর সে রাজা হয় না, বুদ্ধি শরীর থেকে আরও সূক্ষ্ম কিন্তু যার বুদ্ধির জোর বেশি সেও রাজা হয় না। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী তাঁর ক্ষমতা অসীম।

আমরা যত রকম যুক্তি দিয়ে দিয়ে এই জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করে গেছি। কিন্তু উপনিষদের পুরো বক্তব্যকে যদি সহজ ভাবে বোঝার জন্য সাজানো যায় তাহলে এই কটি বাক্য দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যাবে।

১) আমি আছি।
২) আমি আছি কারণ আমার এই বোধ আছে।
৩) আমার এক জগৎ আছে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যত বড়ই হোক, অতীতে যাই হোক আর ভবিষ্যতে যাই হোক, আমি যতটুকু জানি সেটাই আমার জগৎ)।
৪) যে জগতের আমার বোধ সেটাই আমার জগৎ।
৫) বোধ না থাকলে আমি আর আমার জগৎ থাকবে না।

এই বোধটা কি আর কোথা থেকে আসে?

৬) মনে হয় যেন এই বোধের কর্তা ইন্দ্রিয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় স্বাধীন নয়, সেইজন্য ইন্দ্রিয় বোধ কর্তা নয়।
৭) যদি স্বাধীন হত তাহলে চক্ষু কর্ণেন্দ্রিয়কে দেখতে পারত আর কর্ণেন্দ্রিয় চক্ষু ইন্দ্রিয়কে শুনতে পারত। তাহলে মনে হয় মনই যেন বোধ কর্তা।
৮) বিচার করলে দেখা যায় মন স্বাধীন নয় (কারণ মন কখন ভালো থাকে, কখন খারাপ থাকে, মন যে কাজ করবে বলে ঠিক করে সেটা অনেক সময় করতে পারে না)।
৯) তাহলে মনকেও যিনি বোধ করেন তিনিই আসল বোধ কর্তা।
১০) এতে মনে হয় যেন ইন্দ্রিয়ের দেবতাই বোধ কর্তা।
১১) কিন্তু দেবতা জ্ঞান যদি সুবিদিত হয় তাহলে দেবতারা মনের বিষয়।
১২) এর অর্থ হল, যেখানে বোধ হয়, অথচ যেটা সুবিদিত নয় সেটাই আত্মা, সেটাই ব্রহ্ম।

তার মানে, গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল বোধ। যার বোধ নেই তার জগৎ নেই। ঠাকুর বলছেন যার মানে হুঁশ আছে সেই মানুষ। হুঁশ আছে, হুঁশটাই আসল, এই হুঁশকেই উপনিষদ বলছেন বোধ, চেতনা। এই বোধ যেখানে গিয়ে ফাইনাল হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় চৈতন্য। ওই চৈতন্যই ব্রহ্ম, সেইজন্য ব্রহ্মের নাম সচ্চিদানন্দ। তিনিই বোধ কর্তা, তিনি চৈতন্য, চিৎ। কোন জিনিসকে তিনি প্রকাশিত করেন? আমার আপনার জগতকে। আমার মনে হয় আমিই বোধ কর্তা, তার মানে আমি আছি, আমার জগৎ

আছে। এই আছে জিনিসটা, সৎ যেটা সেটাকে তিনি প্রকাশ করেন। কিভাবে প্রকাশ করেন? নিজে তিনি ওই বোধ হচ্ছেন। এই ব্যাপারটা আমরা এখানে এখনও আলোচনায় নিয়ে আসিনি, আমরা এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি। যিনি চৈতন্য তিনিই বোধ কর্তা, শুধু বোধ কর্তাই নন, সেই বোধটাও তিনি। সেইজন্য এই যে আমি বোধ সেটাও আত্মাই আর আমার যে জগৎ সেটাও আত্মাই। সেইজন্য আত্মা ছাড়া কিছু নেই, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। শুধু তিনি যে বোধ কর্তা বলে কিছু করছেন তা না, সেই বোধটাই তিনি, ওই বোধের আত্মা তিনি। যদি কোন বস্তু থাকে তাহলে তার একটা সার, তার একটা আত্মা থাকতে হবে। বোধের আত্মা যিনি তিনিই বোধ কর্তা। যেমন আমার আপনার আত্মা শুদ্ধ ব্রহ্ম, তেমনি সেই বোধের আত্মা শুদ্ধ ব্রহ্ম, তেমনি এই ফোনের আত্মাও সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম। পরে এটাকে নিয়েও আলোচনা করবেন।

ন্যায় আর বৈশাষিকরা বলছেন মনের সাথে আত্মার সংযোগে বোধ উৎপন্ন হয়। এটাকে যদি মেনেও নেওয়া হয় তাহলে আগে মানতে হবে যে আত্মা আর মনের যোগ হয়েছে। যখনই যোগ হয় তখনই তাদের সমান ধর্মী হতে হবে। সমান ধর্মী না হলে কখনই যোগ হতে পারবে না। এখন পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে সোডিয়াম আর ক্লোরিন মিলে গেলে লবণ হয়। কেন হয়? দুটো সমানধর্মী, এর ইলেক্ট্রন একটু বেশি আছে ওর একটু কম আছে। জল কেন হয়? অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন দুজনে তাদের ইলেক্ট্রনগুলো শেয়ার করে নেয়। সমানধর্মী যদি হয় তাহলে আত্মা একটা দ্রব্য বা element হয়ে যাচ্ছে, যেটা ওরা নিজেরাও মানে না। তাহলে তো আত্মার ধর্মটাই পাল্টে যাবে। শুধু তাই না, আত্মার সংযোগে বোধ উৎপন্ন হওয়া মানেই একটা ক্রিয়া হচ্ছে। কারণ বোধ জিনিসটা একটা ক্রিয়া। যার ফলে আত্মার উপর সেই ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এসে যাবে। কিন্তু উপনিষদের দর্শন অনুযায়ী বা আত্মার ব্যাপারে উপনিষদে যা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে আত্মাকে কোথাও দ্রব্য রূপে বর্ণনা করা হয় না, কেউ মানছেনও না। তাছাড়া আত্মা যে মনের সঙ্গে মিলছে, বোধের উৎপন্ন হচ্ছে, তাতে আত্মার উপর একটা ছাপ পড়ে যাচ্ছে, কখনও আবার ছাপ পড়ছে না। তাহলে আত্মা পরিবর্তনশীল হয়ে যাচ্ছে। আত্মা পরিবর্তনশীল হয় এই কথা উপনিষদে কোথাও বলছেন না। আত্মাতে কক্ষণ কোন ধরণের পরিবর্তন হয় না। তাই ন্যায় বৈশাষিকদের এই যুক্তি চলবে না। আত্মা ও মনের সংযোগের জন্য যে বোধ হয়, এই থিয়োরী তাই একেবারেই চলবে না। এখানে শুরু করছে আত্মা ও মনের সংযোগে বোধ আর পুরো কেনোপনিষদি চলছে বোধকে নিয়ে। *কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ*, মনটা কোথা থেকে আসছে, মনটা কি? তখন আচার্য এই ভাবে ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে এদের মতকে খণ্ডন করে বলছেন, তোমরা উপনিষদকে মান সেইজন্য এই যুক্তিটা চলবে না। আচার্য ন্যায় ও বৈশাষিকদের সাথে উপনিষদের কথা দিয়েই এভাবে তুলোধূনো করছেন। কিন্তু বৌদ্ধদের সাথে এভাবে যুক্তিতে যাবেন না।

আত্মার সাথে মনের যে যোগ, বা আত্মা যে বোধ করে, আসলে তা নয়। আত্মা হলেন বোধস্বরূপ। আত্মার উপর কোন কিছুর ছাপ পড়ে না। যে কোন দর্শনের দিক থেকে যদি নেওয়া যায়, তাঁরা আত্মাকে যেভাবে দেখেন, সেখান থেকে বোধের যে সৃষ্টি, যদি তাদের এই মতকে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে অনেক জটিল সমস্যা হয়ে যাবে। সেইজন্য তাদের মত নেওয়া যাবে না। মত তাহলে কাদের নিতে হবে? একমাত্র বেদান্তের মতকেই নেওয়া যাবে। বেদান্ত মতে আত্মা হলেন বোধস্বরূপ। এরপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আসবে, যদি তুমি মনে কর তুমি বোধ করছ, কারণ বোধ করা মানে তার উপর ছাপ পড়া। আমরা যে কাজই করি না কেন, সব কাজের একটা ছাপ আমাদের মনের উপরে সব সময় পড়ে। সেইজন্য ভালো কাজ করলে ভালো মানুষ হয়, খারাপ কাজ করলে খারাপ মানুষ হয়। কিন্তু আত্মার উপর কোন ছাপ পড়ে না, আত্মা সব সময় সব কিছুতে নির্বিকার, অথচ আত্মা আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে।

এবার আচার্য বৌদ্ধদের মত খণ্ডন করছেন। তিনি সমস্ত বোধের আত্মা, তার মানে সমস্ত বোধেরও তিনি বোদ্ধা, তার উপর কোন ছাপ পড়ে না। সেইজন্য এই কথা বলা, তিনি নিজেকে জানেন, আমরা যে অর্থে জানি সেই অর্থে না। তিনি আছেন, এরপর আর কিছু বলাও যায় না, আর বলার কোন

দরকারও নেই। আগের আগের মন্ত্রে আমরা এই জিনিসগুলো আলোচনা করে এসেছি। *প্রতিবোধবিদিতং*, সেইজন্য বলছেন যাঁরা মুমুক্ষু তাঁরা জানেন যখনই কোন চেতনা আসে, কোন বোধ যেখানে আসে, সমস্ত চেতনা, সমস্ত বোধের মূল হল আত্মা। এটা মনেরও ক্রিয়া নয়, আত্মা থেকে মনের যে সংযোগ এটা তারও ক্রিয়া নয় আর momentary consciousnessএর যে পরিবর্তন হয়, এটা তারও ক্রিয়া নয়। মুমুক্ষুরা, যাঁরা ঈশ্বর জ্ঞানের দিকে এগোচ্ছেন তাঁরা যখন এটাকে বুঝতে পারেন তখনই তাঁরা মোক্ষ লাভ করেন।

এতক্ষণ একটা যুক্তি চলছিল, এখানে এসে এবার একটা information দিচ্ছেন। যাঁরা মুমুক্ষ হন, আগের আগের যাঁরা সিদ্ধ পুরুষরা ছিলেন বা যিনিই সিদ্ধ পুরুষ হন, তাঁরা দেখেন যত চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, যত information আসছে, চেতনার জগতে যা কিছু আছে, তার যে বোধ হচ্ছে, সেই বোধেরও যিনি বোদ্ধা, সেই বোধের যে অস্তিত্ব সেটাই আত্মা। এই জিনিসটা যখন জেনে যায় তখন সে মুক্ত হয়ে যায়। কেন মুক্ত হয়ে যায়, এর পেছনেও একটা খুব সহজ যুক্তি আছে। সেই যুক্তিটা কি? মন্ত্রে বলছেন *প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে*, প্রত্যেকটি যে বোধ সব বোধের আত্মা হলেন সেই শুদ্ধ আত্মা। এই জ্ঞানটা যখনই হয় তখনই মানুষ মুক্ত হয়, তাছাড়া মানুষ মুক্ত হয় না। আমি যদি বলি, তোমাকে আমি ভালোবাসি বা একটা ছেলে তার মাকে গিয়ে বলছে, ওই মেয়েটিকে আমি ভালোবাসি, ওকে যদি আমি বিয়ে না করতে পারি আমি সুইসাইড করব। এই যে বোধ, প্রথম বোধ হল আমি তাকে ভালোবাসি, বলছেন, এই বোধের আত্মা কিন্তু সেই শুদ্ধ আত্মা। আমি সুইসাইড করব, নিজেকে শেষ করে দেব, এই বোধেরও আত্মা কিন্তু সেই শুদ্ধ আত্মা। যিনি এই জিনিসটা জানেন, সমস্ত বোধের বোদ্ধা সেই আত্মা, তখন সে মুক্ত হয়ে যায়। উপনিষদ কোন পত্রিকা নয় যে কতকগুলো মামুলি তথ্য আমাদের দিয়ে যাবেন, এখানে যা কিছু বলছেন সবটাই আমাদের জীবনে সরাসরি প্রযোজ্য। খুব সহজ ভাষায় ঠাকুর বলছেন, তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না। একই কথা কেনোপনিষদ বলছে। প্রত্যেকটি বোধের আত্মা ভগবান নিজে। এই জিনিসটাকে যিনি জানেন তিনি ছাড়া আর কেউ মুক্ত হন না। ঠাকুর আরও বলছেন, ঈশ্বরই কর্তা বাকি সব অকর্তা। তিনি কর্তা, এটাই জ্ঞান। এই কথা গুলো যখন বলা হয় তখন আমরা খুব সুন্দর বুঝে যাচ্ছি, শুনতেও ভালো লাগছে। কিন্তু এটাকেই যখন যুক্তি দিয়ে রাখা হচ্ছে তখন আর কেউ বুঝতে পারে না। যুক্তি দিয়ে এটাকে এখানে কিভাবে দেখাচ্ছেন?

উপনিষদ প্রথমে দেখালেন, জগতে যা কিছু আছে আমাকে নিয়েই আছে। তার মানে আমি আর আমার জগৎ এক, আমিও যা আমার জগতও তাই, দুটোকে আলাদা করা যায় না। আমি আর আমার জগৎ এই দুটো কি? বোধ, আমার বোধ আমার জগতের বোধ। এই বোধ জিনিসটা কি? দেখাচ্ছেন, বোধ ইন্দ্রিয় থেকে আসে না, মন থেকেও আসে না। আর যদি মনে হয় আমি এই জিনিসটাকে ভালো ভাবে জানি, তাহলে বুঝতে হবে ওটা আসল বোধ নয়। আসল বোধটা হল মৌলিক, যেটা দুই নয়। এটা যুক্তি দিয়ে নিয়ে গেলেন। এবার সেখান থেকে সিদ্ধান্তে আসছেন। তোমার যত রকমের বোধ হয়, তোমার ভালোবাসার বোধ, তারও আত্মা তিনি, তোমার যে ঘৃণার বোধ সেটাও তিনি, ভালোর বোধ সেটাও তিনি, মন্দের বোধ সেটাও তিনি। যত তোমার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, কাউকে গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছে সেটাও তিনি। কাউকে খুন করার ইচ্ছে হচ্ছে সেটাও তিনি। সবটাই তিনি, কারণ তিনি বোধস্বরূপ, তিনি না থাকলে চেতনা আসবেই না। চেতনা যদি না হয় চিন্তা আসবেই না, কারণ চিন্তার পেছনে রয়েছে চেতনা। একবার ওকে দেখাতে হবে আমি ওর কি করতে পারি, এর পেছনে একটা চেতনা আছে যে এই লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। ওই চেতনার সাথে একটা বোধ আছে, চেতনা মানে বোধ, একটা চিন্তা। ওই চেতনা কোথা থেকে আসছে? বলছেন ওই চেতনা ইন্দ্রিয় থেকে আসে না, মন থেকেও আসে না। এর যে আসল, যেটা সার, যেটা মূল, যেটা বোধস্বরূপ। চিনি একটা বস্তু, কিন্তু তার আত্মা মিষ্টত্ব। ঠিক তেমনি চিন্তন বা চিন্তা, এর আত্মা চেতনা। চেতনার আত্মা বোধ। বোধের আত্মা বোধস্বরূপ। বোধস্বরূপটাই আত্মা। সেইজন্য যত চেতনা, যত চিন্তা চলছে, সব কিছুর আত্মা। কথামৃতে এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, তোমার ধর্মে মতি তিনিই দিয়েছেন। তিনি দিয়েছেন মানে তিনি কি উপর

থেকে সাপ্লাই দিচ্ছেন? আবার এক জায়গায় বলছেন, মা তুই এতটুকু কেন দিলি? ও বুঝেছি এতেই তোর কাজ হবে। যার ভেতরে যে চিন্তা-ভাবনা আছে, যে বোধ আছে, বোধের জন্য যে শক্তি আছে, সমস্ত কিছুর আত্মা তিনি। তাঁকে কেউ কালী বলুক, ব্রহ্ম বলুক, আত্মা বলুক, যাই বলুক না কেন, শেষ কথা তিনি। সমস্ত শক্তির সার তিনি, সমস্ত চেতনার সার তিনি, সমস্ত চিন্তার সার তিনি। কেনোপনিষদ যুক্তি এটাকেই দেখাচ্ছেন। যে জিনিসটা আমরা কথামৃতে পড়ার পর মেনে নিচ্ছি, সেটাকেই এখানে যুক্তি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর যে বলছেন, সব কিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে, এটাকে আমি আপনি মানব কি মানব না? নির্ভর করে ভক্ত হলে আমি মানব, ভক্ত না হলে ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেব। কেনোপনিষদ এভাবে চলে না, কেনোপনিষদ বলে দিচ্ছেন, তুমি মান আর নাই মানো, এখানে তোমাকে এই যুক্তি দিয়ে দেওয়া হল। এরপর তুমি যদি না মানো, তোমার দুর্ভাগ্য।

এই যে আমরা এত আলোচনা করে যাচ্ছি, এটাই সহজ ভাষায় হয়ে যায় নেতি নেতি। চিন্তন যেটা হয়, যেটা দিয়ে awarenessটা আসে, যেখানে আমি বোধ, আমার যে জগৎ এই বোধ, এটারই সব থেকে গুরুত্ব। আমি আছি আর আমার জগৎ আছে, এই বোধ, আমি এই বোধটাকে ধরব। ওই বোধটাকে ধরার জন্য ওর বাইরে যা কিছু আছে আমি সব ফেলে দেব, এটাই নেতি নেতি সাধন। আমরা যে ধ্যান করি সেখানেও তাই করা হয়, আমি এখন ঠাকুরের ধ্যান করছি, ঠাকুর ছাড়া অন্য কিছু আমার মনের মধ্যে আসতে দেব না। নেতি নেতি মানেই তাই, যে কোন চিন্তন আসাকে সরিয়ে দেওয়া, একমাত্র ধ্যেয় বস্তুকে ধরে রাখা। নেতি নেতি সব জায়গাতেই লাগে। কিন্তু নেতি নেতিতে ধ্যান করা যায় না। এটাই আবার পরে আলোচনায় আসবে। কারণ ধ্যান হয় কোন বস্তুর উপর, শুদ্ধ চৈতন্য তো কোন বস্তু নয় তাই নেতি নেতি ধ্যান হয় না। শুধু এই ভাবকে ধরে রাখা, যেটা সব কিছুর উৎস সেটাই আসল আমি। এর বাইরে যত ফালতু জিনিসকে সরিয়ে দেওয়াটাই নেতি নেতি, এরপর শেষে যা থাকছে সেটাই আছে। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে কচুরিপানা ভেসে আসছে, সেগুলোকে আমি হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছি। সরিয়ে দেওয়ার পর কি থাকছে? গঙ্গাজলই থাকছে, যা আছে তাই আছে। কিন্তু কুয়ো থেকে জল নিতে গেলে আমাকে জল তুলতে হবে। দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। সেইজন্য অদ্বৈত বেদান্তের নেতি নেতি সাধনায় কোন বস্তু বা জিনিসে একাগ্র করা হয় না, আবর্জনা গুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যাঁরা ইষ্টের ধ্যান করেন তাঁদেরও এভাবেই ধ্যান করতে হয়। তফাৎ হল, এখানে ইষ্টের চিন্তন করা হয়, চিন্তন করতে করতে ইষ্ট সজীব হয়ে ওঠেন। সজীব হয়ে যাওয়ার পর ওই চিন্তনটা বাকি সব কিছুতে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যায়।

শুদ্ধ বেদান্তে আলম্বন বলে কিছু নেই। আমাদের সবারই আমির একটা অবধারণা আছে, জগতের ব্যাপারেও একটা অবধারণা আছে। এই যে চিন্তা আমি কে, আমার যে জগৎ, এই চিন্তাটা কোথা থেকে আসছে? ওটাকে ধরে রাখা আর তার অন্যান্য যে অবলম্বন গুলো এসেছে, অর্থাৎ করণগুলো যা আছে সেগুলোকে সরিয়ে দেওয়া। ওটাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়াকেই বলে আত্মজ্ঞান। মুমুক্ষুরা, যাঁরা উপনিষদের মতে সাধন-ভজন করেন, তাঁরা এটাই করেন, এর বাইরে কিছু করেন না। এটাকেই বলে নেতি নেতি। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটেতেই যিনি সমান ভাবে অবস্থিত, আমার যত চিন্তা-ভাবনা তার মধ্যে যেটা সবটাতেই থাকে, যা কিছু করছি তার মধ্যে যেটা সব অবস্থাতেই থাকছে, যখন কিছু করছি না তখন যেটা একই ভাবে থাকছে, ওটাই শুদ্ধ চৈতন্য, ওই জিনিসটাকে জেনে যাওয়া, ওই জিনিসটাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়াকেই বলে আত্মজ্ঞান। শুদ্ধ চৈতন্যের উপর এখন অনেক রকম আবর্জনা পড়ে আছে। মুমুক্ষুরা এটাই করেন, এটা ইন্দ্রিয়ের কার্য, এটা মনের কার্য, এটা বুদ্ধির কার্য, এটা আমিত্ব ভাবের কার্য, মুমুক্ষুরা সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। সরিয়ে নেওয়ার পর যেটা থাকল সেটাই আত্মা। সেটাই মন্ত্রে বলছেন, প্রত্যেকটি বোধের যে প্রত্যগাত্মন্ সেটা হল সেই আত্মা, এটাকে জানাই আত্মজ্ঞান।

এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, যেখানেই আত্মাকে অনাত্ম রূপে দেখে সেটাই বিনাশ বা মৃত্যুর কারণ। ইন্দ্রিয়গুলি অনাত্মা আর মনও অনাত্মা, দেহটাও অনাত্মা, চিন্তা-ভাবনা এটাও অনাত্মা। কিন্তু সেখানে যখন আমিত্ব এসে যায় তখন ওটাই মৃত্যুর কারণ হয়। কারণ প্রত্যেকটি জিনিসের উৎপত্তি হয় আবার বিনাশ হয়। কিন্তু আত্মাকে যখন আত্মা রূপে জেনে যায় তখন সে অমর হয়ে যায়। ঠাকুরকে যখন ঠাকুর রূপে জানবে তখন অমর হয়ে যাবে। ঠাকুরকে অন্য কোন রূপে জানলে তার ঈশ্বর দর্শন হবে না, ঈশ্বর লাভ হবে না, ঠাকুরকে ঠাকুর রূপেই জানতে হবে। ওই আত্মাটা কি, এর উপরই এতক্ষণ আলোচনা চলছিল। যে কোন বোধ বা চিন্তন যেটা আসছে, তার যে প্রত্যগাত্মন্ ওটাই আত্মা, বাকি সব কিছু অনাত্মা। অনাত্মাতে যখন আত্মা বুদ্ধি হয়ে যায়, তার মানে যেটাকে আত্মা বলছে আসলে সেটা অনাত্মা, অনাত্মার বিনাশ আছে, এটাই মৃত্যু।

আত্মনা বিন্দতে বীর্যং, আত্মার বোধ যখন হয়ে যায় তখনই মানুষ বীর্য লাভ করে, তখনই মানুষের মধ্যে শক্তির বিকাশ হয়। আত্মার যথার্থ জ্ঞান যখন চলে আসে তখনই মানুষ শক্তি পায়, অমরত্ব লাভের সামর্থ পায়। আচার্য এর সাথে যোগ করছেন, তুমি যদি সম্পদ নিয়ে চল, সাহায্য নিয়ে চল, মন্ত্র নিয়ে চল, ঔষধী নিয়ে চল, তুমি যেভাবেই চল এগুলো কখনই তোমাকে বীর্য দিতে পারবে না। এর একটা মৌলিক সিদ্ধান্ত আছে, যা আমরা আগেও আলোচনা করেছি। ক্রিয়া আর ফল দুটো যখন এক হয়ে যায়, সেটাই ঠিক ঠিক শক্তি। আত্মজ্ঞান পাওয়ার জন্য আত্মাকেই জানতে হয়। অন্য কোন ভাবে যদি মনে কর তুমি আত্মাকে জানবে, কখনই তা সম্ভব নয়। কারণ তখন ক্রিয়া আর ফল আলাদা হয়ে যায়। যদি কেউ মনে করে মন্ত্র জপ করে আমি ঈশ্বর লাভ করব, তা কখনই হবে না। ঈশ্বর লাভ করতে হলে ঈশ্বরকেই জানতে হবে। মন্ত্র মনকে অন্য দিকে ছিটকে যাওয়া থেকে আটকে দেয়, এছাড়া মন্ত্র আর কিছু করে না। আমরা দীক্ষা নিয়ে ঠাকুরের মন্ত্র এত জপ করে যাচ্ছি কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, সব সময় ভয়ে মরছি, কামনা-বাসনা গুলো সব সময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কারণ ঠাকুরের যে স্বরূপ আসল স্বরূপ সেই স্বরূপের বোধটা নেই। সেই বোধ যেমনি আসবে তখন যত রকমের ভয়, লোভ, ক্রোধ, এই জিনিসগুলো উড়ে যাবে। কারণ তখন বুঝে যাবে, ভয় হচ্ছে এটাও একটা ভাবনা, এই ভাবনার নীচে সেই আত্মাই আছেন, সেই ঠাকুরই আছেন। ভয়টা কাল্পনিক ঠাকুরই সত্য। লোভ হচ্ছে, কাম ভাব জাগছে তখন বুঝতে পারবে, মনের সব রকম ভাব আসছে সেই শুদ্ধ চৈতন্য থেকে, যে শুদ্ধ চৈতন্য নির্বিকার। এইভাবে চিন্তা করলে সব রকম ভয়ের ভাব, কাম ভাব, লোভের ভাব চলে যাবে।

একটা বয়সের পর কাম ভাবের সমস্যা থাকে না ঠিকই, কিন্তু অল্প বয়সে এগুলো সমস্যাও হয় আবার কৌতুহলও থাকে। কিন্তু কোন কিছুই সমস্যার হয় না, যদি ওই কামের চিন্তাকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, পর্যবেক্ষণ করতে করতে ওই চিন্তাটা চলে যায়। কারণ কাম ভাব একটা ঢেউ, ওই ঢেউয়ের তলায় সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সমুদ্র, যেখানে কোন বিকার নেই। যখন ওই ঢেউকে দেখছে তখন সে ওই ঢেউ থেকে আলাদা হয়ে গেল। তাই বলে যে সে শুদ্ধ চৈতন্যে পৌঁছে গেল তা নয়, কারণ কালই আবার ওই ভাবটা এসে আবার ঢেউ তুলবে। অকূল সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে একটা জাহাজ চলেছে, সমুদ্র একেবারে শান্ত, একটা ঢেউ নেই, বাতাস চলছে কি চলছে না কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওই জাহাজের কোন যাত্রী যদি ছ ঘন্টা পরে ঘুম থেকে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকায় তখন দেখবে সেই একই দৃশ্য। সমুদ্রের একটা ছবিতে যদি জাহাজ আঁকা থাকে, ওই ছবির জাহাজ আর এই জাহাজের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। কারণ কোন ঢেউ নেই, সামান্যতম যদি ঢেউ হয় তাহলে সময়ের বোধ আসবে। আর ওই অবস্থায় যদি সাত দিন সাত রাত চলেছে। তার মানে শান্ত সমুদ্র কি রকম? ছবির মত। যোগের স্বাভাবিক অবস্থা সেই শান্ত সমুদ্র। এবার একটার পর একটা ঢেউ উঠছে, মনে যে এই ঢেউ উঠছে এটাই জ্ঞান। আমরা ওই ঢেউ গুলো নিয়েই নাচানাচি করি। একবার যদি আমরা ভাবি ঢেউটা সত্য নয়, সমুদ্রটাই সত্য। কি রকম সত্য? ছবিতে যে সমুদ্র থাকে, এটাই। প্রত্যেকটি ঢেউয়ের আসল সত্যটা হল সমুদ্র। আত্মা হলেন সেই সমুদ্র, আর যত চিন্তন হচ্ছে সব চিন্তন হল সেই সমুদ্রের ঢেউ। আমাদের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণও একটা সেই ঢেউ, আমিও একটা ঢেউ, কারণ আমরাও একটা চিন্তন, একটা বোধ।

স্বামীজী বলছেন, যীশুও একটা ঢেউ, বুদ্ধও একটা ঢেউ, বড় ঢেউ এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সবটাই চিন্তন। এর আগে বলা হয়েছিল, প্রত্যেকটি বস্তু আমার কাছে এসে একটা চিন্তন, একটা বোধ হয়ে যাচ্ছে। তাই ঠাকুরও একটা ঢেউ, ওটাও একটা বোধ।

ঋষিরা বলছেন, ঢেউয়ের পারে যাও, সেই সমুদ্রকে জান। আর এটা জান, ওই সমুদ্রই আত্মা আর ওটাই তুমি, ওটাই ব্রহ্ম। তখন তুমি সব সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে। স্বামীজী বলছেন, আমরা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারি, সমুদ্রকে শুকিয়ে দিতে পারি, নক্ষত্রকে কক্ষচ্যুত করে দিতে পারি, কারণ আমরা ঠাকুরের সন্তান। এটাই যদি একবার বোধে বোধ হয়ে যায়, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমার যত চিন্তা-ভাবনা উঠছে তার সার হল প্রত্যগাত্মন্, আমি সেটাই। অন্যের যে চিন্তা-ভাবনা উঠছে সেটাও আমি। তখনই আমার মধ্যে অনন্ত শক্তি চলে আসবে। এখানে বলছেন, এই বোধ যখন আসে তখন সেই শক্তি আসে যে শক্তি দিয়ে আত্মজ্ঞান হয়। ঈশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বর দর্শন যে হয় সেটার জন্য একটা শক্তি লাগে। সেই শক্তি ঈশ্বরের স্বরূপের বোধ যখন হয় তখন সেই শক্তিটা আসে। আমরা যতই জপ করি, তপস্যা করি না কেন তাতে কিছু হবে না, শক্তি আসলে আসে ওই স্বরূপের বোধ থেকে। আত্মার স্বরূপের বোধ এলে আত্মজ্ঞানের সামর্থ আসে, ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ এলে ঈশ্বর জ্ঞানের সামর্থ আসে। তাই বলছেন, মৃত্যুর পরাভব একমাত্র হয় আত্মবোধ থেকে, তাছাড়া আর অন্য কিছু দিয়ে হয় না।

বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্, আর যখন আত্মা ও আত্মাসম্বন্ধী বিদ্যাকে জেনে যায় তখনই মানুষ অমৃত লাভ করে। একটাই কথা দুভাবে বলছেন। মুণ্ডকোপনিষদেও বলছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। প্রথম কথা বলছেন, মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে পাওয়াটা যেন বন্ধ হয়, তার জন্য আমাকে অমৃতত্ব লাভ করতে হবে। অমৃতত্ব লাভ একমাত্র আত্মজ্ঞান দিয়েই হবে। অবিদ্যা, অনাত্মের জ্ঞানের নাশই অমৃতত্ব লাভ। বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়, ওই বিদ্যা পাওয়ার জন্য একটা শক্তি লাগে, সেই শক্তি আত্মার স্বরূপের বোধ হলে আসবে। আত্মার স্বরূপের বোধ হলে সেই শক্তিটা আসে, যে শক্তি দিয়ে আত্মবিদ্যাকে আয়ত্ত করতে সামর্থ হয়। আত্মবিদ্যা আয়ত্ত করাও যা আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়াও তাই। আত্মজ্ঞান হওয়াও যা অমৃতত্ব লাভ করাও তাই। প্রথমে শক্তি অর্জন করতে হবে, সেই শক্তি দিয়ে বিদ্যা লাভ করতে হবে। অশ্বত্থামা একদিন শ্রীকৃষ্ণকে গিয়ে বললেন, আপনার সুদর্শন চক্রটা আমাকে দিয়ে দিন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওই তো কোণে রাখা আছে, তুমি তুলে নিয়ে চলে যাও। অশ্বত্থামা তাড়াতাড়ি গিয়ে চক্রকে তুলতে গেল, কিন্তু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও সুদর্শন চক্রকে তুলে পারল না। চক্র পেয়েও সে নিতে পারছে না। শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে কিছু শক্তির নমুনা দেখে বিশ্বামিত্র তাঁকে কিছু বিদ্যা দিয়ে দিলেন। তারপর দেখলেন শ্রীরাম সব অসুর গুলোকে মেরে দিচ্ছেন তখন তিনি যত বিদ্যা ছিল সবই শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়ে দিলেন। ঠাকুরও দেখলেন নরেনের মধ্যে বিশেষ শক্তি আছে যা আর কারুর মধ্যে নেই, তিনি সমস্ত বিদ্যা দিয়ে দিলেন। প্রথমে দরকার শক্তি। আত্মার স্বরূপের বোধটা যখন এসে যায়, আরে এটাই তো আত্মা, তখন ওই শক্তিটা এসে যায়, যে শক্তি দিয়ে সে বিদ্যা পাবে। বিদ্যা পাওয়াও যা অমৃতত্ব পাওয়াও তাই, তার আর মৃত্যু নেই। কারণ সে জেনে গেল যে আমি তো অবিনাশী, আগেও আমি ছিলাম, আজও আছি আর আগামী দিনেও থাকব। সর্বব্যাপী, অবিচ্ছেদ চৈতন্যের সাথে সে এক হয়ে গেছে। এখন সে অনন্ত শক্তির অধিকারী হয়ে গেল।

ঠাকুরকে যদি আমরা অবতার রূপে না দেখে মানুষ রূপে দেখি তাহলে এই ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। ঠাকুরকে যদি আমরা মানুষ রূপে দেখি তাহলে ধর্ম অনেক সহজে বুঝতে পারব, অবতার রূপে দেখলে অনেক সমস্যা এসে যাবে। স্বামীজী বলছেন, ঠাকুরের জীবন হল বেদের জীবন্ত ভাষ্য। বেদের অনেক কথা কিছুই বোঝা যাবে না যতক্ষণ ঠাকুরের জীবনকে না দেখা হবে। এবার ভাবা যাক, ঠাকুরের শক্তি ছিল কি ছিল না? ঠাকুরের শক্তি যদি না থাকে তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনের এত সেন্টার হচ্ছে কিভাবে! ঠাকুরের শক্তি যদি না থাকে, তাহলে তাঁর নামে এত যুবক জগতের ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে, ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে আসছে কেন! এবার আমরা ঠাকুরের বাস্তবিক জীবনের

দিকে তাকালে কি দেখতে পাই? সারাটা জীবনে তাঁর কিছুই ছিল না, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, চাকরির সূত্রে দাদার হাত ধরে কলকাতায় এসেছেন, তারপর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের একজন পূজারীর কাজ করতে লাগলেন। এই সম্বল আর শক্তি দিয়ে কি কেউ জগদ্বরেণ্য হতে পারে?

আত্মবিদ্যা বা অবতার শক্তি আর আত্মবিদ্যার অভাবে কি তফাৎ হতে পারে এর একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝা যায়। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র যা যা করেছেন লক্ষ্মণ ঠিক তাই তাই করেছেন। শ্রীরাম একপত্নী ব্রত ছিলেন, লক্ষ্মণও একপত্নী ব্রত। শ্রীরামকে বাবা আদেশ করছেন তিনি জঙ্গলে গেছেন, কিন্তু লক্ষ্মণকে কেউ আদেশও করেননি। বাল্মীকি রামায়ণ পড়লে দেখা যায় লক্ষ্মণ জীবনে একবারই রেগে গিয়েছিলেন যখন রাজা দশরথ ওই আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর লক্ষ্মণ একবারও হা হুতাশ করছেন না, শ্রীরামকে অনেকবার করতে দেখা যাচ্ছে। উল্টে লক্ষ্মণ দাদা শ্রীরামকে থামাচ্ছেন, দাদা! আপনি রেগে যাবেন না, আপনার কথা শুনেই আজ আমার এত শক্তি, আপনি এভাবে হতাশ হয়ে যাবেন না। কিন্তু পূজা শ্রীরামেরই হয়। শ্রীরামের যা যা গুণ লক্ষ্মণেরও তাই তাই গুণ। শ্রীরাম যদি রাবণকে বধ করে থাকেন, লক্ষ্মণও মেঘনাদের মত বীরকে বধ করেছেন। দুজনের আচার, ব্যবহার সবটাই এক। কিন্তু পূজা পান শ্রীরামচন্দ্র। এটাই হল আত্মার শক্তি। এরপর অনেকে অনেক রকম যুক্তি, থিয়োরী নিয়ে আসতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। কোথাও এমন কিছু একটা হয় যাতে দুজনের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। আত্মজ্ঞানের জন্য শক্তির তারতম্য হতেই পারে। অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে, যাঁদের জ্ঞান হয়ে গেছে তাঁদের সবারই শক্তি সমান হয় না কেন। ঠাকুর এই ব্যাপারে বলছেন, শক্তির একটু তফাৎ হয়। আত্মজ্ঞান হয়ে গেলেও শক্তির তফাৎ থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞানী যদি চান, তাঁর শক্তির প্রকাশ হবেই। ত্রৈলঙ্গস্বামী নিজের শক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু তাঁর নিজের সময়েই তিনি কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলেন, বলা হত, এই একজন বারাণসীকে আলোকিত করে রেখেছেন। যেখানে যা কিছু শক্তির প্রকাশ, কম বেশি যাই হোক, সেখানেও তিনিই আছেন।

বলছেন, দেবতা হোক, মানুষ হোক, ভূত-প্রেত যাই হোক সবার মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি সব আছে। সংসারে এত রকম দুঃখ, এরা এগুলো থেকে বেরোতে পারে না। এদের এত দুঃখের কারণ এরা সবাই অজ্ঞান। অজ্ঞান কি? নিজের আত্মাকে না জানা। যাদের ইষ্ট ঠাকুর, ঠাকুরকে না জানাটাই দুঃখের কারণ। ধর্মসাধন একটাই কাজ করে, মানুষের শোক আর মোহকে নিবারণ করে দেয়। এটাকেই পরের মন্ত্রে বলছেন –

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাসমাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।২/৫।।

(এই জীবনেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে কৃতকৃত্যতা হয়, কিন্তু এই জন্মে যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ন হয়, তবে মহান বিনাশ (অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্যাপী সংসারগতি লাভ হয়। (সুতরাং) বিবেকীগণ চরাচর সকলেরই মধ্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-পূর্বক এই সংসার থেকে বিরত হয়ে অমৃত (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ) হয়ে থাকেন।)

যদি কদাচিৎ কোন অধিকারী পুরুষ, অধিকারী পুরুষ মানে যাঁর সামর্থ আছে, এই আত্মজ্ঞানের সামর্থ পেয়ে যান আর এই জন্মেই যদি আত্মাকে জেনে যান তাহলে *ইহ চেদবেদীদত সত্যমস্তি*, তাঁর মধ্যে এই পরমার্থ ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার মানে তাঁর আর কখন নাশ হয় না। *ন চেদিহাবেদিন্মহতী বিনষ্টিঃ*, যদি এই আত্মজ্ঞান না আসে তাহলে কিন্তু তার মহা বিনাশ। মহা বিনাশ মানে, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এই ক্রমটা নাশ হয় না, এটা চলতেই থাকে। এখানে *ইহ* শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, ইহ মানে এখানেই। মৃত্যুর পর আমি যে কোন স্বর্গ পাব তা নয়। গীতাতেও এই একই ভাব, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই হবে। খ্রীশ্চান আর ইসলামে সেইজন্য এই জন্মের উপর খুব জোর দেয়। যদিও তারা পুনর্জন্ম মানে না, কিন্তু আসল জোর দেওয়া হয়, তোমাকে এখনই করতে হবে।

ঠাকুরও তাই ঢিমে তেতালা একেবারেই সহ্য করতেন না। যা কিছু করার এখনই করতে হবে। যদি না কর তাহলে তোমার মহা বিনাশ নিশ্চিত। মহা বিনাশের আরেকটা সমস্যা হল, যে কারণে তার জ্ঞানটা হল না, কোন কারণে এমন হয়ে যেতে পারে যে বা এমন একটা যোনিতে গিয়ে জন্ম নিল সেখানে আর কিছুই করতে পারল না। সেইজন্য বলছেন, সব কিছু ছেড়ে আগে জ্ঞান লাভ কিসে হয় তাই কর। জ্ঞান লাভ না করলে তোমার মুক্তি হবে না। আমাদের প্রশ্ন হতে পারে, যদি ঈশ্বরের কাছে যাওয়াই উদ্দেশ্য তাহলে তিনি এখানে আমাদের কেন পাঠালেন? এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। এই জায়গাতে ঠাকুর বলছেন, তিনি চান সৃষ্টি চলুক, তোমার কি চাই তুমি বল। তাঁর লীলা খেলাতে যদি তুমি অংশ নিয়ে ভোগ করতে চাও, তাহলে চালিয়ে যাও। স্বামীজীকে একজন বলছে, স্বামীজী! আপনি যে এই আত্মা আত্মা বলছেন, আমি তো আমার গয়না, টাকা-পয়সা, মান সম্মানের মধ্যেই আত্মাকে দেখছি। স্বামীজী তখন বলছেন, দেখতে থাকুন, হাজার হাজার জন্ম ধরে দেখতে থাকুন। যখন এগুলো থেকে বিরক্ত এসে যাবে তখন এদিকে আসবেন।

এই রকম যখন বিচার করে, আমি যদি এই জ্ঞান লাভ না করি তাহলে কিন্তু আবার আমার জন্ম হবে আর এই ভাবেই আমাকে আবার যেতে হবে। গীতাতে, ঠাকুরও বার বার বলছেন বিচার কর, যদি জ্ঞান না হয় তুমি আবার সমস্যায় পড়ে যাবে। ঠাকুর যে বুড়ি ছোঁয়ার গল্প বলছেন, সেখানে উনি বলছেন, কেউ কেউ যখন বুড়িকে ছুঁয়ে দেয় তখন তারা বেঁচে যায়। আমাকেই ঠিক করতে হবে আমি এই খেলাতে আনন্দ পেতে চাইছি নাকি এই খেলা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি। সেইজন্য উপনিষদ সাধারণ মানুষের জন্য ছিল না। কারণ সাধারণ মানুষ সংসারের খেলাটা ছাড়তে চায় না, তারা চায় আমি যাতে সুখে থাকতে পারি, আমার বাড়ির লোকেরা যাতে খুশি থাকে, আমার যাতে কোন সমস্যা না হয়, আপনি বলুন কি করলে আমার এগুলো সব ঠিক থাকবে।

অথচ এখানে বলছেন, তুমি আগে বিচার করে দেখ কত কষ্টের মধ্যে তুমি পড়ে আছ। এর থেকে তুমি কি বেরিয়ে আসতে চাইছ? আমি বেরোতে চাই না। তাহলে তোমার জন্য এই বিদ্যা নয়। না, আমি বেরোতে চাইছি। তাহলে তোমার জন্য এই বিদ্যা। আর যারা বলছে, আমি বেরোতে চাই কিন্তু বাকিদের কি হবে? তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, খেলা এভাবেই চলতে থাকবে। কারণ এখনই যদি সবাইকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়, তিনি আবার একটা পুরো নতুন সেট এমনিই দাঁড় করিয়ে দেবেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই সৃষ্টি এসে যায়। বুড়ি ছোঁয়াছুয়ি খেলায় বুড়ি চায় না সবাই তাকে ছুঁয়ে দিক, খেলা যত চলে তত তার মজা। সেইজন্য এই খেলা চলতেই থাকবে, তুমি চাও আর নাই চাও। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যদি এখনই মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয় তাতেও কিছু আসবে না। কারণ এক্ষুণি আবার একটা সৃষ্টি দাঁড়িয়ে যাবে, সেই একই খেলা আবার চলতে থাকবে। সমস্ত কিছুর কেন্দ্র তুমি নিজে, তুমি কি চাও? তুমি আবার ওই পদ্ধতিতে আরেকবার যেতে চাইছ, আবার প্রথম থেকে মা-বাবার বকুনি, স্কুলের পড়া, পরীক্ষা, পাশ ফেলের ভয়, ওটা করো না, সেটা করো না, কত রকমের শোক মোহ ভাবলেই আতঙ্ক লেগে যাবে।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ, এভাবে তুমি বিচার কর, বিচার করার পর দেখ সমস্ত জীবে যে ওই এক আত্মতত্ত্ব রয়েছে, এটাকে জেনে যাও। কারণ যত চিন্তা-ভাবনা, তারও যে প্রত্যগাত্মন্ এটা সেই আত্মা। একবার যখন জেনে যাবে যাবতীয় যা কিছু আছে আত্মাই আছেন, আত্মাই ব্রহ্ম, তুমি সেই আত্মা, তখন আর তোমার মৃত্যু বলে কিছু থাকবে না। তোমার মৃত্যু নেই তাই তোমার পুনর্জন্মও নেই, তোমার কোন শোক মোহ থাকবে না, দুঃখ বলে তোমার কিছু থাকবে না। তিনি কেন সৃষ্টি করেছেন, কেন এই খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, এর উত্তর খুঁজতে গেলে কোন দিন উত্তর পাবে না।

ঠাকুর বলছেন, শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে আমার জেনে কি হবে। কারণ আমাকে এখান থেকে যে করেই হোক বেরোতে হবে। ঠাকুর হোমা পাখির উপমা দিচ্ছেন, হোমা পাখির বাচ্চার এই

বোধ যখন আসে যে মাটিতে পড়লে আমি শেষ, তখন সে চোঁচা করে মায়ের দিকে দৌড় লাগায়। জগতে তো এত পাখি আছে, তারা সবাই এখানে দিব্যি আনন্দে আছে। কোন পাখি যদি চোঁচা দৌড়াতে শুরু করে তখন ওর পাশে কোন পাখি যদি থাকে আর যদি জিজ্ঞাসা করে 'তুমি কোথায় পালাচ্ছ'? 'আমি এখানে মারা যাব, আমি মার কাছে যাচ্ছি'। 'আরে কি বলছ, আমি তো কত আনন্দে আছি'। 'তুমি থাক তোমার আনন্দ নিয়ে, আমি চললাম'। এটাই এখানে বলছেন। এই বলে এই অধ্যায়টা শেষ হয়ে যায়।

যখন এই বোধ এসে যায়, সমস্ত প্রাণীতে তিনিই আছেন, তখন *প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃত্য ভবন্তি*, যখন এই পৃথিবীকে ছেড়ে দেয়, এই দেহের যখন পতন হয়ে যায় তখন তিনি সেই শুদ্ধ আত্মা রূপে বিরাজ করেন, আর তাঁর পুনর্জন্ম হয় না। এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আত্মা কি এই জিনিসটাকে দুটো অধ্যায়ে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখালেন শুদ্ধ চৈতন্যই আত্মা আর চেতনা বলতে যেটা বোঝায়, যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে হয়, সেটা কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য নয়। যিনি জানেন যে কোন চেতনা, তার যে প্রত্যগাত্মন্ তিনিই শুদ্ধ আত্মা, এটাকে যাঁরা জেনে যান তাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে যায়। তাতে তাঁদের যে শক্তি আসে সেই শক্তি দিয়ে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভের পর তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না। যাদের জ্ঞান হয় না তাদেরই আবার জন্ম হয়। সেইজন্য যাঁরা এগুলোকে ভালো করে বিচার করেন বুঝে নেন তাঁরা সমস্ত প্রানীর মধ্যে, সমস্ত কিছুর মধ্যে সেই আত্মাকেই দেখেন। এই জ্ঞানকে অর্জন করে বাকি জীবনটা চালাতে শুরু করেন যাতে সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারেন। এটাকেই ঠাকুর হোমা পাখির উপমা দিয়ে বলছেন, মাটিতে পড়লে চুড়মার হয়ে যাবে।

তৃতীয় খণ্ডঃ

তৃতীয় খণ্ডের পেছনে একটা প্রেক্ষাপট আছে, এই প্রেক্ষাপটকে না জানলে এই অধ্যায়ের বক্তব্যকে ধরা যাবে না। একবার দেবতা আর অসুরদের সংগ্রাম হয়েছিল, সেই সংগ্রামে দেবতারা জয়ী হয়েছিলেন। অধ্যায়ে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি এই তিনজন দেবতার নাম আসে। দৈবাসুরের সংগ্রামের কাহিনী বেদে অনেকবার এসেছে। এখানে দেবতা আর অসুরের অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ব্যাখ্যা দেন বর্তমান কালের পণ্ডিতরা যাঁরা কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী, তাঁরা বলেন আর্যরা যখন বাইরে থেকে এসে স্থানীয় আদিবাসীদের জয় করে তখন তারা নিজেদের দেবতা আর এদের অসুর বলতে শুরু করল। এখন সমস্ত দিক থেকে অনুসন্ধান করে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আর্যরা কেউ বহিরাগত ছিলেন না। কিন্তু এখনও এরা ওই পুরনো থিয়োরীকে চালিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজরাই এই থিয়োরীটা প্রথম দিয়েছিল। স্বামীজী খুব রেগেমেগে এদের বলেছিলেন, ইংরেজদের কেউ যদি বাড়িতে বসে থাকে, বাইরের দেশে গিয়ে যদি লুটপাট না করে থাকে, কিছু এ্যাডভেঞ্চার যদি না করে থাকে তাহলে এদেরকে তারা অপদার্থ মনে করে। আর ওদের নিজেদের ব্যাপারে যে ধারণা সেই ধারণা তারা অপরের উপর লাগায়। সেইজন্য ওরা মনে করে আর্যরা যখন ভালো ছিল তারা অবশ্যই কোন জাতিকে জয় করেছিল।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার সময় বলা হয়, দেবতারা শুভ শক্তির প্রতিভু আর অসুররা অশুভ শক্তির প্রতিনিধি। আচার্য শঙ্করের মতে, দেবতা মানে যেখানে আত্মজ্ঞানের প্রবৃত্তি আছে আর যারা প্রাণ শক্তির উপর বেশি নির্ভর করে চলে তারা অসুর। অর্থাৎ অসুররা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকেই শেষ কথা বলে মনে করে। আরও একটা ব্যাখ্যা আছে, যারা সুরা অর্থাৎ সোমরস পান করার অধিকারী তারা দেবতা আর যাদের সোমরস পানের অধিকার নেই তারা অসুর। আবার অসুর শব্দ অসূর্য থেকে আসে, অর্থাৎ যেখানে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ নেই, অসূর্য মানে যেখানে আলো নেই। আলো মানে আত্মজ্ঞানের আলো। এতগুলো ব্যাখ্যাকে মিলিয়ে দিলে দেখা যাবে, দেবতা-অসুরের সংগ্রাম নিয়ে যত প্রচলিত কাহিনী আছে সব সেখান থেকে এসে গেছে। অসূর্য মানে যেখানে সূর্য নেই। তাহলে অসুররা কোথায় থাকে? পাতালে। পুরাণের কাহিনী এভাবেই তৈরী হয়। আসলে আমাদের বুদ্ধি ভোঁতা বলে সূক্ষ্ম জিনিস ধরতে পারি না, আমাদের দরকার অসুর, পাতাল, মারামারি, কাটাকাটি, তখন আমাদের বুদ্ধি এগুলো খুব সহজে ধরে নিতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে যখন যাবে তখন আমাদের বুদ্ধি কিছুই ধরতে পারে না।

পৌরাণিক কাহিনীতে সবারই সৃষ্টি কাশ্যপ মুনি থেকে, তাঁর অনেক স্ত্রী। এদের মধ্যে যারা অদিতি থেকে জন্ম নিয়েছে তাদের আদিত্য বলা হয়, তাদের নেতা ইন্দ্র। দিতি, দনু এদের সন্তানরা অসুর। দেবতা, অসুর আসলে এরা ভাই ভাই। পৌরাণিক কাহিনীকে একশ ভাগ বিশ্বাস করা যায় না, সাথে সাথে আবার নাকচও করা যায় না। সব কিছু মিলিয়ে মূল একটাই দাঁড়ায়, দেবতা আর অসুর এই দুজন কখনই এক সঙ্গে থাকবে না, ক্ষমতা ভাগাভাগি করবে না, এদের লড়াই সব সময় চলবে। তবে টিভি সিরিয়াল বা সিনেমায় যেভাবে অসুরদের দেখায় উপনিষদে ঠিক তা নয়, এর মধ্যে একটা রূপক আছে। পৌরাণিক কাহিনী হলেও, অসুর বা দৈত্যরা ঠিক সেই রকম হিংস্র নয়, যেভাবে আমরা ভাবি। এরা সবাই একই পিতার সন্তান, তাদের মায়েরা আবার আপন বোন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আর আচার্য শঙ্করও একেবারে পরিষ্কার করে বলছেন, দেবতা আর অসুরের মধ্যে তফাৎ হল, যাঁরা আত্মজ্ঞানকে মনে করে শেষ কথা তাঁরা দেবতা, আর যারা বল, বিদ্যা, বুদ্ধিকে মনে করে শেষ কথা এরাই অসুর। লড়াই এদের চিরন্তন। বলা হয় মানুষের মধ্যেও সব সময় দেবতা অসুরের লড়াই চলছে, এটাকেই বলে শুভ শক্তি ও অশুভ শক্তির লড়াই। আমরা এর মধ্যে যাচ্ছি না।

এনারা যখনই কোন একটা আইডিয়াকে মানুষের মধ্যে দিতে চান তখন তাঁরা ভালো করেই জানেন সূক্ষ্ম জিনিসকে এরা নিতে পারবে না। তখন তাঁরা কোন কাহিনীর মাধ্যমে, যেখানে অসুররা

আছে, তাদের সব ভয়ঙ্কর রকম অস্ত্র-শস্ত্র, পাতাল লোকে থাকে, দেবতাদের আক্রমণ করে পাতাললোকে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকে, একটা আইডিয়াকে সামনে নিয়ে আসেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে। দেবতারা কখনই অসুরদের আক্রমণ করেন না, কিন্তু অসুররা যখনই শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখনই তারা দেবতাদের আক্রমণ করে। আক্রমণ করে দেবতার সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয়, তাদের ঐশ্বর্য, সম্পদ সব কিছুতে অধিকার করে বসে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। এরপর দেবতারা তপস্যা করতে থাকে, অনেক সময় ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করে। তখন ভগবান বিষ্ণু নিজে নেমে এসে দেবতাদের সাহায্য করেন বা শক্তির আরাধণা করে, শক্তি তখন এসে দেবতাদের সাহায্য করেন।

কেনোপনিষদের কাহিনীর প্রেক্ষাপট হল, এই রকম দেবতা আর অসুরদের মধ্যে একটা লড়াইয়ে দেবতারা জয়ী হয়েছিলেন। জয়ী হয়ে যাওয়ার পর দেবতারা অহঙ্কারে ফুলে ফেঁপে বলাবলি করছেন, আমি এমনটি লড়লাম, আমি এমনটি জয় পেলাম। এখানে প্রতীক রূপে তিনজন দেবতাকে নিয়ে আসছেন, অগ্নি, বায়ু আর ইন্দ্র। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সবাই লাফালাফি করতে করতে হঠাৎ দেবতারা দেখছেন সামনে একজন যক্ষ, বলা হচ্ছে যক্ষকে দেখে দেবতারা কিন্তু বুঝতে পারছেন না ঠিক কি জিনিস, একটা বিচিত্র বস্তু, যে বস্তু দেবতাদের জ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে। পরস্পর জিজ্ঞেস করছে এটা কি বস্তু। দেবতারা জানতেই পারলেন না এটা কিসের রূপ। তখন দেবতারা অগ্নিকে বলল, তুমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো। অগ্নি সেই বিচিত্র রূপের কাছে গেছেন। যক্ষ উল্টে অগ্নিকেই জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কে হে? আমি অগ্নি। অগ্নির ভেতরে অহঙ্কার আছে, সবে অসুরদের জয় করেছে। অগ্নি বলছেন আমার আরেকটা নাম জাতবেদা। ও! আচ্ছা তাই! তুমি কি কর? আমি সমস্ত কিছুকে জ্বালিয়ে দিই। ও! তাই! এই নাও একটা ঘাসের টুকরো দিলাম, এটাকে পুড়িয়ে দাও তো। অগ্নি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘাসের টুকরো জ্বালিয়ে দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। মাথা নীচু করে অগ্নি ফিরে এসেছে। এরপর বায়ু দেবতাকে পাঠানো হল। বায়ুকেও একই প্রশ্ন, বায়ুও বলছেন আমার আরেকটা নাম মাতরিশ্ব। তুমি কি কর? আমি সব কিছুকে উড়িয়ে দিই। এই ঘাসের টুকরোটা উড়িয়ে দাও তো। বায়ু দেবতাও পুরো শক্তি দিয়েও ঘাসের টুকরোকে ওড়াতে পারল না। বায়ু দেবতাও লজ্জায় সেখান থেকে ফেরত চলে এলেন। এরপর দেবতাদের রাজা ইন্দ্র নিজেই দেখতে গেলেন। ওই যক্ষ ইন্দ্রের সাথে কথাই বললেন না, ইন্দ্র আসতেই যক্ষ ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই সময় দেবতাদের সামনে উমা হৈমবতী আবির্ভূতা হলেন। তিনি দেবতাদের বললেন, তোমরা যেটা দেখলে এটাই ব্রহ্ম। তোমরা যে অহঙ্কার করছ অসুরদের জয় করেছ বলে, তা নয়, ইনিই জয় করেছেন। এটাই প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্য।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।।৩/১।।

(প্রসিদ্ধ যে একবার (দেবাসুর সংগ্রামে) ব্রহ্ম দেবতাদের হয়ে অসুরদের উপর বিজয় প্রাপ্ত করেন। সেই ব্রহ্মেরই বিজয় বশতঃ দেবতারা মহিমান্বিত হলেন।)

মন্ত্রের একেবারে সরল অর্থ হল একবার ব্রহ্ম দেবতাদের হয়ে জয়লাভ করলেন এবং দেবতাদের মহিমান্বিত করলেন। এখানে অসুর শব্দটা নেই, শুধু বলছেন *ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো*, একবার ব্রহ্ম দেবতাদের জন্য জয় পেয়েছিলেন। বেদে দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের একটা নাম পুরন্দর। পুরন্দর শব্দের অর্থ করতে গিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় যে, যিনি জয় করার জন্য নগরকে ধ্বংস করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা, যাঁরা বেদের উপর পড়াশোনা করেছেন, তাঁরা এই ধরণের ব্যাখ্যা থেকে আর্যরা ভারতে বহিরাগত এই মতবাদ নিয়ে এলেন। আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিল, ইন্দ্র তাদের নেতা ছিলেন। আর্যরা ইন্দ্রের নেতৃত্বে এখানকার স্থানীয় জাতিগুলোকে পরাজিত করল। এটা একটা সমস্যা যে, পাশ্চাত্য জগতে ওদের যারা জয়ী নেতা হত তাদেরকেই তারা ভগবান বানিয়ে দিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা একবারও গভীরে গিয়ে ভেবে দেখল না যে এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে, আধ্যাত্মিক ভাবেই তাই জিনিসটাকে দেখা দরকার। এখানে দেবতাদের যে জয় হল, এই কাহিনীর মাধ্যমে কি বলতে চাইছেন, এই

ব্যাপারটা কোথাও পরিষ্কার করে বলা নেই। অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে, এই ধরণের কাহিনীগুলো একটা রূপক। রূপকের অর্থ যিনি ব্যাখ্যা করবেন তিনি যেমনটি বলবেন তেমনটি অর্থ হবে। অপরের কাছে ওটা আরেক রকম দেখাবে। যেমন পুরুষসূক্তমে আছে পুরুষ অর্থাৎ ভগবান যিনি সৃষ্টি করলেন তাঁকে বলছেন *অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্*, তিনি যে সৃষ্টি করলেন সেই সৃষ্টি থেকে তিনি দশ আঙ্গুল বড়। তার মানে জগৎ যতই বড় হতে থাকুক ভগবান সব সময় তার থেকে একটু বড় থাকবেন। তাই সৃষ্টি কোন দিন ভগবানকে জানতে পারবে না। এই তত্ত্বটাই ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনীতে দড়ির কাহিনীর মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে মা যশোদা দড়ি দিয়ে বাঁধতে যাচ্ছেন কিন্তু সব সময় দড়ি একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে। বেদে যেখানে বিষ্ণুর স্তুতি আছে সেখানে বিষ্ণুর আরেকটা নাম উরুক্রম, উরুক্রম মানে যিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেন। তাতে স্তুতি করে বলছেন, হে ভগবান আপনার দুটি পা দিয়ে এই জগৎ, অন্তরীক্ষ সব জানা যায়, কিন্তু আপনার যে তৃতীয় পা সেটাকে জানার কোন উপায় নেই। পুরুষসূক্তমে যেটা বলতে চাইছেন এখানেও একই জিনিস বলছেন। প্রথম পা দিয়ে পুরো পৃথিবীকে মেপে নিলেন, দ্বিতীয় পা দিয়ে অন্তরীক্ষকে মেপে নিলেন, কিন্তু ভগবানের তৃতীয় যে পা সেটাকে জানার কোন পথ নেই। তার মানে দাঁড়ায়, এই জগতের বাইরেও যে ভগবানের অস্তিত্ব, সেটাকে সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। এটাকেই একটা কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপনা করছেন। ভাগবতে আরেকটা কাহিনী হয়ে গেছে। দুটোই এসেছে পুরুষসূক্তম থেকে। এর ভাব হল, আমাদের যে দৃশ্য জগৎ আর স্বপ্ন জগৎ, এই জগৎ হল সীমিত, এর বাইরেও একটা কিছু আছে, যেটাকে মানুষ ধ্যানের গভীরে না গেলে জানতে পারবে না।

এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি দেবতারা অসুরদের উপর জয় পেয়েছেন। সেই বিজয়ের জন্য দেবতাদের অহঙ্কার হল, তাঁরা মনে করলেন এই বিজয় আমরাই পেয়েছি, আমরা মহিমান্বিত হয়ে গেছি। আত্মা কি, ব্রহ্ম কি এই আলোচনায় আমরা আর যাচ্ছি না। কিন্তু মন্ত্র শুরুই হয় ব্রহ্ম দিয়ে। খুবই সহজ সরল কাহিনী। ঠাকুর অধর সেনকে বলছেন, তুমি যে ডেপুটি হয়েছ তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছ। সব তাঁর ইচ্ছাতে, তাঁর কৃপাতেই হয়, এই জিনিসটা আমাদের কাছে খুব সাধারণ কথা হয়ে গেছে। কাহিনীতেও এই সহজ জিনিসটাকে বলছেন, দেবতাদের জয় তাঁর কৃপাতেই হয়েছে। কিন্তু এটা উপনিষদ, ছোটদের কাহিনী নয়। পরে উমা হৈমবতী এসে ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু দেবতাদের বলবেন, *সা ব্রহ্মেতি হোবাচ*, *সা* মানে উমা। ওখানে আবার বলবেন, সেইজন্য দেবতাদের মধ্যে এই তিন দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ুর সম্মান বেশি। পরের অধ্যায়ে এটাই বলবেন, কেন দেবতাদের মধ্যে এই তিনজন দেবতাদের সম্মান বেশি, কারণ এনারাই প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান পেয়েছিলেন। এই তিনজনের মধ্যে আবার ইন্দ্র সবার আগে জেনে ছিলেন, তাই তিনি রাজা। কারণ উমা ইন্দ্রকেই বললেন *সা ব্রহ্মেতি হোবাচ*। এর মধ্যেও আবার একটা ছোট্ট প্রেক্ষাপট আছে।

এই কাহিনীটাও একটা রূপক। বায়ু প্রানীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চালন করে, ভেতরে যে প্রাণশক্তি কাজ করে, এই শক্তিই বাইরে বায়ু রূপে চলে। অগ্নি এখানে বাক্, মানুষ যে কথা বলে, বাক্যালাপ করে, এই বাণীর দেবতা অগ্নি। এখানে কাহিনীর মাধ্যমে এই তিনটে জিনিসকে একসাথে নিয়ে আসছেন। অনেক সময় মানুষ এমন কিছু ক্রিয়া করে বা এমন কিছু কথা বলে, যেটা দিয়ে ঈশ্বরীয় ভাব বেরিয়ে আসে। নিজের কর্মের দ্বারা, নিজের বাণীর দ্বারা, নিজের অন্তর মন দ্বারা কখন সখন আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝতে পারি, তখন মনে হয় আমি একটা কিছু হয়ে গেলাম। আমাদের যতগুলো ইন্দ্রিয় রয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে কাছাকাছি হল প্রাণশক্তি, ধ্যান করাটাও প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তি বা বাণী তখনই হয় যখন মন কাজ করে। বলছেন, মনে হয় এই প্রাণশক্তি ও বাণী এই দুটো মাঝে মাঝে একটা ঈশ্বরীয় বোধ পেয়ে যায়, ঈশ্বর আছেন এই বোধটা। কিন্তু আবার হারিয়ে যায়, এক ভাবে থাকে না। কিন্তু কাহিনী রূপে দেখাচ্ছেন তাঁরা যখন যক্ষের কাছে গেলেন তখন তাঁরা বুঝতে পারছেন কিছু একটা আছে। অনেক সময় আমরা কিছু একটা করি তাতে মনে হয় যেন এটা করা আমার ক্ষমতার বাইরে। কি করে সম্ভব হল? আমরা বলি তাঁর কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। আবার অনেক সময় উৎসাহে এমন সব কথা বলে ফেলি যে, তখন

মনে হয় আমি কি করে এত গভীর কথা বললাম। কর্ম আর বাণীতে এমন কিছু একটা হয়ে যায়, মনে হয় কি করে হল। স্বামীজীর রচনাবলী পড়লে আমাদেরও অনেক সময় মনে হয় একটা মানুষের মধ্যে এত জ্ঞান কি করে থাকতে পারে! ঠাকুর বলছেন, মা রাশ ঠেলে দেন। বাণী দিয়ে বোঝা যায় যে একটা শক্তি যেন কাজ করছে। কিন্তু মানুষের যে অহং ভাব, যেটা দিয়ে সমস্ত ক্রিয়া চলছে, প্রাণের ক্রিয়া, বাণীর ক্রিয়া, এগুলো দিয়ে মাঝে মাঝে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা ঝলক পেয়ে যায়, ধ্যানের গভীরেই হোক বা অন্য কোন অবস্থায় হোক বা মন চিন্তন করে একটা ভাব পেয়ে যায় যে তিনি আছেন। কিন্তু সব সময় থাকে না, হারিয়ে যায়। তখন ঈশ্বরীয় কৃপা আসে, উমা হৈমবতী সেই ঈশ্বরীয় কৃপার মূর্ত রূপ। ঈশ্বরীয় কৃপা এসে যখন সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়ে ঈশ্বর জ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে দেন, তখনই মানুষ ওই জ্ঞানে পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বায়ু আর অগ্নি এই দুজন দেবতা যক্ষের কাছে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন কিছু একটা হচ্ছে, কিন্তু ধরতে পারলেন না। ইন্দ্র একটা আভাস পেলেন এবং যক্ষের অন্তর্ধান হয়ে গেল, তাতে বুঝতে পারছেন যে কিছু একটা হচ্ছে। তারপর উমার আবির্ভাব হল, তাঁর কথা থেকে ইন্দ্র বুঝতে পারলেন এটাই ব্রহ্ম। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মানুষের মধ্যে যেভাবে সব কিছু হতে থাকে সেটাকেই এই কাহিনী ইঙ্গিত করছে।

কাশ্যপ মুনির বিভিন্ন সন্তানদের কেউ দেবতাদের পক্ষে কেউ আবার অসুরদের পক্ষে। শুধু পক্ষে বিপক্ষে নয়, দলবদলও হয়। যেমন নাগ জাতি মূলতঃ অসুরদের পক্ষে, কিন্তু বাসুকি আবার বিষ্ণুর সঙ্গে আছেন। স্পষ্ট করে বলা যাবে না যে এরা ওদিকে আর ওরা এই দিকে। প্রহ্লাদ দৈত্য বংশের কিন্তু উনি বিষ্ণুর পূজা করছেন। স্বর্গের সাম্রাজ্য কে চালাবে এই নিয়ে দেবতা আর অসুরদের সংগ্রাম লেগেই থাকত। কিন্তু যখনই সংগ্রাম হত অসুরদের হাতে দেবতারাই বেশির ভাগ সময় বেদম মার খেত। আর অসুরদের পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কথা কাহিনীতে একবারও পাওয়া যায় না যে দেবতারা অসুরদের উপর জয়ী হয়েছেন। প্রকৃতির এটাই নিয়ম, ভালো মানুষরা কখনই দুষ্ট মানুষদের জয় করতে পারে না। অসুরদের হারানোর তিনটি পথ ছিল। প্রথমটা খুবই প্রচলিত উপায় ছিল, ভগবান নিজে এসে যদি দেবতাদের সাহায্য করেন। দ্বিতীয় ছল করে মারা একটা ঘটনাই আছে, ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে ছল করে মেরেছিলেন। এর বাইরে আরেকটি উপায় আছে, অসুররা নিজেরাই নিজেদের বিনাশ করে দিত। যেমন ভস্মাসুর, সে নিজের মাথায় হাত রেখে ভস্ম হয়ে গেল। এমন কিছু একটা কায়দা করে দিতেন তাতে নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে মারা যেত। এই ধরণের পৌরাণিক কাহিনী আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে ছড়িয়ে আছে। নিজের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে নিয়ে আসত। ভগবান নিজে এসে অসুরদের বিনাশ করেন ঠিকই, কিন্তু ভগবান দেবতাদেরও আত্মা আবার অসুরদেরও আত্মা। সেইজন্য কেউ কাউকে মারতে পারে না, নিজেকে নিজে ছাড়া কেউ মারতে পারবে না। কেউ যদি অপরের থেকে প্রচুর কষ্ট পেয়ে থাকে বা পাচ্ছে, একটু বিচার করলে বুঝতে পারবে সবার ভেতরে যিনি অন্তরাত্মা তিনি না মারলে আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমরা সব সময় মনে করি বাইরের লোকেরাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। কর্মফল যিনি দেন, সেই বিধাতাই আমাদের সবার অন্তর্যামী। তার মানে আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা যেই করুক, শেষ পর্যন্ত সব ফল আসছে বিধাতা থেকেই। কারুর যদি মনে হয় আমার দুঃখ-কষ্টটা বেশি আসছে, একটু বেশি করে কয়েক দিন জপ-ধ্যান করুক, ঠাকুরের নাম করুক, ঠাকুরের কাছে একটু বেশি সময় নিয়ে বসুক, সব দুঃখ-কষ্ট কেটে যাবে।

জগতে শেষ পর্যন্ত কেউ আমাকে সুখী করতে পারবে না, কেউ আমাকে আনন্দ দিতে পারবে না, কেউ সুখ দিতে পারবে না, কেউ আমাকে কোন আঘাত দিতে পারবে না, একমাত্র আমি ছাড়া। এগুলো কোন তাত্ত্বিক কথা নয়, এটাই সত্য। ঠাকুর ক্যান্সারে কত কষ্ট পাচ্ছিলেন, খেতে পারছেন না, খরচ বেড়ে যাচ্ছে, টাকা নেই। অত কিছুর মধ্যেও ঠাকুর কি একবারও বলছেন, আমার যে আত্মজ্ঞান, আমার যে জগন্মাতা, আমার ঈশ্বর জ্ঞান এগুলো সব ফালতু? অসম্ভব, ঠাকুরের কখনই বলবেন না। এটাই হল taste of spirituality সত্যের পরীক্ষা। সত্যের এটাই পরীক্ষা, দুঃখ, যন্ত্রণার মধ্যেও যিনি ওই সত্যকে ধরে আছেন। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের শরীর মনকে ধরে আছি। দুঃখ-কষ্টে তার

কাছেই মানুষ যায় যাকে সে মনে করে এই আমার সম্বল। প্রিয়জনের কাছে গিয়েই মানুষ তার মনের কথা বলে। আর অপ্রিয় মানুষ থেকে দূরে থাকতে চায়। দুঃখ কষ্টে যদি মনে হয় ঠাকুর আমার জন্য কি করলেন! তার মানে সে ঠাকুরের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, তার মানে সে ঠাকুরের লোক নয়। দুঃখ কষ্টে কেউ যদি চোখের জল ফেলে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলে, হে ঠাকুর তুমি থাকতে আমার এরকম কেন হল? সত্যের পরীক্ষা মানেই, দুঃখ-কষ্টেও সে ঠাকুরকে ধরে আছে নাকি ঠাকুর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

দেবতারা যে জয়ী হলেন তাতে তাঁরা নিজের আত্মার জোরেই জয়ী হয়েছেন, কারণ জয় হওয়াটাও আত্মার জন্যই হয় আর পরাজয়টাও আত্মার জন্যই হয়। যাঁরা আত্মার পূজা করেন, আত্মার অর্চনা করেন তাঁরা জয়ী হন। এবার দেবতারা জয়ী হয়েছেন। এখানে জয়ী হওয়ার তাৎপর্য হল ঐশ্বর্য প্রাপ্তি, কর্মের দ্বারা, বাণীর দ্বারা আর জ্ঞানের দ্বারা ঐশ্বর্য প্রাপ্তি। ঐশ্বর্য প্রাপ্তির সাথে সাথে একটা অহঙ্কারের উদয় হয়। দেবতারা জয়ী হয়েছেন, সংসারে তাঁদের নাম হয়ে গেছে। অগ্নির নাম হয়ে গেল, বায়ুর নাম হয়ে গেল, এখান থেকে কাহিনীটা এগিয়ে যায়। যার জোরে তৎকালীন যে একটা ক্ষমতা পেয়ে যায়, সেই ক্ষমতা পাওয়ার পর অন্যায় কর্ম করছে কিনা, অন্যায় কর্ম করছে মানেই খুব অহঙ্কার করছে। তখন অন্তর্যামী যিনি ওই ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি ওই ক্ষমতাটা ফিরিয়ে নেন। এই ভাবকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী। ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু জয়ী হওয়ার জন্য মহিমান্বিত হলেন, যে সম্মান পেলেন, দেবতারাও অহঙ্কার করছেন, আমরা আমাদের জোরে জয়ী হয়েছি। দেবতারাই ভুলে গেলেন যে তাঁদের এই জয় ঈশ্বরের কৃপায় হয়েছে। আমি বলতে আমি যেটাকে আমি মনে করছি, সেটা অহঙ্কার, আমার সাফল্য এটার জন্য হচ্ছে যদি মনে করি, তখন যিনি সাফল্য করিয়েছেন তিনি ওই শক্তিটা আমার থেকে কেড়ে নেবেন। এই জন্যই কেড়ে নেবেন, আমার যে শুদ্ধ মন, সেই শুদ্ধ মন থেকে আত্মার শক্তি প্রকাশিত হয়েই এই সাফল্য এসেছিল। অহঙ্কার করা মানে ওই শুদ্ধ মনে আবরণ পরে গেল। আবরণ পরে যাওয়া মানে আর ওখান থেকে আত্মার শক্তি প্রকাশিত হতে পারবে না।

এই যে এখানে বলছেন দেবতারা অসুরদের উপর জয় পেয়েছেন। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, দেবাসুর রূপেই দেখা হোক বা ইন্দ্রিয়ের উপর জয় বা মন, বাণী ও কর্ম দিয়ে সংসারের একটা উপলব্ধি বা এগুলো দিয়ে ঈশ্বরের একটা প্রতীতি, যেই অর্থেই নেওয়া হোক না কেন, কি বিরাট এক সাংঘাতিক শক্তিকে নিয়ে এখানে বলছেন আমরা ভাবতেই পারি না।

এই ধরণের কাহিনীর অনেকগুলো বিন্যাস আছে। আমরা কয়েকটা নিয়ে বলছি, পরে আচার্যের ভাষ্যে আরও কয়েকটা আসবে। এই কাহিনীর প্রথম তাৎপর্য হল, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ুর সম্মান বেশি। এই তিনজনের মধ্যে ইন্দ্রের সম্মান আরও বেশি, কারণ তিনিই প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় তাৎপর্য হল, এই কাহিনী দেখিয়ে দিচ্ছে যে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া কত কঠিন, বায়ু, অগ্নি দেবতারাও পেলেন না, আর ইন্দ্র কাছে যেতেই তিনি তাঁর সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তৃতীয় তাৎপর্য হল, আমাদের অবস্থার বিচারের দিকে দিয়ে এই তাৎপর্য। মানুষের মধ্যে যে ভাব তা হল আমি কর্তা। এই কাহিনীর মাধ্যমে এই ভাবকে কাটানো হচ্ছে। ঠাকুর বার বার বলছেন, ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সব করেন। ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা এই ভাবটা জাগানোর জন্য এই কাহিনী নেওয়া হয়েছে। কারণ ওখানে দেখানো হয়েছে বায়ু সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, অথচ ব্রহ্মের সামনে একটা ঘাসের টুকরোকে নড়াত পারল না। অগ্নি দেবতাও দহন করতে পারলেন না। এটকে দেখানো যে, যা কিছু হচ্ছে তিনি করাচ্ছেন বলে হচ্ছে, তা নাহলে হত না। চতুর্থ আরেকটা তাৎপর্য হল, যে দেবতাই হন, ইন্দ্রই হন আর সূর্য বা চন্দ্রই হন, এনারা সবাই ব্রহ্মেরই একটা অভিব্যক্তি। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে এনারা শূন্য। কঠোপনিষদে এটাই বলছেন, *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*, সমস্ত দেবতারা কাজ করছেন তিনি আছেন বলে। দেবতারা যাঁদের এত শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, তাঁরা সেই ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া তাঁরা সবাই জিরো। প্রথমটায় বলা হল, মানুষ কখন যেন নিজের ভেতরে আত্মার প্রকাশ, ঈশ্বরের বোধ হঠাৎ করে পেয়ে যায়, কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। তাঁর কৃপা হলে এই বোধটা চিরস্থায়ী ভাবে

বসে যায়। আর বেদ উপনিষদের দৃষ্টিতে যদি দেখি তখন এই কয়েকটা ব্যাখ্যা এখানে আসে। আচার্য শঙ্কর এখানে একটা লম্বা ভাষ্য দিয়ে বিষয়ের ভূমিকা রাখছেন।

উনি প্রথম পয়েন্টে বলছেন, উপনিষদের উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান হলেই মানুষের মুক্তি। এই শিক্ষাটা আগের অধ্যায় দুটোতে দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এই জ্ঞান পাওয়াটা কত কঠিন, এটাকে দেখানোর জন্যই এই অধ্যায় শুরু করছেন। কথামৃত পড়ার পরে আমাদেরও মনে হয় ঈশ্বর জ্ঞান পাওয়া কত সহজ। কিন্তু কত কঠিন এই জ্ঞান পাওয়াটা, এটাকে মানুষ বুঝতে পারে না, তাই এই অধ্যায়ের মাধ্যমে দেখাচ্ছেন তুমি যেটা মনে করছ তা নয়, অত্যন্ত কঠিন এই জ্ঞান পাওয়া। যাঁরা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ করছেন, সেই দেবতারাই এই জ্ঞানের কাছে অসহায় হয়ে যাচ্ছেন। আচার্য এই ভাবে একটা ছোট্ট ভূমিকা দিলেন। এরপর আরও খুব গভীর ভাবে তিনি এর ব্যাখ্যা করছেন। সেখানে প্রথমে দেখাবেন আগের দুটো অধ্যায়ে যে ব্রহ্মের কথা বলা হল, এই অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে সগুণ সাকার ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে, ব্রহ্ম বলতে এখানে ঈশ্বর। ব্রহ্ম বলতে ঈশ্বর যদি না হয় তাহলে অনেক বিরোধ এসে যাবে। সেইজন্য বলছেন, যিনি সমস্ত প্রানীর অন্তর্যামী, সমস্ত যে আত্মা, তাঁর যে সমষ্টি রূপ ঈশ্বর বা সগুণ সাকার ব্রহ্ম তাঁর কথা বলা হচ্ছে। আগের দুটো অধ্যায়ে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের আলোচনা করা হয়ে গেছে। সগুণ সাকারটাও ব্রহ্মের আরেকটা দিক, যেখানে উপাসনা হয়, ভক্তি করা হয়, পূজা অর্চনা করা হয়, এই অধ্যায়ে তাঁরই বর্ণনা করছেন।

এই কাহিনী মূল একটা জিনিসকে ইঙ্গিত করছে, ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু, এই তিন দেবতা আমাদের শরীরের তিনটে অংশকে ইঙ্গিত করছে। বায়ু হল প্রাণ, অগ্নি বাণীর আর ইন্দ্র অহঙ্কার। এই অহঙ্কার মানে অন্তর মন, যে জায়গাতে আমিত্ব বোধটা আসে। এই তিনটেরই আত্মার জ্ঞান হয়। তৃতীয় আর চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্ম শব্দ আসছে। আচার্য বলবেন, এখানে যে ব্রহ্মের কথা বলছেন, এই ব্রহ্ম হলেন সোপাধিক ব্রহ্ম, যে ব্রহ্মের উপর উপাধি দেওয়া আছে, আমাদের ভাষায় যিনি ঈশ্বর বা ভগবান। এই অধ্যায়ে আচার্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি নিয়ে আসছেন। বেদান্তের আলোচনা শুনে শুনে আমাদের একটা খুব প্রচলিত ধারণা হয়ে গেছে যে ব্রহ্ম মানেই নির্গুণ নিরাকার হতে হবে। কিন্তু তা কখনই নয়, ব্রহ্ম শব্দ বলতে তিনি নির্গুণ নিরাকারও আবার সগুণ সাকারও। সেইজন্য ব্রহ্ম শব্দের আগে প্রায়শই দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়, নিরুপাধিক ব্রহ্ম আর সোপাধিক ব্রহ্ম। যখন উপাধি থাকে না তখনও ব্রহ্ম, যখন উপাধি দেওয়া থাকে তখনও ব্রহ্ম।

উপনিষদ যদি বুঝতে হয়, যদি বেদান্ত বুঝতে হয়, তার থেকেও বেশি যদি হিন্দু ধর্মকে বুঝতে হয় তাহলে আগে উপাধি জিনিসটাকে ভালো করে বুঝতে হবে। উপাধিকে আমরা এভাবে বলতে পারি, আমার সামনে একটা পর্দা দেওয়া আছে আর ওখানে সাদা একটা জিনিস রাখা আছে, আমার চোখে রঙিন চশমা দেওয়া আছে। আমার চশমার রঙ যেমন যেমন পাল্টাবে তেমন তেমন সেই বস্তুটাও পাল্টাবে। আর চশমার লেন্স যত বড় জিনিসটা তত বড় দেখাবে। চশমাতে আবার একটা ঠুলি দেওয়া আছে, জিনিসটাকে পুরো কখনই দেখা যাবে না। উপাধি বলতে এটাই। আর তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে উপাধি মানে একটা বিশেষণ দিয়ে দেওয়া, সামান্য থেকে বিশেষ হয়ে যাওয়া। একজন সাধারণ লোক ছিল তাকে একটা উপাধি দিয়ে বিশিষ্ট করে দেওয়া হল। বিশেষণ কাউকে দিয়ে দেওয়া মানে তাকে সামান্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কার্যক্ষেত্রে এর একটা সমস্যা হবে, একজনকে যদি রাজা করে দেওয়া হয়, এরপর সে সাধারণ লোকের মত থাকবে না। একদিকে যেমন সে বিশেষ হয়ে গেল, অন্য দিকে একটা যে বড় গ্রুপের সাথে ছিল সেখান থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একটা ছোট গ্রুপে চলে গেল। এটা এক একজনের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে, কিভাবে সে জিনিসটাকে দেখছে। একদিকে যেমন এর একটা বৈশিষ্ট্য এসে গেল, তেমন গোষ্টির দিক থেকে ছোট হয়ে গেল। যেমন কাঠ, কাঠের গোলাতে সব কাঠ স্তূপাকার করে রাখা আছে। এবার ওই কাঠের গুদাম থেকে একটা কাঠ নিয়ে এসে চেয়ার বানিয়ে দেওয়া হল, তার মানে তাকে একটা উপাধি দিয়ে দেওয়া হল। সেই চেয়ারকে যদি

একটা সিংহাসন বানিয়ে দেওয়া হয় তখন আরও বিশেষ হয়ে গেল। ওই সিংহাসনই যখন পুরনো হয়ে গেল তখন একটা ঐতিহাসিক বস্তু হয়ে গেল। একটা জিনিসই অনেক কিছু, সেটা কাঠ, সেটা চেয়ার, সেটা সিংহাসন, সেখান থেকে একটা ঐতিহ্য বস্তু রূপে সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়ে গেল। এইভাবে আমরা সব কিছুতে বিশেষণ দিতে থাকি। এবার যেমনি ওই বিশেষণ দিয়ে বলা হচ্ছে, যেমন বলা হল, ঐ এ্যন্টিকটা নিয়ে এসো তো, আমি বুঝে গেলাম আমি কি আনতে বলছে। যদি বলা হয় কাঠ নিয়ে আসতে তখন কিন্তু ওই চেয়ারটা নিয়ে আসব না, অথচ চেয়ারটাও কাঠ। বাংলায় উপাধি মানে যেমন বিশেষণ বেদান্তেও উপাধির অর্থ বিশেষণ, শব্দের অর্থ পালটায় না কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা পালটায়।

ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের যেমনি একটা উপাধি দিয়ে দেওয়া হল, তখন ওই জায়গাটায় বিশেষণ হয়ে গেল, ওটা একটা বিশেষ হয়ে গেল। বিশেষ হয়ে গেলে এবার আমরা সহজেই তাকে ধরতে পারব। আস্তাবলে শত শত ঘোড়া আছে, যখন ঘোড়া বলছি, তখন যে কোন ঘোড়াকেই বলা যাবে। কিন্তু যেমনি বলা হল লাল ঘোড়া, এবার বিশিষ্ট হয়ে গেল, পাগলা ঘোড়া, আরও বিশিষ্ট হয়ে গেল। বেদান্তে শুদ্ধ নিরাকার ছাড়া কিছু নেই। শুধু একটা করে উপাধি চাপে আর একটা করে জিনিস দেখায়, পালটায় না কিছুই, দেখায় অন্য কিছু। ঠাকুর রঙের গামলার কথা বলছেন, একজনের কাছে একটা রঙের গামলা আছে, যে যাই রঙ চাইত সে তাকে কাপড়ে সেই রঙে ছুপিয়ে দিত। ঠাকুর এখানে উপাধির কথাই বলতে চাইছেন। উপাধিতে একটা মজার ব্যাপার হল, আমরা যখন লাল ঘোড়াকে লাল রঙের বিশেষণ দিচ্ছি, ওটা কিন্তু ঠিক ঠিক উপাধি নয়, ওটা বিশেষণ। আর ব্রহ্মের যে উপাধির কথা বলা হল, ওটা বোঝাবার জন্য বলা হল। আসলে উপাধি মানে বিশেষণ হয় না, ওটা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেটা দিয়ে ওকে বিশিষ্ট করে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবিগুরু বলা হয়, কবিগুরু একটা উপাধি দিয়ে দেওয়া হল। কবি অনেকেই আছেন কিন্তু কবিগুরু বললে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বোঝাবে। কিন্তু উপাধি দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ কি পাল্টে গেলেন? কবিগুরু না বললে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুলি কি অন্য রকম হয়ে যাবে? মহাত্মা গান্ধী থেকে মহাত্মা সরিয়ে দিলে কি গান্ধীজীর সম্মান কমে যাবে? তাহলে মূলতঃ উপাধি জিনিসটা মিথ্যা হয়ে যায়।

নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই আছে, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁর উপর যত উপাধি আমরা চাপাই সবটাই মিথ্যা। দিলে ভালো না দিলে তাঁর স্বরূপ পাল্টাবে না। যখন লাল ঘোড়া বলছি, তখন ঘোড়ার লাল বাস্তবিক, ওই ঘোড়াকে লাল ছাড়া অন্য কোন রঙে কল্পনা করতে পারব না। এগুলো আপাতঃ ভাবে শুনলে খুব সহজ মনে হয়, কিন্তু বুঝতে গেলে কঠিন মনে হবে। জিনিসটা কঠিনও নয় আবার সহজও নয়, শুধু বোঝার ব্যাপার। উপাধি মানে বাইরে থেকে কিছু জিনিস এনে তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে বিশেষ করে দেওয়া, সেটা তার বাস্তবিক নয়। আর কিছু জিনিস আছে যেটা তার বাস্তবিক, যেমন লাল ঘোড়া, ঘোড়ার লাল রঙটা বাস্তবিক। তাহলে অবাস্তবিক লাল কি হবে? লাল রঙ অথচ লাল নয়। স্ফটিকের কাছে যদি লাল ফুল রাখা হয় তখন স্ফটিকটা লাল রঙের দেখাবে, কিন্তু স্ফটিকের কোন রঙ নেই, অথচ দেখাচ্ছে লাল। স্ফটিকের পাশে যে রঙের ফুল রেখে দেওয়া হবে স্ফটিককে সেই রঙের দেখাবে, আসলে স্ফটিক পাল্টাচ্ছে না। লাল ঘোড়া বা লাল ফুল আর লাল স্ফটিকের মধ্যে এটাই তফাৎ, একটা বাস্তবিক লাল আরেকটা উপাধি লাল। উপাধিটা মিথ্যা, স্ফটিকের পাশে যে রঙের ফুল রেখে দিচ্ছে স্ফটিক সেই রঙ ধরে নিচ্ছে, আসলে তার কোন রঙ নেই। যতক্ষণ ফুল আছে ততক্ষণ তার ওই ফুলের রঙ থাকবে, উপাধিটা সরিয়ে দিলে স্ফটিক আবার যেমনকার ছিল তেমন হয়ে যাবে।

আমরা যে লাল ফুল, লাল ঘোড়া বলছি তাতে আমরা একটা বস্তুর কল্পনা করছি। কিন্তু বাস্তবিক উপাধি, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিগুরু উপাধি সরিয়ে দিলে তিনি যেমন কবি তেমন কবিই থাকবেন। অথচ কবিগুরু উপাধি দিয়ে দেওয়াতে তিনি বিশিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁর কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। খুবই সহজ ব্যাপার, একটা বস্তু আছে, বস্তুকে বোঝাবার জন্য দুটো জিনিস ব্যবহার হয়, একটা বিশেষণ, আরেকটা উপাধি। বিশেষণ যখন দেওয়া হয় তখন এটা তার বাস্তবিক পরিবর্তন,

উপাধি যখন দেওয়া হয় তখন পরিবর্তন হয় কিন্তু অবাস্তবিক। যেমন স্ফটিকের পাশে লাল জবা রাখা হল, স্ফটিককে লাল রঙের দেখাবে, স্ফটিকের এই লাল রঙ অবাস্তবিক। আর যখন লাল ঘোড়া, লাল গোলাপ বলা হয়, তখন ঘোড়া বা গোলাপের রঙটা বাস্তবিক, দুটোতে তফাৎ আছে। রামানুজম্ বিশিষ্টাদ্বৈতে যে ব্রহ্মের কথা বলছেন আর আচার্য যে ব্রহ্মের কথা বলছেন সেখানে এই তফাৎটাই হয়। রামানুজম্ বলছেন, সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের গুণ। আচার্য বলছেন, এগুলো গুণ নয়, এটাই তাঁর স্বরূপ। তিনি এটাই, একটা বলাও যা, দ্বিতীয়টা বলাও তাই। বাকি যে জিনিসগুলো আসছে এগুলো উপাধি, এগুলো দেখাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে কিছু নেই। যখন প্রসঙ্গ আসবে তখন এই নিয়ে আলোচনা হবে।

এখানে মূল জিনিস হল, একটা বস্তুকে বিশিষ্ট বানিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু ওই বিশিষ্টের জন্য যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা বাস্তবিক নয়। পরিবর্তনটা বাইরে থেকে এসেছে, যতক্ষণ আছে ততক্ষণই আছে। এর আগে যে আমরা উপমা নিলাম, কাঠকে চেয়ার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখানে পরিবর্তনটা বাস্তবিক। এটা কিন্তু উপাধি নয়, বৈশিষ্ট্য এসেছে। বৈশিষ্ট্য দুই প্রকার হয়। একটা inner transformation, আরেকটায় transformation কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু দেখাচ্ছে। যেমন জল, জলে ঢেউ হচ্ছে, ঢেউটা মিথ্যা, জলটাই ঢেউ আকারে দেখাচ্ছে, শান্ত হয়ে গেলে সেই জলই থাকছে। ঠাকুর বলছেন, জল শান্ত হলেও জল, হেললে দুললেও জল, সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে তাও সাপ আবার তীর্যক গতিতে চলছে তাও সাপ। এই যে আপাত পরিবর্তন, এটাকেই বলা হয় উপাধি। Transformationটা এখানে উপাধি, বাস্তবিক নয়। উপাধি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আছে, যখন নেই তখন নেই। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে যেমন যেমন উপাধি দেওয়া হবে সেখান থেকে তেমন তেমন বস্তু বেরিয়ে আসবে। তিনি অনন্ত তাই উপাধিও অনন্ত, তাঁর প্রকাশও অনন্ত হবে। যখন দেহ, মন, বুদ্ধি তাঁর উপর চাপিয়ে দেবে তখন মানুষ হয়ে যাবে। চারটে পা, মন আর ইন্দ্রিয় চাপিয়ে দিলে তিনি গরু, ছাগল হয়ে যাবেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা, এই ভাব নিয়ে যখন একটা উপাধি লাগিয়ে দেওয়া হবে তখন তিনি ঈশ্বর হয়ে গেলেন। জগতে যে ক্রিয়াশক্তি, সঞ্চালন শক্তি চলছে, এই উপাধি দিয়ে দিলে তখন তাঁকে বলছেন বায়ু দেবতা। আত্মার উপর দাহিকা শক্তি লাগিয়ে দেওয়া হবে তখন তিনি অগ্নি দেবতা হয়ে যাবেন। এই ধরণের সমস্ত শক্তি যত রয়েছে, এই উপাধি লাগিয়ে দিলে তিনি দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হয়ে যাবেন। যখন ব্যক্তিগতে স্তরে একটা অজ্ঞান দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছেন তখন তিনি হয়ে যান জীবাত্মা। যখন একটা বিচার শক্তি দিয়ে তাঁকে সীমিত করে দিচ্ছি তখন বুদ্ধি বলছি। আগের অধ্যায়ে যে বললেন *প্রতিবোধবিদিতং*, যত রকম চিন্তা-ভাবনা উঠছে সব কিছুর মধ্যে সেই আত্মা। আত্মা আলাদা বলে কিছু হয় না, যিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম। এই জগতে যা কিছু বোধ হচ্ছে, যে কোন জিনিসের যে বোধ হয়, সেটাই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, শুধু তখন হয়ে যাচ্ছেন উপাধি সহিত ব্রহ্ম।

আমাদের ক্ষেত্রে উপাধি ঠিক ঠিক ভাবে হয়ে যায় সীমিত একজন। উপাধি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে সীমিত করে দেয়। এই যে সীমিত করে দেওয়ার কথা বলা হল, আসলে এটা মিথ্যা। কেন মিথ্যা? কারণ উপাধি মাত্রই মিথ্যা হয়। কেবল বেদান্তের ব্রহ্মের উপর এটা মিথ্যা হয় তা নয়, উপাধি জিনিসটাই মিথ্যা হয়। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দেখাচ্ছে, যখন নেই তখন নেই। যদি বাস্তবিক transformation হয়ে যায়, আমি তাকে আর ফেরত নিয়ে যাব না। কেমেস্ট্রিতে বলা হয় ফিজিক্যাল চেঞ্জ, কেমিক্যাল চেঞ্জ। যখন কোন জিনিসের ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয়, একটু যত্ন নিলে সেটা ফেরত চলে যাবে, কিন্তু কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়ে গেলে তাকে আর পালটানো যাবে না। দুধ যদি দই হয়ে যায় তাকে আর দুধে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু জল যদি বরফ হয়ে যায়, বরফকে আবার জলে নিয়ে যাওয়া যাবে। আশ্চর্যের যে আত্মা যখন কোন কিছু থেকে বা কোন কিছুতে transform হয়ে যান, সেখানে ফিজিক্যাল চেঞ্জের জন্য যে একটা প্রক্রিয়া লাগে সেটাও আত্মার ক্ষেত্রে দরকার পড়ে না। কারণ এখানে শুধু জ্ঞান আর অজ্ঞানের তফাৎ। কারণ এই তফাৎটা উপাধির জন্য হয়, আর উপাধি জিনিসটাই মিথ্যা। ওই মিথ্যা বোধটা সরিয়ে দিলেই যেমন ছিল তেমন হয়ে যাবে। এখানে একটা জিনিসকে খুব ভালো করে বুঝে নিলে ব্যাপারটা ধারণা করতে আর কোন অসুবিধা হবে না। একটা পেন, পেনকে যদি কোন

কারণে পাল্টে দেওয়া হয়, এই পেন কিন্তু আর ফেরত আসবে না। তার কারণ, এই পেন একটা, এই পেন দেশ, কাল ও বস্তুতে আবদ্ধ, পেনকে যদি ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে ভাঙা পেন স্থায়ী হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ এই পেনকে যদি চেঞ্জ করতে চায় এটা আবার কোন একটা বা দুটো বা তিনটে জিনিসেই চেঞ্জ হবে।

নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম অনন্ত, ব্রহ্মের একটা transformation হবে না, ব্রহ্মের অনন্ত transformation হবে। উপাধি দিয়ে দিলেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম ঈশ্বর রূপে দেখান। তিনিই আবার জগৎ রূপে দেখান, তিনিই আবার তেত্রিশ কোটি দেবতা রূপে দেখান, তিনিই আবার আল্লা রূপে দেখান, তিনিই আবার গড্ রূপে দেখান। আমাদের দেখতে হবে উপাধিটা কি, উপাধি যা তিনি তাই রূপে দেখাবেন। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত যত উপাধি আছে সবটাই মিথ্যা, মিথ্যা এই কারণে উপাধিগুলো সরিয়ে দিলে যা ছিল তাই থাকবে। কিন্তু যতক্ষণ আছে ওটা একেবারে সত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যত উপাধি দেওয়া হোক, বিশ্বকবি, কবিগুরু, নাইট যত উপাধিই দেওয়া হোক তাতে তাঁর কবিতার কোন পরিবর্তন হবে না। উপাধিগুলো ফেরত নিয়ে নেওয়ার পরেও কবিতার কোন পরিবর্তন হবে না। উপাধি জিনিসটা পরিবর্তন আনে ঠিকই, কিন্তু ওই পরিবর্তনটা বাস্তবিক পরিবর্তন নয়। ফলে উপাধি সরিয়ে দিলে জিনিসটা যেমন ছিল তেমনই দেখাবে। ঠাকুর বলছেন, তোমাকে আমি ডেপুটি ফেপুটি বলতে পারব না বাপু বা বলছেন, তোমাকে আমি রাজা-টাজা বলতে পারব না।

ঠাকুর একজন লোককে উপাধি ছাড়া দেখছেন। যত আমরা উপাধি ছাড়া দেখব তত আমাদের ভালোবাসা বেশি হবে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়। আমরা যাকে ভালোবাসছি একেই তো তার শুদ্ধ আত্মার উপর উপাধি দেওয়া আছে, জীবাত্মা হয়ে দেহধারী হয়ে গেছে, এরপর আমরা আরও পাঁচ খানা উপাধি চাপিয়ে দিচ্ছি। কি রকম? আমার সন্তান, আমার প্রথম সন্তান, আমার প্রথম সন্তান তাই অত্যন্ত ভালোবাসার সন্তান, এই ভাবে একটা একটা করে উপাধি চাপাতেই থাকছি। ফলে আমার সন্তানের বাইরে যারা আছে তাদের উপর আমার ভালোবাসা কমে যাচ্ছে। বেদান্ত তাই সব উপাধিকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। দেবতাদের উপাধি, মানুষের উপাধি, জগতের উপাধি সব ছিঁড়ে দিচ্ছে। তাহলে থাকবে কি? থাকবে সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সাধনা করতে করতে তাঁর সমস্ত উপাধি খসে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দুটো উপাধিই থেকে যায়, আমি আর আমার ঈশ্বর, এই দুটোর বাইরে বাকি সব উপাধি খসে পড়ে যায়। সিদ্ধ অবস্থায় যদি দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, সেখানেও কিন্তু একটা উপাধি থেকে যায় ঈশ্বর, আর ঈশ্বর থাকলে দুটো উপাধি হবেই, ঈশ্বর আর আমি। অদ্বৈত বেদান্ত এখান থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে যান। ওই আমিত্ব বোধ, এই অহঙ্কার, যেখান থেকে আমি বোধ হয়, এই উপাধিকেও তুমি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাও। তখন কি থাকবে? নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। তৃতীয় অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় এটাই।

আমি আছি আর আমার ঈশ্বর আছেন, এই অবস্থায় যিনি আছেন তিনি তো বলতে পারেন আমি এই অবস্থায় ভালোই আছি, আমার উপাধি ত্যাগ করার কি আছে! তাহলে উপাধি ত্যাগ না করলে কি হবে? এখানে দুটি জিনিস হয়। প্রথম কথা, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। এই কারণেই হিন্দুরা ধর্মান্তরণ করে না। হিন্দুদের কাছে পরিষ্কার কথা, 'সংসার জ্বালায় তুমি কি দগ্ধ হচ্ছ? তোমার জীবনে কি কষ্ট আছে? শোক আর মোহ কি আছে'? 'আমি তো সেইজন্যই আপনার কাছে এসেছি'। 'তাহলে এই নাও, তোমার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হল উপাধি'। এটা গেল প্রথম। কিন্তু এভাবে যদি সব confined করে দেওয়া হয়, তাহলে তো বিদ্যাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা। ধর্ম শাস্ত্র তারই জন্য যার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে মরছে, আমি আর পারছি না আমাকে বাঁচান। তখন তাকে বলা হবে, অনেক সুখ ভোগ করেছ। পেটের জ্বালা নিয়ে একজন ডাক্তারের কাছে গেছে। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করেছে কি খেয়েছিলে। ঝালমুরি খেয়েছিলাম। ডাক্তারবাবু প্রথম বলবেন, ঝালমুরি খেও না, আর এই ওষুধ খাও ঠিক হয়ে যাবে। যে ডাক্তার রোগীকে ধরেই বলে তোমার এই অসুখ, সেই অসুখ আছে,

সেই ডাক্তারকে লোকেরা বিশ্বাস করবে না। যে ডাক্তার এই হাসপাতাল সেই হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ডাক্তারকে কেউ বিশ্বাস করবে না। হিন্দু ধর্মে ঠিক এই কথাই বলে, তোমার সমস্যা তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমার কাছে যাবো না। তুমি না এলে তো বিদ্যাটাই হারিয়ে যাবে। যেমন ঠাকুর ছিলেন, ঠাকুরের কথা কজন জানত, কেশব সেনের মত মানুষ যদি পেপারে না লিখে থাকত, স্বামীজীর মত লোক যদি লেকচার না দিতেন তাহলে ধীরে ধীরে ওই বিদ্যাটা হারিয়ে যেত। ঠাকুরও তাই কুঠি বাড়ির ছাদের উপর থেকে ডাকছেন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। অন্য দিকে ত্রৈলঙ্গ স্বামী কি করেছিলেন? তাঁর কাছে কি আধ্যাত্মিক সম্পদ ছিল আমরা জানি না, কারণ তাঁর শিষ্যের পরম্পরা ছিল না, তাই সেটা হারিয়ে গেছে। ঠাকুরকে শ্রীমা এই কথাই বলছেন, 'ঠাকুর তুমি এলে, কদিন শিষ্যদের নিয়ে আনন্দ করে চলে গেলে, সব কি এখানেই শেষ হয়ে যাবে'। এই বিদ্যা যাতে শেষ না হয়ে যায় স্বামীজী তাই রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করলেন। হিন্দুরাও দেখল এই বিদ্যা যাতে শেষ না হয়ে যায় তাই ব্রাহ্মণ বর্ণকে দাঁড় করাল। তোমরা এই বিদ্যাকে ধরে রাখো যাতে এই বিদ্যার নাশ না হয়ে যায়। তুমি খাওয়া পাবে না, তোমার সম্পদ হবে না, সমাজ থেকে তোমাকে শুধু সম্মানটুকু দিয়ে দেওয়া হবে, এর বেশি কিছু পাবে না। ব্রাহ্মণরাও তাই আট দশ হাজার বছর ধরে এই বিদ্যাকে বহন করে চলে এসেছেন। আজ যে আমরা বেদ উপনিষদ পাচ্ছি, শুধু ব্রাহ্মণদের এই ত্যাগের জন। এখন প্রযুক্তি বিদ্যা অনেক উন্নত হয়ে গেছে, আর হারিয়ে যাবার সম্ভবনা নেই।

এবার প্রথম পয়েন্টে আর দ্বিতীয় পয়েন্টে এসে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। প্রথম পয়েন্ট হল আমার দরকার, আর দ্বিতীয় পয়েন্ট হল ব্রাহ্মণরা ত্যাগের দ্বারা যে বিদ্যাটা ধরে রেখেছেন, সেই বিদ্যার সংরক্ষণ। শুধু ধরে রাখলেই হবে না। কারণ বেদ উপনিষদের বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা নয়, এই বিদ্যা হল personality transforming বিদ্যা। যেমন যেমন এই বিদ্যা গ্রহণের সাথে গ্রহিতার ব্যক্তিত্বের যদি তেমন তেমন সদর্থক পরিবর্তন না হয়, এই বিদ্যা তার কোন কাজেই আসবে না। তবে এগুলো সিদ্ধ পুরুষের কথা কিনা, সিদ্ধ পুরুষের কাছ থেকে না শুনলেও, অন্য কোন ভাবে শুনলেও মনের অনেক জ্বালা যন্ত্রণার প্রশমন হয়। কিন্তু এই ধরণের matching খুব কম হয়। দুটো আমাদের পাশাপাশি চলতে থাকে, ব্রাহ্মণরা বিদ্যাটা ধরে আছেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ বড় ঋষি মহাত্মা হয়ে যাচ্ছেন। আর লোকেদের যখন দরকার পড়ছে তাঁরা গিয়ে, এই যে stream চলছে, গঙ্গা থেকে খাল কেটে নিয়ে আসার মতন। এক একজন সাধু, ঋষি এক একজন খাল, সেখান থেকে জল টেনে নিয়ে আসছেন। স্বামীজী হলেন প্রথম যিনি ধর্মকে বাস্তবায়িত করার দিকে নামালেন, ধর্মকে নিয়ে সবার কাছে যেতে শুরু করলেন। আর এই যাওয়াটা তিনি বিদেশে গিয়ে শুরু করলেন। এই দুটো জিনিস পাশাপাশি চলে, ব্রাহ্মণদের বিদ্যাটা রক্ষা করতে হয়, ওনাদের কাছে কোন দ্বিজ গেলে তাকে শিক্ষাটা দিয়ে দিতেন। কাজে লাগাবার জন্য ঋষিরা ছিলেন। আর মানুষের যখন দুঃখ-কষ্ট হত তখন তারা ব্রাহ্মণদের কাছে যেত আবার কখন ঋষি মহাত্মাদের কাছে যেত। এই দুটো দিক, একটা হল ব্যবহারিক প্রয়োগ যেখানে মানুষ শোক মোহের পারে যায় আর তার সাথে বিদ্যাকে রক্ষা করার দায়ীত্ব। আমরা এখানে যে শাস্ত্রের আলোচনা করছি এটা হল বিদ্যার সংরক্ষণ, যখন জেনে নিল তখন তত্ত্বটা সংরক্ষণ হয়ে গেল। এদের মধ্যে অনেকে আছে যারা দুঃখ-কষ্টে আছে, আমার কেন এই দুঃখ-কষ্ট হচ্ছে, তারা এটাকে জীবনে প্রয়োগ করল, সঙ্গে সঙ্গে তার ওই দুঃখ-কষ্টের লাঘব হয়ে যাবে। যদি কারুর মনে হয়ে আমার জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাত হয়েছে, তখন তার এগুলো জানা দরকার। কারণ যতক্ষণ উপাধি না সরানো হয় ততক্ষণ দুঃখ-কষ্ট যাবে না। বিদ্যার সংরক্ষণ আর বিদ্যাকে জীবনে প্রয়োগ করা, এই দুটো দিক।

শ্রীমা বলছেন, মনে রেখো আর কেউ না থাকুক তোমার একজন মা আছেন, এই কথাটা ভাবলেই আমাদের ভেতরে একটা অদম্য সাহস সঞ্চারিত হয়ে যায়। লোকনাথ বাবা বলছেন, বনে, জঙ্গলে যেখানেই বিপদে পড়বে আমাকে মনে করবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভয় চলে যাবে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও মা এই রকম কথা বলছেন। লোকনাথ বাবার নাম স্মরণ নিলে, শ্রীমার কথা মনে পড়লেই যদি শক্তি এসে যায়, তাহলে একবার যদি আমি ভাবি আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম

যেখান থেকে সব সৃষ্টি বেরিয়ে এসেছে, আমি সেই ব্রহ্ম যাঁর উপর উপাধি চাপিয়ে দিলে জগৎ বেরিয়ে আসে, এই যে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালাচ্ছে এরাও সেই আমি যার উপর সন্ত্রাসবাদীর একটা উপাধি দেওয়া আছে, আর দেশের শুভ যা কিছু হচ্ছে সেটাও আমি, তাহলে কি হবে একবার ভেবে দেখুন! কম্যুনিস্টরা বলে সবাই এক, দেশে যখন বলে justice for all, কিন্তু সবাই কি কখন এক হয়! আমার মাথা আর পা কি এক, equal justice কি কখন হয়? সমান একমাত্র আধ্যাত্মিক স্তরেই হয়, আধ্যাত্মিক স্তর ছাড়া equality কখনই হয় না। এনারা এখানে তাত্ত্বিক কিছু বলছেন না, ঠাকুরও সেই এক কথা বলছেন, গীতাতেও ভগবান একই কথা বলছেন, সবই শুদ্ধ আত্মা। উপাধির জন্য বস্তু পাল্টে যাচ্ছে। একটা একটা করে মন বুদ্ধি লাগিয়ে দিচ্ছে একটা করে লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টির খেলার উপাধি দিয়ে দিচ্ছে এটাই জগৎ রূপে ভাসছে। ওই সৃষ্টিতে যত শক্তি চলছে, বিভিন্ন শক্তিকে লাগিয়ে দিচ্ছে একটা একটা করে দেবতা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি দেবতা হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজের উপর দীন হীন কাঙালীর উপাধি লাগিয়ে দিচ্ছি, আমি একটা দীন-হীন কাঙালী হয়ে যাচ্ছি, বাস্তবে আমি সেই শুদ্ধ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। ঠাকুর বলছেন, তুমি মানো আর নাই মানো তুমি সেই রাম। এখানে আলোচনাটা ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়েই চলছে।

আচার্য অনেকগুলো জটিল জিনিসকে এক করে এক জায়গায় নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। আচার্য বলছেন এই তৃতীয় অধ্যায়টা অর্থবাদ, অর্থবাদ মানে গ্রন্থ স্তুতি বা যে কোন বিদ্যার স্তুতি। বেদের অর্থ নিরুপণের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল অর্থবাদ থাকতে হবে। তবে কোন শব্দে, কিভাবে গ্রন্থস্তুতি করবে বোঝা যায় না। ফলে শুধু বেদ কেন, যে কোন শাস্ত্র পড়ার সময় বোঝা যায় না এটা কি কোন instruction, নাকি অর্থবাদ। গ্রন্থস্তুতি করতে গিয়ে ওনারা কি বলে বসবেন কোন ঠিক নেই। অর্থবাদে প্রশংসা করার জন্য বলবেন, যে এই রকম করবে তার এই রকম হবে, স্বর্গে যাবে, এই হবে, সেই হবে। অথচ গ্রন্থস্তুতি করার পুরো অধিকার আছে, এটা আমাদের একটা প্রাচীন রীতি। কঠোপনিষদে নচিকেতার কাহিনী একটা আখ্যায়িকা, কেনোপনিষদের এটিও একটা আখ্যায়িকা। অথচ আচার্য বলছেন এটা অর্থবাদ। ভাষ্য ছাড়া তাই এই ধরণের শাস্ত্র পড়তে গেলে পুরো সংশয় লেগে যাবে। ঠাকুর বলছেন শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশিয়ে আছে। আমাদের পক্ষে ধরা খুব মুশকিল কোনটা চিনি কোনটা বালি। আচার্য বলছেন ব্রহ্ম বিদ্যার ব্যাপারে উপনিষদের যা কিছু বলার ছিল আগের অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ভাবে বলা হয়ে গেছে। এখন যেটা বলা হচ্ছে এটা অর্থবাদ, বিদ্যার স্তুতি করা হচ্ছে। কারণ এই বিদ্যাটা খুব কঠিনতম আর কত কঠিন সেটাকে অর্থবাদ রূপে আনা হচ্ছে। কাহিনীটা এই কারণেই আনা হয়েছে এটা দেখানোর জন্য যে, এই বিদ্যা একেবারেই সহজ নয়। কিভাবে বলছেন সহজ নয়? ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু দেবতার মত ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মের কাছে গিয়েও এই বিদ্যাকে জানতে পারল না। দেবতাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরাই যদি না জানতে পারে সেখানে তুমি যদি বিদ্যাটা না বুঝতে পারো তাতে দোষের কিছু নয়। এখানে উপনিষদের বিদ্যাটা যে বুঝতে পারছেন না তা না, আধ্যাত্মিক যে কোন বিদ্যা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। তার জন্য যে চরিত্র দরকার, যে সংযম লাগে, সেটা বেশির ভাগ মানুষেরই নেই।

কেউ যখন জেনে গেলে এই বিদ্যাটা কত কঠিন তারপর সে যখন উঠে পড়ে এই বিদ্যাকে পাওয়ার জন্য লাগবে তখন সে ভাববে, এই বিদ্যাটা কঠিন ঠিকই কিন্তু আমাকে এতে লেগে থাকতে হবে। আর শুধু লেগে থাকলেই হবে না, আমাকে খাটতে হবে। আমাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে আমাদের উপাধি কেন ছাড়তে হবে। কেনোপনিষদের শুরু হয়েছিল, শিষ্য এসে গুরুকে প্রশ্ন করছে, মন কার দ্বারা প্রেরিত হয়। গুরু শিষ্যকে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে দেখাচ্ছেন তুমি যখন এর অনুশীলন করতে যাবে তখন দেখবে এটা কত কঠিন। প্রাণপনে তোমাকে এই সংগ্রামে নামতে হবে। বোঝাতে গিয়ে ওনারা দু তিন রকমের উপমা এনেছেন, এরপর এটা যাতে ভালো ভাবে বুঝতে পারে সেইজন্য এই কাহিনীটা আনছেন। কারণ আমাদের মস্তিষ্ক স্থূল হওয়ার জন্য সূক্ষ্ম জিনিস অনেক সময় আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকতে চায় না, সেইজন্য কাহিনী রূপে বললে আইডিয়া যেন একটা আকার পেয়ে যায়। আকার পেয়ে গেলে আমাদের মনের যে জাল, যে জালের ফোঁকর গুলো বড় বড়, সেখানে ধরা পড়ে যায়।

দ্বিতীয় আরেকটা কারণ আচার্য বলছেন, এমন হতে পারে কাহিনীর উদ্দেশ্য হল আমাদের অহঙ্কারের নাশ করা। ইন্দ্রিয় সংযমে, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এগুলোতে আরও মানুষকে প্রেরিত করা জন্য এই কাহিনীকে নিয়ে আসা হয়েছে। মানুষ যদি রাগ-দ্বেষ যুক্ত হয় আর শম, দম আদি রহিত হয় তাহলে তার দ্বারা কোন দিন কোন জ্ঞানই হবে না। উপনিষদ বোঝা মানে উপনিষদের তত্ত্বের সাথে এক হওয়া। তত্ত্বের সাথে যদি এক না হয় উপনিষদ সে বুঝতে পারবে না। উপনিষদ বুঝতে হলে তাকে আগে রাগ-দ্বেষ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শুধু রাগ-দ্বেষ থেকে বেরিয়ে এলে হবে না। গ্রামের অনেক বিধবাও রাগ-দ্বেষের বাইরে চলে আসে, সবাইকে সে ভালোবাসে। তাই বলে যে সে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে তা নয়। শম, দম, উপরতি তিতিক্ষা এগুলোও যেন থাকে, এই গুণগুলো যদি না থাকে তাহলে তার দ্বারা উপনিষদের জ্ঞান প্রাপ্তি হবে না। ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যদি না হয় তাহলে উপনিষদ কোন দিন বুঝতে পারবে না।

আচার্য বলছেন, *ব্যাবৃত্তবাহ্যমিথ্যাপ্রত্যয়গ্রাহ্যত্বাদ্ব্রহ্মণঃ*, মিথ্যা প্রতীতি যা কিছু হচ্ছে, এটা গ্রহণ করা যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তখনই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। উপাধি কেন ছাড়ব, এই প্রশ্নের উত্তর এখানে দিচ্ছেন। উপাধি জিনিসটাই মিথ্যা, মিথ্যা বলতে যেখানে বাস্তবিক কোন পরিবর্তন না হয়ে আপাত পরিবর্তন হয়। যে কোন জিনিসে বাহ্য প্রতীতি হওয়াটা যতক্ষণ না বন্ধ করা হয় ততক্ষণ কোন দিনই ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে না। বাহ্য প্রতীতি হওয়া মানে, কোন জিনিসকে হয় আমরা ভালোবাসি অথবা কোন জিনিসকে হয় আমরা পছন্দ করি না। যাকে ভালোবাসি আমরা তার কাছে যেতে চাই, যাকে পছন্দ করি না তার থেকে দূরে থাকতে চাই। যেখানেই এর কাছে যেতে চাই, ওর থেকে দূরে থাকতে চাই, সেখানেই একটা ক্রিয়া দরকার। ক্রিয়া হলেই তার একটা ফল হবে। এবার প্রবৃত্তি এসে গেল, প্রবৃত্তি মানে একটা জিনিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বা একটা জিনিস থেকে বেরিয়ে আসছে। নিবৃত্তিতেও একটা প্রবৃত্তি থাকে, বেরিয়ে আসার ইচ্ছা। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুটোতেই ক্রিয়া লাগে। ক্রিয়া থাকলেই ফল হবে, ফল হলেই তার ভালো মন্দ হবে। ভালো মন্দ হলে ওই ভালো আর মন্দের প্রতি রাগ আর দ্বেষ থাকবে। ওই রাগ আর দ্বেষের জন্য আবার তাকে ক্রিয়া করতে হবে। এই যে চক্রাকারে চলতে থাকা, এটা শুধু হয় বাহ্য প্রতীতিতে।

একজন লোক গান শুনতে ভালোবাসে। যেখানেই গানের প্রোগ্রাম হবে সেখানে দৌড়ে যাবে। গান শোনার জন্য তাকে অনেকটা দূরে যেতে হবে, সে আবার বাসে করে যেতে পারে না, তার জন্য একটা গাড়ি লাগবে। গানের প্রতি একটা রাগ আর বাসের প্রতি একটা দ্বেষ। রাগ আর দ্বেষ জড়িয়ে গেল। গাড়ি কেনার জন্য টাকা চাই, টাকা আয় করার জন্য তাকে অনেক কিছু করতে হবে। রাগ আর দ্বেষ দুই প্রকার হয়, একটা হয় খুব তীব্র আর আরেকটা হয় কম তীব্র। রাগ-দ্বেষ যেখানে খুব তীব্র সেখানে একটু ভোগ করে বা বিচার করে ছাড়তে হয়। আর কম তীব্রতা শম, দম, তপস্যাদি করলে যায়। তা নাহলে ওটা যাবে না। কম তীব্র মানে, ওটা এখন বীজ স্তরে চলে গেছে। বীজ স্তরে ছোট ছোট চারা দেখা যাবে। সন্ন্যাসীদের দেখলে সবাই মনে করে উনি কত ত্যাগ করেছেন, তাঁদের সব কিছুই অন্যদের থেকে আলাদা। কিন্তু যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, আত্মদর্শন হয়নি তাঁর কিন্তু ত্যাগ এখন হয়নি। সাধু জীবন-যাপনের জন্য, গেরুয়ার জন্য আর আশ্রমে থাকার দরুন সন্ন্যাসী এখন সুরক্ষিত। সুরক্ষিত থাকার জন্য জগতের বেশির ভাগ ভোগের জিনিস থেকে তিনি সরে এসেছেন। সরে আসার জন্য ভোগের তীব্র স্পৃহাটা চলে যায়। কিন্তু ভোগের স্পৃহা গুলো বীজাকারে বা চারা রূপে থেকে যায়, ওগুলো তাঁর কোন দিন যাবে না। যে যত বড় সাধুই হন বা সন্ন্যাসীই হন, ঈশ্বর দর্শন হয়নি বা আত্মদর্শন হয়নি, এগুলো থাকবেই। এই জায়গাতে এসে আত্মনিয়ন্ত্রণ আর আত্মজ্ঞান দুটো সমান অনুপাতে চলে, যেমন যেমন তিনি আত্মজ্ঞানের দিকে এগোবেন তেমন তেমন তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণ বাড়বে। তেমনি যেমন যেমন তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ করবেন তেমন তেমন আত্মজ্ঞানের দিকে এগোবেন। যতদিন না আত্মজ্ঞান হচ্ছে ততদিন কামনা-বাসনার বীজগুলো যাবে না। ঠাকুর বলছেন, অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কালই আবার ফেকড়ি

বেরিয়ে আসবে। ফেকড়িটা কিন্তু বৃক্ষ নয়, কিন্তু ফেকড়ি থেকে বৃক্ষ হতে বেশি দিন সময় লাগবে না। একটি ফেকড়ি যদি থেকে যায়, পুরো অশ্বত্থ গাছ দাঁড়িয়ে যেতে কয়েকটা দিনের তফাৎ মাত্র।

গীতায় ভগবান বলছেন, *রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*, *পরং দৃষ্ট্বা*, পরমকে যখন জেনে যায় একমাত্র তখনই সমস্ত বীজের নাশ হয়। পরমকে জানার জন্য এই দুটো পাশাপাশি চলতে থাকে, যেমন যেমন ঈশ্বরের দিকে এগোবে তেমন তেমন জগতটা খসে যেতে থাকে, দ্বিতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, মন থেকে নিয়ন্ত্রণ, বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে নিয়ন্ত্রণ, শম, দম, তপঃ, তিতিক্ষা, উপরতি এগুলো চলতে থাকে। আর যেটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে সেটাকে ধরে রাখা, যাতে আর না চলে যায়। সন্ন্যাসীরা মনে করেন, আমি তো ইন্দ্রিয় জয়ী আমার আর কিসের ভয়। কিন্তু সন্ন্যাসীকেও ধরে রাখতে হয়, কারণ যদি কোন কামনা-বাসনা ধাক্কা মারে সন্ন্যাসী নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না। একটা মত্ত হাতিকে পিলখানায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু ধরে আনলেই হবে না, ভালো করে চেন দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। এটাকেই বলে উপরতি, যেটাকে টেনে আনা হয়েছে সেটাকে ভালো করে বেঁধে রেখে দাও।

তিতিক্ষা মানে সব রকম কষ্ট সহ্য করা। ইন্দ্রিয় সংযম না হলে আমিত্বটা পুরো দমে থাকে। আমিত্ব যদি পুরো দমে থাকে তাহলে আধ্যাত্মিক জীবন এগোতেই চাইবে না। আধ্যাত্মিক জীবন তাই খুব কঠিন। লোকে মনে করে ঠাকুরের মন্ত্র পেয়েছি, জপধ্যান করব তাতেই হয়ে যাবে, না এতে কিছুই হয় না। সেইজন্য বেদান্তে প্রথমেই বলে দেওয়া হয়, শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা এই চারটে যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে তুমি এগোতে পারবে না। আচার্য বলছেন, নিজের অহঙ্কার, এই আমিত্ব বোধ, এর যদি শান্তি হয়, এর অভিমান যাতে নাশ হয়, তবেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। আমাদের সমস্যা হল আমাদের বাহ্য প্রতীতি এতই বেশি, আর তার উপর এই আমিত্ব, এর নাশ আমাদের জন্য অনেক দূরের কথা। আমিত্বের যদি নাশ না হয় তোমার কিছুই করার নেই।

তৃতীয় বলছেন, প্রথম দুটো অধ্যায়ে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলা হল, এই অধ্যায়ে তাই সগুণ সাকারের প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন। প্রথম অধ্যায়ে কয়েকটা মন্ত্রে বলা হয়েছিল *নেদং যদিদমুপাসতে*, তুমি যাঁর উপাসনা করছ ইনি তা নন। সেইজন্য এই উপাসনা ব্রহ্মের উপাসনা হতে পারে না। আগে বলা হয়েছে যে, সাধনা দুই প্রকার, ইতি ইতি আর নেতি নেতি। ইতি ইতি সাধনায়, একজন ইষ্টের প্রতি বোধ রাখা হয়। নেতি নেতি যা কিছু আছে সব কিছুকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। জগতে যত ধর্ম সব ধর্মই dualistic, এটা তারা নিজেরাও জানে না। Dualistic একটা Technical term, যেখানে দুটো সত্তাকে মেনে নেওয়া হচ্ছে। আমি আর ইষ্ট, দুটো সত্তা মানেই dual হয়ে গেল। যখনই জীব আর ব্রহ্মে ভেদ রাখা হয় তখনই ওটা dualistic হয়ে যায়।

অদ্বৈতের সাধনা মানেই নেতি নেতি সাধনা। ইসলামে বলা হয় আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর, আমরা তা বলি না, কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর আমরা বলি না, আমরা বলি কৃষ্ণই একমাত্র আছেন, এই জগতে কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই। কৃষ্ণের সাধনা কিভাবে হবে? কৃষ্ণ মন্ত্রের জপ করে। তখনই dualism হয়ে গেল। অদ্বৈত যদি হয়, ওখানে সাধনা হবে না। সাধনা এই জন্যই হবে না, নির্গুণ নিরাকারই আছেন, ওখানে উপাধি দিয়ে দিলে আলাদা দেখাবে। এখানে তাই সাধনা হল উপাধিকে সরানো। উপাধিকে সরানোটা উপাসনা রূপে হয় না, উপাসনা হল একটা দিকে মনকে নিয়ে যাওয়া। নেতি নেতি মানে উপাধিকে সরিয়ে দেওয়া। সেইজন্য আগেই বলে দেওয়া হল, *নেদং যদিদমুপাসতে*, তুমি যাঁর উপাসনা করছ তিনি কিন্তু ব্রহ্ম নন। তার মানে যখনই উপাসনা হচ্ছে সেটা ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্মের উপাসনা মানেই নেতি নেতি পদ্ধতিতে উপাধিকে বাদ দেওয়া। যখনই মনে কোন ধরণের উপাধি এসে যাচ্ছে, তখনই উপাধিকে সরিয়ে দিতে হবে। এর অনুশীলন করা দূরের এটাকে বোঝাও সম্ভব নয়। সেইজন্য ঠিক ঠিক অদ্বৈত সাধনায় উপাসনা হয় না, অদ্বৈত সাধনা তাই খুব কঠিন। গীতায় ভগবান বলছেন, *অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে*, যাঁরা অব্যক্তের সাধনা করেন তাঁদের শুধু দুঃখই দুঃখ, কারণ বেশির ভাগই দেহবুদ্ধি নিয়ে চলে, দেহের সাথে একত্ব হয়ে থাকার জন্য অব্যক্ত সাধনা করতে পারে না। সেইজন্য উপনিষদ

সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসনাকে এখানে নিয়ে আসছেন। কারণ সাধারণ মানুষ নেতি নেতি সাধনা করতে পারবে না, তাই দেখিয়ে দিচ্ছেন সগুণ সাকারের উপাসনা কিভাবে হয়।

আচার্য বলছেন, এখানে ব্রহ্ম শব্দ বলতে পরমাত্মাকে বুঝতে হবে, পরমাত্মা মানে ঈশ্বর। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম কোন কিছুতে জড়ান না, কিন্তু তিনি শক্তি রূপে বা সাক্ষাৎ অবতার রূপে এসে ধর্মের সংস্থাপন করে দেন। আচার্য খুব সুন্দর যুক্তি নিয়ে আসছেন, *ন হ্যান্যত্র পরাদীশ্বরাৎ নিত্যসর্বজ্ঞাৎ পরিভূয়াগ্ন্যাদীস্তৃণং বজ্রীকর্তুং সামর্থ্যমস্তি*। কাহিনীতে বলছেন, অগ্নি দেবতা গেলেন, তাঁকে একটা ঘাসের টুকরো দিয়ে বললেন, এটাকে পুড়িয়ে দাও। অগ্নি দেবতা পারলেন না। বায়ু দেবতাকেও বললেন, বায়ু দেবতাও পারলেন না। আচার্য খুব সহজ একটা যুক্তি নিয়ে এসে বলছেন, একটা ঘাসের টুকরোকে বজ্র সমান করে দিতে পারেন এটা ঈশ্বর ছাড়া কেউ পারবে না। ঘাসের টুকরো বজ্রের মত হয়ে গেছে তাকে আর অগ্নি পোড়াতে পারবে না। এই ক্ষমতা, একটা ঘাসের টুকরোকে বজ্রের সমান করে দিলেন, একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিসে পরিবর্তন করে দিচ্ছেন, এই ক্ষমতা ঈশ্বর ছাড়া আর কারুর হতে পারে না, কারণ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ। কিন্তু ওটা শেষ কথা নয়, বেদান্ত মতে শেষ কথা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, তিনি কখনই ঘাসের টুকরোকে বজ্র সম করে দেবেন না। তিনি সব সময় উপাধি রহিত, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, উপনিষদের যিনি আত্মা, তিনি কোন কিছুতে জড়ান না। কিন্তু ঈশ্বর, তিনিও লিপ্ত নন, কিন্তু জগৎ কার্যে তিনি আছেন। সেইজন্য তিনি ঘাসের টুকরোকে বজ্র বানিয়ে দিচ্ছেন।

কেন বানিয়ে দিচ্ছেন? যেমন যেমন এগোব তেমন তেমন ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর পাব। ব্রহ্ম আর ঈশ্বরের মধ্যে কি সম্পর্ক, এটাকে বোঝান যায় না। যাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁরাই এর অনুভব করেন। এর একটা খুব স্থূল উপমা নেওয়া যেতে পারে। অকুল সমুদ্র, সমুদ্রের একটা বিরাট ঢেউ উঠেছে। সেই ঢেউটা এখন চলছে, চলতে চলতে কখন উপরে উঠছে আবার কখন নীচে নেমে যাচ্ছে। ফিজিক্সে ঢেউকে বলে একটা disturbance, ঢেউ বাস্তবিক কিছু না। ওটা ঢেউ চলে না, disturbance চলে। ফিজিক্সের সিদ্ধান্তে disturbanceটা যেন একটা এনার্জি, যেটা চলছে। ওটাই ঢেউ আকারে দেখায়, আসল জলটা কোথাও যায় না। পুকুরে যদি একটা পাথর ছুঁড়ে ফেলা হয় তখন মনে হবে তরঙ্গ চলছে। আসলে কিছুই চলে না, একটা disturbance, একটা এনার্জি চলতে থাকে। একটা কাগজের টুকরো যদি ওই তরঙ্গের উপর ফেলে দেওয়া হয় তখন দেখা যাবে কাগজের টুকরোটা একই জায়গাতে যেমন যেমন ঢেউ আসছে তেমন তেমন উঠতে নামতে থাকে, কাগজটা কোথাও যায় না। তার মানে আসলে জল নড়ছে না। বেদান্ত মতে এটাই সৃষ্টি। কিছুই চলে না, কোথাও যায় না, শুধু মনে হয় যেন চলছে।

তখনকার দিনে ঋষিরা ফিজিক্সের সিদ্ধান্ত জানতেন না, কিন্তু তাঁদের কাছে সব পরিষ্কার ছিল। অকুল সমুদ্র কোন কুল কিনারা নেই, সেখানে একটা বিরাট ঢেউ উঠল। এই যে ঢেউ চলছে, এক একটা ঢেউয়ে হাজার হাজার টন জলরাশি, কিন্তু তাতে এক একটা জলবিন্দু আছে। এবার যদি কল্পনা করা হয়, এই জলরাশি চলছে, তা ফিজিক্সের সিদ্ধান্তেই নেওয়া হোক বা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতেই নেওয়া হোক, আমরা মেনে নিচ্ছি ঢেউটা চলছে। ঢেউয়ের মধ্যে এখান দুটো জিনিস চলছে, একটা হল পুরো ঢেউটা, দ্বিতীয় চলছে জলের পার্টিকেলস গুলো। ওই যে পুরো ঢেউটা, এটাই ঈশ্বর আর জলের মধ্যে যে এক একটা পার্টিকেলস আছে, ওটাই জীব এবং তার যে বাহ্য রূপ এটাই জগৎ। এনারা বলেন, এই ঢেউ বা ঈশ্বর সমুদ্র থেকে আলাদা কিছু নয়। আর যত জীব আছে সবই ঈশ্বরের শরীরের অঙ্গ। যখন ঢেউটা শান্ত হয়ে সমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে তখন যেন একটা সৃষ্টি শেষ হয়ে গেল। আবার এক সময় ঢেউ উঠবে। এই ঢেউ ওঠা ঢেউয়ের মিলিয়ে যাওয়া, এটাই শক্তির খেলা। শক্তির খেলায় কখন ঢেউ উঠল আবার একটা সময় সমুদ্রে মিলিয়ে গেল। এই উপমাতে একটাই তফাৎ হয়ে যায়, ঢেউয়ের যে সমগ্র জলরাশি, এর সমষ্টিকে বলছেন ঈশ্বর, এখানে জলরাশি নেই, এখানে হল শুদ্ধ চৈতন্য সচ্চিদানন্দ, তাই এখানে পার্টিকেলস্ বলে কিছু হয় না, তাঁর একটা কণা আর তাঁর পুরোটা সমান, এর ধারণা করা

আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা জলের সমুদ্র নয়, চৈতন্যের সমুদ্র। আলোর সমুদ্র বললে সেখানেও ফোটন আছে, চৈতন্যতে তা হয় না, চৈতন্যের কোন বিভাজন হয় না, এর একটা কণাও যা পুরোটাও তাই। এই উপমাটা একটা জিনিসকে বোঝানর জন্য বল হল। যখন তিনি চলছেন তখন সৃষ্টি, সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ে যে চৈতন্য সত্তা, সেটাই ঈশ্বর, আর ঈশ্বর ও ব্রহ্ম আলাদা কিছু নয়। তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে এক বিন্দু জলও যা, বড় ঢেউও তাই, এটাও জল ওটাও জল কিন্তু ঢেউ রূপে আর জলকণা রূপে দুটো আলাদা। এই সিদ্ধান্তকে আধার করেই এই আলোচনা চলছে।

আচার্য বলছেন, *ঈশ্বরেচ্ছয়া তৃণমপি বজ্রীভবতীত্যুপপদ্যতে*, একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই একটা ঘাসের টুকরো বজ্র সম হয়ে যেতে পারে। ঈশ্বর নিজে করে দেন না, তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই হয়ে যায়। এখানে আবার খুব জটিল এক দার্শনিক তত্ত্ব এসে যাচ্ছে। আমি যখনই কোন কিছুর ইচ্ছা করি তখন ওটাকে কার্যে পরিণত করতে আমি উঠে পড়ে লেগে যাব। এখানে আমার ইচ্ছাকে ফলে রূপান্তরিত করার জন্য কার্যের সাহায্য নিতে হবে। আমি যদি কিছু বিশেষ কোন দামী খাবার খেতে চাই, আমাকে আগে টাকা জোগার করতে হবে, যেখানে এই বিশেষ খাবার পাওয়া যায় সেখানে যেতে হবে, একটা লম্বা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু সব কিছুর মূলে রয়েছে একটা চিন্তা, ওই চিন্তার পরিণতি হল অনেকগুলো কার্যে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা হয় না, শুদ্ধ চৈতন্যের চিন্তা করাও যা, জিনিসটা হয়ে যাওয়াও তাই। তিনি যেমনি ভাবলেন সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হয়ে গেল। এই কথাই আচার্য বলছেন, তাঁর ইচ্ছা মাত্রই ঘাসের টুকরো বজ্র হয়ে যায়। সেইজন্য এখানে যে ব্রহ্ম শব্দ আনছেন, এই ব্রহ্ম বলতে ঈশ্বর। কাহিনীর মাধ্যমে তিনটে জিনিসকে দেখাচ্ছেন, প্রথম হল এই বিদ্যাটা কত কঠিন, দ্বিতীয় শম, দম, তিতিক্ষা ও উপরতি অর্থাৎ সংযম না হলে এই বিদ্যাকে আয়ত্ত করা যাবে না আর তৃতীয় ঈশ্বরোপসনাকে এখানে রাখা হচ্ছে। আচার্য প্রথমে কাহিনীটা বলে এর একটা ভূমিকা রাখলেন।

আজ থেকে একশ বছর আগেও বেশির ভাগ মানুষের বেদান্ত বোঝার ক্ষমতা ছিল না। যাঁরা পরম্পরা বিদ্যাতে বড় হতেন তাঁরাই বুঝতেন। বর্তমান ফিজিক্সের এক এক করে সব সিদ্ধান্ত আসার পর বেদান্তের অনেক কিছু সবার পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। এটাকে বলে counter intuitive, আমাদের মন বলছে জিনিসটা এই রকম চলবে কিন্তু বাস্তবে দেখছি জিনিসটা অন্য রকম চলছে। আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি আসার পর যখন কোয়ান্টাম ফিজিক্স এলো তখন তার এতো counter intuitive যে আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীও কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে মানতে রাজী হলেন না, অনেক দিন পর্যন্ত কোয়ান্টাম ফিজিক্সের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থেকে গেলেন। কিন্তু বিরোধিতা করে কি আর হবে, যেটা সত্য সেটাকে তো নাকচ করে দেওয়া যাবে না। বেদান্তের সিদ্ধান্ত গুলিও এত counter intuitive যে আমরা এভাবে কল্পনা করতে পারি, যাঁরা সাধনা করেন তাঁদের সাথে যদি কেউ আলোচনা করতে যায়, করতে করতে একটা জায়গায় গিয়ে সব এলেমেলো হতে শুরু করে দেয়, ধরে রাখাটা খুব কঠিন। গুরু মুখে শুনে শুনে অনেকের ধারণাটা দৃঢ় হয়ে গেছে, সেখান থেকে আর সরে যায় না। অথচ আচার্য শঙ্করকে ছেড়ে কেউ যদি রামানুজমের ভাষ্য পড়তে শুরু করে তখন তার সবটাই অন্য রকম মনে হতে থাকবে। আচার্যের সাথে রামানুজের বিরোধের কারণ বোঝার জন্য আরেকজন তৃতীয় আচার্যের দরকার, তিনি যদি বুঝিয়ে দেন কেন এই তফাৎ, তবেই বোঝা যাবে। এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য যে কত সূক্ষ্ম স্তরে বেদান্তের আলোচনা চলে, এইটাকে ধারণা করা।

অথচ এটাই সত্য, আচার্য শঙ্কর যা বলেছেন, ঠাকুরও তাই বলছেন। ঈশ্বর আর ব্রহ্মের একত্ব। ভক্তরা তাও মেনে নেয়, বেদান্তীরা মানেন না, অথচ এটাই আশ্চর্যের কথায় কথায় তাঁরাও এই এক কথা বলছেন। আচার্যের শিষ্যরা আবার দেখাচ্ছেন এই দুটো যেন আলাদা, ফলে অনেকের প্রচুর সমস্যা হয়ে যেত। আচার্য শঙ্কর ঈশ্বর আর ব্রহ্মে কোন তফাৎ করেন না। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যখন এসে যায় তখন তাকে ঈশ্বর বলছেন। ঈশ্বরও তাই একটা উপাধি। কি উপাধি? সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যিনি কর্তা, কর্তাটা হয়ে গেল একটা উপাধি। এখন ওই যে সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, সেটাকে এখান ঈশ্বর রূপে দেখাচ্ছে।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যে কর্তা, এই কর্তা উপাধিকে সরিয়ে দিলে, তখন আর কিসের ঢেউ, কিসের জল, শুধু সচ্চিদানন্দ সমুদ্রই আছে।

সাধারণ লোকেদের বোঝানর জন্য অনেক রকম শব্দের ব্যবহার করতে হয়, সেই রকম অনাত্মাও একটা শব্দ। আত্মা আর অনাত্মা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু অনাত্ম শব্দ যেমনি বলা হল তার মানে আত্মা ছাড়া আরেকটা বস্তু এসে গেল। মাখন আছে আর মাখনের ডেলা আছে। মাখন দিয়ে মাখনের কিছু করতে গেলে কিছু করা যাবে না। জল দিয়ে জলের উপর দাগ টানা যাবে না। তেমনি মাখন দিয়ে মাখনকে কাটা যাবে না। এটাকে বলে স্বক্রিয়ার অভাব, ঠিক ঠিক একই বস্তু যদি থাকে, সেই বস্তুর উপর ওই একই বস্তু দিয়ে কিছু করা যাবে না। সেই রকম আত্মা দিয়ে আত্মার উপাধি হবে না, উপাধি মানেই একটা বিভাজন। আত্মা দিয়ে আত্মাকে বিভাজন করা সম্ভব নয়। অথচ বিভাজনটা বাস্তব, আমি আপনি আলাদা। শুধু বেদান্ত নয়, সমস্ত ধর্মের কাছেই এটা একটা সমস্যা। সমস্যা হল, যিনি ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ, সেখান থেকে এই সৃষ্টি কি করে আসে। এর উত্তর কারুর কাছেই নেই। বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বর, জীব ও জগতের বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে, আর খুব সহজ ভাবে উত্তরও দিয়ে দেন। কিন্তু যুক্তি তর্ক দিয়ে চলতে শুরু করলে তখন দেখা যাবে ওই উত্তর কোন ভাবেই দাঁড়াচ্ছে না। সেইজন্য হিন্দু ধর্ম ছাড়া সব ধর্মই বিজ্ঞানের কাছে মার খাচ্ছে, হিন্দু ধর্মের কাছে কোন সমস্যাই হয় না। তখন বোঝানর জন্য বলা হয়, আত্মার উপর অনাত্মের একটা ছায়া পড়ে। যেমনি বলা হল আত্মার উপর অনাত্মের ছায়া, তখন আত্মার উপর একটা বস্তুকে নিয়ে আসতে হয়। যেমনি আলাদা একটা বস্তু নিয়ে আসা হবে তাহলে বুঝতে হবে আত্মা ছাড়াও অন্য কিছু আছে। অথচ বেদান্ত বলছে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। তাহলে ব্রহ্মের উপর কিসের ছায়া পড়ছে? এটাই সমস্যা। একদিকে বলছেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই, অন্য দিকে বলছেন আত্মার উপর অনাত্মার ছাপই উপাধি। তাহলে অনাত্মাটাও তো আত্মা, কোথাও কোন বিরোধ নেই। ঈশ্বর ছাড়া কি কিছু আছে! ঈশ্বর যদি না থাকেন, মানে ঈশ্বর ছাড়া যদি কিছু হয়, তাহলে অনীশ্বর হয়ে যায়। আর অনীশ্বর যেটা হয়ে যায় তার সত্তা থাকতেই পারে না। সত্তা মানেই সৎ, সৎ মানেই ঈশ্বর। তাহলে ঈশ্বর ছাড়া তো কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরের যে শক্তি সেটাও ঈশ্বরই। তাহলে সেই ঈশ্বর এত রূপে কি করে দেখাচ্ছেন? এই রহস্য আবার এসে যাচ্ছে। কোন ধর্মই এর উত্তর দিতে পারে না। যে কোন ধর্মগ্রন্থকে এই প্রশ্ন নিয়ে ঝাঁকুনি দিলে দাঁড়াতে পারে না। একমাত্র বেদান্তই দাঁড়াতে পারে।

বেদান্ত বলবে, অনাত্ম বলে কিছু নেই। তাহলে এগুলো কি হচ্ছে? ওই যে সচ্চিদানন্দ, ওখানে রহস্য কিছু একটা হয়। রহস্য কেন? গীতায় ভগবান বলছেন, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*, আমার যে মায়া এটা দৈবী, দৈবী হওয়ার জন্য মানুষ এটাকে কোন দিন বুঝতে পারবে না। আর এই দৈবী মায়া এটা ঈশ্বরেরই, দুটো আলাদা কিছু না। সেইজন্য তন্ত্র সাধনায় বলে শিব আর শক্তি। কেন বলে? এটাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তিনি, যিনি এক, তিনি এবার শিব আর শক্তি রূপে এসে যান। দুটো এসে যাওয়া মানে এবার খেলা শুরু হয়ে গেল, সৃষ্টি হওয়ার আর কোন সমস্যা নেই। মূলে তিনি এক, কার্যক্ষেত্রে তাঁরা দুই হয়ে যান। বেদান্তে সেইজন্য এটাকে বলে মায়া। মায়া মানে নেই, অথচ দেখাচ্ছে যেন আছে। নেই কিন্তু দেখাচ্ছে আছে, এটাকেই বলছেন অনাত্মা। আসলে আমরা যখন ভাবি তখন ভাবছি, শুদ্ধ আত্মা আছেন, এর উপর আমার মন আছে, মনটা যেন অনাত্মা, আত্মার উপর ছাপ পড়ছে ইত্যাদি। এরকম কিছুই নয়। বেদান্ত যুক্তি দিয়ে দিয়ে দেখান, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আত্মা ছাড়া কিছু নেই। যেমন সমুদ্র আর ঢেউ। ঢেউ বলে কিছু নেই, ওই সমুদ্রের জলই একটা আকার নিয়েছে, মূল সমুদ্র, সমুদ্রই আছে। তখন বলবেন, ঢেউএর পেছনে একটা শক্তি আসছে, সেই শক্তি সূর্য থেকে আসুক, বাতাস থেকে আসুক, যাই থেকেই আসুক, দুটো ফ্যাক্টর এসে যাচ্ছে তবেই সমুদ্রে ঢেউ তৈরী হচ্ছে। এনারা এটাই বলেন, ব্রহ্ম আর শক্তি এক, এটাই আছে, যিনি চৈতন্য তিনিই শক্তিমান, যিনি শক্তিমান তিনিই শক্তি। ঠাকুরও বার বার অগ্নি আর দাহিকা শক্তির কথা বলছেন।

Realityএর উপরে যে appearance এসে যায়, এটাকেই বলছেন অনাত্মা। আমি ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি, আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে ঠাকুরের ধ্যান করতে। আমিও এবার ধ্যান করছি এই ভেবে যে, ঠাকুর হলেন সেই চৈতন্য, আর আমি হলাম শরীরধারী, আমার ভেতরে কত রকম কাম, ক্রোধ, লোভ রয়েছে, এগুলোর জন্যই আমার আসল স্বরূপকে কেমন দেখাচ্ছে। এই ভাবে যেতে যেতে আরও যদি গভীরে যায় তখন আত্মা অনাত্মার ব্যাপারগুলো এসে যায়। আমাদের কাছে মনে হয়, তিনি আছেন, জগৎ আছে আর আমি আছি, এই তিনটের সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে আমাদের দম বেরিয়ে যায়। বেদান্ত মতে এই তিনটে এক, আলাদা কিছু নয়। যেটা দেখাচ্ছে, ওটা বাস্তবিক শুধু দেখাচ্ছে, এছাড়া আর কিছু না।

রিচার্ড ফাইনম্যান্ খুব নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী, নোবেল প্রাইজও পেয়েছেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রেডিও থেকে তাঁকে ইনভাইট করে বলা হয়েছে 'আপনি যার উপর কাজ করে নোবেল প্রাইজ পেলেন, দু মিনিটে একটু বুঝিয়ে দিন জিনিসটা ঠিক কি'। ফাইনম্যান্ খুব সুন্দর করে দু তিনি মিনিটে বললেন, কিন্তু শ্রোতারাও কেউ তাঁর বক্তব্য কিছু বুঝতে পারল না, আর যে সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল সেও কিছু বুঝল না। তার কিছু দিন পরেই ফাইনম্যান্ ট্যাক্সি করে কোথাও যাচ্ছিলেন। ট্যাক্সিওয়ালা ফাইনম্যানকে চিনতে পেরেছে, 'আপনি মিস্টার ফাইনম্যান'? 'হ্যাঁ'। আমেরিকাতে সবাই খুব পড়াশোনা করে, প্রেসিডেন্ট থেকে একজন ট্যাক্সিওয়ালা পর্যন্ত সবাই বিজ্ঞান, সাহিত্য নিয়ে চর্চা করে। তা নাহলে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার রেডিওতে একজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানী কি বলছেন সেটাকে মন দিয়ে শুনছে। ড্রাইভারটি বলছে, 'সেদিন আপনার লেকচারটা শুনলাম, আপনাকে যে দু মিনিটে বলতে বলা হয়েছে, এটা খুবই বোকা বোকা কথা'। ফাইনম্যান্ ড্রাইভারের কথা শুনে খুব সতর্ক হয়ে গেলেন। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলছে, 'আমি যদি আপনার জায়গায় হতাম আর আপনি যদি আমাকে ওই রকম প্রশ্ন করতেন তাহলে আমি বলতাম, আমার রিসার্চ যদি দু মিনিটে বলা যায় তাহলে এটা নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হত না'। যে জিনিসটার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তার মানে এটাকে দু মিনিটে বলা যাবে না।

তাহলে আট হাজার দশ হাজার বছর ধরে হিন্দুরা এই ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এই ধর্ম একটা জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর একটা পুরো বর্ণ, ব্রাহ্মণরা নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছেন, এই বিদ্যা, এর শাস্ত্রগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেইজন্য বলা হয়, এই বিদ্যা অত সহজ নয়। আমরাও প্রথম থেকে এই কথা বলে আসছি, কেনোপনিষদই বলে দিচ্ছেন, বাপু অত সহজ নয়। বেশি সহজীকরণ করে দিলে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। কেনোপনিষদ কবে রচনা হয়েছে আমাদের জানা নেই, খুব কম করে হলেও পাঁচ থেকে ছয় হাজারের নীচে তো হবেই না, বরং আরও বেশিও হতে পারে। ছয় হাজার বছর ধরে পরম্পরার থেকে পরম্পরায়, আর কোন একটা পরিবার নয়, ভারতের হাজার হাজার পরিবারের যজ্ঞ উপবীত ধারণ করে বাবা-মায়ের আশ্রয় ছেড়ে ব্রাহ্মণ সন্তানরা গুরুগৃহে চলে গেল আর ঘুম থেকে উঠে খাওয়া নেই দাওয়া নেই একটার পর একটা শাস্ত্র আবৃত্তি করে করে মুখস্ত করে যেত। মিলিটারিরা যেমন নিজের জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করে সীমান্তে লড়াই করে, ভারতের পুরো একটা বর্ণ ব্রাহ্মণরা ঠিক সেই রকম যে বিদ্যাকে রক্ষা করে এসেছেন নিজেদের বলিদান দিয়ে, সেই বিদ্যা যদি অতি সহজ হত তাহলে তাঁরা এভাবে একে রক্ষা করতেন না।

এরপর বলছেন, *ঈশ্বর নিত্যপ্রসিদ্ধঃ*, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এই সব শাস্ত্রের মাধ্যমে মানুষ জানে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু এর বিশেষ অর্থটা বোঝানর জন্য এই কাহিনীর উপস্থাপনা করা হয়েছে। এর আগে একটা মন্ত্রে বলা হয়েছিল *প্রতিবোধবিদিতং*, যেখানে বলা হয়েছিল, যত রকম চিন্তা-ভাবনা আছে, ইন্দ্রিয়ের যত রকম কাজ আছে, সব কিছুর আধার আত্মা। কিন্তু এখানে এসে আচার্য পাল্টে যাচ্ছেন, পাল্টে গিয়ে বলছেন, যেটা ন্যায় শাস্ত্রেও বলা হয়, সৃষ্টিকে দেখলে স্রষ্টার অনুমান হয়। এর উপমা হল, নদীর ওপারে বন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে ধুয়ো উঠছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে ওখানে লোকজন

আছে। আচার্য এখানে খুব সুন্দর ভাষার প্রয়োগ করে বলছেন, *যদিদং জগদ্দেবগন্ধর্বযক্ষরক্ষঃ পিতৃপিশাচাদিলক্ষণং*, এই যে সৃষ্টি যেখানে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র কত বিচিত্র রকমের জিনিস দেখাচ্ছে, আর তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের যোনি বিভিন্ন স্থানে বাস করছে, আর যেখানে গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, পিশাচাদি যে নানা রকমের প্রানী আছে, এমন একটা সৃষ্টি যেটাকে দেখে অনন্ত মনে হয়। আর এখানে বাস করা মানে মনের বিভিন্ন স্তরে যারা অবস্থান করছে, যাদের বলছেন গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, পিশাচাদি, সব কিছু দেখে মনে হয়, এর পেছনে কোন এক চৈতন্য সত্তা আছেন, যিনি *অত্যন্তকুশলশিল্পিভিরপি*, একজন অত্যন্ত কুশল শিল্পী ছাড়া এই ধরণের সৃষ্টির কাজ কেউ করতে পারেন না।

আইনস্টাইন প্রথম যে থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি নিয়ে এলেন, ওটাকে প্রমাণ করার কোন পথ ছিল না। ইদানিং কালে এখন বিজ্ঞানের কিছু কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষা হচ্ছে যেখান থেকে একশ বছর আগে যেটা আইনস্টাইন বলেছিলেন সেটা প্রমাণিত হচ্ছে। সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ওনারা দেখলেন সূর্যগ্রহণের কিছু ছবি যদি নেওয়া যায় সেই ছবি দিয়ে বোঝা যাবে তারাদের স্থিতি পাল্টায় কিনা। তখন যুদ্ধের জন্য ওনাদের যোগাযোগটা ঠিক ছিল না। যাই হোক, ওনারা দেখলেন আইনস্টাইন যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, দিনের বেলা যদি তারা থেকে আলো আসে তাহলে সূর্যের কাছে এসে আলোটা একটু বেঁকে যাবে, পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। আর্থার এডিংটন ছিলেন এই পরীক্ষার প্রধান। আর্থার এডিংটন তখন ইংল্যাণ্ডে, আইনস্টাইন জার্মানীতে, এদিকে যুদ্ধ লেগে আছে, কোন টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে না। আর্থার এডিংটন তখন অন্য রাষ্ট্রের এক বন্ধুকে ব্যাপারটা বললেন। তিনি সেখান থেকে আইনস্টাইনকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন – your theory proved correct। আইনস্টাইন টেলিগ্রামটা পেলেন, তিনি কোন গ্রাহ্য না করে ওটাকে জানালার ধারে রেখে দিয়েছেন। তখনও উনি নোবেল প্রাইজ পাননি, শুধু একজন প্রফেসর। সেই সময় তাঁর এক ছাত্রী এসেছে। ছাত্রীর সাথে তার পিএইচডির টপিকসের আলোচনা করছেন। আলোচনা করার পর ছাত্রীটিকে বললেন, একটা টেলিগ্রাম এসেছে ওটা তোমার দেখে ভালো লাগবে। ছাত্রীটি টেলিগ্রাম পড়ছে, your theory proved correct, সে তো আনন্দে জোরে চেঁচিয়ে উঠেছে। মেয়েটি তখন আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করছে, 'স্যার আপনার কি খুব আনন্দ হচ্ছে না'? 'একটুও না'। 'কিন্তু আপনার থিয়োরীতে ভুল প্রমাণিতও তো হতে পারত'? আইনস্টাইন তখন বলছেন, 'then I will felt sorry for God', ভগবান তুমি ভুল আমি ঠিক, এটাই হতে হবে। উনি স্পেসকে নিয়ে আলোচনা করছেন, স্পেসে এটাই হতে হবে। অথচ কয়েক বছর পরে তিনিই কোয়ান্টাম ফিজিক্সকের থিয়োরীকে মানতে চাইছিলেন না।

একই জিনিস এখানেও বলছেন। বিজ্ঞানীদের কাছে ভগবান শব্দ বলে কিছু নেই, তাঁদের কাছে আছে world order, বেদে যাকে ঋতম্ বলছেন। আচার্য ফিজিক্সের কিছুই জানতেন না, কিন্তু এটা জানতেন যে এত ধরণের যোনি আছে, জগতটা এই রকম, এই যে সব নিখুঁত ভাবে চলছে, সব কিছু কেমন সুন্দর ভাবে গোছান, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। এটাই আচার্য তাঁর যুক্তিতে বলতে চাইছেন, এই যে world order, এই world orderএর পেছনে এক চৈতন্য সত্তা, খুব প্রখর বুদ্ধি আর প্রচণ্ড দক্ষ যদি কেউ না থাকেন তাহলে এই perfectionএ এমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা হতে পারত না। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে একটু যদি ব্যতিক্রম হয় পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্য রকম হয়ে যাবে। World orderএ এমন fine tuning হয়ে রয়েছে যে জগতটা পুরো ব্যালেন্সে অবস্থিত হয়ে আছে। কার্য দেখলে একজন কর্তার কথা মনে পড়ে। ঠাকুর লাটু মহারাজকে বলছেন, তুই বলতে পারলি না, এই যে জগৎ, গ্রহ, নক্ষত্র দেখছ, এর একজন কর্তা আছেন! প্রথম এই কথা পড়লে বুঝতে পারা যায় না ঠাকুর কি ধরণের যুক্তি নিয়ে আসছেন। কারণ ঠাকুরের বাকি সব কিছুই অত্যন্ত সূক্ষ্ম আর যৌক্তিক।

একটু গভীরে চিন্তা করলে বোঝা যায় এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে, সৃষ্টিকে দেখলে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে। আচার্য শঙ্কর কিন্তু অত সহজে ছাড়ছেন না, কারণ সৃষ্টি থাকলে একজন স্রষ্টা

থাকবেন এটা একটা সাধারণ লোকও জানে, তাহলে আচার্যের ভাষ্য হাজার বছর ধরে সবাই মুখস্ত করত না। আচার্যের যুক্তি গুলো এত সাদামাটা যে বোঝা যায় না। আমাদের বিচিত্র বিচিত্র সব ধারণা হয়ে আছে যে, আচার্যের এই ভাষ্যগুলো না পড়লে বোঝা যাবে না।

আচার্য শঙ্কর বারবার বলবেন, জগতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে একে কখনই না করা যাবে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরে কেউ যাবে না। এমনকি বেদে যদি শত বাক্য থাকে যা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিপরীত, সেটাকে গ্রহণ করা যাবে না। যদি কেউ এমন থাকেন যিনি যুক্তি দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে অন্যথা পেয়েছেন, তখন এই জ্ঞানরাশিকে re-align করে নেওয়া হবে। যেটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, চাক্ষুস যা দেখছি এটাকে আচার্য সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেন। আমাদের সাধারণ ধারণা যে আচার্য বেদের বাইরে যান না, কিন্তু তা নয়। উনি বলছেন, এই জগতকে আমি সরাসরি দেখছি, এটাকে প্রমাণ করার জন্য আমার অন্য কিছু লাগবে না। যে জিনিসগুলোকে চাক্ষুস জানা যাবে না, সেখানে আমরা যুক্তি লাগাব আর যেখানে যুক্তি দিয়েও জানা যাবে না, সেখানে আমরা শাস্ত্র প্রমাণ নিয়ে আসব। আচার্য এখানে বলছেন, জগতে কখনই দেখা যায় না জড় পদার্থ নিজে থেকে একজোট হয়ে একটা কাজের জিনিস হয়ে যায়। অনেক পরে ফিজিক্স ল অফ এ্যনট্রপি এনেছে, জিনিসগুলো নিজে থেকে disintegrate করে যাবে কিন্তু কখনই নিজে থেকে integrate করে না। আর কদাচিৎ, যেমন crystal formation হয়, সেটাকেও তিনি আলোচনা করছেন। মূল কথা হল, জগৎ যেটা জড় এটা নিজে থেকে কাজের বস্তু হয়ে যাবে না। আর ফিজিক্সের ল অফ এ্যনট্রপি, যেখানে বস্তু ধীরে ধীরে বিনাশের দিকে যায়, এই থিয়োরী আচার্যের সময় ছিলই না, তা সত্ত্বেও তিনি খুব সহজ যুক্তি দিয়ে বলছেন, এটা কখন হতে পারে না। জড় পদার্থ যদি কোন কাজের জিনিস হয়ে যায়, তার মানে তার পেছনে একটা চেতন সত্তা আছে। এই চেয়ার, টেবিল এগুলো দেখলে মনে পড়ে যায়, একজন চৈতন্য সত্তা আছে, যার বুদ্ধি আছে, সে এগুলো তৈরী করেছে। এই যুক্তিকে নিয়ে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। আচার্য বলছেন, গায়ের জোরে এই যুক্তিকে কেউ উড়িয়ে দিলে তার কোন মানেই হবে না। এই জগতের পেছনেও এক চৈতন্য সত্তা আছেন, এটা আচার্যের প্রথম যুক্তি।

আচার্য বলছেন, যেখানে কোন সংঘাত হয়, সংঘাত মানে পাঁচটা জিনিসের সংমিশ্রণে একটা জিনিস তৈরী করা হয়েছে, তখন বোঝা যায় এই জিনিসটা কারুর কাজে লাগবে। যেমন বাড়ি, রথ এগুলো দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এগুলো কেউ তৈরী করেছে। সংঘাত মানেই ওখানে একটা চেষ্টা জড়িয়ে আছে। ইদানিং Randomness Theory বিজ্ঞানের খুব নামকরা থিয়োরী। বিজ্ঞানীদের মাথায় কখন কি ভাব আসে আর সেটাকে নিয়ে কয়েকদিন খুব লাফালাফি করতে থাকেন। এই থিয়োরীতে বলছে, জিনিসগুলো যদি এলোপাতাড়ি চলতে থাকে, সেখান থেকে একটা জিনিস দাঁড়িয়ে যায়। কোন বিজ্ঞানীকে বা কোন যুক্তিবাদী পণ্ডিতকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই ভৌতিক জগতে প্রানী এলো কোথা থেকে? তাঁরা বলবেন, কিছুই না, নানা রকম জিনিস মিশে মিশে জিনিসটা এসে গেছে। এই যুক্তিকে টানতে শুরু করলে এর অর্থ হবে, আমি একটা দ্বীপে গেলাম, যে দ্বীপে কেউ কোন দিন বাস করেনি। দ্বীপে শুধু বালি আর বালি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখলাম বালির উপর একটা রোলেক্স ঘড়ি পড়ে আছে। তখন আমি বলব এই রোলেক্স ঘড়িটা হল random product। বিজ্ঞান যখন বলে বিগব্যাঙ থেকে সৃষ্টি এসেছে, আর ওখান থেকেই পদার্থ এক অপরের সাথে মিশে মিশে প্রাণের জন্ম সেটাকে আমরা মানতে রাজী আছি। আর জনমানব শূন্য একটা দ্বীপে নিজে থেকেই একটা উইনডোস টেন কম্প্যুটার অন্ হয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে, বিজ্ঞান তখন বলছে এই জিনিস হতে পারে না, এটাই আশ্চর্যের। এই হল দুমুখো সাপের নমুনা। নিজের অনুকূলে যে যুক্তি যাবে সেটাকে টেনে নেবে আর যেটা তার বিরুদ্ধে যাবে সেটা নেবে না। একটা দ্বীপ, যে দ্বীপে কেউ কোন দিন যায়নি। সেখানে হঠাৎ যদি দেখি একটা সুন্দর সোনার নেকলেস পড়ে আছে। আমাদের কি কারুর বিশ্বাস হবে? সোনা যা বালিও তাই, শুধু গঠনের তফাৎ। নানান রকম হতে হতে তার থেকে পুরো আলাদা একটা জিনিস দাঁড়িয়ে যায়। বালি, বালি থেকে বালির ঢিপি হয়ে গেলে বোঝা যায়, বালির পাথর যদি হয়ে যায় বোঝা যায়। কিন্তু

বালি থেকে একটা সোনার গয়না হয়ে গেছে, কেন হয়ে গেছে, কারণ randomness theory অনুসারে তাই হওয়ার কথা। যদি বালি থেকে সোনার গয়না হতে পারে না, তেমনি randomness theory অনুসারে প্রানীরও সৃষ্টি হতে পারে না। আচার্য শঙ্কর পদে পদে এই যুক্তিটা ব্যবহার করবেন। যখন দুটো জিনিস নিজে থেকে জুড়তে পারে না, সেটা যখন জোড়া হয়েছে, তার মানে কোন এক চেতন প্রানী আছে। যেমন একটা বাড়ি আছে, বাড়িতে ইট আছে, বালি আছে, সিমেন্ট আছে, মূলতঃ এগুলো সবই মাটি, সিমেন্ট বিশেষ পাথর থেকে তৈরী হয়েছে আর লোহা, কাঠ এগুলো আছে। পৃথিবীর যা যা লাগে সেটাই আছে, বেশি randomnessএরও দরকার নেই। সেখান থেকে এই জিনিসগুলো নানান রকম মিশ্রণ হতে হতে একটা জিনিস হয়ে গেল, সে কি কখন হয়! আমরা এটা বিশ্বাস করব না যে নিজে থেকে একটা বাড়ি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এটা বিশ্বাস করছি যে জড় পদার্থ থেকে একটা প্রানী চলে এসেছে। আমাদের সহজ ভাষায় বললে এটাই বলা যায়, কোটি কোটি, শত কোটি বছর ধরেও যদি randomness চলতে থাকে, তাহলে যেখানে শুধু বালি আর নারকেল গাছ আছে সেখানে কি একটা রোলেক্স ঘড়ি দাঁড়িয়ে যেতে পারে? কারণ ওই ঘড়িতে যে সূক্ষ্ম জিনিসগুলো রয়েছে, ওটা randomnessএ হওয়ার কথা নয়। আচার্য এই যুক্তি গীতা, উপনিষদে যেখানেই দরকার সেখানেই ব্যবহার করছেন।

তখন মীমাংসকরা এর উপর আপত্তি করবেন। মীমাংসকরা কর্মকে মাহাত্ম্য দেন। তাঁরা বলেন কর্ম যদি করা হয় কর্ম নিজে থেকে ফল দিয়ে দেয়। বেদের কর্মকাণ্ডে এনারা এটাই বলেন, বেদের যজ্ঞের এমন ক্ষমতা যে, বেদের যজ্ঞ করলে তুমি যা চাইবে পেয়ে যাবে। সবাই যে কর্ম করে যাচ্ছে, সব কর্মের ফল একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, কর্ম সমূহ একটা যেন ভাণ্ডার, এর শাস্ত্রীয় পরিভাষা অপূর্বতা। একটা জায়গায় জমে আছে, ওখান থেকে ফলগুলো পায়। সাংখ্যরা তখন বলছেন, ঠিকই যে randomness দিয়ে হবে না কিন্তু কর্ম দিয়ে হচ্ছে। কর্মের এমন খেলা যার জন্য সব কিছু হচ্ছে। এমনিতে পূর্বমীমাংসকদের দর্শন খুব উচ্চমানের দর্শন। বেদের কর্মকে এনারা প্রচণ্ড সম্মান দিতেন। মহাভারতেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তক্ষককে মারার জন্য আহুতি দেওয়া হচ্ছে, ব্রাহ্মণরা জানতে চাইছেন তক্ষক এখনও আসছে না কেন? তখন ধ্যান করে জানতে পারলেন তক্ষক দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। ব্রাহ্মণরা তখন বললেন আহুতি দিয়ে ইন্দ্র সমেত তক্ষককে নামিয়ে আনো। বেদের যজ্ঞ কর্মের এমন শক্তি যে ইন্দ্রকেও টেনে যজ্ঞে নামিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে।

কর্ম একটা নৈর্ব্যক্তিক, নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার জন্য বলছেন কর্ম। এখানে কর্ম মানে শুধু বৈদিক কর্ম নয়, মানে action, এটা ঠিক আবার randomnessও নয়, randomnessটাও কর্ম, কারণ সেখানে এনার্জির খেলা চলছে। এখানে কর্ম বলতে, একটা অদৃশ্য শক্তি কিছু রয়েছে কিন্তু পুরো জিনিসটা নিজে থেকে চলছে। তখনকার দিনে আমাদের যত চিন্তাবিদরা ছিলেন, তাঁদের কাছে এই জিনিসগুলো ঠিক পরিষ্কার ছিল না। তাঁরা অনেক রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলেন, ভারতবর্ষে এখনও সেই সিদ্ধান্তগুলো চলে। নিউটনই প্রথম ফিজিক্সে পুরো দমে গণিতকে নিয়ে এলেন। আগেও কিছু কিছু গণিত ছিল, কিন্তু আগে গণিত ছিল আলাদা, আর ফিজিক্স ছিল thinking process। যেমন গ্যালিলিও বলছেন, উঁচু থেকে যদি একটা বড় বল আর ছোট বল ফেলা হয় তাহলে দুটো একই সাথে পড়বে। এগুলো সবই চিন্তন জগতের। নিউটন সব পাল্টে দিয়ে সব কিছুকে ইক্যুয়েশানে ফেলে দিলেন। একটা বড় বল আর ছোট বল উঁচু থেকে ফেললে একই সাথে পড়বে, কেন পড়বে? নিউটন তার ইক্যুয়েশান দিয়ে দিলেন। একটা জিনিস যখন চলছে, ওটা কিভাবে চলে? তার ইক্যুয়েশান দিয়ে দিলেন। হাইস্কুলের ফিজিক্সের যেটাই পড়ে সেটাতেই নিউটন আছেন। হীট, সাউণ্ড, লাইট সবেতেই নিউটন ছেয়ে আছেন, কোন ব্রাঞ্চ উনি ছাড়েননি। নিউটন কত বুদ্ধিমান ছিলেন একটা ঘটনাতেই বোঝা যায়। আগেকার দিনে আধুলি বা এক টাকার কয়েনে সাইডে খাঁজ খাঁজ থাকত। ইদানিং কালে আর খাঁজ কাটা থাকে না। ইংল্যাণ্ডে প্রথম যখন কয়েন বেরিয়েছে তাতে সোনা বা রূপা থাকত। কিছু অসৎ লোক কয়েনকে ঘষে ঘষে কিছু সোনা

বার করে নিত। একটা একশ টাকার কয়েনকে ঘষে ঘষে এমন করে দিত যে একশ টাকার মূল্য আশি টাকায় নামিয়ে দিত। মিন্ট থেকে কয়েন বেরোতে না বেরোতেই চোরেরা ঘষে ঘষে সোনা বার করে নিত। সরকারের খুব সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। তখন নিউটনকে ট্রেজার ইনচার্জ করে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে বলা হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েনের গোলাকারের ধারটা খাঁজ খাঁজ করে দিলেন। এবার কয়েন ঘষলেই খাঁজ চলে যাবে, দূর থেকেই বোঝা যাবে যে এই কয়েনকে ঘষা হয়েছে। রাতারাতি চুরি বন্ধ হয়ে গেল।

নিউটন আসার পর ফিজিক্স পুরোটাই পাল্টে গেল, জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটাই নিউটন পাল্টে দিলেন। এটাকে বলে deterministic outlook, এর অর্থ হল কোন জিনিসের পেছনে যে শক্তিগুলো কাজ করে, সেটাকে দিয়ে সেই জিনিসকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। যেমন একটা বস্তুকে আমি একটা জায়গা থেকে ঠেলে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, এটাকেই একেবারে গাণিতিক ভাবে বলে দেওয়া যাবে দু মিনিট পর এই জিনিসটা কোন জায়গায় থাকবে। একটা বস্তুর উপর যদি তিনটে শক্তি থাকে, পঞ্চাশটা বা হাজারটা শক্তি থাকে, যদি ঠিক ঠিক হিসাব করা হয় তাহলে ঠিক ঠিক বলে দেওয়া যাবে এতটা সময়ের পর বস্তুটা কোথায় থাকবে, এটাকেই বলে deterministic outlook। এই deterministic outlook মানব জীবনের এমন বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে যে কল্পনাই করা যায় না। নিউটন নিজে খুব ধর্মভীরু ছিলেন, যীশুকে মানতেন, বাইবেল মানতেন। অথচ উনি বুঝতে পারলেন না ওনার ফিজিক্সের সমস্যা গুলো বিজ্ঞানকে পুরো deterministic বানিয়ে দিল। আমি predict করে দেব এই জিনিসটা কি হবে, যদি তুমি আমাকে বলে দাও কি কি শক্তি এর উপর কাজ করছে। এটাকেই পরে মানুষের উপর নিয়ে এলেন, মানুষের ভাগ্য, তার পুরুষার্থ, মৃত্যুর পর কি হবে। সব কিছু deterministic হয়ে গেল। আশ্চর্য এটাই যে, এই deterministic attitude ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই আছে, যেটাকে আমরা কর্মবাদ বলছি। ফিজিক্সে যেটাই নিউটনের deterministic ওটাই হিন্দুদের কর্মবাদ, যা আমাদের জীবনকে মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত করেছে।

নিউটনের determinismএর পর যখন কোয়ান্টাম ফিজিক্স এলো, তখন সমস্ত বিজ্ঞানী এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলে দিলেন এই জিনিস কখনই হতে পারে না। যেমন কোয়ান্টাম ফিজিক্সে একটা এ্যটম আছে, ধরা যাক রেডিয়াম, রেডিয়াম যে রে তৈরী করছে, কখন সে একটা পার্টিকেল ছাড়বে জানার কোন পথ নেই। প্রথম যখন রেডিও এ্যক্টিভিটি বেরিয়েছে তখন বিজ্ঞানীদের মাথায় কি রকম বাজ পড়েছে একবার কল্পনা করে দেখা যাক। চারশ বছর ধরে বিশ্বের বড় বড় পদার্থ বিজ্ঞানীরা deterministic philosophyকে নিয়ে চলছিলেন, সব কিছুকে determine করা যায়। এমনকি ঈশ্বরের ব্যাপারেও বলে দিলেন, ঈশ্বরের নাম great watch maker। আগেকার দিনে ঘড়িগুলো সব স্প্রিংএ চলত। ঘড়ি গুলোতে একটা সময়ের পর দম দিতে হত। স্প্রিং আর হুইলের যত ভালো ব্যালেন্সিং হবে তত ওই ঘড়িগুলো ঠিক টাইম দেবে। কিছু কিছু ঘড়ি আছে দুদিন পরেই টাইমের গোলমাল হতে শুরু করে। একদিন দুদিনে হবে বা দু বছর, চার বছর চলার পর দু তিন মিনিট স্লো হতে শুরু করে। কিন্তু সুইস ঘড়িগুলো পঞ্চাশ বছর চলার পরেও একটুও গোলমাল হবে না। এমনকি ডায়মণ্ডের উপর সব লাগানো থাকত যাতে ঘষে না যায়। ভগবান হলেন গ্রেট ওয়াচ মেকার। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা বিরাট বড় ঘড়ি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ঘড়ির কাঁটার মত চলছে। তার মানে সমস্ত কিছু deterministic। এটাকে আনলেন নিউটন।

হঠাৎ মাঝখান থেকে দেখা যাচ্ছে, যেমন রেডিয়াম দুম্ করে একটা পার্টিকেল ছেড়ে দিচ্ছে আর ফেটে যাচ্ছে। নিউটনের ফিজিক্সের নিয়মে বলার কথা এটা কখন ফাটবে। কিন্তু এখন গাণিতিক হিসাবে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে এটাকে জানার কোন পথ নেই। তাহলে deterministic outlook কোথায় গেল? পদার্থ বিজ্ঞানীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ওরা মানতেই চাইছেন না। তুমি বলে দাও ওটা কখন ফাটবে? জানার কোন পথ নেই। এখন ওটাকে প্রমাণ করার জন্য নিয়ে এলেন

probability theory। সেখানে তাঁরা বলছেন, জিনিসটা এই রকমও হতে, সেই রকমও হতে পারে, মাঝে মিনিমাম এতটুকু থাকবে, error margin বাড়বে এর থেকে নীচে যাবে না। Deterministicএ error margin জিরো। একটা ব্যাট দিয়ে একটা বলকে এত জোরে মারলে অমুক জায়গায় এত বেগে যাবে, এটা খুব সহজ সিদ্ধান্ত।

এটাই কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডে চলে গেলে, সেখানে একটা পার্টিকেল আরেকটা পার্টিকেলকে ধাক্কা মারছে তখন deterministic সিদ্ধান্তে বলবে এই পার্টিকেলটা এই বেগে এই জায়গায় এই সময়ে যাবে; কোয়ান্টাম ফিজিক্সে বলছেন, তুমি নিশ্চিত ভাবে বলে দিতে পার না পার্টিকেলটা কোথায় যাবে। কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলে, এই পার্টিকেলটা খুব কম হলে মিনিমাম এতটুকুর মধ্যে থাকবে আর বেশি হলে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে থাকবে, অর্থাৎ যে কোন জায়গায় চলে যেতে পারে। আমি একটা চক ছুড়লাম, আমি জানি কত জোরে ছুড়লে কোন দিকে কত বেগে যাবে, হিসাব করে দেখা গেল চকটা এই জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু একটা ইলেক্ট্রনকে যদি এভাবে ছোড়া হয়, কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলবে, খুব কম হলে এই দরজা দিয়ে যেতে পারে, ওই দরজা দিয়েও যেতে পারে, আর বেশি হলে ৩৬০ ডিগ্রিতে যে কোন দিক দিয়ে যেতে পারে। মানলাম ওদিকে দিয়ে যেতে পারে কিন্তু এই দিক দিয়ে কি করে যাচ্ছে? এটাই কোয়ান্টাম ফিজিক্স। বাস্তবে এটাই হয়, বিজ্ঞানীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন।

এখানে এসে deterministic পুরো ভেঙে গেল। নিউটনের ফিজিক্স আমাদের এই জগতে চলে। বাজারে একটা ইলেক্ট্রনিক গেজেট কিনলাম। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা এটা কতদিন চলবে? দোকানদার বলল ছয় মাস প্লাস মাইনাস এক মাস। দোকানদার যদি কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ভাষায় বলতে চায় তখন বলবে, পাঁচ থেকে সাত মাস এর রেঞ্জ আর আগে পেছনে যত দিন খুশি চলতে পারে। তার মানে কালই খারাপ হয়ে যেতে পারে আর সারা জীবনও চলতে পারে। মার্জিনটা তাহলে কি দাঁড়ালো? শূন্য থেকে অনন্ত। আমি বললাম পাঁচ থেকে সাত মাসটা একটু কম করে ছয় থেকে করুন। বলল ওই মার্জিনটা হবে না। এটা গাণিতিক দিক দিয়েও প্রমাণিত, আর থিয়োরেটিক্যালি দিনরাতই ওনারা এই জিনিসটা দেখছেন।

আমাদের যে কর্মবাদ, পূর্বমীমাংসকদের যে থিয়োরী, এটা পুরোপুরি deterministic, সেইজন্য এর কোন দাম নেই। এই জন্মে আমি যদি তোমার উপর অত্যাচার করে থাকি, পরের জন্মে তুমি আমার উপর অত্যাচার করবে। এই জন্মে আমরা যত মাছ খেয়েছি, আগামী জন্মে এই মাছগুলো আমাদের মাছ বানাবে আর খেতে থাকবে। আর যত ছাগল, মুরগী খেয়েছি এরাও সামনের জন্মে আমাদের খাবে। তার মানে আমাদের মুক্তি অথৈ জলে ডুবে থাকবে। আমরা কথায় কথায় বলি কাউকে কষ্ট দিও না তাহলে তুমিও একদিন কষ্ট পাবে, এটাই কিন্তু deterministic হয়ে গেল। আচার্য বলছেন জগৎ সৃষ্টিতে determinism theory কাজ করে না। নিউটন যে সিদ্ধান্ত ফিজিক্সে এনেছিলেন তার হাজার বছর আগে আচার্য খুব দৃঢ় ভাবে বলে দিলেন জগৎ সৃষ্টিতে এই থিয়োরী চলবে না। ইদানিং তাই বেদান্তের কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে অনেকেই লিখতে শুরু করেছেন, যদিও না বুঝেই লিখছে, কারণ দুটো জিনিস পুরো আলাদা। বেদান্তের সাথে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু determinism theoryকে বেদান্ত মানে না। একটা সীমা পর্যন্ত চলবে, ঠাকুর যেমন বলছেন, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে। এটা জানা কথা যে ঝাল লাগবেই, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে আমি যত মাছ খেয়েছি আগামী যত জন্ম আমার হবে তত জন্ম মাছেরা আমাকে খেতে থাকবে, তা কি কখন হয় নাকি! কর্ম দিয়েই জগতের সৃষ্টি, সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের দরকার নেই, পূর্বমীমাংসকদের এই সীদ্ধান্তকে আচার্য আটকে দিচ্ছেন।

প্রসঙ্গ থেকে সরে আমরা একটা অন্য বিষয়ের দিকে যাচ্ছি। গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়কে ভগবান বলছেন শাস্ত্র, গীতার অন্য কোন অধ্যায় সম্পূর্ণ শাস্ত্র নয়। পঞ্চোদশ অধ্যায়ই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র। কোন গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র রূপে বিবেচ্য হওয়ার জন্য একটা শর্ত হল, তাতে বেদান্তের পাঁচটা জিনিসের

আলোচনা থাকতে হবে। প্রথমটা হল জীব, জীব মানে মানুষ বা অন্যান্য প্রানীরা কোথা থেকে এসেছে, দ্বিতীয় জগৎ কি, জগৎ আর এর উপাদান কোথা থেকে এসেছে, তৃতীয় ঈশ্বর কি, চতুর্থ মায়া কি আর পঞ্চম ব্রহ্ম কি। এই পাঁচটি জিনিসের যেখানে আলোচনা করা হয় সেটাই পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র। সাধারণ ভাবে বেশির ভাগ শাস্ত্রে পাঁচের কম জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করা হয়, কোথাও দুটো কি তিনটে, কোথাও বা একটি বা চারটি। যেমন বিজ্ঞান, বিজ্ঞান জীব আর জগৎ এই দুটোর বাইরে যাবে না, ঈশ্বরকে তারা মানবে না। সব শাস্ত্রকে কেন পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র বলা যায় না অনেকেই জানেন না। এগুলো জানার জন্য খাটাখাটনি করতে হয়, গভীরে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক দর্শনের ক্ষেত্রে। এই যে কেনোপনিষদের আলোচনা চলছে, এর তত্ত্ব যে কত কঠিন, এই ধারণাটাই প্রথমে হতে চায় না। যখন শুনছি তখন মনে হবে সবটাই পরিষ্কার, সব বুঝে ফেলেছি। কিন্তু শোনার পর মাথা থেকে নেমে যেতে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। চব্বিশ ঘন্টা এর পেছনে লেগে থাকতে হয়।

উপনিষদের বক্তব্য একটাই, আত্মা। উপনিষদ আত্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য কোন আলোচনা করেন না। আত্মাকে কখন আত্মা বলেন, কখন ব্রহ্ম বলেন। তৃতীয় অধ্যায় যখন শুরু হয় তখন আবার সেই ব্রহ্ম শব্দ দিয়েই শুরু হয়েছে। আচার্য শঙ্কর বলছেন এই ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম নয়, সগুণ সাকার ব্রহ্ম। সগুণ সাকার ব্রহ্মকে ঈশ্বর রূপে বলছেন, যিনি কর্মফল দেন, জীবের উপর কৃপা করেন, যিনি বিধাতা, যিনি স্রষ্টা। তখন পূর্বমীমাংসারা আচার্যকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, আপনি আগে বলুন, এখানে আপনি ঈশ্বরকে কেন নিয়ে আসছেন? কারণ কর্ম দিয়েই এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, এর মধ্যে আবার ঈশ্বরকে কেন আপনি টেনে আনছেন? আচার্য যখন ভাষ্য রচনা করছেন, একটা কথা বলছেন, যখনই সুযোগ পান ওই কথা দিয়ে তিনি বেদান্তের সিদ্ধান্ত গুলিকে ঢুকিয়ে দেন। এখানে প্রসঙ্গ ছিল *ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে*, অধ্যায় শুরু হচ্ছে ব্রহ্ম শব্দ দিয়ে। আচার্য সেখানে তখন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, এই যে কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে এটা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম হতে পারে না। সগুণ সাকার মানে যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। এটাতে পূর্বমীমাংসকরা আপত্তি করছেন, সৃষ্টির জন্য কোন ঈশ্বর লাগবে না, কর্ম দিয়েই সব হয়ে যায়।

পূর্বমীমাংসকদের এই মতকে আচার্য এবার খণ্ডন করছেন। তিনি বলছেন, তোমরা যে বলছ শুধু যজ্ঞ দিয়ে, কর্মের বিধান দিয়ে জগৎ চলে, না তা কখনই হয় না। পূর্বমীমাংসকদের খুব জোরালো মত এটাই যে, যে যজ্ঞাদি কর্ম হয় সেটা দিয়েই মানুষ সব পায়, সেটা দিয়েই দেবতারা শক্তি পান। বেদের পুরুষসূক্তমে ভগবান যজ্ঞ করেছেন, সেই যজ্ঞ দিয়েই সৃষ্টি। তার মানে জগতে যা কিছু হচ্ছে, সব যজ্ঞাদি কর্ম দিয়েই চলছে। এর সৃষ্টি যজ্ঞ দিয়েই হয়, জগতের যে স্থিতি সেটাও কর্ম দিয়েই হয় আর এর বিনাশও কর্ম দিয়ে হয়। এই ধরণেরই একটা আইডিয়া ফিজিক্সে ছিল, যেখানে এটাই বলা হচ্ছে, যদি এর forces গুলোকে আমি জানতে পারি তাহলে তার outcome আমি বলে দিতে পারব। পরে দেখা গেল জিনিসটা অত সহজে হয়ে যাবে না, ফিজিক্সেও অতটা সহজ নয়। আমাদের এখানে সমস্যা হল, যদি আমরা কর্মকেই শেষ কথা বলে মেনে নিই, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্ম দ্বারা হয়, মানুষের ভালো মন্দ সব কর্ম দ্বারা হয়, দেবতাদের খুশি কর্ম দিয়েই হয়, কর্মের উপরে কিছু নেই। কর্মের যে একটা ভাণ্ডার তাকে বলে অপূর্বতা। সব কিছু সেখানে জড়িয়ে রয়েছে, সব কিছু সেখান থেকেই চলছে। এটাকেই আমরা বলছি প্রারব্ধ, খারাপ কিছু হতে থাকলে বলি, তোমার এই কর্মগুলো এতদিন জমে ছিল, এখন বেরোতে শুরু হয়েছে। এই ভাবেই যদি সব কিছু হয় তাহলে সব থেকে বড় সমস্যা হবে যে মানুষের মুক্তি বলে কিছু হবে না, কারণ সবটাই কর্মে বাঁধা হয়ে আছে। কর্মের ফল থাকবেই, আর মুক্তি কখন কোন কর্মের ফল হয় না।

পূর্বমীমাংসকরা বলেন, মুক্তি বলে কিছু নেই। তাহলে বেদ উপনিষদে যে মুক্তির কথা বলা হয় সেটা কি? এত উত্তরে তাঁরা বলেন, মুক্তি মানে সর্বোচ্চ স্বর্গ। বৈষ্ণবরা যেমন বলে বিষ্ণুর কাছে থাকা এটাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা, ইদানিং আমরা ঠাকুরের ভক্তরা যেমন রামকৃষ্ণলোকের কথা বলছি। এই কথাগুলো

মুক্তি থেকে আলাদা, বেদান্তের মুক্তি তা নয়। বেদান্তের মুক্তি মানে আত্মজ্ঞান, নিজেকে জানা। পূর্বমীমাংসকদের মতে শ্রেষ্ঠতম স্বর্গে যাওয়াটাই মুক্তি। কিন্তু ওখান থেকেও সবাইকে ফেরত চলে আসতে হবে। কর্মের যে শক্তি এতদিন তাকে স্বর্গে থাকতে দিচ্ছে, ওই শক্তি ক্ষয় হয়ে গেলে তাকে আবার ফেরত চলে আসতে হবে। পূর্বমীমাংসকরাও বলছেন, ঠিকই আবার ফেরত চলে আসতে হবে কিন্তু ওটা এত দীর্ঘ সময়ের জন্য হবে যে সেটার জন্য ভাবতে হবে না। তাই পরে পরে আচার্য শঙ্করের প্রখর যুক্তির সামনে তারা আর দাঁড়াতে পারল না। ধীরে ধীরে তারাও এই মতকে পাল্টাতে শুরু করল। এখানে আচার্য এদের এই কর্মবাদকে আক্রমণ করছেন। এখানে মজার যেটা তা হল বিজ্ঞানও কিন্তু সব কিছু কর্মের দিক দিয়েই দেখে, নানান রকমের ফোর্স বিগব্যাঙের সময় শুরু হয়েছিল, ওটাই হয়ে যাচ্ছে, এছাড়া আর কিছু না। কিন্তু পূর্বমীমাংসকদের কর্ম আরও গভীর স্তরে চলে, গভীরে মানে, অনেক কর্ম আছে যে কর্ম এখনই ফল দেবে না, অনেকদিন পর ফলে দেবে। আমি এখন যজ্ঞ করলাম, এই যজ্ঞের ফল আমার মৃত্যুর পর স্বর্গে দেবে। এই আইডিয়া বিজ্ঞানীদের কাছেও নেই। বিজ্ঞানীদের কাছে কর্মের ফল এখনই এবং এখানে হয়ে যাবে। এর থেকেও আরও গভীরে যে পূর্বমীমাংসা যাচ্ছে, তাকেই আচার্য খণ্ডন করে দিচ্ছেন, সেখানে বিজ্ঞানকে খণ্ডন করতে কতক্ষণ আর লাগবে। কিভাবে খণ্ডন করছেন তার উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং আরও আলোচনা করা হবে।

আচার্য বলছেন, কর্ম আর কর্মের উপভোগ যদি স্বাধীন হত, তাহলে যে কোন মানুষ বলতে পারত, আমি এই কর্ম করেছি আমাকে এই ফল দাও। কিন্তু দেখা যায় সে ফল পায় না। কত কষ্ট করে চাষবাশ করছে, বীজ দিচ্ছে, সার দিচ্ছে, কিন্তু ফসল হওয়ার সময় সেই পরিমাণ ফসল কোন কারণে হয় না, যেটাকে আমরা দৈব বলছি। কর্তা আর কর্ম যদি স্বাধীন হত আর কর্ম যদি পুরোপুরি কর্তার অধীন হত, তাহলে সবাই বলতে পারত আমি এই কর্ম করেছি, আমাকে এই ফল দাও। আমরা কত লোককে দেখছি, কত বদমাইশি করছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, দিনে দিনে সে আরও ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে। কত মানুষ ভালো কাজ করেই যাচ্ছে, সে আর ভালো ফল পায় না। তার মানেই কিছু একটা গোলমাল আছে। আমরা বলব, তার আগের আগের জন্মের কর্মের ফলে হচ্ছে। হতে পারে, কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে কর্ম পুরোপুরি কর্তার অধীন নয়। যদি কর্তার অধীনে থাকত তাহলে সে দাবী করতে পারত আমি এই কর্ম করেছি, আমাকে এই ফল দাও, কিন্তু পাচ্ছে না। এটা হল আচার্যের প্রথম যুক্তি।

তারপর বলছেন, যেখান থেকে সব কর্মের ফল আসছে, সেখানকার নিয়ন্ত্রণ কর্তা যিনিই হন, এটা নিশ্চিত যে তাঁর দেশ, কাল, নিমিত্তের জ্ঞান আছে। দেশ, কাল, নিমিত্তের জ্ঞান যাঁর আছে, তিনি সব কিছুকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যে, যার যেটা প্রাপ্য সে তার প্রাপ্য পেয়ে যায়। ঠাকুর এই জিনিসটাকেই এক শাশুড়ির তিন বউমার কাহিনী দিয়ে বোঝাচ্ছেন, যে কাহিনী আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। শাশুড়ির একটা মাটির পাত্র ছিল যেটাতে মেপে সে বউমাদের চাল দিত। তাতে বউমাদের ভাতে কম হত, আধ পেটা খেয়ে থাকতে হত, বউমাদের খুবই কষ্ট। একদিন কিভাবে চাল মাপার পাত্রটা ভেঙে যায়। বউমারা আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছে, এবার আমরা পেট ভরে ভাত খাব। শাশুড়ি বউমাদের নৃত্য দেখে বলছে, যতই তোমরা নাচ কোঁদ আমার হাতের আটকেল আছে। যাঁরই দেশ, কাল, নিমিত্তের জ্ঞান আছে তিনিই একমাত্র জিনিসটাকে এমন ভাবে regulate করতে পারেন যাতে যার যেটা প্রাপ্য সে সেটা যেন পেয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় আরও মারাত্মক হল, যদি কর্ম blindly চলত, তাহলে কেউ কর্ম করত আর সেই কর্মের ফল আরেকজন কেউ পেয়ে যেত। কর্ম যদি এলেমেলো চলত তাহলে জিনিসটা এই রকমই হত, এলোপাতাড়ি গুলি চালালে যাকে গুলি করতে চাইছে তার গুলি না লেগে অন্যের শরীরে গুলি লেগে সে মরে গেল। কর্মও যদি এলেমেলো চলত তাহলে কার জিনিস কার ঘাড়ে গিয়ে পরবে কেউ জানতেও পারবে না, কিন্তু তাতো হচ্ছে না। যে যা কর্ম করছে সেই কর্মের ফল তার কাছেই যাচ্ছে। এই জগতে একটা শৃঙ্খল আছে, কোন কিছুই এখানে এলেমেলো চলে না। তখন আচার্য বলছেন, যেমন চুম্বক পাথর

আর লোহা এক অপরকে টেনে নেয়, সেভাবেই জিনিসটা চলছে। গীতায় ভগবান বলছেন, *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*। একবার জিনিসগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর চলছে তো চলছেই, নিজের মত চলে যাচ্ছে। জগতে কত রকমের ফোর্স আছে, সব ফোর্সকে বার করতে বিজ্ঞানীদের কত সময় লাগল। ম্যাগনেটিক ফোর্স আলাদা, ইলেক্ট্রিক্যাল ফোর্স আলাদা, এ্যটমিক ফোর্স আলাদা, এই ধরণের কত রকমের ফোর্স জগতে আছে। এখনও সব ফোর্সের কথা বিজ্ঞান জানেই না।

তুমি বলতে পার, চুম্বক পাথর যে লোহাকে টেনে নেয় সেখানে কোন কর্তার দরকার পড়ে না, ঠিক সেভাবেই সব চলছে। ঠিকই বলছ, হতে পারে, ফসল হতে পারে, বৃক্ষে ফল হতে পারে, কিন্তু ফলকে পেরে, গুছিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসাটা হবে না। প্রকৃতিতে, আকাশে, বাতাসে যে শক্তিগুলো রয়েছে, রেললাইনের ধারে কত রকম ফলের গাছ, জাম গাছ, কাঁঠাল গাছ, আম গাছ দেখা যায়। এই গাছগুলো কোন মানুষের লাগানো নয়। এখন কিছু কিছু জায়গায় বনসৃজনের জন্য বিভিন্ন বৃক্ষ রোপণ করা হয়। কিন্তু বনে জঙ্গলে, রাস্থার ধারে আপনা থেকেই কত বিশাল বিশাল বৃক্ষ, কোন পাখির বিষ্ঠা, বা মুখে করে নিয়ে এসে সেখানে ফল খেয়েছে আর তার বীজটা পড়ে বৃক্ষ হয়ে গেছে। নিজের মতই বৃক্ষ হয়ে যাচ্ছে, নিজের মতই ফল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বৃক্ষের ফলগুলো প্যাকেজিং হয়ে আমাদের ঘরে ঘরে আপনা আপনি চলে আসবে, সেটা হবে না। যখনই গুছিয়ে বাড়ি নিয়ে আসা হয়ে, তার মানেই ওখানে একটা চেতন শক্তি রয়েছে। কর্মে একটা শক্তি কাজ করছে, এটা তা নাহলে হবে না। আচার্য এটাই দেখাচ্ছেন, তুমি যতই বল ওই একটা শক্তি থাকবে।

দু রকমের কর্ম হয়, একটা হল অনন্ত ফলা। অনন্ত ফল মানে সদ্য ফলকারি, কর্ম করল আর সঙ্গে সঙ্গে ফল দিয়ে দেবে। দ্বিতীয় হল আগামী ফলা, যে কর্মের ফল অনেক পরে পাওয়া যায়। যেমন চাষবাশ করলে তার সদ্য ফল হবে, কিছু দিনের মধ্যেই ফসল ঘরে চলে আসবে। আমি খেলাম, সদ্য ফল দিয়ে দিল, আমার খিদে মিটে গেল। বলছেন, ফলোদয় হয়ে গেলে ওই কর্মটা নাশ হয়ে যায়। যেমন, আমরা খাওয়া-দাওয়া করি, উদ্দেশ্য হল ক্ষুধা নিবৃত্তি, পেট ভরা। পেট যেমনি ভরে গেল, ওই যে কর্মটা করা হয়েছিল সেই কর্মের নাশ হয়ে গেল। ওই কর্ম দ্বিতীয় বার ফল দেবে না। চাষের পর ফসল ঘরে চলে এলে ওই চাষের কর্মটা নাশ হয়ে গেল, আর ফল দেবে না। আবার ফল পেতে গেলে নতুন করে আবার চাষ করতে হবে। আগামী ফলা কর্মে কর্ম হয়ে যাওয়ার পর তার ফল অনেক পরে দেবে। কেউ যদি পটাসিয়াম সায়নেট খেয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে দেবে। আর যদি আর্সেনিক পেটে যেতে থাকে তাকে অনেক বছর পরে মারবে।

ঠিক তেমনি আরও দু রকমের কর্ম হয়, একটা স্বাধীন কর্ম, আরেকটা পরাধীন কর্ম। স্বাধীন কর্ম হল যেমন চাষবাস, আমি যেমনটি চাষ করব তেমনটি ফসল পাব। পরাধীন কাজ হল, কোন সেবক যখন নিজের সেব্যকে খুশি করার চেষ্টা করে। এখন চাষের ফলের মত যা কিছু হয় সেটা নিজের অধীনে আছে, যেমনটি করলাম তেমনটি পেয়ে গেলাম। কিন্তু সেব্য সেবকের সম্পর্কে তা হবে না। সেবক সেবা করে যায়, যিনি সেব্য তিনি খুশি হয়ে নিজের মত সেবককে ফল দেন। তার মানে, আমি যেমন সেবাই করে থাকি না কেন, যে সেবা কাজ করলাম, করার পর ওর ফল আর আমার হাতে নেই। কিন্তু চাষবাসের ক্ষেত্রে যে চাষ করছে সে বলতে পারে আমি এই ধরণের বীজ দিয়েছি, এই ধরণের উন্নত সার দিয়েছি, সেচের ব্যবস্থা করেছি, এবার আমার ফসল এমনটা হবে। সে একটা মোটামুটি প্রত্যাশা করতে পারে যে আমার এবার এতটা ফসল হবে। কিন্তু যেখানে সেবার কাজ হয়েছে সেখানে ফল কেমন হবে কেউ জানে না। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে আগেকার দিনে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হত না, আর তখনকার দিনে ওখানে জীবন-যাপন করাও খুব কষ্টসাধ্য ছিল। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে চলে এলে ওখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হত না। এক ভদ্রলোক একদিন বিকালে চলে গেছেন, নিজের পরিচয় কাউকে দেননি। কেউ তাঁকে আপ্যায়নও করেননি। বরঞ্চ অসময়ে চলে আসার জন্য আশ্রম থেকে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ভদ্রলোক শুধু বললেন, একটু ঘুরে দেখতে পারি কি? বলা হল, হ্যাঁ দেখতে

পারেন। ওখানে একটা দাতব্য হাসপাতাল আছে, সেখানে গেলেন। ভদ্রলোক ওখানে গিয়ে বললেন, কিছু টাকা ডোনেট করতে চাই। রসিদ বই নিয়ে আসা হল। ভদ্রলোক একটা দশ হাজার টাকার চেক হাতে তুলে দিলেন, আজকের দিনে যার মূল্য কম করে দু লাখ টাকা হবে। যে ম্যানেজার কোন আপ্যায়ন করেননি, তিনি শুনে দৌড়ে গিয়ে ওখানে হাজির হয়ে গেলন। তারপর জানা গেল উনি একজন খুব নামকরা লোক ও খুব বড় ভক্ত পরিবারের। এরপর তো সবাই ব্যস্ত হয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করতে শুরু করে দিলেন। এখন আশ্রমে তিনি কত টাকা ডোনেশান দেবেন সেটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। আশ্রমের লোকেরা যতই খাতির যত্ন করুক তিনি যেটা ঠিক করে রেখেছেন তার একটা পয়সা বেশি দেবেন না।

আচার্য বলছেন, কর্মফল যিনি দিচ্ছেন, যেমন সেব্য সবটাই জানেন, তাঁর নিজের কাছে কতটা আছে, তিনি সেবা কেমন পেয়েছেন, সেবকের কতটা দরকার, এগুলো সব ভেবে চিন্তে তিনি সেই রকম ফল দেন। পূর্বমীমাংসকদের বলছেন, এখন তুমি যদি এই পয়েন্টে বল ঈশ্বর বলে কিছু নেই, কারণ পূর্বমীমাংসকরা ঈশ্বর মানেন না, তখন আচার্য বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন সেখানেও ঈশ্বরের কথা কিভাবে বলা হয়েছে। এইসব বলার পর আচার্য বলছেন, মূল কথা হল তাঁর ইচ্ছাতেই কর্মফল পাওয়া যাবে, এই রকম দেখা যায় না। তাহলে কিভাবে হয়? এখানে ঈশ্বর বলতে কি বোঝেন আচার্য বলছেন।

প্রথম দুটো অধ্যায়ে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে একটা জায়গায় বলা হয়েছিল, যত রকমের চেতনা হচ্ছে, সব কিছুর চেতনার যিনি চেতয়িতা তিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। এক একটা জিনিসকে ধরে ধরে দেখানো হয়েছিল কিভাবে বাণী, মন, শ্রোত্র এদের সবার যিনি অন্তর্নিহিত শক্তি, যাঁর শক্তি সঞ্চালনে এরা সবাই যে যার মত কাজ করতে পারছে, তিনি হলেন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। এরপর যে সগুণ সাকারের কথা এখানে বলা হচ্ছে, এই সগুণ সাকারের ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। অন্যান্য উপনিষদে একটা আলোচনা আছে যেখানে দেখাচ্ছেন, আমরা যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকি তখন আমাদের একটা চেতনা থাকছে। কিন্তু সেই চেতনার উপর একটা আবরণ আছে, যার জন্য জগতে এত রূপ দেখা যায়। জাগ্রত থেকে স্বপ্নাবস্থায় চলে যাওয়ার পর সেখানেও একটা চেতনা কাজ করছে। কিন্তু সেই চেতনার উপরেও একটা আবরণ পড়ে আছে। স্বপ্ন থেকে গভীর নিদ্রায় চলে যাওয়ার পর শুধু একটা অজ্ঞানের বোধ থাকে, গভীর নিদ্রা থেকে জাগার পর এটাই সবাই বলে, আমার কিছু মনে নেই আমি কোথায় ছিলাম। তার সাথে একটা আনন্দের ভাব থাকে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনটে অবস্থার বাইরে আরেকটা চতুর্থ অবস্থা আছে, যাকে বলছেন তুরীয় অবস্থা। তুরীয় অবস্থা সব কিছুর পারে। ঠাকুর যাকে বলছেন, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ। যখন শরীরকে নিয়ে বলা হয় তখন জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি আর স্পেসকে নিয়ে যখন বলেন তখন বলেন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ। আমার এই শরীরের পেছনে একটি চৈতন্য সত্তা আছে, যে সত্তা আমাকে জাগ্রত অবস্থায় কাজ করাচ্ছে। সেই চৈতন্য সত্তা আমাকে স্বপ্না অবস্থায় কাজ করায় আর সুষুপ্তি অবস্থায় কাজ করায়। আর যখন কোন কাজ করাবার কেউ থাকে না, কোন আবরণ নেই, তখন তাকে তুরীয় বলছেন। তাহলে ঈশ্বর বলতে কি বোঝায়?

এর আগে আমরা একটা উপমা ব্যবহার করেছিলাম। যদি আমরা কল্পনা করি সমুদ্রে একটা বিরাট ঢেউ, ওই ঢেউয়ে জলীয় কণাগুলো রয়েছে, জলের ও জলীয় কণার যে সমষ্টি এটাই ঈশ্বর। ঠাকুরও এই উপমা নিচ্ছেন, বরফ, বরফ গলে যাওয়া। কারণ যিনি সচ্চিদানন্দ, পূর্ণব্রহ্ম যিনি, মনের তো রূপান্তর হয় না, চেতনার এক ফোঁটাও যা, সমস্তটাও তাই। আমার ক্ষেত্রে চৈতন্যের উপর যে একটা স্থূল শরীরের আবরণ আর চৈতন্যের উপর একটা সূক্ষ্ম শরীরের আবরণ, যেটা স্বপ্নে আমাকে দেখায়। স্বপ্নে আমি অনেক কিছু তৈরী করছে, তার কান্না, তার হাসি। সেখান থেকে হয়ে যাচ্ছে সুষুপ্তি অবস্থা, ঠাকুর যাকে স্পেসে কারণ বলছেন। এবার যদি আমরা কল্পনা করি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের স্থূল শরীর হতে পারে, তার পেছনে সেই চৈতন্য সত্তা আছে। সেই সমস্ত চৈতন্য সত্তাকে একসাথে নিলে সব স্থূল শরীরগুলো একসাথে হয়ে যাবে, এটাই ঈশ্বরের একটা রূপ, একেই বলে বিশ্বৈদেবা বা বিশ্বরূপ। তেমনি

সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরগুলোকে যদি একসাথে নিয়ে নেওয়া হয়, সেটাও ভগবানের একটা রূপ। আর যখন সুষুপ্তি অবস্থায় আছি, যেখানে কোন আবরণ নেই শুধু অজ্ঞানের আবরণ আছে, এবার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যতগুলো শরীর আছে তাকে যদি সমষ্টি রূপে নিয়ে নেওয়া হয়, সেই চৈতন্যের উপর তার উপর যে আবরণ, এটাকে বলে ঈশ্বর। তাহলে ঈশ্বরের তিনটে রূপ হয়ে যায়, যখন সমস্ত স্থূল শরীরের সাথে একাত্ম হয়ে যে সমষ্টি রূপ তার একটা নাম হয়ে যায়, সূক্ষ্ম শরীরের সাথে যখন তখন তার একটি নাম আর যখন কারণ শরীরের সাথে একাত্ম তখন আরেকটি নাম। ঈশ্বর আর জীব সব সময় আলাদা, কারণ ঈশ্বর হলেন সমষ্টি আর জীব ব্যষ্টি। জীব আর ঈশ্বর কোন দিন এক হতে পারবে না। আমি আর ঠাকুর কখনই এক হতে পারি না। কিন্তু সমস্ত উপাধি যখন ত্যাগ করে দেবে তখন তুরীয় অবস্থায় চলে যাবে, তখন কোন আবরণ নেই, আর ওই দিক থেকে ঈশ্বর, যিনি সমষ্টি, তাঁরও কোন আবরণ নেই, এবার এই দুটোর মধ্যে কোন ভেদ থাকবে না। তখন দেখে যিনি অন্তর্যামী তিনিই ঈশ্বর। সেইজন্য ঠাকুর বার বার বলছেন, যতক্ষণ আমি বোধ আছে ততক্ষণ আমি ঈশ্বর বলা যায় না। শেষ আমি বোধটা থাকে সুষুপ্তি অবস্থায় বা সবিকল্প সমাধিতে। এবার এই জিনিসটাকে নিয়েই আচার্যের আলোচনা চলবে।

আচার্য এরপর বলছেন, এই যে ঈশ্বর, যখন কেউ কাজ করে তখন এই ঈশ্বরের উপর একটা সংস্কার পড়ে যায়। কারণ ঈশ্বর অজ্ঞানে আবৃত কিনা, যেমন এর আগে বর্ণনা করা হল কিভাবে কারণ শরীর হয়েছে। তিনি কারণ শরীরকে ছেড়ে দিতে পারেন, কিন্তু ছাড়তে পারবেন না। কেন ছাড়বেন না? ওটা ছাড়াও যা, সৃষ্টির বিনাশটাও তাই। সৃষ্টি আছে মানে তিনি থাকবেন, থাকলে একটা মায়ার আবরণ তাঁর উপরেও থাকে। মায়ার আবরণ আছে বলে মনের আবরণ থাকবেই। সংস্কারের ছাপ ওই মনের উপর পড়ে। সংস্কারের ছাপ যখন পড়ে তখন সেটার দরুন মানুষ নিজের নিজের কর্মফল পেয়ে যায়। এছাড়া এই জিনিসটাকে বোঝার অন্য কোন উপায় নেই। এর অর্থ হল, আমরা যখন ঠাকুরের পূজা অর্চনা করছি তখন সমষ্টি মনে একটা ছাপ পড়ে যায়। তবে এটা ভালো করে জানা দরকার যে, আমার মনে সব কাজের যেভাবে ছাপ পড়ে ঠাকুরের মনে সেভাবে পড়ছে না। যেটার পেছনে যে সমষ্টি আত্মাতে আবরণ রূপে যে বুদ্ধিটা রয়েছে, সেখানে ছাপ পড়ছে। ঈশ্বরের যে চৈতন্য তাতে ছাপ পড়বে না, তাঁর যে সমষ্টি মন তাতে গিয়ে ছাপটা পড়ে। সেটাই পরে ফল রূপে ব্যষ্টির উপর আসে। এছাড়া অন্য কোন ভাবে এর ব্যাখ্যা করা যাবে না।

বলছেন, যে কোন জিনিস যত সময়ই অতিবাহিত করুক, নিজের স্বভাব পাল্টাতে পারে না। যেমন আগুন নিজের স্বভাব পাল্টাতে পারে না, জল তার নিজস্ব স্বভাব পাল্টাতে পারে না। ঠিক তেমনি এই জগতে আমরা যা দেখছি এখানে কর্মের খেলা পাল্টাতে পারে না। সেইজন্য আচার্য বলছেন, তুমি যতই যুক্তি নিয়ে আস এটা কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা বলতে ওই যে সমষ্টি মন বা বৈষয়িক মনে যে ছাপ পড়ে সেইজন্যই হয়। সেইজন্য তুমি যদি মনে কর, কর্ম নিজে স্বাধীন মত চলতে চলতে এই জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, জগতের কাজ হচ্ছে, সেটা কখনই হয় না।

তখন আবার আচার্য জীব আর ঈশ্বরকে এক করতে গিয়ে অনেক কিছু বলছেন, অন্যান্যরা তখন এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি নিয়ে আসবেন। কিন্তু আচার্য স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, তুরীয় অবস্থায় জীবের যে সত্তা আর ঈশ্বরের যে সত্তা, দুটো এক হয়ে যায়। যদি এক না হয় তাহলে অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ হয়ে যাবে। দ্বৈতবাদ মানে ঈশ্বর আর জীবের যে তফাৎ এটা চিরন্তন হয়ে যাবে। ঈশ্বর আর জীবের তফাৎ তখনই থাকে না, যখন জীব আর ঈশ্বর নিজের নিজের উপাধি গুলোকে ছেড়ে দেন। উপাধি ছেড়ে দিলে আর দুই থাকবে না, কি থাকবে বলা যাবে না, এটাই অদ্বৈত।

ঈশ্বর কাউকে বেশি পছন্দ করেন, কাউকে কম পছন্দ করেন, এই জিনিস কিন্তু কখনই হয় না। এটা পুরোপুরি আরোপ। যেমন সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সূর্য থাকলেও চোখ বন্ধ করে থাকলে দেখতে পায় না, এগুলো লৌকিক ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। এর সাথে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন সূর্যের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তোমার উপর নির্ভর করে তুমি সূর্যের আলোকে কিভাবে নেবে। সূর্য নিজের

জায়গায় অবস্থিত। জিনিসগুলো অন্য রকম পাল্টাচ্ছে বলে তারা অন্য রকম দেখছে। তেমনি ঈশ্বর নিজে থেকে কোন কিছু করেন না। জীব যেভাবে সব করে সে সেভাবেই ফল পায়, কিন্তু প্রসেসিংএর সবটাই ওখান থেকে হয়। যদি কোথাও থেকে প্রসেসিং না হয়, তাহলে যে মানুষ যে কর্ম করেছে সে ঠিক সেই রকম ফলই চাইবে, আর সেটা কখন হতেও দেখা যায় না। এই যুক্তিটা এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। কথাই আছে যে, মাছ চুরি করলে জেল আর পুকুর চুরি করলে রাজা, তার কিছু হয় না। কোন এক সত্তা আছে, যাঁর দেশ, কাল ও নিমিত্তের জ্ঞান আছে, যার জন্য ফলের তারতম্য হয়ে যায়। ফলের যে তারতম্য হচ্ছে, কারুর ভালো হয়, কারুর খারাপ হয়, এতে যে তিনি কোন পক্ষপাতিত্ব করছেন তা না। মূল একটাই কথা পুরো জিনিসটা ব্লাইণ্ড নয়। সেইজন্য প্রথমে বলা হল, ব্রহ্ম বলতে সগুণ সাকার ঈশ্বর যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, এই বলাতে দোষের কিছু নেই। খুব সংক্ষেপে আচার্য বলতে চাইছেন উপনিষদের কথা যেখানে আসছে সেখানে এই অধ্যায়ের ব্রহ্ম বলতে ঈশ্বর। কোন ঈশ্বর? যিনি জগৎ স্রষ্টা। এই একটা কথা বলার জন্য অনেকগুলো যুক্তি এনে দেখালেন মীমাংসকরা কর্ম, কর্মফল, ঈশ্বরের ব্যাপারে যে মত পোষণ করেন সেটা কেন ঠিক হতে পারে না।

আচার্য বলছেন, *জয়ং লব্ধবদ্ দেবানামসুরাণাং সংরামেহসুরাজ্জিত্বা জগদরাতীনীশ্বরসেতুভেত্তৄন্*, শত্রু আর ঈশ্বরের মর্যাদা যারা ভঙ্গ করে সেই অসুরদের উপর তিনি জয় পেয়েছেন। শত্রুর মর্যাদা কিভাবে ভঙ্গের ব্যাপারে বলছেন, সংসারের শত্রু, মানবজাতির শত্রু বা সৃষ্টির শত্রু, বিভিন্ন শত্রু বিভিন্ন স্তরের হয়। এখানে আচার্য দ্বৈতের আলোচনাতে নামছেন, জগতকে জগতের মত দেখছেন। এই জগতে ভগবান সব কিছু হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন, মানুষের মধ্যে ভালো মানুষ, মন্দ মানুষ হয়েছেন, সিংহ করেছেন, বাঘ, সাপ, ব্যাঙ সব করেছেন আর ওইদিকে দেবতা অসুরদের করেছেন। এই সব কিছুকে নিয়ে জগতে একটা ভারসাম্য অবস্থা চলে। কোন কারণে যখন এই সাম্য ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় তখন একজন কেউ বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে যায়, তখন ভগবান নিজে এসে জগতের সাম্য ভাবটা ফিরিয়ে আনেন। সৃষ্টি সব সময় একটা ব্যালেন্সে চলে। সৃষ্টির ব্যালেন্স ঠিক করার জন্য একটা প্রচলিত ধারণা হল তিনি সব সংহার করে দেন।

ইদানিং পরিবেশ সংক্রান্ত যেসব সমস্যা গুলো আসছে এতে বোঝা যাচ্ছে যে ঈশ্বর এবার সংহার করবেনই। কারণ মানুষের ক্ষমতা অত্যাধিকে বেড়ে যাচ্ছে, যার ফলে প্রকৃতির ভারসাম্যকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। ভারসাম্য ঠিক করার জন্য ঈশ্বর কিভাবে ধ্বংস করবেন আমাদের জানা নেই। তিনি কলেরা হয়ে, প্লেগ হয়ে, প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক কিছু হয়ে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে কিভাবে করবেন আমাদের কারুরই আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এগুলো যখন বেশি বেড়ে যায় তখন তিনি আবার বিজ্ঞানী রূপে এসে ওদের নিধনের ওষুধ আবিষ্কার করে দেন। যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের হ্রাস হয় তখন তিন কপিল মুনি, অবধূত বা শঙ্করাচার্যের বা ঠাকুরের মত জ্ঞানীর অবতার হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আবার ভরিয়ে দেন। আমাদের কাছে অবতার মানে শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণ, যাঁরা লড়াই করেছিলেন, একেবারেই তা নয়। যারা শারীরিক ভাবে লড়াই করে জগতের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয় তখন তিনি সেই অনুযায়ী শরীর ধারণ করেন আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের হ্রাস হয়ে গেলে তিনি তখন শঙ্করাচার্য বা ঠাকুরের মত জ্ঞানগুরু হয়ে আসেন। যদি জ্ঞানী পুরুষের অনেক আধিক্য হয়ে যায় আর অজ্ঞানীর সংখ্যা কমে যায় সেখানেও তাঁকে ভারসাম্য রাখতে হবে তখন তাঁকে আবার অসুর হয়ে আসতে হবে। অসুরদের মধ্যে তিনি সরাসরি অবতার হয়ে আসেন না। ফিজিক্সের ল অফ এ্যন্ট্রপিতে স্বাভাবিক ভাবেই সব জিনিস খারাপ হবে। সমাজে কখনই ভালোর সংখ্যা বেশি হবে না, খারাপের সংখ্যাই বেশি থাকে। খারাপের সংখ্যাটা যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তিনি এসে ওটাকে ব্যালেন্স করে দেন। যদি বলেন, সবটাই যদি ভালো হয়ে যায়? তাহলে সৃষ্টি নাশ হয়ে যাবে। সবটাই ভালো হয়ে গেলে একেবারে সাম্য অবস্থায় এসে যাবে। সাম্য অবস্থায় আসা মানেই সৃষ্টির নাশ। সৃষ্টি মানেই বৈষম্য, বৈষম্য মানে ব্যালেন্সটা গোলমাল। ব্যালেন্সের গোলমালে খারাপটা যদি একটু বেশি হয়ে যায় তখন তিনি এসে ওটাকে ঠিক করে দেন। সেইজন্য দেবতা অসুরদের মধ্যে

দেবতাদের ক্ষমতা বড্ড বেশি বেড়ে গেছে, এই জিনিস হবে না। কিন্তু যদি কখন দেখা যায় ইন্দ্রেরও ক্ষমতা বেড়ে গেছে তখন ভগবান কিছু একটা করে দেন, হয়ত কোন সুন্দরী নারীকে দিয়ে প্রলোভিত করে দিলেন যাতে ইন্দ্রের পতন হয়ে যায়। জগতকে তিনি ব্যালেন্সের বাইরে যেতে দেবেন না। আর ব্রহ্মজ্ঞানীর সংখ্যা কখনই অসীম হয় না। মূল বক্তব্য হল একটা শক্তি আছে যা জগতকে ধরে আছে, আরেকটা শক্তি জগতের বিনাশ করছে। এই দুটোই থাকবে। আমি যদি মনে করি জগতে শত্রুর সংখ্যা কমে যাবে, তাত্ত্বিক দিয়ে এটা কখনই সম্ভব নয়।

কোয়ান্টাম ফিজিক্সে একটা খুব মজার থিয়োরী আছে। যে কোন এ্যাটমের ভেতরে সব সময় সব কিছু এলোপাতাড়ি আর খামখেয়ালী মত চলে, কারুর জানার কোন উপায় নেই যে ওর ভেতরে কখন কোনটা হবে। সেইজন্য determinismএর থিয়োরী সেখানে সম্পূর্ণ ভাবে collapse করে যায়, এটা mathematically proved। আর scientifically proof করেছে যে এর কোন মাথামুণ্ডু নেই। অনেকগুলো বানরকে আফিং খাইয়ে, বিছের কামড় দিয়ে দেওয়ার পর ওরা যেরকম আচরণ করবে, একটা এ্যাটমের ভেতরে জিনিসগুলো ঠিক সেই রকম আচরণ করে। কিছু কিছু বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের এই মতকে মানতে রাজী ছিলেন না। তাঁরা বললেন, ঠিক আছে, আপনি এর একটা thought experiment করুন। ধরে নিন আপনি ছোট হয়ে একটা এ্যাটমের ভেতরে ঢুকে গেলেন, এরপর আপনি ওখানে কি দেখবেন? কোয়ান্টম ফিজিক্সের নামকরা বিজ্ঞানীরা বললেন, আগে তুমি বল একটা মানুষকে তুমি অতটা ছোট করবে কি করে যে এ্যাটমের ভেতরে ঢুকবে, তবেই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তরটা দেব। কারণ একটা মানুষকে এ্যাটমের ভেতরে ঢুকতে হলে তার কোয়ান্টাম সাইজ হয়ে যাচ্ছে। কোয়ান্টামের সাইজ হয়ে গেল তার আচরণ কোয়ান্টামের মতই হয়ে যাবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, সবাই যদি ঠাকুরের মত নিজের স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করে, তখন তাকে এটাই বলতে হয়, তুমি এটা কল্পনা করবে কি করে। একজন ভদ্রমহিলা তাঁর একজন পরিচিত ভদ্রলোককে বলছেন, আমি আপনাকে যা যা প্রশ্ন করব আপনি ইয়েস নোতে উত্তর দেবেন। ভদ্রলোকও সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, তার আগে আপনি বলুন, আপনি আপনার স্বামীকে মারধোর করাটা বন্ধ করেছেন? ভদ্রমহিলা খুব বুদ্ধিমতি ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছেন উনি কি বলতে চাইছেন। সব কথা ইয়েস নোতে চলে না। যদি বলেন বন্ধ করেছি, তার মানে আগে আপনি স্বামীকে মারতেন, আর যদি বলে না, তার মানে এখনও আপনি মারছেন। এভাবে উত্তর চলে না। ঠিক তেমনি hypothetically বলা, সবাই যদি ঠাকুরের মত নিজের স্ত্রীর সাথে আচরণ করে, এভাবে চলে না।

আচার্য তখন বলছেন, ব্রহ্ম জয় করলেন এবং তার যে ফল সেটাও দেবতাদের দিয়ে দিলেন। লড়াই করলেন দেবতাদের জন্য আর তার ফলটাও দিয়ে দিলেন দেবতাদের। শ্রীশ্রীমা বাগবাজার ঘাটে এসে এক ব্রাহ্মণকে ফল দান করেছেন, ফল দান করার পর মা বলছেন, এই ফল গ্রহণ করুন আর এর ফলটাও নিন। খুব সহজ ভাষায় এগুলো বোঝার পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। লড়াই ঈশ্বর করলেন, জয়ী হলেন, আর জয়ের যে ফল জগতকে ভোগ করা, সেটাও দেবতাদের দিয়ে দিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তো ওখানে দেবতাদের কমাণ্ডর হয়ে লড়াই করেননি, তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু আদি দেবতাদের মাধ্যমেই লড়াই করেছিলেন। ফলে যাঁরা বড় বড় কমাণ্ডার ছিলেন, তাঁরা অহঙ্কারে ফুলে ফেঁপে উঠলেন, আমি জয় করলাম, আমি জয়ী হলাম। পরের মন্ত্রে এটাই বলছেন –

ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োহস্মাকমেবায়ং মহিমেতি। তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব। তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি।।৩/২।।

(দেবতারা ভাবলেন এই বিজয় আমাদেরই আর এই মহিমা আমাদেরই হয়েছে। ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যা অহঙ্কার অবশ্যই বুঝে গেলেন। দেবতাদের মঙ্গলার্থে তিনি নিজেকে তঁদের ইন্দ্রিয় গোচর করলেন। কিন্তু দেবতারা জানতে পারলেন না যে, এই পূজ্যস্বরূপ যিনি সম্মুখে অবস্থিত তিনি কে।)

ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু দেবতারা ভাবতে শুরু করলেন এটা আমাদেরই জয়, আর এতে আমাদেরই মহিমা বৃদ্ধি হয়েছে। ব্রহ্ম দেবতাদের মনের এই ভাব জেনে গেলেন। দেবতাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি দেবতাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। আচার্য ভাষ্যে বলছেন *তদা আত্মসংস্থস্য প্রত্যগাত্মন ঈশ্বরস্য সর্বজ্ঞস্য সর্বক্রিয়া ফলসংযোগজয়িতুঃ প্রাণিনাং সর্বশক্তের্জগতঃ স্থিতিং চিকির্ষোঃ*। এখানে তিনি ঈশ্বরের কয়েকটি গুণের কথা বলছেন। প্রথমে বলছেন *আত্মসংস্থস্য*, সবারই অন্তঃকরণে অবস্থিত, *প্রত্যগাত্মন*, সবারই ভেতরে যে চৈতন্য সেটা তিনি। *সর্বজ্ঞ*, ভগবান সব সময়ই সর্বজ্ঞ, তিনি সবটাই জানেন। *সর্বক্রিয়া ফলসংযোগজয়িতুঃ*, প্রাণিগণ যত রকম ক্রিয়া করছে, সেই ক্রিয়ার ফলের সাথে যে সংযোগ করিয়ে দেওয়া হয়, এটা ভগবানই করেন। এর আগে যেটা বলা হয়েছিল সেটা অন্য কারণে ছিল, এখানে অন্য ভাবে দিচ্ছেন। ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করা হয় সেটাও ক্রিয়া, আর সেই প্রার্থনার জন্য তিনি যেটা দেন সেটাও তিনি করেন, কারণ তিনিই সব কিছুর মালিক। সেইজন্য ভগবানকে বলা হয় তিনি ন্যায়পরায়ণ, তিনি আবার করুণাময়। এগুলোকে নিয়ে অনেকে তর্ক করে, ন্যায়পরায়ণ আর করুণাময় এক সঙ্গে কি করে হবে? তিনি সবই হন। কারণ তিনি হলেন আমার অন্তর্যামী, আমার প্রত্যগাত্মা তিনিই, আমার আসল আমিটা তিনিই। তিনি কেন আমাকে মারতে যাবেন! কেউ কি নিজেকে কখন মারতে চাইবে! জিভে যদি দাঁতের কামড় পড়ে তাহলে কি আমি আমার দাঁতকে নোড়া দিয়ে ভেঙে দিতে চাইব যে, আমার জিভকে কামড়ে দিয়েছে। ঈশ্বর কেন আমাকে শাস্তি দিতে যাবেন। আঘাত এলে আমরা অনেক সময় বলি, ঠাকুরের মার। ঠাকুর কেন আমাকে মারতে যাবেন! তিনি তো আমার পূর্ণ আত্মা, তিনি আমার ভেতরে অবস্থিত। ঈশ্বর আমার আসল স্বরূপ, তিনি আমাকে কোন দুঃখে মারতে যাবেন। কথামৃতে কোথাও ঠাকুর এই ধরণের কথা বলছেন না যে, ঈশ্বর তাকে মেরে রেখেছেন। দীন দুঃখী যেখানে সেখানে একটা করুণার ভাব রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঠাকুর তাদের মেরে রেখেছেন, এই ধরণের কথা কখনই হতে পারে না। সবারই শেষ কথা ঈশ্বর, তাই নিজের লোককে কেউ কি কখন মারে? মা যখন নিজের সন্তানকে মারছে, তখন তাকে ঠিক পথে রাখার জন্যই মারছে। অন্তর্যামীও আমাদের মারেন, আমাদের ঠিক পথে রাখার জন্য, কিন্তু তাই বলে কখনই তিনি আমাদের অভিশপ্ত করবেন না। যিনি বলছেন, হে ভগবান! দুঃখ যদি দিলে সহ্য করার ক্ষমতা দাও। এই ধরণের কথা শুনলেই বোঝা যায়, ঈশ্বর সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। যখন ভাবছি ঈশ্বর আকাশের কোথাও বসে আছেন, তিনি একজন দোর্দণ্ড একনায়ক নেতার মত সব কিছু চালাচ্ছেন, তখন এই কথা বলা যায়। বেদান্তের এই ভাব নয়, তিনি আমার প্রত্যগাত্মা, আমার আসল আমিটা তিনি, তিনি কেন আমাকে কষ্ট দিতে যাবেন। আমি কিছু করেছি, তার কর্মফলের সংযোগে এখন যা কিছু আসছে। ঠাকুর বলছেন, একবার যদি কেউ হাতজোড় করে বলে দেয়, অমনটি আর করব না, ওখানেই সব পাপের ক্ষয় হয়ে গেল। সত্যি সত্যি তাই হয়। ঠাকুর এর সাথে বলে দিচ্ছেন, আর যেন সে ওই পাপ কাজ না করে।

কিন্তু দেবতাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, ঈশ্বরই জগতের সব কিছু রক্ষা করেন, এখানে শব্দটা বলছেন, *অগ্ন্যাদিস্বরূপ- পরিচ্ছিন্নাত্মকৃতঃ*। ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, সেই ব্রহ্মের উপর যখন এক একটা উপাধি লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন আমরা ওই উপাধিটাই দেখতে পাই, অগ্নি আদি স্বরূপ দেবতারা ব্রহ্ম বা আত্মার উপাধি। যেমন শুদ্ধ ব্রহ্মের উপর শরীর মন উপাধি লাগিয়ে দিলে আমরা এক একটা প্রানীকে দেখতে পাই। কোন কাজের জিনিসের উপর উপাধি দিয়ে দিলে তখন এক একটা বস্তু রূপে দেখায়, যেমন এই মাইক্রোফোন দেখাচ্ছে। সমস্ত জগতের উপর দহন শক্তির উপাধি লাগিয়ে দিলে অগ্নি হয়ে যাচ্ছে। জগতের সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁর, তিনি ব্রহ্মা। কিন্তু ব্রহ্মাও ব্রহ্ম নন, কারণ উপাধি লেগে আছে। যেখানে উপাধি আছে ওই জিনিসটা সীমিত, তা যে উপাধিই হোক, যত বড় উপাধিই হোক, সে সীমিত। দেবতাদের মধ্যেও অগ্নি একটা উপাধি, বায়ু একটা উপাধি, ইন্দ্র একটা উপাধি। উপাধিযুক্ত থাকলে কখনই সর্বশক্তিমান হবে না, সর্বশক্তিমান একমাত্র তিনিই হবেন যিনি উপাধিশূন্য, তিনিই ঈশ্বর। সোপাধিক ব্রহ্ম এজন্যই বলা হয়, সৃষ্টি যেখানেই আছে সেখানেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়, তাছাড়া অন্য কোন উপাধি, উপাধি বলতে জাগতিক দিক দিয়ে যে উপাধি বলে সেই দিক দিয়ে নয়।

তখন বলছেন, এনারা তো উপাধিবান, উপাধি আছে বলে তাঁদের অহঙ্কার আছে। অহঙ্কার থাকার জন্য তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন আমরা জয়ী। দেবতাদের এই মিথ্যা অহঙ্কার যখন হয়ে গেল তখন ব্রহ্ম জেনে গেলেন যে এদের অহঙ্কার হয়েছে। কারণ তিনি সবারই অন্তর্যামী কিনা, সবারই প্রত্যগাত্মা, সবারই ভেতরে বাস করছেন। আর তিনি সবাইকে প্রেরণা দেন, তিনি হলেন প্রেরক। আমরা যখন খারাপ কাজ করছি সেই কাজের প্রেরকও তিনি, কারণ যতক্ষণ ওই খারাপ কাজ না করতে পারছি ততক্ষণ মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে থাকবে, ওখান থেকে আমি বেরোতে পারব না। সেই সময় মনে হয় এই কাজটা না করলে আমি বেরোতে পারব না, মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করতে থাকবে। ঈশ্বরই ভালো মন্দ সব কাজের প্রেরক।

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *মিথ্যাভিমানাৎ পরাভবেয়ুরিতি তদনুকম্পয়া দেবান্*, দেবতারা এত অহঙ্কার করছে, এরা জানে না যে অহঙ্কার বিনাশের কারণ আর শেষে এদেরও অবস্থা অসুরদের মত না হয়ে যায়। অহঙ্কার বেশি হলে আত্মার শক্তি প্রকাশিত হয় না। তখন দেবতাদের উপর ব্রহ্মের অনুকম্পা হল। অনুকম্পা যদি না হত ব্রহ্ম দেবতাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এভাবে কৃপা করতেন না। এই যে প্রেরক শব্দ আনা হল, এর তাৎপর্যই হল, তাঁর যখন অনুকম্পা হয় তিনি তখন ওটা করান। কারণ সে ওখানে আটকে আছে। ঠাকুর বলছেন, হাসপাতালে নাম লেখালে যতক্ষণ রোগ না সারছে ততক্ষণ ছাড়া পাবে না। যে সত্যিকারের ঈশ্বরের শরণাগত, তিনি তাকে অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। আমাদের কখন ভালো সময় চলতে থাকে আবার কখন মন্দ সময় চলে। মন্দ সময় চলতে থাকলে বুঝতে হবে তিনি তাকে ভালো করার জন্যই করছেন। চিকিৎসা চলাকালীন ডাক্তাররা মিষ্টি ওষুধও দেন আবার তেতো ওষুধও দেন। বলছেন, দেবতারা অভিমান করছেন, তাও আবার মিথ্যা অভিমান। মিথ্যা অভিমান কেন? এই জয় তো তারা পায়নি, এই জয় তাদের জন্য আমি করে দিয়েছি। আমাকে তাই অনুকম্পা বশতঃ দেবতাদের অহঙ্কার ভেঙে দিয়ে এদের উপর কৃপা করতে হবে। ঈশ্বর এই ভাবে ভাবলেন। তখন, নিজের যোগমায়ার শক্তিতে যিনি সবাইকে বিস্মিত করে দিতে পারেন, তিনি এক অদ্ভূত রূপে দেবতাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয় করে নিজে আবির্ভূত হলেন।

এখানে চারটে পয়েন্ট মনে রাখার। প্রথম পয়েন্ট, দেবতাদের মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত করার জন্য দেবতাদের উপর অনুকম্পা হল। তিনি দেবতাদের মিথ্য জ্ঞানের নাশ করছেন ঠিকই, কিন্তু সব থেকে বড় হল, দেবতাদের উপর তিনি অনুকম্পা করছেন। দ্বিতীয় যোগমায়ার প্রভাবে, কারণ ভগবান যখনই কারুর ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপে ধরা দেন তখন তিনি যোগমায়াকে আশ্রয় করেই আসেন। অবতার মানেই মায়া, যোগমায়া ছাড়া তিনি আসবেন না, যোগমায়ার আশ্রয় ব্যতিরেকে অবতার হয়ে আসাটা সম্ভই হবে না। কারণ তিনি হলেন সমষ্টি, ওই বিশাল সমষ্টি কখনই যোগমায়ার আশ্রয় ছাড়া আসতে পারবেন না। আচার্যও তাঁর গীতার সম্বন্ধ ভাষ্যে বলছেন, *দেহবান ইব জাতঃ*। তিনি দেহবানের মতই জন্ম গ্রহণ করেন, এটাই তাঁর মায়া, ভগবান বলছেন, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*। ভগবানের মায়াকে অতিক্রম করা খুব কঠিন। তৃতীয় পয়েন্ট, অতি অদ্ভূত রূপ। ভগবান কার সামনে কি রূপে আবির্ভূত হবেন আমরা জানি না। যে রূপে আমি ধ্যান করছি সেই রূপেও আসতে পারেন, আবার যে রূপের ধ্যান করছি না, সেই রূপেও আসতে পারেন। ঠাকুর অনেক রূপে দেখছেন, কখন রতির মার রূপে, কখন দেখছেন তিনি দিগম্বরী হয়ে মন্দিরের আলসেতে দাঁড়িয়ে আছেন। কি রূপে আসবেন আমরা জানি না। চতুর্থ হল, তিনি দেবতাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয় হলেন। যেমন ঠাকুরের ইন্দ্রিয়ের বিষয় হলেন মা কালী। মা কালী রতির মার রূপে এসে ঠাকুরকে বলছেন, তুই ভাবমুখে থাক। খুব বিখ্যাত কথা। প্রথম কথা ঠাকুরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আর দ্বিতীয় কথা মা যোগমায়াকে আশ্রয় করলেন আর তৃতীয় হল, রতির মার বেশ। কেনোপনিষদের ক্ষেত্রে অনুকম্পা হয় তাঁর মিথ্যা জ্ঞান নাশ করা। আসলে ঈশ্বর অনুকম্পা ছাড়া কিছু করেন না। শেষ পয়েন্ট, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, অর্থাৎ ঠাকুর দেখতে পাচ্ছেন যে জিনিসটা হচ্ছে। ঈশ্বর যে অবতার হয়ে আসেন আর অবতার বা ঈশ্বর রূপে এসে যে কৃপা করেন, অবতার রূপে আসার এই চারটে প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে ভগবান বিশ্বরূপ

দেখাচ্ছেন, সেখানেও এই চারটে পয়েন্ট আসছে। অর্জুনকে ভগবান কৃপা করছেন। একটা একটা রূপ দেখিয়ে অর্জুনকে বলে দিচ্ছেন। দ্বিতীয় ভগবান নিজের যোগমায়া শক্তিকে দেখাচ্ছেন। তৃতীয় এক অদ্ভুত রূপ অর্জুনকে দেখাচ্ছেন। আর চতুর্থ পয়েন্টা হল, তুমি স্থূল চোখে বিশ্বরূপ দেখতে পারবে না, তাই তোমাকে একটা দিব্য চক্ষু প্রদান করছি। এই ক্ষেত্রে দিব্য চক্ষু না দিয়ে ইন্দ্রিয়ের বিষয় করে দিচ্ছেন। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে বলে দিচ্ছেন, তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিলাম, এবার তুমি সব দেখ কি হচ্ছে। অর্জুনও জানে এটা কি হচ্ছে। কিন্তু ইন্দ্রকে বলেননি কি হচ্ছে, দেখছেন একটা অদ্ভূর প্রানী। দেবতারা বুঝতেই পারছেন না এই প্রানীটা কোথা থেকে এল।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় আর ঈশ্বরের ক্ষমতায় সব হয়, আর ঈশ্বর চান না কেউ ভুল বুঝে অহঙ্কার বশতঃ মনে না করে যে এটা সে তার নিজের ক্ষমতার জোরেই করেছে। এখানেও তিনি চাইছেন দেবতাদের রাজা ইন্দ্রেরও মন যেন অসুরদের মত না হয়ে যায়। সেইজন্য ব্রহ্ম যক্ষ রূপে দেবতাদের যাতে দৃষ্টিগোচর হতে পারেন, সেইভাবে আবির্ভূত হলেন। পুরাণ বা মহাভারতে আমরা যক্ষ বলতে যে যক্ষকে জানি, এই যক্ষ সেই যক্ষ নয়, যক্ষ বলতে এখানে বোঝাচ্ছেন এমন একটা অদ্ভূত বিচিত্র প্রানী যেটা আগে কেউ কখন দেখেনি, একটা অজানা প্রানী। এতক্ষণ আমরা এর উপর বিস্তৃত আলোচনা করলাম। দেবতারা ওই বিচিত্র জিনিসটা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন, এই রকম বিচিত্র জিনিস তো আমরা আগে কখন দেখিনি। দেবতারা তখন অগ্নিকে বললেন –

তেঽগ্নিমব্রুবন্ - জাতবেদ এতদ্বিজানীহি।
কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি।।৩/৩।।

(তাঁরা তখন অগ্নিকে বললেন 'হে জাতবেদা, তুমি সম্মুখে অবস্থিত যক্ষকে জেনে এসো যে, ইনি কে'। অগ্নি বললেন 'তাই হোক'।)

অগ্নি তুমি গিয়ে দেখে এসো জিনিসটা কি। *তথেতি*, অগ্নি বললেন, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। একটা বাক্যের মধ্যে পুরো একটা কাহিনীকে রেখে দিলেন। এখানে নতুন করে বোঝার কিছু নেই। কিন্তু আচার্য নিজের তরফ থেকে বলছেন, অগ্নি সবাইকে জ্বালাতে পারে, অগ্নি বাণীর স্বরূপ আর দেবতাদের মধ্যে সব থেকে তেজস্বী।

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি।।৩/৪।।

(অগ্নি সেই যক্ষের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। যক্ষ অগ্নিকে এই ভাবে অভিভাষণ করলেন 'তুমি কে?' অগ্নি বললেন 'আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, আমি জাতবেদা নামেও খ্যাত'।

অগ্নি ভয়ে ভয়ে সেই যক্ষের কাছে গেলেন। যক্ষের কাছে গিয়ে অগ্নি যেন অবশ হয়ে গেছেন। এখানে অগ্নি ধৃষ্ট হননি, তিনি অবশ চিত্ত হয়ে গিয়ে যক্ষকে জিজ্ঞেস করতে পারছেন না আপনি কে। অগ্নিকে পাঠানো হয়েছিল যক্ষের ব্যাপারে জেনে আসার জন্য, কিন্তু আসার পর উল্টোটা হচ্ছে, যক্ষই অগ্নিকে জিজ্ঞেস করছেন, *কোঽসীতি*, তুমি কে, তোমার পরিচয় কি? তখন অগ্নি বলছেন, 'আমি অগ্নি'। বিনয়ের সাথেই অগ্নি নিজের নাম বললেন, কিন্তু নিজের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বললেন, 'আমার আরেকটা নাম জাতবেদা'। জগতে যাঁরা খুব বিখ্যাত লোক, ক্ষমতাবান লোক তাঁদের একটা নামে হয় না, দুটি নাম থাকতে হবে। দুটো নাম থাকা মানেই গুরুত্ব বাড়ানো, আমি কিছু একটা হলাম। যদিও অগ্নি যক্ষের সামনে গিয়ে একটু দমে গেছেন, কিন্তু নিজের গুরুত্বটা দেখাবার জন্য বলছেন, আমার নাম অগ্নি আর জাতবেদা নামেও আমাকে সম্বোধন করা হয়। সেই পূজ্য যক্ষ তখন অগ্নিকে প্রশ্ন করছেন –

তস্মিংস্তয়ি কিং বীর্যমিতি। অপিদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।।৩/৫।।

(ব্রহ্ম বললেন 'তাদৃশ তোমার কি সামর্থ্য?' অগ্নি এই উত্তর দিলেন 'পৃথিবীতে এই যা কিছু আছে, তার সমস্তই আমি দগ্ধ করতে পারি'।)

এই জগতে তোমার সামর্থ কি? অগ্নি বলছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুকে আমি দহন করে দিতে পারি। এখানে পৃথিবী বলতে আকাশকেও বোঝায়, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব কিছুকে আমি দহন করতে পারি। দহন শক্তিটাই অগ্নি। অগ্নির সামর্থের কথা শুনে সেই মূর্তি বলছেন –

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে – নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।।৩/৬।।

(ব্রহ্ম তখন অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করে বললেন, 'এটাকে দগ্ধ কর'। অগ্নি পূর্ণোৎসাহ হয়ে বেগে সেই তৃণের নিকট গমন করলেন; কিন্তু সেই তৃণকে দগ্ধ করতে পারলেন না। তিনি সেই যক্ষের নিকট হতে দেবতাদের কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন 'এই পূজনীয়স্বরূপ কে, তা জানতে পারলাম না'।)

একটা ঘাসের টুকরো অগ্নির সম্মুখে রেখে বললেন, এই ঘাসের টুকরোকে তুমি পোড়াও তো। অগ্নি সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন ঘাসের টুকরোকে পোড়াতে। কিন্তু অগ্নির ভেতরের যে শক্তি সেই শক্তিকে ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, অগ্নি তা নিজেও জানেন না। কারণ তাঁর যে শক্তি সেই শক্তি আসলে আত্মারই শক্তি, সেই শক্তিকে অগ্নির ভেতর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। মৃত ব্যক্তি যেমন কিছু বলতে পারে না, করতে পারে না, ঠিক তেমনি অগ্নির যে আত্মা সেটাই চলে গেছে। এটা কাহিনী, এই ঘটনাকে আমরা আক্ষরিক ভাবে নিতে পারি না, কিন্তু কঠোপনিষদ ও অন্য উপনিষদেরও একই ভাব, *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর ধাবতি পঞ্চমঃ।* সবই তাঁর ভয়ে চলে, তাঁর শক্তিতেই চলে। আবার বলছেন *যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।।* অগ্নি চেষ্টা করেও কিছু মাত্র দহন করতে পারলেন না। আচার্য বলছেন *হতপ্রতিজ্ঞঃ*, অগ্নি প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলেন এই বলে যে আমি জেনে আসছি ওই বিচিত্র অদ্ভূত মূর্তি কে। কিন্তু কিছু জানাতো দূরের, নিজেই অসমর্থ হয়ে লজ্জিত ও প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হয়ে অগ্নি সেই পূজ্যমূর্তির কাছ থেকে দেবতাদের কাছে ফিরে এসে বলছেন, *নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং*, আমি এই যক্ষের ব্যাপারে বিশেষ ভাব জানতে পারলাম না।

অথ বায়মব্রুববন্ - বায়বেতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি।।৩/৭।।

(অনন্তর দেবতারা বায়ুকে বললেন 'হে বায়ু, তুমি এই সম্মুখস্থ যক্ষকে জেনে আস যে, ইনি কে'। বায়ু বললেন 'তাই হোক'।)

দেবতারা তখন বায়ু দেবতাকে বললেন, হে বায়ু তুমি জেনে এসো এই মূর্তির স্বরূপ কি। বায়ু দেবতাও তাই হোক বলে বেরিয়ে গেলেন। এখানে আচার্য একটাও বাক্য লেখেননি। এটাই আচার্যের বৈশিষ্ট্য যেখানে দরকার নেই সেখানে তিনি একটি শব্দও বলবেন না।

তদভ্যদ্রবৎ; তমভ্যবদৎ - কোহসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি।।৩/৮।।
তস্মিংস্তয়ি কিং বীর্যমিত; অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি।।৩/৯

(বায়ু তাঁর নিকট গমন করলেন। ব্রহ্ম তাঁকে এই ভাবে অভিভাষণ করে বললেন 'তুমি কে'? বায়ু বললেন 'আমি বায়ু নামে প্রসিদ্ধ, মাতরিশ্বা নামেও আমি খ্যাত'। ব্রহ্ম বললেন 'তাদৃশ তোমার কি সামর্থ্য?' বায়ু এই উত্তর দিলেন 'পৃথিবীতে এই যা কিছু আছে, এর সমস্তই আমি গ্রহণ করতে পারি'।

এবার বায়ু এসেছেন, সেই একই ভাবে যক্ষ বায়ুকে কিছু বলার আগেই প্রশ্ন করছেন, তুমি কে? আমি বায়ু, আমাকে মাতরিশ্ব নামেও সম্বোধন করা হয়। বায়ু দেবতাও দুটো নাম উল্লেখ করে নিজের

অহঙ্কার প্রকাশ করছেন। তুমি কি কর, তোমার সামর্থ কি? জগতে যা কিছু আছে সব কিছুকে আমি গ্রহণ করে নিতে পারি।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্। স তত এব নিববৃতে – নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।।৩/১০।।

(ব্রহ্ম তখন বায়ুর সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করলেন এবং বললেন 'এটা গ্রহণ কর'। বায়ুও পূর্ণোৎসাহ নিয়ে বেগে সেই তৃণের সম্মুখে গমন করলেন; কিন্তু তৃণকে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি যক্ষের কাছ থেকে দেবতাদের কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন 'এই পূজনীয়স্বরূপ যে কে, এটা আমি জানতে পারলাম না'।

আচার্য বলছেন, বায়ু শব্দটা বান থেকে এসেছে, বান যেটা যায়। বান গমনে হয়, বায়ুও গমনে, বায়ু চলে সেইজন্য তার নাম বায়ু। মাতরি শব্দের অর্থ যিনি অন্তরীক্ষে শয়ন করেন, শয়ন করা মানে বিচরণ করা। বাতাস উপরে বিচরণ করে, সেখান থেকে বায়ুর আরেকটা মাতরিশ্ব। যখন বলছেন আমার সামর্থ হল, আমি সব কিছুকে গ্রহণ করতে পারি তখন *তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি*, একটা ঘাসের টুকরো দিয়ে বায়ুকে বললেন, এটাকে ওড়াও দেখি। বায়ু পূর্ণ বেগে সেই তৃণ খণ্ডের দিকে ধেয়ে গেলেন। কিন্তু যে বায়ু সব কিছুকে ফুস্ করে উড়িয়ে দেন, তিনি তৃণের টুকরোকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না। কারণ বায়ুর আত্মাই চলে গেছেন, লবণের লবণত্ব চলে গেলে সে একটা পাথর ছাড়া কিছু না। মাথা নীচু করে বায়ু দেবতা ফেরত চলে এলেন, বলছেন, এই মূর্তি যে কি স্বরূপবিশিষ্ট তা আমি জানতে পারলাম না।

অথেন্দ্রমব্রুবন্ - মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ তিরোদধে।।৩/১১।।

(অনন্তর দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন 'হে মঘবন্! তুমি এই সম্মুখস্থ যক্ষ সম্বন্ধে জেনে আসো যে ইনি কে'? 'তথাস্তু' বলে ইন্দ্র তাঁর নিকট গেলেন। যক্ষ ইন্দ্রের নিকট থেকে তিরোহিত হয়ে গেলেন।)

দেবতারা তখন ইন্দ্রকে বললেন, হে মঘবন্, আমরা তো জানতে পারলাম না, আপনি জেনে আসুন এই মূর্তির কি স্বরূপবিশিষ্ট। ইন্দ্র বললেন তাই হোক। তারপর ইন্দ্র সেই মূর্তির কাছে গেলেন। সেই মূর্তি ইন্দ্রের সাথে কোন কথাই বললেন না, *তস্মাৎ তিরোদধে*। যক্ষ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ইন্দ্র যেতেই তিনি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে তিনি গ্রাহ্যই করলেন না, একটিও কথা না বলে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলন। মঘবন্ শব্দের অর্থ শক্তিমান, যিনি শক্তিমান তাঁকে *মঘবন্* বলা হয়। বলছেন, ইন্দ্রের অহঙ্কার সবার থেকে বেশি, কারণ তিনি দেবতাদের রাজা বলে কথা। আমরা এর আগে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম যে, বিভিন্ন যে ইন্দ্রিয় গুলো আছে এরা কখন সখন কোন ভাবে ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা ভাব পেয়ে যায়। আর আমিত্ব যিনি, যাকে অহঙ্কার বলা হয়, তাঁর তো ঈশ্বরের বোধ আসেই। যদিও এই বোধ স্থায়ী নয়, কিন্তু ভুল তাও না, ওখানে একটা আভাস মাত্র আসে। আমাদের শরীরের যে প্রাণশক্তি কাজ করে, প্রাণের উপরে যে বাণী আদির ক্রিয়া হয়, সেখানে যে জায়গাতে শেষ আমিত্ব রয়েছে, ওই আমিত্বটাই শেষ কথা আর ঈশ্বর জ্ঞান আমিত্ব থেকেই হয়। অগ্নি, বায়ু দেবতাদের মত ইন্দ্র কিন্তু ফেরত এলেন না। ইন্দ্রের মনে কোথাও একটা অনুসন্ধিৎসা জেগে গেল, এই জিনিসটা কি হল, কেন হল, কিভাবে হল। তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন, যদিও যক্ষ তাঁর সাথে কথাও বললেন না।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্; তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।।৩/১২।।

(সেই ইন্দ্র ওই আকাশেই (যেখানে যক্ষ অন্তর্ধান করেছিলেন) এক অত্যন্ত শোভাময়ী স্ত্রীর সকাশে উপস্থিত হলেন এবং সেই সুবর্ণালঙ্কারাভূষিত (অথবা হিমালয় পুত্রী) উমাকে (পার্বতীরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা) জিজ্ঞাসা করলেন 'এই যক্ষ কে'?

যে জায়গায় যক্ষ ছিলেন, সেখানেই আকাশে এক অপরূপা সুন্দরী নারী যিনি সুবর্ণ আভূষণে আবৃতা হিমালয় পুত্রী উমা রূপে এসে হাজির হলেন। ইন্দ্র সেই দেবীকে জিজ্ঞেস করছেন, *কিমেতদ্ যক্ষমিতি*, যে যক্ষকে আমরা কেউই জানতে পারলাম না, তিনি কে ছিলেন? এখানে বলছেন, অদিতির সন্তান যে ইন্দ্র আর বজ্রধারী যে দেবরাজ দুজন একই। দেবরাজ ইন্দ্রের মনে আমি দেবতাদের রাজা এই অহঙ্কার ও অভিমান ছিল, যক্ষ তাই ইন্দ্র আসতেই অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। যক্ষ চলে গেছেন, কিন্তু ইন্দ্র সেখান থেকে চলে যাননি, শ্রদ্ধাপ্লুত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীমসেন যোশীর নামে বলা হয় তিনি এত সুন্দর 'পা' এর সুর গলা দিয়ে বার করতেন যা ভারতে কোন গায়কই পারেন না। ভীমসেন যোশীকে নিয়ে একটা প্রচলিত ঘটনা আছে, তিনি যে গুরুর কাছে গান শিখতেন সেই গুরুর কাছে একদিন রেওয়াজ করছেন, কিন্তু কন্ঠ দিয়ে 'পা'এর সেই সুরটা বেরোচ্ছিল না। ভীমসেন যোশীর পাশেই তাঁর গুরুভাইও আওয়াজ বার করছেন। সুর ঠিক মত না বেরোতে গুরু খুব রেগে গেছেন। উনি সেই সময় জাতি দিয়ে সুপুরি কাটছিলেন, রেগে তিনি ওই জাতিটা ভীমসেন যোশীকে ছুঁড়ে মেরেছেন। যে জায়গাতে এসে জাতিটা লেগেছে সেখানটা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। গুরু দেখছেন ঝর ঝর করে রক্ত বেরোচ্ছে। গুরু কিছু বললেন না, একটা কাপড়ের টুকরো নিয়ে মাথায় বেঁধে দিয়ে বললেন, এবার গাও। এরপর ভীমসেন যোশীর গলা দিয়ে সেই যে সুর বেরিয়ে এলো, সারা জীবনের মত তাঁর সেটা থেকে গিয়েছিল। ভীমসেন যোশীর গুরুভাই পরে এই ঘটনাটা অনেককে বলেছিলেন। গুরু-শিষ্যের এই ধরণের সম্পর্ক নিয়ে অনেক ঘটনা আছে। গুরুর প্রতি শিষ্যের এমন শ্রদ্ধা যে গুরু যাই করুন বা বলুন না কেন, শিষ্য গুরুর কাছ থেকে নড়বে না, ওখান থেকে উঠে বেরিয়ে যাবে না। অগ্নি আর বায়ু অপমান বোধ নিয়ে ওখান থেকে চলে এলেন কিন্তু ইন্দ্র দাঁড়িয়ে থেকে গেলেন। তখন দেখছেন ওই জায়গায় উমা হৈমবতী আবির্ভূতা হয়েছেন।

এখানে এটাই বলছেন, যক্ষের প্রতি ইন্দ্রের ভক্তি দেখে স্ত্রী বেশ ধারিণী উমা রূপা বিদ্যাদেবী দেখা দিলেন। এখানে তিনটে পয়েন্টকে নিয়ে ভাবতে হবে। প্রথম পয়েন্ট যক্ষের প্রতি ইন্দ্রের ভক্তি, দ্বিতীয় পয়েন্ট স্ত্রী বেশ ধারিণী উমারূপা এবং তৃতীয় পয়েন্ট বিদ্যাদেবী। প্রথম পয়েন্ট ইন্দ্রের ভক্তি। বিদ্যা তখনই একজনের সামনে নিজেকে উন্মোচন করবেন, যখন তার সেই বিদ্যার প্রতি ভক্তি হবে। সেইজন্য বলা হয় উপনিষদের মন্ত্রকে মুখস্ত করতে, মুখস্ত করাটা বিদ্যার প্রতি ভক্তি। উপনিষদ একটা বিদ্যা, এই বিদ্যা যখনই কারুর উপর কৃপা করবেন তখনই এর মন্ত্রের অর্থ স্পষ্ট হবে। প্রথম কথা ভক্তি, শ্রদ্ধা চাই। বিদ্যা এখানে উমা রূপে এসেছেন। বলছেন বিদ্যা সব থেকে শোভাময়ী, শোভন মানে সুন্দর। যেখানে আমাদের ভালোবাসা হয় সেখানে একটা শোভন অধ্যাস হয়। শোভন অধ্যাস মানে, যাকে আমরা ভালোবাসি তাকে আমরা সব থেকে সুন্দর দেখি। মা নিজের সন্তানকে সবার থেকে সুন্দর দেখে, কারণ ওখানে একটা শোভন অধ্যাস জড়িয়ে থাকে। শোভন অধ্যাস মানে হয় চাপিয়ে দেওয়া, শোভন মানে সুন্দর, সে সুন্দর না থাকলেও ওই আমার কাছে সব থেকে সুন্দর মনে হবে। কাউকে সুন্দর দেখতে লাগাটা আমার মনের প্রজেকশান। বলছেন, জগতে যা কিছু আছে বিদ্যার মত সুন্দর কিছু নেই, বিদ্যাই রূপের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। পরের দিকে যখন সরস্বতী দেবীকে আনা হল তখন সরস্বতীকে সৌন্দর্যের দেবী রূপে নিয়ে আসা হয়েছিল, এই সৌন্দর্যের আরেকটা অর্থ হয় dignity maintain করা। বর্ণনা করছেন, উমা হৈমবতী সুবর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিতা।

আচার্য বলছেন, *অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী, নিত্যমেব সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ততে ইতি*, উমা হৈমবতী ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করেন। সেইজন্য তিনি যখন এসেছেন তখন ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, *কিমেতদ্ যক্ষমিতি*, এই যক্ষ কি স্বরূপবিশিষ্ট। এই অংশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই যে, বর্তমান কালের ভারতের ইতিহাসে বলছে শিব হলেন অনার্যদের দেবতা। কিন্তু শঙ্করাচার্য এটাকে কত সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করছেন, উমা বা পার্বতী ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গী। ঠাকুর বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, এখানে যে জায়গাতে ব্রহ্ম এসেছেন সেখানেই শক্তির আবির্ভাব, উমা হৈমবতীকে দেখা যাচ্ছে। আর তিনিই যখন ব্রহ্মের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন তখনই এনারা জানতে পারছেন।

অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখলে এটা হল বিদ্যার প্রকাশ। আর যদি ভক্তি বা আমাদের পরম্পরার দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে এটা পার্বতী, দুর্গা অর্থাৎ শক্তির প্রকাশ, শক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। যেখানেই ব্রহ্ম সেখানেই শক্তি, যেখানে যক্ষ এসেছেন সেখানেই উমা হৈমবতী এসেছেন।

যুক্তির দিক দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন, কিন্তু সিদ্ধান্তের দিকে দিয়ে গেলে খুব সহজে বোঝা যায়। সিদ্ধান্ত হল, যেখানেই সগুণ সাকার ব্রহ্ম সেখানেই তাঁর শক্তি। কারণ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, একসাথেই চলে। সেইজন্য সাধারণ ভাবে দেখা যায় অবতার আর তাঁর শক্তি একসাথেই আসেন। তিনি এলেন, তিনি আবার বিদ্যারূপিণী। ঠাকুরও শ্রীমাকে বলছেন বিদ্যারূপিণী। বিদ্যারূপিণী তাই তিনি সর্বাপেক্ষা শোভামানা। এর আরেকটা অর্থ হতে পারে, উমা বা পার্বতী হিমালয় পুত্রী, তাঁর অনেক আভূষণাদি আছে, আভূষণাদির দ্বারা তাঁর যে সৌন্দর্য সেটা গৌণ, বিদ্যা দিয়ে যে সৌন্দর্য সেটাই প্রাথমিক। কারুর যদি গুণ থাকে ওই গুণই তার আসল সৌন্দর্য।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।।৪/১।।

(উমাদেবী বললেন 'ইনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মেরই এই বিজয়ে তোমরা নিজেদের মহিমান্বিত মনে করছ'। সেই উমাবাক্য থেকেই ইন্দ্র জানলেন যে ইনি ব্রহ্ম।)

বলছেন, এই যে হৈমবতী উমা, ইনি ব্রহ্মবিদ্যার মূর্তরূপ। এক জায়গায় বলছেন, মা সরস্বতীর জ্ঞান ভাণ্ডারের একটা কণা যদি কেউ পেয়ে যায়, সে এই জগতে বিপুল সম্মান পায়। তার মানে জগতে সমস্ত বিদ্যার যদি কোন মূর্তরূপ হয় তাহলে সেটাই সরস্বতী দেবী হয়ে যাবেন। জগতে যত রকমের ঐশ্বর্য হতে পারে, ঐশ্বর্য বলতে যা কিছু বুঝে নিতে পারা যায়, তাকে যদি একটা মূর্ত রূপ দেওয়া যায় সেটা যক্ষ। সেইজন্য হিন্দুরা কখনই মূর্তির পূজা করে না, আমি ঈশ্বরকে এই রূপে দেখতে চাই। আইনস্টাইন যদি আমাদের পরম্পরাতে বিজ্ঞানী হতেন, তিনি তখন বলতেন, আমি অত ত্যাগ বৈরাগ্য বুঝি না, আমি শুধু বিদ্যাই বুঝি। তাহলে তিনি কার উপাসক হবেন? মা সরস্বতীর। আমাদের কত দুর্ভাগ্য, সরস্বতী পূজার দিন আমাদের বাচ্চাদের হাতেখড়ি হয়, বিদ্যাটা যেন পায়। কিন্তু উদ্দেশ্য হল বড় হয়ে যেন প্রচুর টাকা আয় করতে পারে। প্রথম থেকেই বিরোধ এসে যায়। অথচ একশ বছর আগেও ব্রাহ্মণ সন্তানদের বিদ্যারম্ভের সময় তাঁরা প্রার্থনা করতেন মা সরস্বতী যেন এর উপর কৃপা করেন যাতে বেদ, উপনিষদ, বেদাঙ্গের জ্ঞান লাভ করতে পারে। কিন্তু এখন উদ্দেশ্য হল যাতে টাকা আয় করতে পারে, আর সেটা করাচ্ছেন মা সরস্বতীকে দিয়ে। একটা ধারণা চলে আসছে যে, লক্ষ্মী আর সরস্বতী একসাথে থাকেন না। আমরা চাইছি লক্ষ্মী আসুক কিন্তু করাচ্ছি মা সরস্বতীকে দিয়ে। শুধু একসাথে থাকছেন না, আমরা সরস্বতীকে লক্ষ্মীর দাসী বানিয়ে দিচ্ছি। এই মানসিকতা যার তার কোন দিনই বিদ্যা হবে না, সেইজন্য দেশের আজ এই দুরবস্থা। এখানে বলছেন, ইনি ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত রূপ। ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত রূপ হলেই তিনি অত্যন্ত শোভমানা হবেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত রূপ, যাঁকে এখানে বলছেন উমা হৈমবতী, তিনি ইন্দ্রকে বলছেন, এই যে যক্ষ ছিলেন, তোমরা যাঁকে দেখেছিলে তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সগুণ সাকার ঈশ্বর।

তোমরা দেবতারা যে জয়ী হলে, তোমাদের যে মহিমা হয়েছে, এই মহিমা তাঁর কৃপাতেই হয়েছে। এতে তোমরা নিমিত্তমাত্র। নিমিত্তমাত্র হওয়ার জন্য মহিমাটা তোমাদেরই হল। এটা জায়গাটা আবার খুব জটিল হয়ে যায়। এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে, দেবতারা তো ঈশ্বরকে ভাবছিলেন না, তাঁদের কোন প্রস্তুতিও নেই, হঠাৎ দেবী কেন বলছেন, তোমরা যাঁকে এতক্ষণ দেখছিলে ইনিই ব্রহ্ম? এই একটা কথাতেই দেবতাদের কি করে ব্রহ্মের ব্যাপারে ধারণা হয়ে গেল? গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদংশ্চ ভাষসে*, তুমি প্রজ্ঞাবানের মত কথা বলছ। তারপর ভগবান পুরো উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। এরপর বিনা কোন রেফারেন্সে, কোন প্রসঙ্গ নেই, একবারও শব্দ আনা হল না, অথচ অর্জুন ওই যুদ্ধভূমিতে হঠাৎ বলছেন, *স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য* কেশব। এখানে কোন প্রসঙ্গই নেই, আগের শ্লোকের কথা তো ছেড়েই দিলাম, পুরো অধ্যায়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তার থেকে আরও যেটা মারাত্মক, অর্জুন একজন যোদ্ধা তিনি কি করে হঠাৎ বলে উঠলেন *স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব*। অনেকের মত যে, প্রথমে গীতা অনেক ছোট ছিল পরে এর মধ্যে অনেক সংযোজন করা হয়েছে, এই শ্লোকটাও সেই রকম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই প্রশ্নের সাথে এখানে একটা ধারাবাহিকতা আছে, ধারাবাহিকতায় কোন গোলমাল নেই। আচার্য শঙ্করের মত ব্যক্তি ওখানেও টানা ভাষ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের একটা জিনিস খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, শাস্ত্র শুনতে শুনতে যদি আমাদের মনে কোন প্রশ্ন ওঠে, কোন রকম সংশয় আসে, তাহলে বুঝে নিতে হবে আমি ভুল, শাস্ত্র কোন ভুল

বলছে না। তার কারণ এখানে এত এত মহাপুরুষদের এত দীর্ঘ পরম্পরা চলছে, এই গোলমাল যদি হত তাহলে শঙ্করাচার্যের মত ব্যক্তিও অনেক আগেই এই প্রশ্নটা তুলে দিতেন। তিনি এই প্রশ্ন তুলছেন না, তার মানেই ওটা ঠিক, আমার ভুল হচ্ছে। এখানেও ঠিক তাই, আমরা মনে করছি দেবতারা আমাদের মত সাধারণ কেউ হবেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সাধারণ নন, দেবতা তাঁরাই হয়েছেন যাঁরা আগের আগের জন্মে যখন মানুষ ছিলেন তখন প্রচুর যজ্ঞ করেছেন, তপস্যা করেছেন বলেই আজ দেবতা হয়েছেন। আমরা যদি এই জিনিসটা নাও মানতে চাই, তাহলে এটাকে মানতে কোন অসুবিধা নেই যে, দেবতাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ অনেক বেশি। আচার্য বার বার দেবতাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, যাঁদের মধ্যে আত্মা বিষয়ক আলো থাকে। সেইজন্য তাঁদের পক্ষে আত্মজ্ঞানের বিদ্যাকে ধরা সহজ। দ্বিতীয়, এটা একটা কাহিনী, কাহিনীতে একটু স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

এটাকে বলে হঠাৎ দর্শন। ঠাকুরও হঠাৎ সিদ্ধের কথা বলছেন। হঠাৎ সিদ্ধে মনে হয় তাঁর হয়ত কোন সাধনা করা ছিল না, কিন্তু কোন কারণে তিনি সিদ্ধি লাভ করে নিয়েছেন। বাইবেলে সেন্ট পলসের কাহিনী আছে। ভগবান যীশুর অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ার পর তাঁর শিষ্যরা সবাই একত্র হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় সেন্ট পলসকে জিউসরা মারার চেষ্টা করছিল। কিছু সংখ্যায় যারা খ্রীশ্চান হয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে মারার জন্য একটা বিরাট যজ্ঞ যেন চলছিল। তখন Saul বলে একজন ছিল, সেও খ্রীশ্চানদের মারার জন্য দামাস্কাস যাচ্ছিল। ঘোড়ায় চেপে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, যেতে যেতে হঠাৎ তার সামনে যীশুখ্রীষ্ট দাঁড়িয়ে গেলেন। ভগবান যীশু তাকে বলছেন, তুমি আমার সন্তানদের কেন মারতে চাইছ? ওই দৃশ্য দেখেই বেহুঁশ হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। তিন দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, পরে তার লোকেরা তাকে ফেরত নিয়ে গেছে। যখন হুঁশ এসেছে তখন থেকে সে শুধু বলে যাচ্ছে, Oh Jesus, forgive me। লোকেরা দেখে অবাক হয়ে গেল, এই লোকটা তো যাচ্ছিল খ্রীশ্চানদের মারতে, হঠাৎ করে কেন বলছে, Oh Jesus, forgive me। এটাকে খ্রীশ্চানদের ভাষায় বলে sudden conversion, দুম্ করে একটা পরিবর্তন হয়ে যায়।

Sudden conversion কার হয়, কেন হয় আমাদের জানা নেই। ঠাকুর এটাকে বলছেন হঠাৎ সিদ্ধ, সে আদপেই এই ভাবের নয় কিন্তু হঠাৎ ওই ভাবটা তার মধ্যে এসে যায়। এর রহস্য আমাদের জানা নেই। দেবতাদেরও এটা হতে পারে। কিন্তু দেবতাদের হওয়াটা বেশি স্বাভাবিক, তার কারণ তাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রভাব অনেক বেশি। যে কোন মানুষ অনেক সাধনা করে সত্ত্বগুণের চরম স্তরে পৌঁছাতে পারে, কিন্তু দেবতারা তাদের থেকে অনেক এগিয়ে। এখানে উমা হৈমবতী দেবতাদের বলছেন, অসুরদের উপর তোমাদের এই যে জয় হল, আসলে ঈশ্বরই এই জয় পেয়েছেন, তোমরা নিমিত্ত মাত্র ছিলে। তোমাদের যে মহিমা বেড়েছে, আসলে কিন্তু এটা ঈশ্বর নিজে করেছেন, সেইজন্য বলছি তোমরা বেশি লাফালাফি কর না। ঠাকুর কথামৃতে পাতায় পাতায় বলছেন, তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। এখানে এই তিনটে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, প্রথম প্রশ্ন হল, যে জয় হয়েছে এই জয় ঈশ্বর পেয়েছেন, দ্বিতীয় তোমরা নিমিত্তমাত্র আর তৃতীয় তোমাদের তাতে মহিমা বেড়েছে। এখানে আমরা প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।

আমাদের জানা দরকার, জীবনে আমরা যা কিছু করছি, জাগতিক ভাবে আমাদের যা কিছু ভালো হয়, সব তিনিই করাচ্ছেন। অশুদ্ধ মন মানে জটিল মন। মন জটিল কেন হয়? এর খুব সহজ উত্তর, বাসনা থেকে মন জটিল হয়। মনে যখন বাসনা আসে তখন বাসনার সাথে জড়িত আরও অনেক কিছু এসে যায়। বাসনা থাকলে অনেক সময় আমরা মুখে কিছু বলতে পারি না, আবার অনেক সময় বলে ফেলি। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, পেটে খিদে মুখে লাজ। খিদেটাও তাতাচ্ছে আবার লাজটাও টেনে রাখছে, অন্যের পেট ভরে গেলে তার প্রতি রাগ হচ্ছে। এভাবেই মন জটিল হয়ে যায়। জটিল মন মানেই, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের আলোর প্রকাশ বিশ্রি ভাবে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়। একটা হাজার ওয়াটের বাল্বের কাঁচ যদি কালো রঙের হয় তাহলে ওর ভেতরে যে আলো জ্বলবে সেটা কি হাজার ওয়াট নাকি

চল্লিশ ওয়াট কিছুই বোঝা যাবে না। আর যদি রীতিমত মোটা করে কালো রঙ লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ভেতরে যত আলোই জ্বলুক বাইরে কোন আলো বেরোবে না। কাঁচ যত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে আলোর প্রকাশ তত বেশি হবে। মন যত শুদ্ধ হবে ঈশ্বরের আলো তত বেরোবে, যত আলো বেরোবে তত তার জগতে প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি হবে। আমাদের জীবনে যা কিছু উন্নতি, এমনকি পরীক্ষায় পাশ করা, ভালো চাকরি পাওয়া, সব তাঁর জন্যই হয়। আগে বলা হয়েছে, আত্মা আছেন বলেই ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের কাজ করতে পারছে। মানুষের যে কোন উন্নতি ঈশ্বরের কৃপা আছে বলেই হয়। এর অন্যথা কিছু হয় না। ঠিক তেমনি একজনের কোন উন্নতিই হচ্ছে না, তার মানে ঈশ্বর তার জন্য এখন কিছু করছেন না। তাহলে বলতে হবে যে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ আছে। একেবারেই নয়, যিনি নিজের মন পরিষ্কার করেছেন, সেখানেই ঈশ্বরীয় আলো প্রকাশিত হয়। যার মন পরিষ্কার করা হয়নি, মনকে একাগ্র করা হয়নি, সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ আসবে না। আশ্চর্যের এটাই, প্রত্যেকটি ধর্ম এই একই কথা বলে।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্*। আমাদের এখানে এমন কেউ নেই যে ঠাকুরের কাছে কোন না কোন সময় প্রার্থনা করিনি, ঠাকুর আমার এই কাজটা যেন হয় যায়, আমার এই সমস্যা মিটিয়ে দাও, অমুক দাও, কোন না কোন ভাবে প্রার্থনা করেছি। কিন্তু আমরা কখন এই প্রার্থনা করি না যে, হে ঠাকুর! আমাকে এমন করে দাও আমি যেন তোমার ভালো নিমিত্তমাত্র হতে পারি। তার মানে, আমার মন, বুদ্ধি এমন পরিষ্কার হয় যাতে তাঁর মহিমা যেন প্রকাশিত হতে পারে। মানুষের কোন মহিমা হতে পারে না, যা কিছু মহিমা হয় সব তাঁরই মহিমা। সাধারণ ভাবে আমাদের বেশির ভাগ প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায় না, খুব কম উত্তর পাওয়া যায়। এটাই হবার কথা। তার কারণ, ভগবান একটাই কাজ করেন, সেই কাজটা হল তিনি আমাদের নিমিত্ত বানাবেন, নিমিত্ত মানেই তাঁর যন্ত্র। ভালো দামী পেন থাকলে ভালো লেখা হবে, সস্তার খারাপ পেন হলে লেখাটাও খারাপ হবে। আমরা যন্ত্র তিনি কর্তা, এটাই আমাদের জীবনের একটা ধ্রুব সত্য, এটাকে কখনই পালটানো যাবে না।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ঠাকুরের রথ চলছে, এর গতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না। যারা এই রথের চাকাকে থামাতে চাইবে তারা পিষে যাবে। যারা এই রথের দড়িতে হাত লাগাবে তারা ধন্য হয়ে যাবে। আমরা হাত লাগাচ্ছি বলে ঠাকুরের রথ চলছে না, নিজে থেকেই চলছে। আমাদের সমস্যা হল আমরা সচেতন নই যে আমরা নিমিত্তমাত্র। ফলে একটা কিছু হলেই আমরা লাফাতে থাকি, আমি এই করেছি, সেই করেছি। যখনই বলছি, আমি এটা করেছি, তার মানে আমি আবার ফেঁসে গেলাম, কারণ নিমিত্তমাত্রের যে যন্ত্র মন, সেই মন আরও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে বড়দের কাছে শুনে আসছি, বেশি অহঙ্কার করতে নেই, অহঙ্কার করলে পতন হবে। অহঙ্কার করলে এইজন্য পতন হবে না যে ভগবান আমাকে শেষ করে দেবেন, আমার মন এমন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাবে যে তাতে যে চৈতন্যের প্রকাশটা আসছিল সেই আসাটা বন্ধ হয়ে যাবে, মহিমাটাও কমে যাবে।

যদি সত্যিকারের শুদ্ধ, পবিত্র মানুষ মনের মত কোন পরিবেশ বা কাজ না পায় তখন বুঝতে হবে ভগবান তার জন্য অন্য কিছু খুলে রেখেছেন। শুদ্ধ পবিত্র মানুষ যদি জীবনে প্রচুর কষ্ট, যন্ত্রণা পায় তাহলে বুঝতে হবে, তার নতুন কোন একটা বড় কিছু খুলতে যাচ্ছে। সাধারণ লোকেদের উপর এটা প্রযোজ্য নয়। সেইজন্য সব সময় নিজে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে তৈরী থাকতে হয় যাতে তাঁর হাতের ভালো নিমিত্ত হতে পারি, কারণ আমরা তাঁর নিমিত্তমাত্র, তাছাড়া আর কিছু না। তাঁরই প্রকাশ আমার আপনার সবার মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়। একটা পিঁপড়ে, একটা বিছে এদের মাধ্যমেও সেই ঈশ্বরের রূপই প্রকাশিত হচ্ছে। আবার তিনি মৃত্যুরূপ, গীতায় ভগবান বলছেন, *কালোহস্মি*, আমি কাল সব কিছুর নাশ করতে এসেছি। ওই কালেরই রূপ বিষধর কেউটে, এক ছোবলে হাতিও মরে যায়। আবার সাধু মহাত্মা, যাঁদের কাছে গেলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, ভগবানেরই রূপ। জগতে কিছু নেই যেটা ভগবানের রূপ নয়, একটা কিছু নেই যেটা তাঁর ইচ্ছাতে চলে না, একটা কিছু নেই যেখানে তাঁর মহিমা প্রকাশ হয় না। গৃহীদের যে

সন্তানাদি হয় সেই সন্তানও ঈশ্বরেরই প্রকাশ। ভগবান বলছেন, আমি এক আমি বহু হব। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *কামহোস্মি*, আমি কাম। সেই কাম শক্তির মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন যোনিতে প্রানীকুলের জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন। সন্তান হওয়া মানে ভগবানের মহিমার প্রকাশ, ওটাই ভগবান। কিন্তু আমরা মনে করছি, এ আমার ছেলে, এ আমার মেয়ে। যেদিন ছেলে বড় হয়ে বাবা-মাকে ফেলে রেখে চলে যায় তখন মানুষ কাঁদে। কিন্তু যদি সে জানে এই সন্তান ভগবানের সন্তান, ঈশ্বরের মহিমা, এরপর সেই সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা সেভাবেই হবে। এরপর যদি সে বাড়ি ছেলে চলে যায়, আমার তাতে কি, ভগবানের সন্তান, আমি যতটুকু করার করে দিয়েছি, এরপর তিনি যা বুঝবেন করবেন। সন্তান যে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটাও তাঁরই মহিমার প্রকাশ। কখন তাঁর শিষ্ট মহিমার প্রকাশ, কখন দুষ্ট মহিমার প্রকাশ। সাপ, বিছে তাঁরই মহিমা আর রোজা যে সারাচ্ছে সেটাও তাঁর মহিমা, ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়াও তাঁরই মহিমা। সুখটাও তাঁর, দুঃখটাও তাঁর, মৃত্যুও তাঁর, জীবনটাও তাঁর, ধর্ম অধর্ম সবই তাঁর।

এখানে ব্রহ্মবিদ্যা মূর্ত রূপ ধারণ করে এসে দেবতাদের তাই সাবধান করে দিচ্ছেন, বেশি অহঙ্কার কর না, তোমার নিমিত্তমাত্র। তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছিলেন যাতে তাঁর মহিমা প্রকাশিত হয়। ভগবান তোমাদেরই বাছলেন, কারণ তোমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ সবার থেকে বেশি, তোমাদের অনেক গুণ আছে তাই তিনি তোমাদের বেছে নিলেন। এরপর তোমরা যদি বল, আমরা এই জয় পেয়েছি, আমাদেরই মহিমা বৃদ্ধি হল, তখন অগ্নি আর বায়ুর মত তোমার শক্তিটাকে তুলে নেওয়া হবে। এটা কোন তাত্ত্বিক কিছু নয়, এটাই একেবারে বাস্তবিক। শুদ্ধ মনের মানুষ যদি কোন ভুল কাজ করতে যায়, একটা দৈবীশক্তি এসে তাকে সাবধান করে দেন। আমাদের সবারই জীবনে কখন না কখন কোন ভাবে এই জিনিস হয়ে থাকবে। উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী এটাই করছেন, তিনি এসে দেবতাদের সাবধান করে দিচ্ছেন, তোমরা অহঙ্কার কর না, এই জয় ঈশ্বরের, তাঁর মহিমাতেই তোমাদের মহিমা। ঠাকুরও বার বার বলছেন সব তিনিই করেন। তাও তো আমাদের হুঁশ হয় না। আমাদের শিক্ষা হবে না, কারণ আমাদের সত্ত্বগুণ নেই। দেবতাদের সত্ত্বগুণ ছিল তাই তাঁরা জেনে গেলেন, ঈশ্বরই সব করেন। দেবতারা ব্রহ্মবিদ্যা পেয়েছিলেন। কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেবতারা ব্রহ্মবিদ্যা পেয়েছিলেন বেদ, উপনিষদে, পুরাণে বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে। মহাভারতে বর্ণনা আছে কিভাবে কচের মাধ্যমে দেবতারা ব্রহ্মবিদ্যা পেয়েছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা পেয়েছিলেন বলে দেবতারা শ্রেষ্ঠ।

উমা হৈমবতী, যিনি ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী, তিনি বললেন *সা ব্রহ্মেতি হোবাচ*, দেবীর এই কথায় দেবতাদের পরিষ্কার হয়ে গেল এতক্ষণ তাঁরা যাঁকে দেখছিলেন তিনি ঈশ্বর। দেবতারা দেবীর কথায় জেনে গেলেন ইনিই সেই সগুণ সাকার ব্রহ্ম, স্বাধীন ভাবে তাঁরা জানতে পারেননি। স্বাধীন ভাবে কি ঈশ্বরকে জানা যায়? যতক্ষণ না কেউ দেখিয়ে দেন, বলে না দেন, ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে যদি খুব ভালো করে অধ্যয়ন করা থাকে তাহলে আমাদের শাস্ত্রগুলি বুঝতে খুব সুবিধা হয়। স্বামীজীও বলছেন, ঠাকুরের জীবন বেদের মূর্ত ভাষ্য। আর সত্যি যদি বলতে হয়, ঠাকুর যদি না আসতেন, তাঁর জীবনী ও বাণী যদি লিপিবদ্ধ না হত তাহলে উপনিষদের কথা, শাস্ত্রের কথা, এর উপর আচার্য যে ভাষ্য রচনা করেছেন, এগুলো আমাদের বিশ্বাসই হত না। আমাদের পরম্পরাতে যেমন ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান প্রাপ্তির সময় মনে হয় সেখানে যেন কেউ ছিল না। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান প্রাপ্তি হল স্বরূপের জ্ঞান, কিন্তু এখানে সগুণ ঈশ্বরের জ্ঞানের কথা বলছেন। সগুণ ঈশ্বরের জ্ঞানে কাউকে দেখিয়ে দিতে হবে। কারণ স্বরূপের অনুভূতি, নির্বিকল্পের সমাধির সময় সেখানে কেউ থাকেন না। কিন্তু সগুণ সাকারের জ্ঞান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে কেউ থাকেন। যীশুখ্রীষ্টের ব্যাপারে কিছু লিপিবদ্ধ নেই, কিন্তু মহম্মদের ক্ষেত্রে একেবারে পরিষ্কার আছে। হীরা মাউন্টেনে মহম্মদ যখন সাধনা করতেন তখন এক দেবদূত তাঁকে ঘোড়ায় করে আল্লার সামনে নিয়ে যেতেন। ঠাকুরও বলছেন সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন, এক একটা দেউড়িতে গিয়ে দেখছে একজন কেউ বসে আছেন, জিজ্ঞেস করছে এই কি রাজা। শেষে যখন রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আর জিজ্ঞেস করতে হয় না। ঠাকুর

এভাবে বলছেন ঠিকই, কিন্তু সেই মুহুর্তে না হলেও, পরে তাকে হয়ত কাউকে জিজ্ঞেস করতে হতে পারে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে অন্য রকম হয়েছে। ঠাকুরের মা কালীর দর্শন সব কিছুই হয়েছে, কিন্তু ওই দর্শনের যাচাই করার জন্য যখন দক্ষিণেশ্বরে নানান ধরণের সিদ্ধ পুরুষরা এলেন তখন তাঁরা ঠাকুরের সব অনুভূতি ও দর্শনকে শাস্ত্র সম্মত বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। সাধকদের ক্ষেত্রে গুরু শিষ্যকে ইষ্টকে দেখিয়ে দেন আর ধ্যানের সময় গুরু যখন সজীব হয়ে ওঠেন তখন তিনিই দেখিয়ে দেন আর গুরু ইষ্টতে লয় হয়ে যান। সাধারণ ভাবে দেখানোর ব্যাপারটা বিশেষ করে সগুণ সাকার সাধনার ক্ষেত্রে থাকে। এই ব্যাপারটা যে শুধু দেবতাদের ক্ষেত্রেই হবে তা না, সবারই ক্ষেত্রে হয়, এক আধটা কোথাও ব্যতিক্রম থাকতে পারে। ব্যতিক্রম যদি হয়ও সেখানেও মনের এলাকা দিয়ে হয় বলে একটা সংশয় থেকে যাবে। যাই হোক দেবতাদের জ্ঞান হয়ে গেল, পরের মন্ত্রে তখন বলছেন –

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।।৪/২।।

(যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র – এই তিন দেবতা ব্রহ্মকে নিকটতম রূপে স্পর্শ করেছিলেন এবং যেহেতু তাঁরাই অগ্রণী হয়ে তাঁকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন সেইহেতু এই দেবতারা অপর দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন।)

দেবতাদের মধ্যে এই তিনজন দেবতা – ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু প্রথম ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, স্পর্শ এখানে সেই অর্থে হয় না, ব্রহ্মের কাছে চলে গিয়েছিলেন। আর এই তিনজন দেবতা জানতে পারলেন ইনিই ব্রহ্ম। ফলে তাঁরা অন্য দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলেন। এর অর্থ হল, ঈশ্বরকে যিনি জেনে যান তিনি তাঁর জাতি বা গোষ্ঠির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে যান। এখানে এই তিন দেবতাদের শক্তি, গুণ ও সৌভাগ্য অন্য দেবতাদের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে গেল, কারণ তাঁরা ঈশ্বরকে জানতে পেরেছিলেন। *নেদিষ্ঠম্* মানে খুব কাছে যাওয়া, নিকটতম ও খুব প্রিয় ভাবে।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোহতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।।৪/৩।।

(যেহেতু ইন্দ্র সম্মুখস্থ ব্রহ্মকে নিকটতম রূপে স্পর্শ করেছিলেন এবং যেহেতু তিনি সবার আগে এনাকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন, সেইহেতু তিনি অন্য দেবগণ অপেক্ষ উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন।)

এই তিনজন দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র আরও শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলেন, কারণ তিনি সবার আগে জেনেছিলেন ইনিই ব্রহ্ম। আসলে ইন্দ্র যেতেই সেই যক্ষ তাঁর সাথে কোন কথা না বলেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, তাতে ইন্দ্রের আরও কৌতুহল বেড়ে গিয়েছিল। আর দ্বিতীয় কথা হল, অগ্নি ও বায়ুর মত তিনি ওখান থেকে সরে আসেননি তার কারণ তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল। সেইজন্য এই তিন দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ। আমাদের প্রচলিত ধারণা আর সাধারণ কাহিনীতেও বলা হয় যে দেবতারা মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদের মধ্যে কিছু দেবতা আছেন যাঁরা অন্য দেবতাদের থেকে একটু এগিয়ে, আর ইন্দ্র হলেন সব দেবতাদের রাজা। লোকেদের এই ধারণাকে আধার করে এই একটা কাহিনীর মাধ্যমে একটা ভাব ছেড়ে দিলেন। এবার একটা একটা করে কারণ দেখাচ্ছেন যার জন্য ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ হলেন। ইন্দ্র সরে আসেননি, শ্রদ্ধা ছিল আর তাঁকেই প্রথম ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী উমা বললেন তোমরা যাঁকে দেখেছিলে ইনিই ব্রহ্ম। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠে আসার পর দেবতারা সেই অমৃত নিয়ে নিলেন, ওই অমৃত থেকেই দেবতারা অমর হয়ে গেলেন। সমুদ্র মন্থনের এই কাহিনীও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, অমরত্ব হওয়ার এই কাহিনীর সাথে যোগ আছে। আর এই ব্রহ্মবিদ্যাকে তাঁরা খুব যত্ন সহকারে রক্ষা করতেন যাতে সত্ত্বগুণ সম্পন্নরাই এই ব্রহ্মজ্ঞান পায়। একটা ঘটনা পেয়ে গেলে সেটাকে নিয়ে কাহিনী তৈরী করা সহজ হয়ে যায়।

পরের দুটি মন্ত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেনোপষিদ খুব মন দিয়ে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে কেনোপনিষদ মূলতঃ আলোচনা করছে চেতনকে নিয়ে। চৈতন্য কি? দ্বিতীয় আলোচনা করছেন যিনি চৈতন্য তিনিই আত্মা, যিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম। এখন শুদ্ধ চৈতন্য, যেখানে কোন কিছু আবরণ, উপাধি নেই এটাকে বলছেন নিরুপাধিক ব্রহ্ম। কিন্তু সমস্যা হল নিরুপাধিক ব্রহ্মের ধারণা করা যায় না। যাঁকে নির্দেশই করা যায় না, আমরা কি করে জানব যে এটাই ব্রহ্ম। দ্বাদশ অধ্যায়ে গীতায় ভগবান বলছেন, দেহবানদের পক্ষে অদ্বৈত ভাব ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। দেহবানরা অদ্বৈত ভাব নিতে পারে না। সেইজন্য তাদের উপাধি লাগাতে হয়। একটা কাঁচের জারে একেবারে ভর্তি করে পরিশুদ্ধ জল রাখা আছে। ডিস্টিল্ড ওয়াটার এত শুদ্ধ জল যে আমাদের জানার উপায় নেই যে জারে জল আছে কি নেই। জারে জল না থাকলেও যেমন দেখাবে, পরিশুদ্ধ জল থাকলেও তেমন দেখাবে। কি করে জানব জল আছে কি নেই? একটা নীল রঙের বড়ি দিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে নীল রঙের খেলা শুরু হয়ে যাবে। পরিশুদ্ধ জলে একটা উপাধি দিয়ে দেওয়া হল। একটা স্ফটিক আছে, ওখানে কিছু আছে কে নেই কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কি করে বোঝা যাবে? ওর পাশে একটা লাল জবা রেখে দিলে স্ফটিকটা লাল রঙের হয়ে যাবে। যে জিনিসটা এমনিতে বোঝা যায় না, তার উপর একটা উপাধি লাগিয়ে দিলে জিনিসটাকে বোঝা যাবে। শুদ্ধ চৈতন্য যিনি, তাঁকেও জানার কোন পথ নেই, একটা উপাধি লাগিয়ে দিতে হবে। উপাধি লাগিয়ে দিলে, আমাদের মত সাধারণ লোক ধারণা করতে পারবে। তারপর সাধনা করে করে সেটাকে জানতে পারল।

উপাধি দুই ভাবে লাগানো হয়। প্রথমটা হল macro, macro মানে বড়। সমস্ত কিছুর সমষ্টিকে নিয়ে একটা উপাধি দিয়ে দেওয়া হয়, যেটাকে আমরা সগুণ সাকার ঈশ্বর বলছি। সমষ্টি মানে, যা কিছু আছে সব কিছুকে এক সঙ্গে করে দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় উপাধি লাগানো হয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যিনি অন্তর্যামী বা অন্তরাত্মা, তাঁকে ধরা হয়। দুভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, একটা হল micro, যেটা আমাদের ভেতরে আর macro, যেটা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছে। আত্মা বা চৈতন্যের দিক থেকে macro আর microর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু যাঁরা ধ্যান করেন তাঁদের জন্য তফাৎ আছে। সাধারণ সাধকের ধারণা ঈশ্বর উপরে স্বর্গে আছেন, তিনি বিরাট, সব কিছুতে ব্যপ্ত আছেন, তাঁর সাধনা করা হয়। যাঁরা ঠাকুরের ধ্যান করেন তাঁরাও সেভাবেই ধ্যান করেন, ঠাকুর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছেন। দ্বিতীয় অন্তর্যামী রূপে, যাঁরা গভীর ধ্যানে যান তাঁরা নিজের ভেতরে তাঁর ইষ্ট বা ঈশ্বরের ধ্যান করেন। ইষ্টকে ধ্যান করা সহজ, সেই ইষ্টই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। তবে গুরু যেমন ভাবে সাধনা করেছেন, যে ভাব শিষ্যকে ধরিয়ে দিয়েছেন, সেই ভাবেই শিষ্যের সাধনা হবে। পরের দুটি মন্ত্রে সমষ্টি আর ব্যষ্টি এই দুটো ভাবকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন, এবার তাই নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করা যাবে। যাতে আমরা ধারণা করতে পারি সেইজন্য এই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। যে কাহিনী বলা হল সেই কাহিনী থেকে সরে এসে এবার আমরা যাতে ধ্যান করতে পারি তারই সুব্যবস্থা করার জন্য বলছেন –

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতম্।।৪/৪।।

(সেই ব্রহ্ম বিষয়ে এই উপদেশ – এই যে বিদ্যুৎপ্রভা চমকিত হল, এরই সদৃশ; আর এই যে চক্ষুর নিমেষ হল, এরই সদৃশ – এই রূপে ব্রহ্মের অধিদৈবত উপদেশ কথিত হল।)

তিনি বিদ্যুতের মত চমকালেন আর নিমেষের মধ্যে সামনে এসে গেলেন বা সামনে থেকে চলে গেলেন। এই যে বিদ্যুতের মত সামনে চলে আসা আর চলে যাওয়া এটাই তাঁর অধিদৈবত রূপ। দুটো শব্দ, অধিদৈবত আর অধ্যাত্ম। অধিদৈবত হল সমষ্টি, বাইরের যে রূপ আর অধ্যাত্ম ভেতরের অন্তর্যামীর রূপ। এখানে বাইরে যে রূপ দেখা যাচ্ছে সেই অধিদৈবতের ব্যাখ্যা করছেন। এই বিদ্যুতের চমকানোর মত যক্ষ সামনে এসে গেলেন আর বিদ্যুতের মত নিমেষে চলে গেলেন, বিনা কোন আভাসে হঠাৎ করে আলো হয়ে গেল, সব সংশয় দূর হয়ে সবটাই পরিষ্কার হয়ে গেল বা চোখের নিমেষে পুরো জিনিসটা হয়ে গেল, এটাই ব্রহ্মের অধিদৈবতম্ রূপ। দৈব শব্দ দেবতা থেকে এসেছে। আমরা মনে করি দেবতারা

স্বর্গে আধিপত্য করেন, ঠিক তেমনি ব্রহ্মকে যখন দেবতা রূপে দেখা হয়, তার মানে বৃহৎ রূপ বা ঈশ্বরীয় রূপে দেখা হয়, সেটাই ব্রহ্মের অধিদৈবত রূপ। সমস্ত কিছুকে জয় করে একজন দেবতা রূপে যেন তাঁকে দেখাচ্ছে। আমরা যখন বলছি ভগবান বিষ্ণু, শ্রীরাম, মা কালী তখন এনাদের দর্শনটাও বিদ্যুৎ চমকানোর মত হয়। আমরা যেসব বর্ণনা পাই সেখানেও বলা হয় যে, ঈশ্বরের দর্শন বিরাট আলো রূপে হয়। ঠাকুরেরও যখন মা কালীর দর্শন হচ্ছে তখনও বিরাট আলোর ঢেউ রূপে।

এখানে বিদ্যুৎ চমকানো বলার অর্থ দুম্ করে হয়ে যাওয়া আর জ্ঞানও দুম্ করে হয়। ঠাকুর বলছেন অন্ধকার ঘরে একটা দেশলাই জ্বাললে দপ্ করে আলো হয়ে সব পরিষ্কার দেখা যায়, একটু একটু করে অন্ধকার যায় না। অন্যান্য জ্ঞান দপ্ করে এভাবে হয় না। যেমন স্টেশনে ট্রেন আসার অপেক্ষা করছি, আসার আগে ট্রেনের হেডলাইটের আলো দেখা যায়, তারপর তার হর্ণ, যত কাছে আসে তার আওয়াজ, কাছে এলে চাকার আওয়াজ, এইভাবে ধীরে ধীরে ট্রেনের সব কিছু পরিষ্কার হয়। ঈশ্বর জ্ঞান ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয় না। ঈশ্বর জ্ঞান দপ্ করে হয় আর পুরোটা একসাথে হয়। আর ঈশ্বরের যে সৃষ্টি এটাও দপ্ করে হয়। এই completnessটা, পুরো জিনিসটা এক সঙ্গে হওয়া, এটাকেই বলছেন *বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা*। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান এক সঙ্গে হয়ে যাবে। কিন্তু জাগতিক জ্ঞান এক সঙ্গে হবে না, সাহিত্য আমাকে একটু একটু করে পড়তে হবে, একটু শিখলাম, সেখান থেকে ধীরে ধীরে একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়তে শুরু করলাম, কিছু দিন পর যেটুকু জ্ঞান হয়েছিল ভুলে যেতে পারি। ঈশ্বর জ্ঞান এভাবে হয় না। ঈশ্বর জ্ঞান হওয়ার পর কোন যে সংশয় থাকবে, সন্দেহ থাকবে, কখনই তা হবে না। ঈশ্বর জ্ঞান একসাথে, পুরোটা, আর চিরস্থায়ী রূপে হয়ে যাবে। এটাকেই এখানে বলছেন অধিদৈবত রূপ। অধিদৈবত রূপকে ব্যাখ্যা করার জন্য যক্ষের উপাখ্যান নিয়েছেন।

এবার আচার্য এর ব্যাখ্যা করছেন। *তস্যৈষ আদেশো*, উপনিষদ আদেশ করে। আদেশ করা মানে উপদেশ দেওয়া। পরমাত্মা সম্বন্ধী আদেশ বা উপদেশ কি? *বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা*, বিদ্যুতের আলোর মত সব কিছুকে প্রকাশিত করে দেয়। ব্রহ্মের একটা বিচিত্র রূপে সামনে আসা, তার মানেই তিনি নিজেকে একবার প্রকাশিত করে দিলেন, তারপর তিনি চলেও গেলেন। ধ্রুবোপখ্যান ও নারদের কাহিনীতেও এই ধরণের বর্ণনা আছে, সেখানেও একবার প্রকাশিত করে চলে গেলেন। ভক্তরা বলেন, তিনি নিজের প্রতি টান বাড়াবার জন্য ভক্তকে একটা ঝাঁকি দর্শন দিয়ে দেন। যেমনি এসে গেলেন আবার তেমনি চলেও গেলেন। তার মানে ঈশ্বর যে সব সময় চোখের সামনে থাকবেন তা না, তিনি নিমেষের মধ্যে এলেন, নিমেষের মধ্যে চলে গেলেন। এই কাহিনী দিয়ে বোঝান হল, ঈশ্বরের যে রূপ তা যখন সামনে আসে তখন দুম্ করে আসে, এসে আবার দুম্ করে চলে যায়। চলে যাওয়া আমরা যেভাবে বলছি, জ্ঞান কিন্তু সেভাবে কখনই চলে যায় না, ঠাকুরের জীবন দেখলে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু তাঁর যে ভাব আদি হয়, সেখানেও হঠাৎ দেখতে পেলেন। এটাই অধিদৈবত রূপ, ঈশ্বরকে যখন দেবতা রূপে কল্পনা করা হবে তখন এভাবেই কল্পনা হবে। তাহলে কি ভগবান ইন্দ্রাদি দেবতাদের মত? তা কি করে হবে, কারণ তার বর্ণনা আগে হয়ে গেছে। জগতে যা কিছু হয় সব তাঁর শক্তিতে হয়, ইন্দ্রাদি দেবতাদের ক্ষমতায় হয় না। আর মানুষ থেকে শুরু করে যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই তাঁর নিমিত্তমাত্র। কিন্তু তাঁর দর্শনটা দপ্ করে হয়। আর ওভাবেই যে থেকে যাবে, যেমন গাছ থেকে মাটিতে একটা ফল পড়লে ওখানে থেকেই যাবে, তা হবে না, দুম্ করেই আবার চলে যাবে।

আমাদের একটা সাধারণ ধারণা যে উপরে ভগবান আছেন, সেখান থেকে তিনি আমাদের দেখছেন। মনে করছি, এটুকু জেনে নিলে সব হয়ে যাবে, এর বেশি জানার আমার দরকার নেই। এই ভাবটা যখন এসে যায় তখন সত্যিই মনে হয় যে, আর আমার জানার আছেটা কি। একজন মহারাজ নতুন এক ব্রহ্মচারীকে বলছেন, অল্প বয়স থেকেই ঠাকুরকে ভগবান রূপে জেনেছি, মেনেছি, তাই ঘর ছেড়ে তাঁর নামে বেরিয়ে এসে এত দূর আসতে পেরেছি। নতুনদের কাছে এই ধরণের কথা উৎসাহব্যঞ্জক মনে হবে। আমাদের গ্রাম্য ধারণা বিষ্ণু হলেন ভগবান, সেখানে বিষ্ণুর জায়গায় তাঁর কাছে

ঠাকুর ভগবান, হয়ত তিনি সৌভাগ্যবান। কিছু দিন বাদে নতুন ব্রহ্মচারী আরেকজন বরিষ্ঠ মহারাজকে ওই মহারাজের কথা বললেন, সেদিন তিনি কি সুন্দর কথা বললেন। উনি শুনে বললেন, যদি কেউ জেনে থাকে ঠাকুর ভগবান তাঁর তো সব হয়েই গেল, তাঁর আর কিছু করার লাগবে না। নতুন ব্রহ্মচারী ভাবলেন, এক অপরকে হয়ত পছন্দ করেন না, তাই এই রকম কথা বললেন। কিন্তু দুজনের কথাই তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। অনেক বছর পর ওই ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হলেন, তারপর অনেক ধ্যান ধারণা করার পর তাঁর উপলব্ধি হল যে, সেদিন দ্বিতীয় মহারাজ ঠিকই বলেছিলেন। তাঁর কারণ, যদি কেউ বলে ছোটবেলা থেকেই আমি ঠাকুরকে ভগবান বলে মানি, এটা সেই রকমই হবে যেমন গ্রামে একটা শিবের মন্দির আছে, সেই গ্রামের বাচ্চা যখন বলে আমি ছোটবেলা থেকেই শিবকে মানি। গ্রামের বাচ্চা ছোটবেলা থেকে শিবকে মানলে যেমন কিছু হয় না, ঠিক সেই রকম আমি বাচ্চা বয়স থেকে ঠাকুরকে ভগবান মানলে কিছু হবে না। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল, সচরাচর যে হিন্দু সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এই জিনিসগুলোকে মেনে মেনে তার এমন হয়ে গেছে যে, ঠাকুরকে মেনেছে বলে মনে করে তার উন্নতি হয়ে গেছে। কিন্তু দুটো মানার মধ্যে মূলতঃ কোন তফাৎ নেই। একজন অবোধ মানুষ, যার কোন আধ্যাত্মিক উত্থান হয়নি, সে শিবকে ভগবান মানে, তাতে তার হলটা কি! বাড়িতে ঠাকুর পূজা হত, বাড়ির সবাই ঠাকুরের ভক্ত, সেখান থেকে তিনি ঠাকুরকে মানেন, জানেন। কিন্তু তাতে হলটা কি! ধর্মের দিক থেকে দেখলে সারা বিশ্বে এই একই সমস্যা।

ঠাকুর বলছেন, খুড়ি পিসির কোঁদল শুনে বাচ্চারাও বলে 'তোর ঈশ্বরের দিব্যি'। ঠাকুর এই উপমা দিয়ে বলতে চাইছেন, এগুলোর কোন দাম নেই। বাইবেল পড়ছে, কোরান পড়ছে, এগুলোকে বলে religious faith, পরে faithfull শব্দটা নিয়ে আসে। Faithfull মানে যীশু যে কথা বলেছেন, মহম্মদ যা বলেছেন, সেটাকে বিশ্বাস করে নেওয়া। আগেকার দিনে খ্রীশ্চান আর খ্রীশ্চান বিরোধীর মধ্যে তফাৎ করা হত faithfull আর faithless দিয়ে। আমাদের এখানেও আস্তিক নাস্তিক এইভাবে তফাৎ করা হয়, তুমি মানো, তুমি মানো না। উপনিষদে এনারাও সেই আদেশই করেন। আদেশ দুই ভাবে করেন। একটা হয়, যে কোন ধর্মের যিনি মহাপুরুষ তিনি সেই ধর্মগ্রন্থে যেমনটি বলে দিয়েছেন, ঈশ্বরীয় ব্যাপারে এটাই সত্য। এখানে এটাকেই আদেশ রূপে বলছেন, *তস্যৈষ আদেশঃ*, আমরা গুরু পরম্পরাতে এটাই শুনে এসেছি, এটাই আদেশ।

কিন্তু তার সাথে যেটা নিয়ে আসেন, সেটা শুধু বর্ণনা নয়, ওর মধ্যে একটা প্রচণ্ড যুক্তি চলবে। বাইবেল বা কোরাণে যেখানে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করা হচ্ছে সেখানে বোঝা যায় ঈশ্বরের মহিমা কি রকম। উপনিষদে ঈশ্বরের মহিমা ওই অর্থে আনবেন না। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, ঈশ্বরকে একমাত্র সমাধি অবস্থাতেই জানা যায়। সমাধিতে মন ঈশ্বরীয় ভাবে এমন ভাবে লয় হয়ে যায়, মন বলতে সঙ্কল্প বিকল্প যে জিনিসটা করে, সেটাকে ভেঙে দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গে মিলে যায়। যখন মিলে যায় তখন আর তাকে মন বলা যায় না। কিন্তু আমরা এটা বুঝব কি করে? এই যে বলা হয় সাধনা করে মন যখন সমাধিতে গিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যে লয় হয়ে যায় তখন মন আর মন থাকে না, তখন নির্গুণ নিরাকারকে দেখতে পারেন, খুবই ভালো। কিন্তু আমরা বুঝব কি করে? এটা তো কথার কথা হয়ে গেল, যে ঈশ্বরকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না, সেই ঈশ্বরকে জেনে আমার কি লাভ হবে! এই সমস্যা থেকে যায়।

সেইজন্য এনারা উপাধির ধারণা নিয়ে এসেছেন। উপাধি মানে একটা যেন মুখোশ লাগিয়ে দেওয়া। মুখোশটা যত ভালো হবে সেই নির্গুণ নিরাকারের অভিব্যক্তি, আমার সামনে যিনি আবির্ভূত হবেন, সেটা তত শ্রেষ্ঠ হবে। ঠাকুর এক বিধবা মহিলা ভক্তকে বলছেন, তোমার ভাইপোর মধ্যেই নারায়ণকে দেখ, এটাও একটা উপাধি, যদিও নিকৃষ্ট উপাধি। কিন্তু এর বেশি সেই বিধবা মহিলা নিতে পারবে না। ঠিক তেমনি যখন বলছেন, জীব, জগৎ, ঈশ্বর সব মিলিয়ে যাঁকে বলছেন তখন এটা অনেকটা উৎকৃষ্ট উপাধি হয়ে গেল। উপনিষদ এই ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ, আর যদি রূপ নিয়ে আসা হয় তাহলে

বেদ হল শ্রেষ্ঠ। বেদ যে কোন মুখোশ বা উপাধিকে এনে অনন্তের উপর চাপিয়ে দেয়, চাপিয়ে দেওয়ার পর সেই অনন্তকে ঈশ্বর রূপে সামনে উপস্থাপন করে দেয়। উপনিষদ এখানে দুটো বিশেষ রূপকে নিয়ে আসছেন – অধিদৈবত আর অধ্যাত্ম।

অধিদৈবত এর আগে আমরা আলোচনা করলাম, যেখানে সেই যে সচ্চিদানন্দ, তাঁর যেন একটা আকার দেখা গেছে। সেই আকারে কি আছে? সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ক্ষমতা। এমন ক্ষমতা যে, অন্যান্য দেবতারা যে ক্ষমতা দিয়ে তাঁদের নিজ নিজ কাজগুলো করেন, তিনি তাঁদের সমস্ত ক্ষমতাটাই কেড়ে নিচ্ছেন। আর তাই না, তাঁর যে আবির্ভাব সেটাও চোখের পাতা ফেলতে যতক্ষণ তার মধ্যেই তিনি আসছেন আবার চলে যাচ্ছেন। বিদ্যুৎ চমকালে যেমন সব কিছু প্রকাশিত হয়ে যায়, তাঁর আবির্ভাবটাও ঠিক তেমনি। এটা হল তাঁর অধিদৈবত, যেন কোন একটা সাকার রূপে সামনে আসছেন। সাকার রূপে এলেও তাঁর যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ক্ষমতা, এর পুরোটাই তাঁর সাথে থাকে। আর এটা যে ধীরে ধীরে হবে তা না, দেশলাই কাঠির মত দপ্ করে জ্বলে ওঠেন। স্কুল কলেজে বিদ্যার্জন করার সময় আমাদের একটু একটু করে জ্ঞান হয়, ঈশ্বরের জ্ঞান একটু একটু করে হয় না, দপ্ করে হয়।

আমরা খুব আবেগ ও ভক্তি নিয়ে বলি ঈশ্বর আমার আপনার সবার ভেতরে আছেন। অন্যরা এতটা না বললেও, তারা বলে যে ঈশ্বর সব দেখছেন। হিন্দু ধর্মের যত শাস্ত্র আছে, সব শাস্ত্রের কাছে তিনি ভেতরে আছেন, এই কথার সাংঘাতিক একটা গুরুত্ব আছে। আরেকটা দিকে তিনি আছেন, এরও একটা গুরুত্ব আছে। তিনি বাইরে অধিদৈবত রূপে, সাকার রূপে আছেন। আর তাই না, যদি সব কিছু মিলিয়ে দেওয়া যায় সেই শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি নিজেই শুদ্ধ চৈতন্য অন্তর্যামী রূপে ভেতরে আছেন, তিনিই আবার বিশ্বরূপ হয়ে আছেন অর্থাৎ অধিদৈবত রূপে তিনি আছেন। অধিদৈবত মানে, সচ্চিদানন্দ যখন একটা রূপ ধারণ করে সামনে চলে আসেন। বিশ্বরূপ দর্শনে পরিষ্কার বোঝাই যায়, মানুষ যখন সব কিছুকে দেখেন এটা তিনিই, সমষ্টি রূপে তিনিই আছেন, তখন একটা। কিন্তু অধিদৈবতে তিনি সামনে এসে যাচ্ছেন। পরের মন্ত্রে অধ্যাত্মম্ বলছেন –

অথাধ্যাত্মং। যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোহনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ।।৪/৫।।

(অতঃপর ব্রহ্মের অধ্যাত্ম বিষয়ক উপদেশ দেওয়া হচ্ছে – এই যে বোধ হয় যে, মন যেন ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়, (অর্থাৎ সাধক যেন) মনের দ্বারা এনাকে বারংবার ঘনিষ্ঠ রূপে স্মরণ করেন, এবং মনের যে ব্রহ্ম বিষয়ক সঙ্কল্প, এটাই ব্রহ্ম বিষয়ে অধ্যাত্ম উপদেশ।)

এর আগে আলোচনা করা হয়েছিল, হিন্দুরা ঈশ্বরকে দুটি রূপে দেখেন, macro আর micro। একটা বৃহৎ রূপ, আরেকটা তাঁর সূক্ষ্ম রূপ। তিনি যেমন এই জগতের সব কিছুর কর্তা, তিনি সব থেকে ক্ষমতাবান, তিনি সমস্ত জ্ঞানের আকর। সবার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে আছেন তাঁর সাথে সমষ্টি ঈশ্বরের কোন তফাৎ নেই, দুটো সম্পূর্ণ এক। অন্তর্যামী রূপে যিনি সবার ভেতরে আছেন তিনিও সমস্ত ক্ষমতাবান, তিনি সমস্ত জ্ঞানের খনি। স্বামীজী যে বলছেন, সমস্ত জ্ঞান তোমার ভেতরেই আছে, সব শক্তি, সব ক্ষমতা তোমার মধ্যেই আছে, এগুলো কোন উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য নয়, কাউকে উৎসাহিত করার জন্যও বলছেন না। এগুলোই ধ্রুব সত্য। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তাঁরই সমস্ত জ্ঞান আছে, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তাঁরই সমস্ত ক্ষমতা আছে, তিনিই তোমার আমার সবার ভেতরে আছেন। তিনি যখন অধিদৈবতম্ রূপে বাইরে এসেছেন, সেটাকে বোঝানর জন্য দেখাচ্ছেন কিভাবে অগ্নিরও কোন ক্ষমতা নেই, বায়ুরও কোন ক্ষমতা নেই, ইন্দ্রেরও কোন ক্ষমতা নেই। ওই যে বৃহৎ রূপ ছিল এবার সেটারই সূক্ষ্ম রূপ দেখাচ্ছেন, তাই বলছেন, *অথ অধ্যাত্মম্*, এবার ব্রহ্মের অধ্যাত্মের কথা বলা হবে।

ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে আছেন তাঁর অভিব্যক্তি কি রকম? অধিদৈবতমে তিনি বাইরে আছেন, তাঁর ক্ষমতাতে ক্ষমতাবান হয়ে অগ্নি দহন ক্রিয়া করেন, বায়ু চলন ক্রিয়া করে আর ইন্দ্র সেই দেবতাদের রাজা। তাহলে ভেতরে যিনি আছেন তিনি কিভাবে কাজ করছেন? মনের যত রকম ক্রিয়া

হচ্ছে মন যা কিছু করছে, এটাই অন্তর্যামীর সাক্ষাৎ ক্রিয়া রূপ। আমরা কি করে বুঝব আমার ভেতরে অন্তর্যামী আছেন? অন্তর্যামী কি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন? সাংখ্যের পুরুষ যেমন চুপচাপ বসে আছেন, তাঁর উপস্থিতিতেই প্রকৃতি সব কাজ করছে, অন্তর্যামী কি সেই রকম? বলছেন, না।

মনে হতে পারে এখানে গীতার কিছু কিছু শ্লোক যেন এর সাথে মিলছে না, যেমন অনেক জায়গায় ভগবান বলছেন, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করে, আমি কিছুই করি না। কিন্তু তা না, সবটাই মেলে। তার মানে, যেখানেই যে কোন ইন্দ্রিয়ের যে কাজ হচ্ছে আত্মা সেখানে নির্লিপ্ত। কিন্তু এখানে তা বলছেন না, বলছেন ব্রহ্মের যে সূক্ষ্ম রূপ, অন্তর্যামী রূপের প্রকাশ হয় মনের কার্য দিয়ে। মন যে নানা রকম চিন্তন মনন করছে, নানা রকম সঙ্কল্প বিকল্প করছে, এতেই বোঝা যায় যে অন্তর্যামীর মাধ্যমে মন কাজ করছে। যদি কেউ বুঝতে চায় আমার ভেতরে অন্তর্যামী আছেন কিনা, তখন কি করে বুঝবে? তোমার মনের ক্রিয়া দিয়ে বুঝতে পারবে। কি করে বুঝতে পারব? এবার তুমি কেনোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে চলে যাও, যেখানে শিষ্য প্রশ্ন করছেন, *ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ*। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গুরু বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়ে দিচ্ছেন, মন যখন চলে সেখানে আত্মা আছেন বলেই মন চলে। এখানে এসে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন আর একই কথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন, কিন্তু এবার আরও জোরের সাথে, গভীর ভাবে বলছেন। বলছেন, আত্মা নিজে কোন কাজ করেন না, তিনি নির্বিকার, কিন্তু আত্মা যখন মন দিয়ে কাজ করেন, এটাই চিন্তন মনন। চিন্তন মনন যেটা হয় এটাই আত্মার কার্যকরী কাজ, যেটা সরাসরি বোঝা যায়। আমরা যখন কোন চিন্তা ভাবনা করছি, যখন কথা বলছি, আসলে আত্মাই করছেন।

অধ্যাত্ম মানে প্রত্যগাত্মন্, ভেতরে আত্মা রূপে যিনি অবস্থিত। আমরা মনে করছি মন যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, সেখানে যাচ্ছে, মন এটা করছে, সেটা করছে, আসলে সব ক্ষেত্রে মন ব্রহ্মকেই বিষয় করে। মন যা কিছু করে আসলে সে ব্রহ্মকেই ধারণা করার চেষ্টা করছে। যেমন এই পেন দেখছি, এই পেন ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। মন যখন এই পেনকে নিয়ে ভাবছে, তখন মন সেই ব্রহ্ম যিনি পেন রূপে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ধরার চেষ্টা করছে। এটাই প্রত্যগাত্মার স্বরূপ। সাধারণ লোকের জন্য বলছেন না, যিনি সাধনা করছেন তাঁরা এভাবে জানবেন। জগতে জাগতিক যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে যদি জানার চেষ্টা বেশি করা হয়, সেখানে আমরা জানি যে এটা আমার পছন্দের, এটা পছন্দের নয়, এটা ভালো লাগে ওটা ভালো লাগে না, এগুলোর মধ্যে কোথাও আমরা হারিয়ে যাতে না যাই, তাই গুরু বলে দিয়েছেন তোমার এই ইষ্ট, ইষ্টের ধ্যান কর, ইষ্টেই সব কিছু তোমার হবে ইত্যাদি। কিন্তু উপনিষদের দিক থেকে যখন দেখা হয় অর্থাৎ অধিদৈবত, অধ্যাত্ম এই রূপে যখন দেখা হয়, তখন এর অর্থ হবে – মনের যে কোন কাজ, মন যে কোন ক্রিয়া যে করছে তখন মন তাঁকেই অভিব্যক্ত করে, তাঁরই চিন্তন করে। আর বলছেন *যচ্চ অনেন মনসা এতদ্ ব্রহ্ম উপস্মরতি সমীপতঃ স্মরতি সাধকঃ,* সাধকগণ, যাঁরা সাধনা করছেন তাঁরা এই যে ব্রহ্মকে বারবার উপস্মরণ করেন, যেমন জপ করছেন যদিও এখানে জপের কথা বলছেন না, কিন্তু ব্রহ্ম চিন্তন করছেন, এই যে বারবার ব্রহ্ম চিন্তন করছেন, এটাই তাঁর অধ্যাত্ম রূপ, এটাই অধ্যাত্মরূপী উপদেশ।

এবার খুব সহজ ভাবে অধিদৈবতম্ এবং অধ্যাত্মকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ঈশ্বর পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে আছেন, তিনি এর বাইরেও আছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ হয়ে আছেন কিন্তু এর মধ্যেও বিদ্যুৎ সম যে কোন লোকের সম্মুখে যেখানে খুশী তিনি প্রকাশিত হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু দেখা যায় যাঁদের মন শুদ্ধ আর যিনি সিদ্ধ, তাঁদের সামনেই তিনি প্রকাশিত হন। এটা তাঁর বাহ্য রূপ, তাঁর বৃহৎ রূপ। তাঁর সূক্ষ্ম রূপ ধরা যায় না। সূক্ষ্ম রূপ কোনটা? সূক্ষ্ম রূপকে এভাবে বোঝা যাবে, সাধারণ লোকেরা যত রকম বিষয় চিন্তন করে, সেটাও কিন্তু ব্রহ্মেরই কাজ আর ব্রহ্মকেই ধরার চেষ্টা করছে। আর সাধকরা যখন সাধনা করেন, ব্রহ্ম যে রূপে আছেন, আত্মা যে রূপে আছেন, সেই রূপের যে সাধনা করে, সেই রূপকে যখন ধরার চেষ্টা করে, এটাই প্রত্যগাত্মনের রূপ, এটাই প্রত্যগাত্মন্, এটাই অধ্যাত্ম।

অধ্যাত্ম মানে হয় প্রত্যগাত্মন্, এখানে আধ্যাত্মিক বলতে অধ্যাত্ম না। গীতাতেও এই প্রশ্ন আসে অধ্যাত্ম কি। অধ্যাত্মের ব্যাপারে উপদেশ কি? এই যে মন বারবার ঈশ্বরকে চিন্তন করার চেষ্টা করছে, ব্রহ্মের চিন্তন করার চেষ্টা করছে, এটাই অধ্যাত্ম বিষয়, এটাই আদেশ অর্থাৎ উপদেশ।

তার মানে যখনই আমরা কোন চিন্তন করছি এই চিন্তন আত্মার জন্যই করতে পারছি। তাতেই বোঝা যায় আত্মা আছেন। কারণ আত্মা যদি না থাকতেন, তাহলে মন কোন কিছুর চিন্তন করতে পারত না। এখানে কিন্তু সাধারণ যে ধারণা নিয়ে মানুষ চলে সেই ধারণাকে নিয়ে চলছেন না, এখানে গভীর স্তরে আলোচনা চলছে। বিরাট রূপ খুব সহজে দেখিয়ে দিলেন, কিন্তু বিরাট রূপ দেখিয়ে দিলেও মন স্থূল অবস্থাতেই থেকে যায়। মনকে এখানে আরও সূক্ষ্ম করছেন। কিভাবে সূক্ষ্মের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন? মন যে চিন্তা ভাবনা করছে, মন যে বারবার ঈশ্বর চিন্তন করে, মনের যে বৃত্তিগুলো ব্রহ্মকে বারবার উপস্মরণ করে, এটাই প্রত্যগাত্মন্, এটাই অধ্যাত্ম। মনের যে সঙ্কল্প বিকল্প গুলো হয় সেখানেও সে ব্রহ্মকে বিষয় করছে। যে ভাবছে আমাকে কিছু টাকা আয় করতে হবে, সেও কিন্তু তখন ব্রহ্মকেই বিষয় করছে। টাকাও ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়, তবে তার এমন কিছু কিছু consequences আছে যার ফলে একটা সময় ব্রহ্ম উড়ে গিয়ে শুধু টাকাটাই থেকে যাবে। স্বামী গম্ভীরানন্দ এক জায়গায় লিখছেন, ঠাকুর টাকা মাটি মাটি টাকা বলে টাকাকে ত্যাগ করলেন। আর শ্রীমার কাছে যখন মনিঅর্ডার আসত তিনি টাকা গুণে গুণে সামলে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে তুলে রাখতেন। মা টাকাকে ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করছেন। সেই টাকাকেই ঠাকুর বস্তু রূপে ত্যাগ করছেন।

এই যে এখানে বলছেন, মানুষ যখন যে কোন বিষয়ের চিন্তন করে তখন সে ব্রহ্মকেই বিষয় করে, এই জিনিসটা এত কঠিন একটা বিষয় যে এই ধারণাটাই হয় না। ঠাকুর যখন টাকাকে গঙ্গায় ফেলছেন আর মা যখন ব্রহ্ম রূপে টাকাকে গ্রহণ করছেন, দুজনের মধ্যে কেউ একজন ভুল। না, কেউই ভুল নয়। ঠাকুর সাধনার জন্য একটা জিনিস করছেন, লোকেদের জন্য একটা শিক্ষাও দিয়ে দিচ্ছেন। এই যে মন্ত্র, খুব উচ্চমানের গুরু একজন অত্যন্ত উচ্চমানের জিজ্ঞাসু শিষ্য, যার সাধনা আছে, যার একটা প্রস্তুতি আছে, সেই রকম একজন শিষ্যকে এই উপদেশ দিচ্ছেন। কথামৃতে অনেক জায়গায় দেখা যায় ঠাকুর কিছু বলার আগে বলছেন, এখানে কোন বাইরের লোক নেই তো, বলার পর কিছু কিছু কথা বলছেন। মাস্টারমশায় সেগুলো আবার লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। ধর্ম যখন খুব উচ্চস্তরে চলে তখন ভালো মন্দের বিভেদ মিটে যায়, পাপ-পূণ্যের ভেদ মিটে যায়। ওই উপদেশ যদি সাধারণ লোক কেউ নিয়ে নেয় তাহলে প্রস্তুতি না থাকার জন্য সে গোলমাল করে বসবে। কারণ ওনারা যে জিনিসটাকে ব্রহ্ম রূপে নিচ্ছেন এরা মুখে যাই বলুক না কেন সেটাকে বস্তু রূপে নেবে। কথামৃতেই আছে, একজন খুব পাপকর্ম করছে অন্য দিকে বেদান্তের উপদেশ দিচ্ছে। সে কথা বলাতে সে বলছে, এটাও তো মিথ্যা। গোলমাল করে ফেলছে, কারণ তার অন্তর মন জানে আমি এটা ধাপ্পা মারছি কিন্তু মুখে বলছে এটা বেদান্তের দিক দিয়ে মিথ্যা। বেদান্ত অধ্যয়নে এই সমস্যা হয়, সেইজন্য সাধারণ মানুষকে বেদান্ত পড়তে দেওয়া হয় না। বেদান্তের এসব তত্ত্ব অত্যন্ত উচ্চমানের জিনিস, সাধনা যদি না থাকে, একটা প্রস্তুতি যদি না থাকে সাধারণ লোক গোলমাল করে বসবে। তোমার প্রস্তুতি যদি হয়ে যায় তখন তুমি বলতে পারবে মিথ্যা বলে কিছু নেই, পাপ বলে কিছু নেই, অধর্ম বলে কিছু নেই, জগৎ বলে কিছু নেই, যেটাই তুমি চিন্তা করছ, যে চিন্তন হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম। এখানে গুরু একজন খুব উচ্চমানের সাধককে এই কথাগুলো বলছেন, দেখো বাপু! তুমি তো আত্মার জ্ঞান চাইছ, প্রথম থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আমি আত্মার জ্ঞানের ব্যাপারে বলে এলাম, এবার তাঁর বিভিন্ন যে রূপ সেটাও দেখ আর তার মধ্যে অধ্যাত্মকেও দেখ। আর তুমি মন দিয়ে যে যে কোন চিন্তা ভাবনা করছ সেখানেও কিন্তু ব্রহ্মকেই বিষয় করা হচ্ছে।

এই যে ব্রহ্ম, তাঁর উপর উপাধি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপাধি শব্দের আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। কিন্তু এবার কি উপাধি লাগানো আছে? মন রূপী উপাধি। ঠাকুর বলছেন, তিনি ঈশ্বরলীলা করেন, তিনি দেবলীলা করেন, জগতলীলা করেন, মানবলীলা করেন। লীলা মানেই উপাধি।

এই যে নানা রকমের লীলা করেন এখানে যে অধ্যাত্ম রূপের বর্ণনা করছেন, এবার কিসের লীলা করছেন? এবার আত্মার উপরে কি উপাধি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে? মন, সেই ব্রহ্মের উপর, সেই আত্মার উপরে মন রূপী উপাধি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনের উপাধি যেই লাগিয়ে দেওয়া হল, তখন মনের যাবতীয় সঙ্কল্প বিকল্প, মনের যত রকমের প্রতীতি হচ্ছে, জানবে এতে ব্রহ্মই অভিব্যক্ত হচ্ছেন, এটা ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এর দ্বারা ব্রহ্মকেই জানা যাচ্ছে। ব্রহ্মের উপরে যখন মা কালী উপাধি লাগিয়ে দেওয়া হল, তিনি তখন মা কালী রূপে আসছেন। ঠাকুর তাই এই বলে মা কালীকেই চাইছেন যে, ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। এই যে প্রথম থেকে বলে যাচ্ছেন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে একমাত্র তখনই জানা যাবে যখন মন সমাধিতে লয় হয়ে যাবে। তাহলে মা কালী কোথা থেকে এলেন? যখন একটা উপাধি লাগিয়ে দেওয়া হল তখন ওই উপাধির মাধ্যমে আমরা মন দিয়ে তাঁকে বিষয় করতে পারছি। আমরা যে বিশ্বরূপ দর্শনের কথা বলছি, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যখন নিয়ে আসছি, তখনও সেই একই জিনিস হয়। অন্তর্যামীর ক্ষেত্রে মনকে উপাধি করা হচ্ছে। সেইজন্য মা কালীর যত ক্রিয়াকলাপ যেমন সব ব্রহ্মেরই ক্রিয়াকলাপ, ঠিক তেমনি মনের যে ক্রিয়াকলাপ সেটাও ব্রহ্মেরই ক্রিয়াকলাপ।

এই যে দুটো রূপের কথা বলা হল, অধিদৈবত আর অধ্যাত্ম, প্রথমটা বিদ্যুৎ সম, চোখের পাতা ফেলতে যতটুকু সময় তার মধ্যে তিনি এসে সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁর সমস্ত ক্ষমতা আছে, তাঁর সমস্ত জ্ঞান আছে। এটা হল প্রথম উপদেশ। দ্বিতীয় উপদেশ, মনের যত রকমের প্রতীতি হচ্ছে, মনের যত রকমের সঙ্কল্প বিকল্প হচ্ছে, মনের যত রকম নিশ্চয় হচ্ছে, এগুলো সব সেই ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, এটাই তাঁর অধ্যাত্ম রূপ। এগুলো কেন বলা হয়? আচার্য বলছেন *এবমাদিশ্যমানং হি ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিগম্যং ভবতীতি ব্রহ্মণ আদেশোপদেশঃ*। যাদের বুদ্ধি কম, যাদের মন্দ বুদ্ধি তাদেরকে বোঝানোর জন্য এই দুটি উপদেশ আনা হল, তা নাহলে তারা ব্রহ্ম বা আত্মার ধারণা করতে পারবে না।

এখানে একটা প্রচলিত কাহিনী দিয়ে শুরু করা হল। আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে জানি ভগবান উপরে আছেন, তিনি আমাদের দেখছেন, আমাদের উপর কৃপা করছেন, এগুলো ভগবানের কিছুই না। এখান থেকে এবার যে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করতে চাইছে, সত্যিকারের মন থেকে বলছে আমি ঈশ্বরকে জানতে চাই, তাকে এবার পদে পদে রামপ্রসাদের গান, কমলাকান্তের গান, ঠাকুর যে গানগুলো গাইতেন, এগুলোকে নিয়ে চলতে হবে। এগুলোই একটা একটা করে তাকে মা কালীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তাকে টেনে নিচ্ছে। উপনিষদ ঠিক একই কাজ বিভিন্ন ভাবে করেন। কি রকম বিভিন্ন ভাবে? প্রথমে নির্গুণ নিরাকারের রূপ দেখিয়ে বলছেন, তিনি আছেন বলেই যা কিছু চলছে, সব কাজ হচ্ছে। এইসব বলে বলে এবার একটা কাহিনী নিয়ে এলেন। কাহিনীতে দেখাচ্ছেন সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যখন অধিদৈবত রূপে ভগবান হয়ে সামনে আসেন তখন তিনি সমস্ত ক্ষমতাবান। তাহলে তো ভগবান বাইরের হয়ে গেলেন, কিন্তু শুধু বাইরেই নয় সবার ভেতরেও সেই ভগবান, এটাকেই বলে অধ্যাত্ম রূপ। মন একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেলে তখন সে বুঝতে পারে আত্মার উপর এই মন উপাধি রূপে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। অশুদ্ধি এসে যাওয়া মানে ওটা একটা উপাধি রূপে এসে গেল। কিন্তু উপাধি রূপে এসে গেলে যে তাঁর স্বরূপটাই পাল্টে যাচ্ছে তা না, ওটাই থাকছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা সাধারণ লোকেদের জন্য নয়, এই কথা বাইরে সবাইকে বলা যাবে না। ঠাকুরও সব কথা সবার সামনে বলতেন না।

এতক্ষণ যাবৎ যা বলা হল এটা একটা সত্য। এনারা এখানে কিছু বলছেন না যে জীবনে আমরা কিভাবে এর প্রয়োগ করব। জিমে প্রথম গেলে ট্রেইনার জিজ্ঞেস করবে আপনি কি ধরণের ট্রেনিং চাইছেন। আমি যে ধরণের ট্রেনিং নিতে চাইব সেই অনুসারে ট্রেইনার আমাকে এই এই জিনিসগুলো অনুশীলন করতে বলবে। এখানে আলোচ্য বিষয় তা নয়। এখানে বলছেন, তোমার সত্য এটা আর ঈশ্বরের সত্য এটা, তোমার আর ঈশ্বরের সত্য এই জায়গাতে এসে মিলন হচ্ছে। এরপর তুমি যতটুকু পালন করবে ততটুকুই তোমার লাভ। আমি যদি কখন অসৎ চিন্তা করি তখন মনে মনে ভাবছি, সেই

আত্মাই এই চিন্তা করছেন, এই অসৎ চিন্তা ঠাকুরকেই চিন্তা করছি, ঠাকুরকে দিয়ে ঠাকুরের চিন্তাই করাচ্ছি, কি আশ্চর্য! সেইজন্য অশুভ চিন্তা করতে নেই, কারণ যে কোন চিন্তাই ঈশ্বরীয় চিন্তা। তখন মনটা আস্তে আস্তে নিজে থেকে অসৎ চিন্তা থেকে সরে আসে। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের এমন এক রূপের চিন্তা করছি যে চিন্তা মানুষকে অন্য দিকে নিয়ে চলে যায়, সেখানে ঈশ্বর উড়ে গিয়ে শুধু জাগতিক জিনিসগুলো থেকে যায়। সাধারণ মানুষ এই জিনিসটাকে নিতে পারে না।

সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, স্বাধীন ইচ্ছা তিনি রেখে দিয়েছেন, তা নাহলে জগতে পাপের বৃদ্ধি হবে। আমি বলতে পারি সবই ব্রহ্ম, সবই আত্মা, সব তাঁর ইচ্ছা, অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু এটা বলছি একটা idealistic standpoint থেকে। Realistic ground কি? জগৎ সেভাবে এখনও প্রস্তুত হয়নি, সবাই জানে আমি আলাদা, সে আলাদা, আমার ইচ্ছাতে অনেক কিছু হয়, অনেক কিছু আবার আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়, অনেক কিছু হয় যেটা আমরা পছন্দ করি না, এটাই realistic ground। ধর্ম যখন চলে তখন ওনারা idealistic ও realistic দুটোকে নিয়েই চলেন। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, স্বাধীন ইচ্ছা তিনি মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। কারণ সাধারণ মানুষ যদি মনে করে সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয় তাহলে জগতের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের সবাই স্বাধীন নাগরিক, কিন্তু একজন পুলিশ আর একজন কয়েদির মধ্যে তফাৎ থাকবেই। Equality একমাত্র আত্মজ্ঞানের অবস্থাতেই হয়, তাঁর নীচে সবটাই inequality। যত দিন যেখানে যেখানে inequality থাকবে তত দিন সেখানে সেখানে উপদেশ গুলো আলাদা আলাদা হবে। কিন্তু তাই বলে উপদেশ আলাদা আলাদা হবে বলে উপনিষদের মূল সত্যকে কখনই ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এই সত্যগুলি আমরা ঠাকুরের জীবন না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

আমরা এভাবে শুধু আমাদের চিন্তাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, ওই চিন্তাগুলো হল শুদ্ধ আত্মারই কাজ। আর চিন্তাতে বিষয় যাকে করছে সেটাও সেই শুদ্ধ আত্মা। শুধু একটাই তফাৎ, আমাদের মধ্যে যে দ্বৈত বোধ এটা আমাদের সামনে আসছে আমি তুমি রূপে, জগৎ আর আমি এই রূপ ছাড়া আর কিছু না। আমাদের চিন্তা ভাবনা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে ব্রহ্ম সব সময়ই ব্যক্ত হয়ে আছেন। তিনি কখনই অব্যক্ত নন, আমরাই দেখতে পাই না, আমার মনের ক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি সব সময়ই ব্যক্ত হচ্ছেন, আমরা বুঝতে পারছি না। বিরাট রূপে তিনিই আছেন, আত্মা রূপে তিনিই আছেন, মনের যে চিন্তা-ভাবনা এটা তাঁরই স্বরূপ, আর মন যে জিনিসটাকে ধরছে সেটাও তিনি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। সেইজন্য বলছেন, এটা আদেশ। দেখো বাপু! এটাই সত্য, এভাবে তুমি সাধনা কর তাতে তোমার মঙ্গল হবে। তখন তুমি জানতে পারবে আত্মা কি, প্রত্যগাত্মা কি। এগুলো আমাদের পক্ষে ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। কিন্তু উপায়ও নেই, ধারণা আমাদের করতেই হবে, তা নাহলে উপনিষদ পড়ার কোন অর্থই হয় না। আমরা উপনিষদ পড়ে বুঝতে পারি না বলে, আচার্যরা আমাদের বলে দেন, তুমি এ রকমটি কর, এ রকম ভাবো, এ রকম দেখতে শুরু কর।

ঠাকুর গীতাকে বলছেন মোক্ষশাস্ত্র, মুক্তি দেয়। উপনিষদ হল একেবারে সাক্ষাৎ মুক্তিশাস্ত্র, উপনিষদ মুক্তির জন্যই। আচার্য শঙ্কর উপনিষদ শব্দকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, উপনিষদ শব্দ এসেছে সদ্ ধাতু থেকে। সেখানে তিনি সদ্ ধাতুর তিনটে অর্থ করে দেখাচ্ছেন কিভাবে উপনিষদ মানুষকে তার সংসার বন্ধন খণ্ডন করে মুক্তির দিয়ে নিয়ে যায়। সেইজন্য উপনিষদ সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। যারা এমনি জানতে চাইছেন উপনিষদে কি আছে, কি বলতে চাইছে, তখন উপনিষদ তার কোন কাজে দেয় না। কিন্তু যার একটু ইচ্ছে জেগেছে যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমি ভালো হতে চাই, তাদের জন্যই এইসব শাস্ত্র। শাস্ত্র হল মা, মা যেমন কখনই ছেলের অমঙ্গল চায় না, যখন বকাঝকা করে, মারধোর করে তখনও মা সন্তানের মঙ্গলের জন্যই করে। একই কথা বারবার বুঝিয়ে বলে, তুমি এ রকমটি করবে না, তুমি এ রকমটি কর। উপনিষদও একই কথা পাঁচ রকম ভাবে বারে বারে বলতে

থাকেন, যাতে কখন তার চেতনা একটু জেগে থাকবে সেই সুযোগে একটা কথাকে ধরে নেবে, সেখান থেকে তার মধ্যে একটা উচ্চ ভাব জাগবে।

উপনিষদ যদিও আগেই বলে দিয়েছেন, যার এই জ্ঞান হয়ে যায় সে অমরত্ব লাভ করে নেয়। অনেক আগেই উপনিষদের মূল বক্তব্য বলা হয়ে গেছে। কিন্তু তারপর আবার সেই আলোচনাকে নিয়ে আসছেন। যারা এই উচ্চ ভাব ধারণা করতে পারবে না, তারা যাতে একটু ধারণা করতে পারে সেইজন্য তখন অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম রূপের তত্ত্বটা সামনে নিয়ে এলেন। এরপর ছয় নম্বর মন্ত্রে বলছেন –

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।।৪/৬।।

(সেই ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীরই সম্ভজনীয় বলেই খ্যাত ও প্রাণিগণ কর্তৃক সম্ভজনীয় রূপেই উপাস্য। যে কেউ এই ব্রহ্মকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তাঁকেই ভূত মাত্রই প্রার্থনা করে থাকেন।)

এটি উপনিষদের একটি অত্যন্ত সুন্দর মন্ত্র। আমাদের প্রায়ই মনে হয় নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্ম, সাকার নিরাকার এগুলোকে যেন আমরা কিছুতেই মেলাতে পারি না। নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানীদের জন্য, ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীরা শুষ্ক হয়। যখনই আমরা নির্গুণ ব্রহ্ম শব্দটা শুনছি তখনই সবারই মনের মধ্যে প্রাথমিক একটা ধারণা আসে যে নির্গুণ ব্রহ্ম বলতে এই রকম কিছু। ঠাকুর যখন মায়ের নাম করছেন বা গোপীদের কথা বলছেন, রামনাম করছেন, তখন ঠাকুরের ওই ভাবের অবস্থাকে মাস্টারমশাই বর্ণনা করে বলছেন, ঠাকুর ভাবে গরগর মাতোয়ারা, চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করছেন। জ্ঞানীরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কিন্তু ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীরা শুষ্ক। একদিকে চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, অন্য দিকে একটা শুষ্ক ভাব। জিনিসটা কিন্তু তা নয়। সেই দিক থেকে এই মন্ত্রটা একটা ব্যতিক্রমী মন্ত্র, তবে অন্যান্য উপনিষদে কোথাও কোথাও আছে কিন্তু কম।

তৎ হ, এই যে ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে, তৎ মানে সেইটা। ওঁম্ যেমন তাঁর বাচক, তেমনি তৎ তাঁর বাচক, সৎ এটাও তাঁর বাচক। সেইজন্য বলা হয় ওঁ তৎ সৎ বলে দিলে সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যায়। ওঁম্ ব্রহ্মের নির্দেশক, তেমনি তৎ ব্রহ্মের নির্দেশক, সৎ ব্রহ্মের নির্দেশক। যখন তৎ বলা হয় তখন ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হচ্ছে। কোন ব্রহ্মকে নির্দেশ করছেন? সব ব্রহ্মের, নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, সাকার ঈশ্বর, নিরাকার ব্রহ্ম যাই বলা হোক, সবটাই তৎ দিয়ে নির্দেশ করা হয়ে যায়। তৎ আসলে সর্বনাম, যেটাকে দেখাচ্ছেন সেটা হল সমস্ত কিছুর সমষ্টি, সেই সমষ্টি বা ব্রহ্মকে তৎ দিয়ে ইঙ্গিত করেন। এখানে অধিদৈবত ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ব্রহ্ম, নিরকার ব্রহ্ম, নির্গুণ, সগুণ, সাকার ব্রহ্মকেই কি ইঙ্গিত করছেন? না, in general, আপনি আমি যে রূপেই নিই না কেন, তৎ হ, সেই ব্রহ্মই। *তদ্বনং নাম*, বলছেন ব্রহ্মের একটা নাম তদ্বনম্। বন মানে জঙ্গল, এখানে জিনিসটা তা নয়। বন শব্দের অর্থ আবার শোভনীয়। উপবন শব্দটা আমরা যে অর্থে বলি বন ওই শব্দেই হয়। আচার্য এখানে বলছেন *বননীয়ম্, বননীয়ম্* শব্দের অর্থ শোভনীয়, যেটা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। সেইজন্য ব্রহ্মের নাম হয় তদ্বন, এটা উপনিষদ আদেশ করছেন। কেন আদেশ করছেন? কারণ ব্রহ্ম হলেন ultimate adorable, ব্রহ্ম হলেন শোভনীয়। কেন শোভনীয়? এটা আমরা আচার্যদের পরম্পরার আদেশ অনুসারে পাচ্ছি। দ্বিতীয় হল, যখন উমা হৈমবতী আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর রূপের বর্ণনা করে বলছেন, *বহুশোভমানাম্*, অত্যন্ত শোভমানা। আবার বলছেন, উমা সব সময় ঈশ্বরের সঙ্গে থাকেন সেইজন্য তিনিও *তদ্বন*। ব্রহ্মের একটা নাম তদ্বন, তার মানে সেই ব্রহ্ম যিনি বননীয়, ভজনীয়, প্রচণ্ড ভালোবাসার জিনিস, সবাইকে টেনে নিচ্ছেন।

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্, সেইজন্য তাঁর উপাসনা *তদ্বন* রূপেই করতে হয়। যদি কাউকে মানুষ সত্যিকারের ভালোবেসে থাকে, এক মিনিটের জন্যও যদি কাউকে ভালোবেসে থাকে, সে তার সন্তান হোক, নাতি হোক, যেই হোক, ওই ভালোবাসার স্পার্ক যদি দিয়ে থাকে, জানতে হবে ঠিক গুরুর হাতে পরলে তিনি ঠিক তাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে চলে যাবেন। ভালোবাসার ওই স্পার্ক যার মধ্যে নেই তার

দ্বারা হয় না। ব্রহ্ম তাঁর একটা নাম তদ্বন, অত্যন্ত বননীয়, অত্যন্ত প্রিয়, যাঁকে আমার চাই, আর উপাসনা তাঁকে সেভাবেই করবে, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না, তোমাকে ছাড়া আমার প্রাণ আটুপাটু করছে। এখানে তো ব্রহ্মের আলোচনা চলছে, মা কালী, শ্রীরাম বা রাধাকৃষ্ণের আলোচনা চলছে না। তাহলে ঠাকুর কেন বলছেন জ্ঞানীরা শুষ্ক? আসলে ঠাকুর সেইসব জ্ঞানীদের কথা বলছেন, যাঁরা জ্ঞান সাধনায় শুধু নেতি নেতি বিচার করেন। নেতি নেতি বিচারে ভালো মন্দ সবটাই ত্যাগ করে দেন। কিন্তু এটা নেতি নেতি বিচার নয়, ঈশ্বরের সাধনা যখন হয় তখন নেতি নেতি বিচারও হয়, ইতি ইতি বিচারও হয়। আমাদের সবারই একটা সাধারণ ধারণা যে ভক্তিতে ইতি ইতি সাধনা হয় আর বেদান্তে নেতি নেতি সাধনা হয়। কিন্তু এটা ঠিক না, বেদান্ত বলছেন তদ্বন, তাঁর যে রূপ, তাঁর যে সৌন্দর্য, ওই সৌন্দর্যের কাছে সব ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু আমরা কথামৃতে যেসব কথা পাই তার সাথে তো এগুলো মিলছে না। না তা নয়, পুরোটাই মিলে যায়, কোথাও কোন দুই রকম কথা নেই।

সমস্যা হল, যতক্ষণ সচ্চিদানন্দের অবধারণা না হয় ততক্ষণ আমরা এটা সেটাকে ঈশ্বরের রূপ বলে মনে করছি, এটা সেটাকে ব্রহ্মের রূপ হিসাবে দেখছি, এটা সেটাকে ভালোবেসে বেড়াচ্ছি। গুরু বলছেন এগুলোকে ছাড়ো। ছাড়তে গিয়ে আবার এত কিছুকে ছাড়া হয়ে যায় যে ততক্ষণে মনটা পুরো শুষ্ক হয়ে যায়। কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান সাধক, তিনি যদি একবার ব্রহ্মের ধারণা করে নিতে পারেন, কেনোপনিষদের প্রথম মন্ত্র থেকে যেটা চলছে, সেটাকে যদি ধারণা করে নিতে পারেন আর তখন যদি বুঝে নিতে পার এটাই তদ্বন, তিনি ভীষণ ভাবে ভালোবাসার যোগ্য, এটাকেই আমার চাই, এবার আর নেতি নেতি হবে না। সমস্যা হল নেতি নেতি উপাসনাতে ওনারা জানেনেই না কি চাইছেন। নেতি নেতি উপাসনাতে যত উপাধি আছে সব উপাধিকে বাদ দিয়ে দাও। বাদ দিতে দিতে এমন এমন জিনিসকেও বাদ দিয়ে দেয় যে যার ফলে তার জীবনটা একটা খটখটে পাথরের মত হয়ে যায়। উত্তরাখণ্ডে যেসব সাধু সন্ন্যাসীরা তপস্যা করতে যান তাঁদের স্থানীয় সাধুদের সংস্পর্শে এসে এই ব্যাপারে খুব ভালো অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি তো সচ্চিদানন্দের সাথে এক, তাঁর মধ্যে যে ভালোবাসা, দূর থেকে তার সুগন্ধ ছড়াবে। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ তাঁর কাছে মৌমাছির মত দৌড়ে আসবে।

কিন্তু তার জন্য তাঁকে মনকে একটা জায়গায় রাখত হবে। কোন জায়গায় রাখবেন? বলছেন, জগতে যা কিছু আছে সেটাতে নয়, *তদ্বন*, তৎ মানে ব্রহ্ম, *বন*, যিনি অত্যন্ত শোভনীয়। এখানে আচার্য *বননীয়ম্* বলছেন। বন মানে জঙ্গল, দূর থেকে জঙ্গলকে খুব সুন্দর দেখায়, সেখান থেকে বন শব্দ এসেছে। আসল বন হল উপবন, আমরা যাকে সাজানো বাগান বলি। সাজানো বাগান দেখলে যেমন খুব সুন্দর লাগে, ঠিক সেই রকম ব্রহ্মাকে বলছেন *তদ্বন ইতি উপাসিতব্যম্*। গুরু শিষ্যকে বলছেন, এতদিনে তুমি ব্রহ্মের ব্যাপারে বুঝে গেছ, তোমার একটা ধারণা হয়ে গেছে ব্রহ্ম জিনিসটা কি। আমাদের ইন্দ্রিয় কাজ করছে, মন কাজ করছে, কিন্তু এগুলো আসল নয়, এর পেছনে যে চৈতন্য সত্তা কাজ করছে ওটাই আসল। ওই যে চৈতন্য সত্তা, সেটাই তদ্বন্, most adorable, অত্যন্ত ভালোবাসার জিনিস, সেটাই প্রাণের প্রাণ।

যখন এর উপাসনা করা হয় তখন কি হয়? *স য এতদেবং বেদাভি হৈনং*, কদাচিৎ যদি কেউ এই ভাবে সাধনা করেন, *সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি*। *বেদাভি* মানে যিনি জানেন, কিন্তু আচার্য এখানে এর অর্থ করছেন যে উপাসনা করে, শুধু জানে না, উপাসনাও করে। জানাটা হয়ে গেল সব থেকে উচ্চস্তরের আর উপাসনা হয়ে গেল নিম্নস্তরের। তখন কি হয়? তখন তাঁকে জগতের সমস্ত প্রাণী ভালোবাসতে শুরু করে। যোগী সাধনা করছেন, তাকে সবাই ভালোবাসতে শুরু করে। কেন ভালোবাসছে? আচার্য এখানে আরেকটা লাইন এগিয়ে বলছেন, যারা তাঁর আশেপাশে থাকেন তারা তাদের জীবনের যেটা অভিষ্ট, যেটা জীবনে চাইছে বা সেই ইচ্ছা নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। কারণ ব্রহ্মের কাছে যে ফলের আশা করে বা ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করে আর সেখান থেকে তার যেটা পুর্তি হয়, এই ধরণের যিনি সিদ্ধ পুরুষ, যিনি ব্রহ্মাকে তদ্বন রূপে জেনেছেন মেনেছেন, তাঁর কাছ থেকেও ওই একই ফল পাওয়া যায়। বলতে

চাইছেন, যিনি ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কিভাবে, তদ্বন রূপে অর্থাৎ অত্যন্ত বননীয়ম রূপে, তখন এনার মধ্যেও একই গুণ এসে যায়। নারদীয় ভক্তিসূত্রেও একই কথা বলছেন। যদি ভক্ত ঈশ্বরের সাথে নিজেকে এক মনে করেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে ফল পায়, এই ধরণের ভক্তের কাছে চাইলেও সে ওই একই ফল পায়। ব্রহ্মের উপাসনা নেতি নেতি দিয়েও করতে হবে না, ইতি ইতি দিয়েও করতে হবে না, তদ্বন রূপে করলেই হবে। ঠাকুর মায়ের নাম করতে করতে, হা কৃষ্ণ, হা গোবিন্দ বলতে বলতে চোখের জলে তাঁর বক্ষ ভেসে যেত। কারণ মা বা ঈশ্বরের যে নাম, তার থেকে ঠাকুরের কাছে আর কিছু প্রিয় হতে পারে না। ঠিক তেমনি যখন কেউ সাধনা করেন ব্রহ্ম থেকে আমার কাছে আর কিছু প্রিয় নেই, বলছেন এটাই সাধনা, এভাবেই সাধনা করতে হয়।

দ্বিতীয় *বেদাভি*, তিনি জেনে যান। আমাদের শাস্ত্রে জ্ঞান শব্দ অনেকগুলো অর্থে আসে, তত্ত্ব রূপে জেনে যাওয়াকে জানা বলে, ধারণা করে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে সেটাকেও জানা বলে আবার উপলব্ধি হয়ে যাওয়াকেও জানা বলে। আচার্য *বেদাভি* শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলছেন, এভাবে উপাসনা করে। যে এভাবে উপাসনা করে তারই এই অবস্থা আর যাঁর উপলব্ধি হয়ে গেছে তাঁর তো কোন কথাই নেই। স্তুতি করে বলছেন, তখন মানুষ তাঁর দিকে ছুটে আসে, কারণ তাঁর কাছ থেকে সমস্ত কামনার পুর্তি হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, যে যাকে ভালোবাসে, যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। ঠাকুরকে যে ভালোবাসবে, যে তাঁর চিন্তন করবে সে ঠাকুরের সত্তা পাবে। যারা নিজের নাতিকে ভালোবাসে, নাতির কথা ভাবতে থাকে তারা নাতির সত্তা পাবে। দুদিন পর নাতির মত অসম্পূর্ণ বাক্যে কথা বলবে, ধীরে ধীরে বুদ্ধিটাও নাতির মত হয়ে যাবে।

আমরা মীরাবাঈয়ের জীবন দেখছি, তাঁর কথা শুনছি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম, ভালোবাসার কথা শুনছি, এরপর তো আমাদের আর কোন শাস্ত্র না লাগারই কথা। তাহলে এত কাঠখড় পুড়িয়ে উপনিষদ পড়তে হয় কেন? আসলে শাস্ত্র না পড়া থাকলে ভাব পাকা হয় না। ঠাকুর বারবার সাধুসঙ্গের কথা বলছেন। কথামৃতে তো সব কথা বলাই আছে তাহলে আবার সাধুসঙ্গের কি দরকার! এই জন্যই দরকার, তা নাহলে ভাব পাকা হবে না। মীরার ভালোবাসার কথা আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, কিন্তু আমরা তো সেই রকম কিছুই করতে পারছি না। কারণ ভাব জিনিসটা পাকা হচ্ছে না। শাস্ত্র চর্চা, সাধুসঙ্গ করতে করতে ভাব পাকা হয়। শাস্ত্র চর্চা ও সাধুসঙ্গে নিষ্ঠাটা দৃঢ় হয়।

এখানে মূল বক্তব্য হল, কেনোপনিষদের প্রথম প্রশ্ন যেখানে করা হয়েছিল সেখানে ওনারা দেখাচ্ছেন চৈতন্যই আসল সত্তা। সেই চৈতন্যকেই আত্মা বলছেন, সেই চৈতন্যকেই ব্রহ্ম বলছেন। যে এটাকে বুঝতে পারে, কিভাবে, *প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে*, আমাদের প্রত্যেকটি যে চিন্তা-ভাবনা আর তার পেছনে যে চৈতন্য সত্তা সেটাই ব্রহ্ম, সেটাই আত্মা, এই জিনিসটাকে যখন তুমি বুঝতে পারবে তখন তোমার অমৃতত্ব লাভ হয়ে যাবে। এবার এই ভাবটা পাকা করাবার জন্য বিভিন্ন রূপ নিয়ে বলছেন। যদি তোমার কিছু ধারণা রূপ পরিগ্রহ করে থাকে তখন তুমি তদ্বন রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করবে, এটাই পাওয়ার যোগ্য, এটাই অত্যন্ত ভালোবাসার, আমার এটাই চাই। অধিদৈবত একটা উপাসনার বিধি, অধ্যাত্ম আরেকটা উপাসনার বিধি, এখানে তদ্বন এটাও একটা উপাসনার বিধি। উপাসনার যে বিধি, এই বিধি দিয়ে সেই সত্যকেই অন্য ভাবে বলা হয়, সত্য ছাড়া অন্য কিছু হয় না, সাধনা মানেই সত্য। অধিদৈবত যেমন একটা সত্য, অধ্যাত্মও একটা সত্য, তদ্বন এটাও একটা সত্য। যেটা সত্য সেটারই সাধনা করা হয়। যারা ঠাকুরকে ভগবান রূপে সাধনা করছেন, সেখানে ঠাকুর ভগবান এটা একটা সত্য, সেটারই সাধনা করা হচ্ছে, এটাই সত্য সাধন। সাধনা মানেই যেটা সত্য সেটার উপর টিকে থাকা। একটা মেয়ে একটা ছেলেকে সত্যিকারের ভালোবাসছে, ভালোবেসে বলছে তুমিই আমার সব। এটা কিন্তু সত্য নয়, তাই এই ভালোবাসা কোন দিন সাধনা হবে না। শাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন জিনিসকে খুব সহজ ভাবে বলে দেয়, এটাই শাস্ত্রের কাজ। যে জিনিসটা যত সহজ বলে মনে হয় বুঝতে হবে সেখানে তত গভীরতা আছে। উপনিষদ খুব সহজ কথা সহজ ভাবে বলে দিলেন, তদ্বন, সব

থেকে ভালোবাসার বস্তু, বননীয়ম্। আমরা যদি নিজেদের বিচার করে দেখি, কাকে আমি বেশি ভালোবাসি, সঙ্গে সঙ্গে বলে দেব ভগবানকে, কিন্তু বিচার করতে গেলে দেখা যাবে তা নয়, কেউ পয়সাকে, কেউ নিজের চাকরীকে, কেউ নিজের একটা ছকে বাঁধা জীবনধারাকে ভালোবাসে। গুরু শিষ্যকে এক এক করে সব কিছু বলে দিয়েছেন, সব বলার এবার শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞেস করছেন –

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি উক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং
বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি।।৪/৭।।

([শিষ্য] – হে ভগবন্! আমায় রহস্য-বিদ্যা উপদেশ করুন। [আচার্য] – তোমায় রহস্য-বিদ্যা বলা হয়েছে, ব্রহ্ম বিষয়ক পরাবিদ্যাই তোমাকে বলা হয়েছে।)

শিষ্য বলছে, হে আচার্য! উপনিষদ বলুন। আচার্য বলছেন, এতক্ষণ তো তোমাকে উপনিষদই বলছিলাম। ঠিক আছে আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধী উপনিষদ বলব। এই মন্ত্রটা খুব মজার মন্ত্র, মন্ত্রের সাধারণ অনুবাদ করে পড়লে মনে হবে গুরু যে এত উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন, তার উপর শিষ্য পুরো রামায়ণ শুনে যেন জিজ্ঞেস করছে সীতা কার ভার্যে। উপনিষদের কথা এতক্ষণ ধরে বলে যাওয়ার পর শিষ্য বলছে, তাহলে এবার উপনিষদ বলুন। এই ধরণের ভুল অর্থ না করার জন্যই ভাষ্য দরকার। আচার্যের ভাষ্য সহ না পাঠ করলে এসব মন্ত্রের অর্থ পুরো ওলটপালট হয়ে যাবে।

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি, শিষ্য বলছে উপনিষদ বলুন। গুরু বলছেন, আরে! উপনিষদই তো বললাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্রাহ্মী উপনিষদ, ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধী উপনিষদ বলছি। আমাদের মনে হবে শিষ্যকে গুরুর এত উপদেশ দেওয়া পুরোটাই জলে চলে গেল। কিন্তু তাতে কিছু contradiction এসে যায়। প্রথম contradiction আসে, আমরা যে ব্রাহ্মণদের এত সম্মান দিয়ে এসেছি, সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীরা এত খেটেখুটে তপস্যা করে সব শুনত, তাহলে কি সব বেকার শুনত? তাদের কি এতটুকু বুদ্ধি ছিল না! দ্বিতীয় contradiction আসে, উপনিষদ তো একদিন দুদিনে বলে দেওয়া হয় না, গুরু যখন উপনিষদ বলতেন তখন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে বলে যেতেন। তার মানে শিষ্যের কোন evolution হয়নি? তৃতীয় হল, এর আগে একটা মন্ত্রে শিষ্য গুরুকে বলছিলেন *নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ*, সেখানে শিষ্য conviction নিয়ে বলছে আমি বুঝে গেছি, তাহলে তো এখানে contradiction এসে যাচ্ছে, সমস্ত জিনিসটাকেই contradict করে দিচ্ছে। আচার্য তখন এটাকে link করছেন, শিষ্য এটা বলতে চাইছে না যে আপনার শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হল না, আপনি শিক্ষা দিতে থাকুন। কারণ আগে যেখানে *প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে*, এই ধরণের কথা বলে দিয়েছেন বা যেখানে বলে দিয়েছেন *প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি*, যে এটাকে জেনে যায় সে অমর হয়ে যায়, যে এই কথাগুলো শুনে নিয়েছে যে, এটা জেনে গেলে সে অমর হয় যায়, তাহলে সে আবার কেন ওই প্রশ্ন করবে, আমাকে অমর হওয়ার কথা বলুন? তাহলে তো *পিষ্টপেষণবৎ* হয়ে যায়। *পিষ্টপেষণবৎ* শব্দটা আচার্যের খুব প্রচলিত শব্দ, তার মানে একবার গম পেষাই হয়ে গেছে, সেই পেষাই আটাকেই আবার পেষাই করছে। একবার বলে দেওয়া হল এই বিদ্যা যখন এভাবে হয় তখন মানুষ অমর হয়ে যায়, আর কিছুক্ষণ পর খোশগপ্পের মত বা সময় কাটাবার জন্য বলতে যাবেন না, এবার বলুন অমর কিভাবে হওয়া যায়। কিন্তু এটা উপনিষদ।

এই যে একটা মন্ত্র *উপনিষদং ভো ব্রূহীতি*, যদিও আমরা ধরে নিই যে শিষ্য বলছেন আমি বুঝলাম না, আপনি আমাকে আবার বলুন। দ্বিতীয়, পুরো উপনিষদের বক্তব্যই হয় মুক্তি, বলে দিলেন তুমি অমর হয়ে যাবে। বলার পরে বলছে, আপনি আবার বলুন। এই রকম বোকা বোকা একটা মন্ত্রকে ব্রাহ্মণরা না খেয়েদেয়ে হাজার হাজার বছর ধরে মুখস্ত করে আসছেন, তা কি কখন হতে পারে! এর মধ্যে যদি একটা গভীর তত্ত্ব না থাকে, একটা বিশেষ কিছু তাৎপর্য না থাকে, যে গভীর তত্ত্বটা পরের প্রজন্মের হাতে তুলে দিতেই হবে, তাহলে এই ধরণের কথা শিষ্য কেন বলছেন! আচার্য শঙ্করের ভাষ্য

না থাকলে এর ভেতরকার গভীর তত্ত্বকে আমরা জানতেই পারতাম না। আচার্য বলছেন, যদি কেউ এটাকে মনে করে শিষ্য ওই একই প্রশ্নকে পুনরায় নিয়ে আসছে, না, জিনিসটা তা নয়। তার কারণ conclusion আগেই বলে দেওয়া হয়েছে, এটা করলে অমর হয়ে যায়, তাই এই ব্যাপারটা হবে না। তাহলে শিষ্যের এই প্রশ্নের অর্থ কি হবে?

আচার্য তখন বলছেন, যদি এমন কিছু বলতে যাচ্ছেন যেটা আরেক ধরণের কোন ফল দেবে, তাহলেও সেটা যুক্তি সম্মত হয় না। আচার্য শঙ্কর কোথাও কোন জায়গায় গায়ের জোরে অন্য কিছু চাপিয়ে দেন না, পুরোপুরি যুক্তি দিয়ে যান। ঠিক আছে এর কি কি সম্ভবনা থাকতে পারে দেখা যাক। এই সম্ভবনা সেই সম্ভবনা থাকতে পারে কিন্তু তিনি ওর যে principle, সেটাকে তিনি intact রাখেন, ওই intact রেখে বাকি সব কিছু চলবে।

বলছেন, সব জিনিসকে যদি আমরা এক সঙ্গে নিয়ে আসি তখন মনে হয়, উপনিষদের যিনি আচার্য তিনি মূল কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু কোথাও কোথাও আরও যদি কিছু বলে দেওয়া হয়, তাহলে বিদ্যাটা যেন দৃঢ় হয়, সেই অর্থে শিষ্যের এই প্রশ্ন। কিন্তু যদি মনে করি কোন বক্তব্য লুকানো ছিল বা কিছু কথা বলা বাকি থেকে গেছে, জিনিসটা তা না। প্রথমে এটা পরিষ্কার যে এটা কোন ফালতু কথা নয়, তার মানে শিষ্য এটা বলতে চাইছে না যে, আপনি এতক্ষণ যা বললেন, আমি বুঝলাম না যে এটা উপনিষদ। আরেকটা অর্থ হতে পারে, কিছু জিনিস বাকি থেকে গেছে যেটা ছাড়া এই জ্ঞান হবে না। আচার্য বলছেন, এই সম্ভবনাও হতে পারে না। কারণ পরের মন্ত্রে বেদের কথা আসবে, বেদাঙ্গের কথা আসবে। আচার্য বলছেন, বেদ, বেদাঙ্গ এগুলো কখনই সহকারী হতে পারে না। সহকারীর অর্থ হল, এটা ছাড়া তোমার ওই জ্ঞান হবে না, এই অর্থে কখন হবে না। এখানে তোমাকে এই বলে শুধু বোঝান হচ্ছে যে, যেমন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের ঈশ্বরীয় কথা বলছেন, বলতে বলতে বলছেন, তোমাদের আরেকটা কথা বলি। আরেকটা কথা বলি, এই কথা ঠাকুর যখন বলছেন তখন এই হবে না যে ঠাকুর আগে যে কথা বলেছেন সেগুলো অসম্পূর্ণ বক্তব্য হয়ে গেছে। পরের মন্ত্রে আসবে, সেখানে আচার্য বলছেন, আত্মজ্ঞান যেটা হয় সেখানে কর্তা কর্ম ক্রিয়ার কোন ভেদ থাকে না। সেইজন্য কখনই আত্মজ্ঞানের জন্য এগুলো বিহিত হতে পারে না। এর সব কিছু মিলিয়ে বক্তব্যটা হল, আত্মজ্ঞানে কারুর কোন সাহায্য লাগে না। যেটা আগে আগে বলে দিয়েছেন সেটাই সম্পূর্ণ। পরের দুটি মন্ত্রে শিষ্যের মনে এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করার জন্য বলা হচ্ছে, এখানে নতুন কোন কথা বলা হচ্ছে না। সাথে সাথে কোন পুনরুক্তিও করা হচ্ছে না, কারণ পুনরুক্তি যদি করা হয় তাহলে ওটা *পিষ্টপেষবৎ* হয়ে যাবে। আর যদি বলা হয় নতুন কিছু বলা হচ্ছে, তাহলে আগে যেটা বলা হয়েছে সেটা অসম্পূর্ণ ছিল। এই কারণেই আগের আগের উপদেশ অসম্পূর্ণ হবে না, ব্রহ্মজ্ঞানের যে মূল তাতে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার কোন বিভেদ থাকে না। কিন্তু এর পরের মন্ত্র কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার ভেদ এসে যাচ্ছে, সেইজন্য এটা কখনই সহকারী হবে না। পরের দুটি মন্ত্রে এই জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বেদের দরকার আছে, কেন দরকার সেটাই পরে আচার্য বলছেন। কিন্তু তার আগে বলছেন এটা কখনই জ্ঞানীর জন্য সহকারী হতে পারে না। তার মানে এটা ছাড়া যে জ্ঞান হবে না, তা নয়। কারণ মূল জ্ঞান আগেই বলে দেওয়া হল, পরের যে দুটি মন্ত্র হল যাতে আমাদের মন ওই ব্রহ্মবিদ্যাতে আরও স্থির হয়, আরও ভালোভাবে অবস্থিত হয়। মূল বক্তব্য হল, উপনিষদের যা বলার বলা হয়ে গেছে, শিষ্যের মনে হল এই ব্যাপারে যদি আরও কিছু বক্তব্য থাকে, শিষ্য জানে নতুন যেটা বলা হবে তাতে এই জ্ঞান আমার মনে আরও দৃঢ় হয়ে বসবে, জ্ঞানের প্রতি আমার আরও নিষ্ঠা হবে। শিষ্যের মনের ভাব এই রকম, আমরা যাকে ভালোবাসি তার ব্যাপারে আরও দুটো কথা শুনতে চাই। ছেলে হস্টেলে থাকে, বাবা দেখতে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর মা তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারবার পাঁচবার জিজ্ঞেস করবে, এই অর্থে শিষ্য এখানে বলছে, কিছু উপদেশ বাকি থেকে গেছে, এই অর্থে না। কেনোপনিষদ এখানে এসে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এরপর দুটি মন্ত্র বলছেন যাতে সব জিনিসটা আমাদের আরও দৃঢ় হয়ে যায় –

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা, বেদাঃ সর্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্।৪/৮।।

(তপস্যা, দম, কর্ম ইত্যাদি উক্তি উপনিষদের পাদস্বরূপ, বেদসমূহ তাঁর বিবিধ অঙ্গ, সত্য তাঁর নিবাসস্থল।)

তপস্যা, দম, কর্ম এগুলোতে এই উপনিষদ অর্থাৎ এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত। *বেদাঃ সর্বাঙ্গানি*, বেদ, বেদাঙ্গ সবটাতে এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত। *সত্যমায়তনম্*, সত্য এর আশ্রয়। তপঃ হল যে কোন জিনিসকে নিয়ে মানুষ যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে আচার্য বলছেন, *তপো ব্রহ্মচর্যার্দি*, যে কোন জিনিসকে নিয়ে যখন কেউ একনিষ্ঠ ভাবে অনেক দিন ধরে করে সেটাই তপস্যা। মা যেমন সন্তানকে জন্ম থেকে ছয় মাস, এক বছর ধরে নিজের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে লালন-পালন করছে, এটাই তপস্যা। ছাত্ররা পড়াশোনা করে এটাও তপস্যা। দম মানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। আজকাল, টিভি, ম্যগাজিনে মন নিয়ন্ত্রণের উপর কত লেকচার, কত লেখা, কত বই বাজারে ছড়িয়ে গেছে। মন নিয়ন্ত্রণ সত্যিই খুব বড় সমস্যা, কিন্তু তার আগে আমাদের অঙ্গগুলির সংযম করা আরও দরকার, এটাকে বলে দম। দম মানেই বহিরিন্দ্রিয়ের, কর্মেন্দ্রিয় গুলির নিয়ন্ত্রণ। মনুস্মৃতিতে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, হস্তচপল, বাকচপল্, চপল মানে চঞ্চল অর্থাৎ শরীরের কোন অঙ্গকে যেন অকারণে নড়াচড়া না করে। বাইরের কর্মেন্দ্রিয় গুলির সবার আগে নিগ্রহ করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কর্মেন্দ্রিয় নিগ্রহের পর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করতে হয়। এই দুটোর নিয়ন্ত্রণ করার পরই মনের নিয়ন্ত্রণ হবে। আর শেষে কর্ম, কর্ম মানে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, বর্তমান কালে আমাদের ভাষায় নিয়মিত জপ-ধ্যান করা। আচার্য বলছেন *এতেষু হি সৎসু ব্রাহ্ম্যুপনিষৎ*, উপনিষদ যে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন এগুলো হল তার আশ্রয়। তার সাথে চারটে বেদ আর সম্পূর্ণ বেদাঙ্গ এগুলো ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা। এর অর্থ হয়, যিনি এই *ব্রাহ্ম্যুপনিষৎ* পেতে চান, ব্রহ্মবিদ্যা পেতে চান, তাঁর জন্য এই জিনিসগুলো দরকার – তপস্যা দরকার, ইন্দ্রিয়সংযম দরকার, জপ-ধ্যান দরকার আর বেদবেদাঙ্গ ধারণা দরকার। কিন্তু এই ভুল করলে চলবে না যে, এগুলো হলেই যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়ে যাবে। শ্রীমা বলছেন, ঠাকুর কি আলু পটল যে এত জপ, এত ধ্যান করলে তাঁকে পেয়ে যাবে! জপ করলে, ধ্যান করলে তাঁকে পাওয়া যাবে না, তাহলে জপ, ধ্যান করা বন্ধ করে দিলে হয়। তাহলে কিছু যে পাওয়ার সম্ভবনা ছিল সেটাও আর কোন দিন পাবে না। শাস্ত্রে বলছেন, তপস্যাদি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না, তাহলে তপস্যা করব না। তুমি আর কোন দিনই পাবে না। বক্তব্য হল, এই যে এত লম্বা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করলেন, করার পর বলছেন ব্রহ্মবিদ্যা জানা, ব্রহ্মকে জানার জন্য মনের একটা অবস্থা লাগে। মনের ওই অবস্থার জন্য মনের একটা পবিত্রতা দরকার, মনের একটা উচ্চস্তর দরকার। সেগুলোর জন্য তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আর শুভকর্মের দরকার। যদি কোন মানুষের জীবন গোছান না হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে, এর মানেই তার তপস্যা নেই, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নেই, মনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, এদের আধ্যাত্মিক উত্থান কখনই হবে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোছান থাকলেই যে তার আধ্যাত্মিক উত্থান হবে তা না, যদি না থাকে তাহলে কোন মতেই হবে না।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এগুলোকে যখন সমাধান করা হয়, এটাকে বলে তপস্যা। বিষয় থেকে নিবৃত্ত হওয়াকে বলে দম। এইসব বলে আচার্য বলছেন, দেখা যায় উপনিষদের জ্ঞান পেলেও লোকেরা নিতে পারে না, যেমন কাহিনী আছে ব্রহ্মা ইন্দ্র আর বিরোচনকে উপদেশ দিলেন, ইন্দ্র এক রকম নিল, বিরোচন আরেক রকম ভাবে নিল। আচার্য খুব সুন্দর কথা বলছেন, যাদের এই জন্মে বা আগের আগের জন্মে তপস্যা করে করে মন একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে একমাত্র তাদের মধ্যেই শ্রুতিযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তার বাইরে যতই সে শাস্ত্রের কথা শুনে যাক, কোন দিন জ্ঞান উৎপন্ন হবে না। যতক্ষণ তপস্যা না করছে, তপস্যা মানে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, দম হল ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরের দিকে ছুটে বেড়ানো বন্ধ করা আর কর্ম হল নিয়মিত জপ-ধ্যান করা। এগুলো দিয়েই মন শুদ্ধ হয়, নির্মল মনেই জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান উদয় হওয়া মানে, গুরু মুখে শাস্ত্রের যে কথাগুলো শোনা হয়েছে সেগুলোকে সত্য বলে মনে হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আচার্য বলছেন, যাঁর হৃদয়ে ভগবানের প্রতি গভীর ভক্তি উদয় হয়েছে, ঈশ্বরের প্রতি যেমন ভক্তি তেমনই গুরুর প্রতি ভক্তি হয়েছে, একমাত্র

এই ধরণের মহাত্মার ভেতরেই এই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। ইষ্টের প্রতি ভক্তি, আর যে গুরুর কাছ থেকে ইষ্টের জ্ঞান পেয়েছেন সেই গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি। মহাভারতের একটা শ্লোক তুলে আচার্য বলছেন '*জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াং পাপস্য কর্মণঃ*', পাপ কর্ম যখন ক্ষয় হয় তখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সব শেষে আচার্য বলছেন, চারটে বেদ আর ছটি বেদাঙ্গ হল কর্ম আর জ্ঞানের প্রকাশক, সেইজন্য এই কটিকে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বলা হয়। বেদ বেদাঙ্গ না থাকলে ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাপারটা কেউ জানতেই পারত না, সেইজন্য এটা আধার, বেদ বেদাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা। এর আরেকটা অর্থ করে অন্য ভাবে বলছেন *সর্বাঙ্গানী*, ব্রহ্মবিদ্যাকে যদি মস্তক রূপে দেখা হয় তাহলে বেদ বেদাঙ্গ হল তার অঙ্গ। *সত্যমায়তনম্*, সত্য তার আয়তন, আয়তন মানে আবাসস্থান। মন, বাণী ও শরীরের অমায়িত্ব অর্থাৎ অকুটিল ভাব এটাই সত্য, এগুলো যাঁর মধ্যে থাকে তাঁরাই সাধু, তাঁদের মধ্যেই ব্রহ্ম ভাব উদিত হয়। অকুটিল ভাব মানে মনে কোন ধরণের জটিলতা, পাটোয়ারি, চালাকি থাকবে না, একেবারে সরল থাকবে। অসত্য যেখানে, কুটিল ভাব যেখানে সেখানেই পলিটিক্স, হৃদয়টা সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকে।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে
লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি।।৪/৯।।

(এই ব্রহ্মবিদ্যাকে যে কেউ এই প্রকারে অবগত হন, তিনি পাপ (অর্থাৎ সংসার-বীজ) ক্ষয় করে অনন্ত এবং সর্বমহত্তম স্বর্গলোকে (অর্থাৎ পরব্রহ্মে) প্রতিষ্ঠিত হন, প্রতিষ্ঠিত হন।)

ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার আশ্রয়। বটবৃক্ষের শেকড়কে আশ্রয় তার শাখাপ্রশাখা অনেক কিছু আছে। ভগবান যীশু, তিনি পড়াশোনা করেননি, কার্পেন্টারের ছেলে অথচ বাইবেল থেকে কত কি বেরিয়েছে, বাইবেল হল ব্রহ্মবিদ্যা। মাইকেল ফেরাডে বিজ্ঞানে যাঁর বিশাল অবদান, জগতের প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটাকে তিনি বাইবেলকে আধার করে পেয়েছিলেন। আর পরের দিকে তাঁর যত আবিষ্কার সেগুলোও তিনি বাইবেলকে আধার করেই বাস্তবায়িত করেছিলেন। আমাদের বেদ ব্রহ্মবিদ্যা, বেদ থেকে আমাদের ব্যাকরণ বেরিয়েছে, সাহিত্য বেরিয়েছে, বেদ থেকে জ্যামিতি বেরিয়েছে, বিজ্ঞান বেরিয়েছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতের কথা যারা বলে যায় তারা ভুলে যাচ্ছে, বর্তমান বিজ্ঞান কোন না কোন ভাবে ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট বা বেদ এমন কি কোরাণ থেকেই বেরিয়েছে, পরে ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে চলে গেছে। ওর উৎসে চলে গেলে দেখা যাবে এর উৎস ধর্ম। ঠাকুরের কথামৃত ব্রহ্মবিদ্যা, কথামৃতের উপর কিছু কিছু কাজ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখান থেকে যে সাহিত্য বেরোবে, কবিতা বেরোবে, বিজ্ঞান বেরোবে, জ্যোতির্বিজ্ঞান বেরোবে, তার এখনও সময় হয়নি, অন্তত হাজার বছর সময় দিতে হবে। সমস্ত বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই জিনিসটাকে যিনি জেনে যান তখন এই জগতে যত রকমের কামনা-বাসনা আছে সব ত্যাগ করে দেন। মৃত্যুর পর মুখ্য আত্মা, তখন আর দেহাত্মা, মন আত্মা এই আত্মা নয়, একেবারে আসল যে আত্মা, সেখানে গিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। *পাপ্মানমনন্তে*, তখন তাঁর সব পাপ চিরদিনের মত ক্ষয় হয়ে যায়। *স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি*, স্বর্গে লোকে গিয়ে সে প্রতিষ্ঠা পায়। আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছেন, এই স্বর্গলোক যেখানে দেবতা আদিরা থাকেন সেই স্বর্গলোক নয়, এই স্বর্গলোক বলতে অমরত্ব বোঝাচ্ছেন, অর্থাৎ তিনি মহান হয়ে যান, তাঁর উপরে আর কেউ কোন দিন যেতে পারে না। যিনি এই বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, অবিদ্যা, কাম, কর্মকে ত্যাগ করে দেন, তিনি চিরদিনের মত সর্বোচ্চ অবস্থায় চলে যাবেন, তাঁর উপরে আর কেউ যেতে পারে না। এই হল ব্রহ্মবিদ্যা, যা কেনোপনিষদ গুরু-শিষ্য সংবাদের মাধ্যমে উপাস্থাপিত করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু
।।হরি ওঁ তৎসৎ।।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	শান্তিমন্ত্র	১
২	বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য	১
৩	কেনোপনিষদের ইতিহাস	১১
৪	ভাষ্য-ভূমিকা	১৪
	মন্ত্রের সূচীপত্র	
ক্রমিক সংখ্যা	সূত্র	পৃষ্ঠা
	প্রথম খণ্ডঃ	৪৮-১১২
১	কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ	৪৮
২	শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্	৬৬
৩	ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ	৭৯
৪	যদ্‌বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে	৮৭
৫	যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্	১০৫
৬	যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি	১১০
৭	যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্	১০৫
৮	যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে	১০৬
	দ্বিতীয় খণ্ডঃ	১১৩-১৫০
১	যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি	১১৩
২	নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ	১২৬
৩	যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ	১৩৩
৪	প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে	১৩৫
৫	ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি	১৪৮
	তৃতীয় খণ্ডঃ	১৫১-১৮৬
১	ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে	১৫২
২	ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োহস্মাকমেবায়ং	১৭৯
৩	তেহগ্নিমব্রুবন্ - জাতবেদ এতদ্বিজানীহি	১৮২
৪	তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোহসীতি	১৮২
৫	তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি	১৮৩
৬	তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি	১৮৩
৭	অথ বায়মব্রুববন্	১৮৩
৮	তদভ্যদ্রবৎ; তমভ্যবদৎ - কোহসীতি	১৮৩
৯	তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিত	১৮৩
১০	তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি	১৮৪
১১	অথেন্দ্রমব্রুবন্ - মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি	১৮৪
১২	স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্	১৮৪
	চতুর্থ খণ্ডঃ	১৮৭-২০৬
১	সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি	১৮৭
২	তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্	১৯১
৩	তস্মাদ্বা ইন্দ্রোহতিতরামিবান্যান্ দেবান্	১৯১
৪	তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো	১৯২

৫	অথাধ্যাত্মং। যদেতদ্‌গচ্ছতীব চ মনোহনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ	১৯৫
৬	তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্‌	২০০
৭	উপনিষদং ভো ব্রূহীতি উক্তা ত উপনিষদ্‌ ব্রাহ্মীং	২০৩
৮	তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা	২০৫
৯	যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে	২০৬